আল্লাহ্‌র তলোয়ার

[দি সোর্ড অব আল্লাহ]

মেজর জেনারেল এ আই আকরাম

মেজর জেনারেল এ আই আকরাম

আল্লাহ্‌র তলোয়ার

(দি সোর্ড অব আল্লাহ)

(প্রখ্যাত মুসলিম জেনারেল খালিদ বিন ওয়ালীদের সামরিক জীবন ও অভিযানসমূহ)

লে. কর্নেল মোহাম্মদ আবদুল বাতেন, এ ই সি
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল্লাহ্‌র তলোয়ার (পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৮৮)
(দি সোর্ড অব আল্লাহ্)
মূল ঃ মেজর জেনারেল এ আই আকরাম
লে. কর্নেল মোহাম্মদ আবদুল বাতেন.এ ই সি অনূদিত
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলনঃ ২৪৬
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২১৫৯
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.৬৪
ISBN : 984-06-0810-0

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০৪
মাঘ ১৪১০
যিলকদ ১৪২৪

প্রকাশক
শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪

কম্পিউটার কম্পোজ
বোনাফাইড প্রিন্টার্স
১১২, ফকিরাপুল, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৩৫০৩৬৪, ৯৩৫৩৪১৪

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল-আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ঃ মোঃ গিয়াস উদ্দিন খসরু
মূল্য ঃ ১১০.০০ (একশত) টাকা মাত্র।

ALLAHOR TALOWAR (The Sword of Allah) : Written by Major general A I Akram in English and translated by Lieutenant colonel Mohammad Abdul Baten A E C into Bangla and published by Sheikh Abdur Rahim, Director, translation and compilation Department, Islamic foundation Bangladesh, Agargaon Sher-e-Bangla Nagar Dhaka-1207, Phone: 9133394. January 2004
E-mail info @ islamicfoundation-bd.org
Web site: www.islamicfoundation-bd.org
Price: Tk. 110.00; US Dollar 4.00

মহাপরিচালকের কথা

আল্লাহ্র তলোয়ার বা সাইফুল্লাহ্ হচ্ছে বিখ্যাত সাহাবী মহাবীর হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-এর উপাধি। মহানবী (সা) তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করেন। হযরত খালিদের সামরিক অভিযান এবং তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এটি একটি ইতিহাস গ্রন্থ।

এটা মুসলমানদের সোনালি যুগের সামরিক ইতিহাস। ইসলামের বিজয়ের ইতিহাস এবং তৎকালীন ভূগোল পরিচিতি এ গ্রন্থের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

ইংরেজী ভাষায় এ মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেছেন পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অফিসার মেজর জেনারেল এ. আই. আকরাম। ১৯৬৪-১৯৬৮ দীর্ঘ পাঁচ বছর তিনি ব্যাপক অধ্যয়ন ও পরিশ্রম করে এ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৬৯ সালে গ্রন্থটি পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়। হযরত খালিদ (রা)-এর বিচরণক্ষেত্র এবং সামরিক অভিযান স্থলগুলো সরেজমিন প্রত্যক্ষ করার জন্য লেখক সউদি আরব, ইরাক, জর্ডান, লেবানন, কুয়েত ও সিরিয়া ভ্রমণ করেন।

এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে তাঁর জীবন ও ইসলাম গ্রহণ এবং বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রিদ্দার যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইরাকের অভিযানসমূহ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সিরিয়ার রণাঙ্গনসহ অন্যান্য রণাঙ্গনের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

এ গ্রন্থ রচনায় লেখক নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছেন। মহানবী (সা)-এর সেনাপতি হিসেবে হযরত খালিদ (রা) কয়েক বছর হিসেবে রণাঙ্গনে ছিলেন। প্রথম খলীফা হযরত আবূ বাকার সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমার (রা)-এর সেনাপতি হিসেবে তিনি বিভিন্ন সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

ইসলামের ইতিহাসে পাঠকদের চাহিদা পূরণে এটি মহামূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করি। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের জন্যও গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ ও সহায়ক বলে বিবেচিত হবে। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন লে. কর্নেল মোহাম্মদ আবদুল বাতেন। আমরা আশা করব বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাগণ এধরনের গ্রন্থ রচনায় এগিয়ে আসবেন।

এ ধরনের মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য আমরা লেখক ও অনুবাদককে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্যকে তুলে ধরার তাওফীক দিন। আমীন!

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলা ভাষায় ইসলামের মৌলিক বিষয়সহ ইসলামের ইতিহাসের বরেণ্য বক্তিদের জীবনী প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা দেশ-বিদেশের পাঠকদের চাহিদা পূরণে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। ইসলাম বিষয়ক গ্রন্থের সিংহভাগই আরবীতে রচিত। এ ছাড়াও উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় রচিত বইও অনুবাদ করে পাঠকদের চাহিদা পূরণে প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ।

আল্লাহ্‌র তলোয়ার বা সাইফুল্লাহ হচ্ছে বিখ্যাত সাহাবী মহাবীর হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-এর উপাধি। মহানবী (সা) তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করেন। হযরত খালিদের সামরিক অভিযান এবং তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী নিয়ে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অফিসার মেজর জেনারেল এ.আই. আকরাম।

ইসলামের সোনালি যুগের ইতিহাস চর্চায় এটি মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করি। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের জন্যও বইটি গুরুত্বপূর্ণ ও সহায়ক বলে বিবেচিত হবে। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন লে. কর্নেল মোহাম্মদ আবদুল বাতেন। আমরা আশা করব আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যকে তুলে ধরার প্রচেষ্টায় এবং এ ধরনের গ্রন্থ রচনায় বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাগণ এগিয়ে আসবেন।

বইটি সম্পাদনা করেছেন জনাব আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রুফ দেখার মত কষ্টসাধ্য কাজ করেছেন আবদুল বারেক মল্লিক। এ ধরনের মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে আমরা আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। নির্ভুল মুদ্রণের জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। তারপরেও কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সম্মানিত পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইল যেন আমাদেরকে অবহিত করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ইসলামের সোনালি যুগের ঐতিহ্যকে তুলে ধরার তাওফীক দিন। আমীন!

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদকের কথা

খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) সামরিক ইতিহাসের একজন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জেনারেল। তিনি ছিলেন এমন একজন বীর যোদ্ধা যাঁর দীর্ঘ সামরিক জীবনে পরাজয় শব্দটি ছিল অজ্ঞাত। পরিস্থিতির প্রতিকূলতা ও স্বীয় বাহিনীর সৈন্য সংখ্যার স্বল্পতা সত্ত্বেও তিনি কয়েকগুণ শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এমন কিছু অভিযান পরিচালনা করে বিজয় অর্জন করেছিলেন সমর বিদ্যার আলোকে যাকে শুধু বিস্ময়করই বলা যায়। এটা কি করে সম্ভব হয়েছিল ? সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, খালিদ (রা) তাঁর বাহুবল ও ঈমানের শক্তির জোরেই একটির পর একটি যুদ্ধ জয় করেছিলেন। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর কিছু জীবনী-গ্রন্থ পাঠ করেও এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। আসলে কি ব্যাপারটি তাই ? মেজর জেনারেল এ. আই. আকরাম রচিত 'সোর্ড অব আল্লাহ্' গ্রন্থটি পাঠ করে আমি এর সঠিক জবাব লাভ করি। লেখক তাঁর দীর্ঘ সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে খালিদের সামরিক দূরদৃষ্টি ও রণকৌশলের প্রয়োগগত দক্ষতার নিখুঁত বর্ণনা দান করেছেন। তিনি খালিদ পরিচালিত অভিযানসমূহের প্রতিটি ক্ষেত্র সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার সঙ্গে তাঁর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে যুদ্ধগুলোর একটি বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা দাঁড় করাতে সক্ষম হন। যুদ্ধের বর্ণনার পাশাপাশি তিনি খালিদের ব্যক্তিত্বে সামরিক নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ যেভাবে আবিষ্কার করেছেন তা পাঠককে তাঁর প্রতিটি যুদ্ধ জয়ের রহস্য উদঘাটনে সহায়তা করে। খালিদ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সামরিক শিক্ষা তো দূরের কথা সাধারণ শিক্ষা লাভেরও কোনো সুযোগ ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি রণকৌশলের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে প্রজ্ঞা ও দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন তা তুলনাবিহীন। এই গ্রন্থটি পাঠ করলে জানা যায় তিনি কত নিখুঁতভাবে আধুনিক সমরবিদ্যার প্রতিটি কৌশল তাঁর বিভিন্ন যুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন। সে দিক থেকে এই গ্রন্থটি অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

ইসলামের সামরিক ইতিহাসের সূত্রপাত হয় রসূল আকরাম (সা)-এর নেতৃত্বে আর তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে খলীফা আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী মহাপরাক্রমশালী পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য বিজয়ের মধ্যদিয়ে।

পাশাপাশি খালিদেরও সামরিক জীবনের সূত্রপাত হয় ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলল্লাহ (সা)-এর বিরোধিতার মাধ্যমে এবং তা পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানগুলোতে। 'সোর্ড অব আল্লাহ' গ্রন্থটিতে ইসলামের সামরিক ইতিহাসের ও রণকৌশলের এই ধারাটিও অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সবদিক বিবেচনা করে আমি গ্রন্থটির অনুবাদ বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করি। সামরিক পেশায় নিয়োজিত পাঠকগণ তো বটেই, সাধারণ পাঠকগণও গ্রন্থটি পাঠ করে ইসলামের সামরিক ইতিহাস ও রণকৌশলের ক্রমবিকাশের ধারাকে উপলব্ধি করার পাশাপাশি বীরশ্রেষ্ঠ খালিদ বিন ওয়ালীদের সামরিক জীবনকে জানতে পারবেন বলে আশা করি।

গ্রন্থটি অনুবাদ করতে গিয়ে আমি অনেকের নিকট থেকে অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি। আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

মুখবন্ধ

ইসলামের ইতিহাস প্রতিভাদীপ্ত সামরিক সাফল্য ও অস্ত্রের শৌর্যমণ্ডিত কৃতিত্বে পরিপূর্ণ। সামরিক ইতিহাসে এমন কোনো যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যাবে না যা সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সময়োপযোগী চূড়ান্ত আক্রমণ রচনায় দক্ষতার দিক থেকে ইসলামের যুদ্ধকে অতিক্রম করতে পারে, এমন কোনো জেনারেলকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি সাহস ও দক্ষতার ক্ষেত্রে কোনো মুসলিম জেনারেলকে অতিক্রম করতে পারেন। মুসলিম সংস্কৃতিতে তরবারি সব সময় একটি সম্মানজনক অবস্থান দখল করে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামের সামরিক ইতিহাসের সাফল্য সম্পর্কে আজকের দিনে খুব কম লোকই সম্যক অবহিত। ইসলামের এই বিখ্যাত যুদ্ধগুলোর উপরে কোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক ব্যক্তিত্বের দ্বারা যথার্থ গবেষণা ও যুদ্ধক্ষেত্রগুলির সরেজমিনে পুংখানুপুংখ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর লিখিত একটি গ্রন্থও নেই। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধগুলির উপরে কোনো গবেষণাই হয়নি। ক্ষেত্রটি এখন পর্যন্ত পরিত্যক্ত।

কোয়েটা স্টাফ কলেজের (পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ) প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ১৯৬৪ সালে প্রথম আমি এই পরিত্যক্ত ক্ষেত্রটি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করি। সামরিক ইতিহাসের একজন আগ্রহী ছাত্র হিসেবে (স্টাফ কলেজে এই বিষয়টি আমি পড়াতাম) আমার মনে হলো সম্ভবত অনেক মুসলিম সৈনিকের তুলনায় সামরিক সাহিত্যের এই শূন্যস্থানটি পূরণের ব্যাপারে আমার দায়িত্বই বেশি। মুসলমানদের সামরিক অভিযানের সমগ্র ইতিহাস রচনা করতে গেলে তা কয়েক শ খণ্ডে দাঁড়াবে। কিন্তু এই উদ্যোগের সূচনা হওয়া দরকার, তাই আমি এই দুরূহ চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করি। আমি খালিদ বিন ওয়ালীদের (তাঁর উপরে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক) অভিযানগুলো দিয়ে যাত্রা শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

কাজে হাত দিয়ে দেখলাম ইসলামের প্রাথমিক যুগের সামরিক অভিযানগুলোর উপরে পর্যাপ্ত তথ্যসমৃদ্ধ বই-পুস্তক থাকলেও তার সবগুলোর ভাষাই আরবী। প্রাথমিক যুগের মুসলিম ঐতিহাসিকদের সব গ্রন্থও অনূদিত হয়নি, আর যেটুকু হয়েছে তাও যথার্থ নয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলোতে অনুবাদকের সততার অভাব পরিলক্ষিত হয়। আমি যে ধরনের গবেষণামূলক কাজে উদ্যোগী হয়েছি তাতে ঐ ভাষাটি জানা দরকার যে ভাষায় মূল ঘটনার বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। আমি আরবী ভাষা শিখি।

[আট]

এরপর আমি প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকদের রচিত সমস্ত বইয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করি। অবশ্য এই তালিকা থেকে দশম শতাব্দীর পরে জীবিত ছিলেন এবং ইতিহাস রচনা করেছেন এমন ঐতিহাসিকদের মুসলিম অথবা খৃস্টান যেই হোন, বই বাদ দেই। কেননা দশম শতাব্দীর পরের ঐতিহাসিকগণ তাঁদের পূর্ববর্তীদের রচিত গ্রন্থ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। আমি পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে দূরে থাকার লক্ষ্যে প্রাথমিক যুগের তথ্য-উৎসসমূহের মধ্যেই মনোনিবেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। গ্রন্থপঞ্জী অপেক্ষাকৃত সহজে প্রস্তুত করা সম্ভব হলেও বই সংগ্রহ করা মোটেও সহজ ছিল না। কারণ, প্রথমত পাকিস্তানে সব বই পাওয়া যেত না। দ্বিতীয়ত, আরব দেশগুলোতে বইগুলোর দাম ছিল বেশি। এ ব্যাপারে অবশ্য আমি বেশ কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর নিকট থেকে সহায়তা লাভ করি। তাঁরা আমার এই প্রকল্পে তাঁদের শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ বেশ কিছু বই দান করেন। আমার এই শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা হলেন জর্ডানের ব্রিগেডিয়ার মজিদ হাজ হাসান, পাকিস্তানের ব্রিগেডিয়ার এইচ, ইউ, বাবর এবং সৌদী আরবের মেজর নায়েফ আওন শরাফ ও মেজর আব্দুল আজিজ আল-শেখ। উল্লেখ্য যে, এঁদের সবাই কোয়েটা স্টাফ কলেজে আমার ছাত্র ছিলেন। এঁদের সহায়তায় প্রাথমিক যুগের মুসলিম অভিযানগুলোর বর্ণনাসম্বলিত মূল্যবান বই-পুস্তকে আমার পাঠাগার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তথ্যসামগ্রী সংগ্রহের পর আমি গবেষণার কাজ পুরোদমে শুরু করি।

যাঁরা এই জাতীয় গবেষণামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন তাদের সামনে আর একটি অন্যতম প্রধান অন্তরায় হলো নির্ভরযোগ্য ভৌগোলিক তথ্যের অনুপস্থিতি। ভৌগোলিক তথ্যপঞ্জীর সাহায্যে সৃষ্টি হয় সামরিক অভিযান কৌশলের ইতিহাস রচনার অবকাঠামো। যতদূর সম্ভব সমকালের সঠিক ভৌগোলিক তথ্যাদি না জেনে সামরিক অভিযানের ইতিহাস রচনা করা আদৌ সম্ভব নয়। সৌভাগ্যবশত আমি ইসলামের প্রাথমিক যুগের দু'জন বিখ্যাত ভূগোলবিদের দু'টি বিখ্যাত গ্রন্থ পেয়ে যাই। গ্রন্থ দু'টি হলো, ইবনে বুসডার 'আল-আলাক ইন নাফীসা' ও ইয়াকুবীর 'আল-বুলদান'। এই গ্রন্থ দু'টিতে সে সময়ের সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থ দুটোর সাহায্যে আমি সে সময়ের ভূমির অবস্থা উদ্ধার করতে সক্ষম হই এবং বর্তমানে অস্তিত্ব নেই এমন অনেক জায়গাও সঠিকভাবে চিহ্নিত করি। কয়েক সপ্তাহ ধরে গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়নের পর আমি যুদ্ধক্ষেত্রগুলোর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হই এবং ম্যাপগুলো প্রস্তুত করি যা এই বইয়ে সংযুক্ত হলো।

যুদ্ধক্ষেত্রগুলোর ম্যাপ প্রস্তুত করার ব্যাপারে জর্দানের ব্রিগেডিয়ার মজিদ হাজ হাসান ও পাকিস্তানের ব্রিগেডিয়ার এইচ, ইউ, বাবর আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। এ ব্যাপারে আরো অনেকের নিকট থেকে আমি সাহায্য পেয়েছি যাঁদের

মধ্য থেকে অন্তত একটি নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি হলেন বাগদাদের ড. আহমেদ মুসা। তাঁর ইরাকের ঐতিহাসিক এটলাসটি ইরাককে আমার সামনে অত্যন্ত বিস্তৃত আকারে পেশ করে।

মুসলিম যুগের প্রথম কয়েক শতাব্দী জুড়ে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ইতিহাসের ক্ষেত্রেও প্রধান সব ব্যক্তিত্বের প্রায় সবাই ছিলেন মুসলিম। আমি ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে বিশেষ করে মুসলমানদের সিরিয়া বিজয় সম্পর্কে, পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের মতামত জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ি। অনেক অনুসন্ধানের পর অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদের ও নবম শতাব্দীর প্রথম পাদের দু'জন বায়যান্টাইন ঐতিহাসিক যথা নিসেফোরাস ও থিওফেনস-এর সন্ধান লাভ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমার জানা কোনো ভাষায় তাঁদের বইয়ের কোনো অনুবাদ খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে পাশ্চাত্য মতামতের জন্য প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবনের 'দ্যা ডিক্লাইন এন্ড ফল অব দ্যা রোমান এমপায়ার' গ্রন্থটির উপর নির্ভর করতে হয়। তাঁর মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব সত্ত্বেও এই গ্রন্থটি খুবই বিখ্যাত। গিবনের এই গ্রন্থ থেকে আমি ঘটনাপ্রবাহের একটি সাধারণ ধারণা লাভ করি। অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য পাশ্চাত্য গ্রন্থের অভাবে আমাকে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

দশম শতাব্দীর পরবর্তীকালে লিখিত গ্রন্থসমূহকে সাধারণভাবে উপেক্ষা করলেও এই গ্রন্থে ভৌগোলিক তথ্যসমূহ সঠিকভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে আমি পরবর্তীকালে লিখিত কিছু গ্রন্থও অধ্যয়ন করি। আমি ত্রয়োদশ/চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত পণ্ডিত ইয়াকুতের 'মু'জাম-উল-বুলদান' গ্রন্থটি থেকে অনেক সাহায্য নেই। এ ছাড়াও চেক পণ্ডিত এলিওস মুসিল-এর বিখ্যাত 'দ্যা মিড়ল ইউফ্রেটিস' গ্রন্থটি থেকেও আমি অনেক উপকৃত হই। লেখক বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে ইউফ্রেটিসের তীরবর্তী সিরিয়ায় ব্যাপক ভ্রমণ ও উক্ত এলাকার ভৌগোলিক বিষয়াদির ব্যাপক অধ্যয়নের পর গ্রন্থটি রচনা করেন।

সংগৃহীত বই-পুস্তক অধ্যয়ন শেষ হলে আমি এই গ্রন্থের প্রথম খসড়া প্রণয়ন করি। তারপর ১৯৬৮ সালের আগস্টের প্রথম দিকে সেনাবাহিনী থেকে ছুটি নিয়ে পাকিস্তান ত্যাগ করি। প্রথমে আমি ইউরোপে, প্রধানত লন্ডনে, বিশেষ করে ব্রিটিশ জাদুঘরে কিছু সময় অতিবাহিত করে বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যে মুসলিম অভিযানের উপর বই-পুস্তকের অনুসন্ধান করি। প্রাথমিক যুগের পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদদের লিখিত কোনো বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ না পেলেও বৃটিশ জাদুঘর পাঠাগারে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের যুদ্ধক্ষেত্রগুলো পরিদর্শনের লক্ষ্যে আগস্টের শেষ দিকে আমি বৈরুতে অবতরণ করি। যে ভূমির উপর দিয়ে খালিদ (রা) বীরদর্পে মার্চ করেছেন, যেসব স্থানে খালিদ (রা) প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং যে

[দশ]

বালুকারাশির উপর দিয়ে তাঁর শত্রুর রক্তধারা প্রবাহিত হয়েছে তা সরেজমিনে পরিদর্শনের লক্ষ্যে আমার এই অভিযাত্রা। লেবাননে আবুল কুদ্‌স নামক স্থানটি চিহ্নিত করা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ ছিল না। এই স্থানটি থেকে খালিদ (রা) একটি ফাঁদে পড়া মুসলিম দলকে উদ্ধার করেছিলেন। আবুল কুদ্‌স চিহ্নিত করে আমি সড়ক পথে সিরিয়া গমন করি।

সিরিয়ায় আমি খালিদের জয়করা প্রতিটি শহর - দামেস্ক, হেম্‌স, ত্যাদমুর, আলেপ্পো ভ্রমণ করি এবং যেসব স্থানে খালিদ (রা) তাঁর যুদ্ধগুলো পরিচালনা করেছিলেন সেগুলো পরিদর্শন করে সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করি যা এই গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। দামেশকে আমি দুর্গের দেয়াল ও ছয়টি ফটক দর্শন করি যেগুলো এখনো খালিদের সময়ে প্রদত্ত নামেই পরিচিত। অবশ্য দুর্গটির ভেতরের অংশ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। দামেশকে অবস্থানকালে আমি জর্দানের বিখ্যাত জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করি এবং সেখানে এমন কিছু মূল্যবান সহায়ক বই-পুস্তক পাঠ করার সুযোগ লাভ করি যেগুলো আমার ব্যক্তিগত পাঠাগারে ছিল না।

হেমসে আমি খালিদের মসজিদ পরিদর্শনের পবিত্র কর্তব্য পালন করি (এ সময় আমার অনুভূতি ছিল অনেকটা হজ করার মতোই)। এই মহাসমরবিশারদ ব্যক্তিটির দীর্ঘ চার বছর ধরে যাঁকে আমি অধ্যয়ন করছি, যাঁর বিষয়ে মগ্ন হয়ে ভাবছি এবং যাঁকে নিয়ে লিখছি। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আমি অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ি। আমি মসজিদের ভেতরে খালিদ (রা)-এর কবরের পাশে ঘণ্টাখানেক ভাবাচ্ছন্নের মতো বসে থাকি। তারপর দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন বর্তমান যুগের মুসলমাদেরকেও খালিদের মতো বিজয়ী করেন যদিও তারা এর ততোটা উপযুক্ত নয়।

সিরিয়ায় অবস্থানকালে কিন্নাসরীনের অবস্থান খুঁজতে গিয়ে একটি মজার অভিজ্ঞতা অর্জন করি। খালিদ (রা) কিন্নাসরীন দখল করেছিলেন এবং এটাই ছিল তাঁর কমান্ডে সর্বশেষ অভিযান। কিন্নাসরীনের কথা অনেকেই জানতো এবং তারা এও জানতো যে, এলাকাটি আলেপ্পোর পাশে কোথাও অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক ম্যাপেও এলাকাটি একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ হিসেবে চিহ্নিত আছে। কেউ কখনও কিন্নাসরীন পরিদর্শনে গেছেন বলে জানা যায় না। ফলে কেউ বলতে পারে না এলাকাটি কোন্‌দিকে এবং কিভাবে সেখানে যেতে হয়। যাহোক, আমি একটি ট্যাক্সি ভাড়া করি এবং ভাগ্যক্রমে একজন বেদুঈনের সন্ধান পাই যে কিন্নাসরীনের দু'মাইল দূরে বাস করে (যাকে আমি একজন সরলপ্রাণ কৃষক মনে করেছিলাম)। বেদুঈনটি আলেপ্পো শহরে কাজে এসেছিল। আমি তাকে তার গ্রামে নামিয়ে দিলে সে আমাকে কিন্নাসরীন যাওয়ার বাকি পথটুকু দেখিয়ে দেবে। আমি তাকে সংগে নেই। আমরা আলেপ্পোর ১৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে জারবা পর্যন্ত একটি ভাল রাস্তা ধরেই অগ্রসর হই। সেখান থেকে বেদুঈনটির নির্দেশে ভাল রাস্তাটি ছেড়ে একটি গ্রাম্য পায়েহাঁটা

[এগার]

পথ ধরে অগ্রসর হই। এই পথে ট্যাক্সি চালাতে খুব অসুবিধা হয়। পাঁচ মাইল অতিক্রম করার পর আমরা বেদুঈনের গ্রামে পৌঁছলে সে নেমে পড়ে এবং আমাদেরকে জানায়, "সামনের পাহাড় এলাকা ধরে অগ্রসর হলে" আমরা কিন্নাসরীন পৌঁছে যাব। পাহাড়ী এলাকা ধরে অগ্রসর হলে ট্যাক্সিচালক ও আমি বিস্ময়ের সংগে আবিষ্কার করি যে, কিন্নাসরীনের অবস্থান সেই রাস্তাটির উপরেই যা ত্যাগ করে আমরা এই দুর্গম গ্রাম্যপথটি ধরেছিলাম। চতুর বেদুঈন নিজ গ্রাম পর্যন্ত ট্যাক্সিতে আসার জন্য আমাদেরকে এই দুর্গম পথে পরিচালিত করেছিল। তবে আমি তার প্রতি এ জন্য কৃতজ্ঞ যে, সে আমাকে কিন্নাসরীনের দু'মাইল কাছাকাছি এলাকা পর্যন্ত গাইড করে এনেছিল।

সিরিয়ায় অবস্থিত বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ইয়ারমুকের যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন। যুদ্ধবিরতি রেখার নিকটবর্তী হওয়ার কারণে এই এলাকাটি ছিল পরিদর্শনের জন্য নিষিদ্ধ এবং কোনো বিদেশী নাগরিকের সেখানে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। আমি পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত জনাব এ, এ, শেখের নিকট এজন্য কৃতজ্ঞ যে, তাঁর প্রচেষ্টায় সিরীয় সরকার আমাকে আমার ইচ্ছামাফিক যেকোন এলাকা ভ্রমণের অনুমতি দান করে। শুধু তাই নয়, সিরীয় সেনাবাহিনী মেঠোপথে চলার উপযোগী একটি জীপ ও এমন একজন কন্ডাক্টিং অফিসার প্রদান করে যিনি এলাকাটি ভালভাবে চেনেন। এই কন্ডাক্টিং অফিসারের সহায়তা আমার জন্য খুবই মূল্যবান ছিল। তাঁর সহায়তায় আমি দীর্ঘ কয়েকঘণ্টা ধরে ম্যাপ ও কম্পাসের সাহায্যে এই বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রটির বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে সক্ষম হই। আমি যুদ্ধক্ষেত্রটির গোটা সম্মুখরেখা বরাবর জীপ চালিয়ে পরিদর্শন করি, বিভিন্ন সুবিধাজনক অবস্থান থেকে এলাকাটির ভূমি পর্যালোচনা করি এবং ইয়ারমুক নদীর উত্তর তীর হতে ইয়ারমুক গিরিসংকটটি পরিষ্কারভাবে অবলোকন করি। আমি ওয়াদী-উর-রাক্কাদ পরিদর্শনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই। কেননা এটিই ছিল যুদ্ধবিরতি রেখা। তবে ইয়ারমুক গিরিসংকট থেকে তিন মাইল দূরবর্তী গ্রাম শাজারা থেকে আমি এলাকাটি পরিষ্কারভাবে অবলোকন করতে সক্ষম হই। এই ওয়াদী-উর-রাক্কাদে সংঘটিত হয়েছিল ইয়ারমুক যুদ্ধের সর্বশেষ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

ইয়ারমুক পরিদর্শনের পর আমি কন্ডাক্টিং অফিসারসহ বুসরায় গমন করি। সেখানকার বিখ্যাত দুর্গ ও বুসরার ভূমি পরিদর্শন শেষে আমরা দামেশকে প্রত্যাবর্তন করি।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহে সমৃদ্ধ দেশ সিরিয়ায় আমি একপক্ষকাল অতিবাহিত করি। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত জনাব এ, এ, শেখ ও প্রথম সচিব জনাব ফজল রহিমের আন্তরিক সহায়তার ফলে সিরিয়ায় আমার ভ্রমণ ফলপ্রসূ ও আনন্দদায়ক হয়েছিল। সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখে আমি ট্যাক্সিযোগে আম্মান গমন করি।

[বার]

জর্দানে প্রবেশ করে অনুভব করলাম (পূর্ব থেকেও ধারণা ছিল) যে, পাকিস্তানীরা এখানে বিদেশী হিসেবে বিবেচিত নয়। বস্তুত পাকিস্তানের বাইরে পৃথিবীর কোন দেশকেই পাকিস্তানীরা এতটা নিজের মনে করতে পারে না যতটা পারে জর্ডানকে। পাকিস্তানীদের জন্য জর্দানের আন্তরিকতা ও আতিথেয়তা সত্যই অবিস্মরণীয়। সেখানে আমি জর্দান সেনাবাহিনীর মেহমানের মর্যাদা লাভ করি এবং যেসব এলাকা পরিদর্শনের ইচ্ছা পোষণ করি আমাকে সেগুলো ভ্রমণের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। এ জন্য আমি জর্দান সেনাবাহিনীর চীফ অব দ্যা জেনারেল স্টাফ জেনারেল আমের খাম্মাসের নিকট কৃতজ্ঞ। সেই সংগে আমি ঋণী আমার পুরাতন ছাত্র ও বন্ধু ব্রিগেডিয়ার মজিদ হাজ হাসানের প্রতি, যিনি আমার গোটা ভ্রমণটিকে সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের দায়িত্ব স্বীয়স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন এবং তা অত্যন্ত আন্তরিক ও দক্ষতার সংগে সফলভাবে সম্পন্ন করেছিলেন।

ইয়ারমুক নদীর দক্ষিণ তীর হতে ইয়ারমুক যুদ্ধক্ষেত্রটি পর্যালোচনার জন্য আমি একটি গোটা দিন ব্যয় করি। এই পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা সিরিয়ার দিক থেকে ইয়ারমুক যুদ্ধক্ষেত্রকে পরিদর্শনের অভিজ্ঞতাকে আরো সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ করে। আমি ফাহল পরিদর্শন করি এবং জর্দান উপত্যকার ঐ এলাকাটিও ভ্রমণের সুযোগ লাভ করি যেখানে ফাহলের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আমি মূতায় গমন করি এবং যে এলাকাটিকে যুদ্ধক্ষেত্র বলে মনে করা হয় তাতে পদচারণ করি। এই এলাকাটির মধ্যবর্তী অবস্থানে ইদানীং একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। মূতা ভ্রমণকালে বিস্ময়কর হলেও জানতে পারি যে, আজকের দিনেও অনেক লোক দাবি করে তারা মূতার যুদ্ধের মুসলিম যোদ্ধাদের চলাচলের ও প্রতিপক্ষের সাথে সংঘর্ষের অলৌকিক দৃশ্য দেখতে পায়। আমি এরূপ অলৌকিক দৃশ্য দর্শনের দাবিদার দু'ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করি। যে তিনজন মুসলিম কমান্ডার এই যুদ্ধে শাহাদৎ বরণ করেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্র হতে দু'মাইল দূরে মাজার এলাকায় তাঁদেরকে দাফন করা হয়েছে। আমি তাঁদের কবর জিয়ারত ও মুনাজাত করি।

১৯৬৮ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর আমার জর্দান ভ্রমণ শেষ হয়। আমি আকাশ পথে বৈরুত হয়ে বাগদাদ গমন করি। সংগে নিয়ে যাই জর্দানে অবস্থানের আনন্দদায়ক ও হৃদয় ছোঁয়া স্মৃতি। জর্দান দেশটি আকারে ছোট হলেও আবেগ ও আন্তরিকতায় অনেক বড়।

বাগদাদে পৌঁছে দেখি আমার ইরাক ভ্রমণের সমস্ত আয়োজন সুসম্পন্ন। ধন্যবাদ আমাদের সামরিক এটাচী কর্নেল এইচ, এম, আই, আমীনের দূরদর্শিতাকে। ইরাক সরকার আমার এই ইসলামের বিজয় অভিযানের ইতিহাস রচনার প্রকল্পকে ভ্রাতৃসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মূল্যায়ন করেছে। ইরাক সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আবদুল্লা আস-সালুম এই মর্মে লিখিত নির্দেশ জারি করেছেন যে, আমি যে সব এলাকা পরিদর্শন করতে চাই তার যেন সুব্যবস্থা করা হয়। এই সরকারী সহায়তা ছিল

আমার জন্য খুবই মূল্যবান। আমাকে যানবাহন ও ড. মুহাম্মদ বাকীর আল-হুসাইনীর মতো একজন দক্ষ গাইড ও সংগী প্রদান করা হয়।

আমি প্রথম এক সপ্তাহ বাগদাদ জাদুঘরের পাঠাগারে অধ্যয়ন করে এবং ড. সালেহ আহমেদ আল-আলী, ড. আহমেদ মুসা (যাঁর এটলাসের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি) ও জনাব ফুয়াদ শফর-এর মতো ইরাকের বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিদের সংগে আলোচনা করে অতিবাহিত করি। এই আলোচনাগুলো কেন্দ্রীভূত ছিল ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়াদির উপর এবং এর দ্বারা আমি প্রভূত পরিমাণ উপকৃত হই। কিন্তু জর্দান ও সিরিয়ায় আমি যত সহজে খালিদের যুদ্ধক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে সক্ষম হই, ইরাকে ততো সহজে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ, জর্দান ও সিরিয়ায় খালিদের যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছিল বিখ্যাত শহর ও সুবিদিত সমতল ভূমিতে, যেগুলো এখনও দর্শনার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। ইরাকে তাঁর যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরে যেগুলো এখন আর বর্তমান নেই। তদুপরি টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয় দুর্বোধ্য রমণীর মতো যখন যেদিকে খুশি গতি পথ পরিবর্তন করে তাদের ভ্রমণ এলাকার ভৌগোলিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরগুলোকে তাদের তীরবর্তী এলাকার যথাস্থানে চিহ্নিত করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র রহমতে আমি অনেকাংশেই সফলতা লাভ করি। প্রথমে বাগদাদ ও পরে কুফাকে কেন্দ্র করে বেশ ক'দিন ধরে মরুভূমির বুক চিরে শত শত মাইল ভ্রমণ করি। আমি খালিদের প্রত্যেকটি যুদ্ধক্ষেত্র চিহ্নিত ও পরিদর্শন করি শুধু আয়ন-উত-তামর দখলের পর সংঘটিত যুদ্ধগুলোর স্থানসমূহ ছাড়া। এই স্থানগুলোর অস্তিত্ব বর্তমান নেই এবং এগুলোর অবস্থাও সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। এরপর আমি বসরা গমন করে মাজার (বর্তমানে আল-আজেইর নামে পরিচিত) ঘুরে দেখি। আমি উবাল্লা ও হুফেইর এলাকায় গমন করি, যার কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না।

এখানেই শেষ হয় আমার ইরাকে আড়াই সপ্তাহের ভ্রমণ। কর্ণেল আমীনের আতিথেয়তায় আমার ইরাক ভ্রমণ খুবই আনন্দদায়ক ও আরামপ্রদ হয়েছিল। ৮ই অক্টোবর, ১৯৬৮ খৃস্টাব্দে আমি সড়ক পথে কুয়েত গমন করি।

কুয়েতে আমার খুব সামান্য কাজ ছিল। পারস্যবাসীদের সংগে খালিদের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় কাজিমায়। আমি কাজিমা চিহ্নিত করে পরিদর্শন করি (প্রকৃতপক্ষে কাজিমার তেমন কিছু অবশিষ্ট নেই)। ইরাক হতে কুয়েত আগমনের মাত্র দু'দিন পরেই আমি পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন করি। ছয় সপ্তাহের সামান্য কিছু বেশি সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানকালে আমি সড়ক পথে ৪,০০০ মাইলের মতো ভ্রমণ করি।

পরবর্তী চারমাস আমি কর্মস্থলে থেকে এই দীর্ঘ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে ইরাক ও সিরিয়ায় খালিদের পরিচালিত অভিযানসমূহের বর্ণনা পুনরায় লিপিবদ্ধ করি। তার ১৯৬৯ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনের অবশিষ্ট

অংশ সম্পন্ন করার মানসে পুনরায় মরুভূমির উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ি। ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখে বিমানযোগে জেদ্দা পৌঁছলে আমাদের সামরিক এটাচী কর্নেল নূর-উল-হক ও রাজকীয় সৌদী সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি আমাকে অভ্যর্থনা জানান। কর্নেল নূর-উল-হক পূর্বেই সৌদী আরব সরকারকে আমার ভ্রমণের তারিখ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। রাজকীয় সরকার ঐতিহ্যবাহী আরব আতিথেয়তায় হস্ত প্রসারিত করে আমাকে রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানায়। আমি সানন্দে তা গ্রহণ করি। বস্তুত এই সরকারী সহায়তা ছাড়া সৌদী আরবের বিশাল এলাকা ভ্রমণ করা আমার পক্ষে হয়ত সম্ভব হতো না। মরুভূমির বিস্তীর্ণ বালুকারাশির বুক চিরে ভ্রমণ করতে গিয়ে সৌদী সরকারের পবর্তপ্রমাণ ঋণের ব্যাপারে আমি আরো অধিক সচেতন হয়ে উঠি। বিশেষ করে রাজকীয় সেনাবাহিনীর সহায়তা ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রগুলোর ব্যাপক পরিদর্শন আমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কিছুতেই সম্ভব হতো না।

রাজকীয় সেনাবাহিনী আমার জন্য একজন তরুণ ও বুদ্ধিমান কন্ডাকটিং অফিসার নিয়োগ করে। তাঁর নাম ক্যাপ্টেন আব্দুর রহমান আল-হাম্মাদ। সৌদী আরবে পাঁচ সপ্তাহ অবস্থানকালে তিনি বরাবরই আমার সংগে ছিলেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সংগে আমার ভ্রমণের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন।

সৌদী আরবে পৌঁছেই আমি মক্কায় গিয়ে ওমরা হজ্জ পালন করি এবং তারপর রিয়াদ গমন করি। প্রথমে আমি আমার পরিকল্পিত ভ্রমণ এলাকার বৃহত্তর অংশ উত্তর আরবের বিস্তীর্ণ এলাকা পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যাতে পরে মক্কা ও মদীনার আশেপাশের অপেক্ষাকৃত সহজগম্য ও পরিচিত যুদ্ধক্ষেত্রগুলো সহজে পরিদর্শন করা যায়। খালিদ (রা) স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যে অভিযানগুলো পরিচালনা করেছিলেন পরিকল্পনা মাফিক প্রথমে আমি সেই এলাকাগুলো পরিদর্শন করি যা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে।

রিয়াদে তিনদিন অবস্থানকালে আমি গোটা সকাল ব্যয় করি ইয়ামামার যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করে। তারপর সড়কপথে বুরায়দা গমন করি। বুরায়দাতে থেকেই আমি নিব্বাজ (বর্তমানে নাবকিয়া) ও বুতাহ ভ্রমণ করি। ১২ই ফেব্রুয়ারি বিমানযোগে হেইল গমন করি এবং সেখানকার ঠাণ্ডার প্রকোপে অনেকটা বিস্মিত হয়ে পড়ি। হেইলে তিনদিনের অবস্থানকালে স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত খালিদের অভিযানের ক্ষেত্রগুলো পরিদর্শনের জন্য অধিকাংশ সময় মরুভূমির বুকে ঘুরে বেড়াতে হয়। এই এলাকাসমূহ পরিদর্শন কতটুকু কষ্টসাধ্য ছিল তা অনুমান করা যাবে এই অভিজ্ঞতা থেকে যে, শুধু সামীরা ও ঘামারা সরেজমিনে দেখার জন্য আমাকে হেইল থেকে মরুভূমির বুকে ধূলিময় মেঠো পথে দীর্ঘ দশ ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে ২০০ মাইল দূরত্ব ঘুরতে হয়েছে। অথচ এই এলাকা দু'টো ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে খুবই কাছাকাছি। সব কিছুর উর্ধ্বে বড় সমস্যা ছিল ম্যাপ রিডিং -এর জন্য আমাকে নির্ভর করতে হয়েছিল একটি এক মিলিয়ন স্কেল ম্যাপের উপরে।

[পনের]

১৫ই ফেব্রুয়ারি রিয়াদে ফিরে পরদিনই জেদ্দায় প্রত্যাবর্তন করি। এবারে শুরু হয় আমার ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্যায় মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিদর্শন।

১৭ই ফেব্রুয়ারি আমি একটি গোটা দিন ও রাতের জন্য তায়েফ গমন করি। সেখানে তায়েফ অবরোধের প্রাক্কালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ক্যাম্পের জায়গায় নির্মিত মসজিদ পরিদর্শন করি। তায়েফ দুর্গের কোনো ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তায়েফ গমনের পথটি পরিদর্শনের সুযোগ লাভ করি। তায়েফের মনোমুগ্ধকর পরিবেশ ও সুন্দর আবহাওয়া ত্যাগ করতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। তবুও জেদ্দায় ফিরে আসি।

আমি হুনাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে একটি গোটা দিন অতিবাহিত করি। ম্যাপে হুনাইন উপত্যকার মধ্যদিয়ে যে সড়কটি চিহ্নিত আছে সেটাই ছিল একসময় মক্কা থেকে তায়েফগামী প্রধান সড়ক। বর্তমানে মক্কা-তায়েফ নতুন মহাসড়ক নির্মিত হওয়ায় পুরাতন সড়কটি অব্যবহৃত পড়ে আছে। ঝড়-বৃষ্টির কারণে সড়কটি দুর্গম হওয়ায় প্রায়ই আমাদেরকে প্রস্তরময় এলাকা দিয়ে গাড়ি চালাতে হয়েছিল। আমাদের বাহন হিসেবে একটি ল্যান্ড রোভার না থাকলে হুনাইনের যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন হয়তো সম্ভব হতো না। ভাগ্যক্রমে আমি যুদ্ধক্ষেত্রটির পুংখানুপুংখ পর্যালোচনার সুযোগ লাভ করি।

মক্কা বিজয়ের পরিকল্পনাকে ভূমির সংগে মিলিয়ে দেখার জন্য একটি দিন অতিবাহিত করি। আমি মক্কা শহরটি ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করি। ইসলামের প্রাথমিক যুগের তুলনায় বর্তমানে মক্কা শহর এতবেশি বিস্তারলাভ করেছে যে, সেকালের মক্কার সীমানা নির্ধারণ করা অসম্ভব। তবু সেকালের কিছু কিছু স্থান ও নিদর্শন যা এখনও বর্তমান সেগুলো পরিদর্শন করি। আমি কাবার দু'মাইল দক্ষিণের কুদা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দক্ষিণ দিক হতে মক্কায় প্রবেশের পথসমূহ অবলোকন করি। পাহাড়ের চূড়া হতে শহরটির একটি বিস্তৃত চিত্র অংকনের চেষ্টা করি। কিন্তু এলাকাটি পর্বতময় হওয়ায় এবং আমার চিত্রাংকনে সীমিত দক্ষতার কারণে কাজটি খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে আমি পাহাড়গুলোকে বাদ দিয়েই একটি ম্যাপ প্রস্তুত করি। মক্কা শহরের বড় স্কেলের একটি টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ থাকলে হয়তো কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজ হতো। আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, এই বইয়ে সংযুক্ত ৫ নম্বর ম্যাপটির ব্যাপারে আমি নিজেই তৃপ্ত নই। হয়তো পরবর্তীতে মানচিত্রাংকনের প্রতিভাসম্পন্ন কোনো লেখক সৈনিকের প্রচেষ্টাকে পূর্ণতা দান করতে পারবে।

মক্কা ও তার আশেপাশের এলাকা ভ্রমণ এখানেই শেষ হয়। ইতিমধ্যে হজ্জের মওসুম শুরু হয়ে যায়। ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ আমি সৌদী সরকারের মেহমান হিসেবে পবিত্র হজ্জ পালন করি। প্রতিটি মুসলিম হৃদয়ের একান্ত বাসনা এই পবিত্র কর্ম সমাপনান্তে আমি মার্চ মাসের ৪ তারিখে মদীনা গমন করি, ইসলামের যুদ্ধক্ষেত্রগুলো পরিদর্শন পরিকল্পনার সর্বশেষ পর্যায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে।

মদীনা ভ্রমণকালে আমি ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধদ্বয়ের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করার সুযোগ পাই। এ যুদ্ধক্ষেত্র দু'টির বিস্তারিত বর্ণনা এতো সহজলভ্য ও তা সকলের

নিকট এতো সুবিদিত যে, ভূমিতে তা চিহ্নিত করতে কোনো বেগ পেতে হয় না। আমি সংশ্লিষ্ট পাহাড়ী এলাকার কিছু নকশা প্রস্তুত করি যা এই গ্রন্থে সংযুক্ত হয়েছে। আমি মদীনা হতে ৭০ মাইল দূরবর্তী আবরাক ভ্রমণ করি- যেখানে প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) স্বল্পখ্যাত আবরাক যুদ্ধে স্বধর্মত্যাগীদের পরাজিত করেছিলেন। আমার ভ্রমণের এই পর্যায়ের আয়োজন করেছিলেন মেজর মুহাম্মদ আব্দুল হামীদ। এই পর্যায়ে আমি একজন পণ্ডিত ও খ্যাতিমান ঐতিহাসিককে আমার গাইড হিসেবে লাভ করি যাঁর নাম ইব্রাহীম বিন আলী আল-আয়শী। তিনি ছিলেন আমার সব গাইডের মধ্যে উত্তম। মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস ও ভৌগোলিক বিষয়াদি সম্পর্কে তার জ্ঞান দেখে আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি।

মদীনায় পাঁচ দিনের অবস্থান শেষে আমি জেদ্দায় ফিরে যাই এবং সেখান থেকে ১১ই মার্চ, ১৯৬৯ খৃস্টাব্দে পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করি। সৌদী সরকার ও সেনাবাহিনীর যাবতীয় সহায়তা ও আতিথেয়তার জন্য বুকভরা কৃতজ্ঞতাবোধ নিয়ে আমি সৌদী আরব ত্যাগ করি। এই ভ্রমণকালে যেসব সৌদী নাগরিকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয় তাঁদের আন্তরিক আতিথেয়তার জন্যও আমার কৃতজ্ঞতা সীমাহীন। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণী সৌদী সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রিন্স সুলতান বিন আব্দুল আজিজের নিকট। তাঁর মহানুভতায় আমি রাষ্ট্রীয় মেহমানের মর্যাদা লাভ করি। এই মর্যাদা না পেলে হয়তো বিশাল মরুদেশ ভ্রমণ সম্ভব হতো না।

পাকিস্তানে ফিরে দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি কেটে ওঠার সংগে সংগেই আমি খালিদের যুদ্ধক্ষেত্রগুলো ভ্রমণের বিভিন্নমুখী অভিজ্ঞতা ও সংগৃহীত তথ্যাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করি। আমি এই ভেবে আশ্চর্য বোধ করি যে, খালিদের যুদ্ধক্ষেত্রগুলো পরিদর্শনের মতো একটি বিশাল উচ্চাভিলাষী প্রকল্প আমি একক প্রচেষ্টায় সম্পন্ন করি। এটা সম্ভব হয়েছিল শুধু মহান করুণাময়ের অশেষ রহমতের ফলে। এজন্য আমাকে শ্রম, সময় ও আর্থিক দিক থেকে উচ্চমূল্য দিতে হয়েছে। গোটা ব্যাপারটি চিন্তা করে আমার অন্তর আনন্দে ভরে ওঠে এজন্য যে, কোনো সহৃদয় দাতার সাহায্য না নিয়েই (যদিও অনুরূপ কোনো প্রস্তাব ছিল না) নিজ ব্যয়েই আমি প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। আমি মনে করি এটা আমার ইসলামের প্রতি নগণ্য খিদমত, ইসলামের ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রতি সামান্য অবদান এবং একজন বিশ্বাসী হিসাবে বিনীত কুরবানী।

পাণ্ডুলিপিটি পুনরায় লিখতে কয়েক মাস লেগে যায় এবং ১৯৬৯ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তা' মুদ্রণের জন্য প্রেসে যায়। এই প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে আমার পাঁচ বছর সময় লাগে।

এটি একটি ইতিহাস গ্রন্থ, মুসলমানদের সামরিক ইতিহাস। এতে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ একজন সৈনিক খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের জীবনী ও

অভিযানসমূহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। খালিদ (রা) ছিলেন সর্ববিজয়ী এমন একজন বীর যাঁর সামরিক জীবনে পরাজয়ের কোনো ঘটনা ছিল না। সাধারণ ও পেশাগত উভয় শ্রেণীর পাঠকের সুবিধার কথা বিবেচনা করে এই গ্রন্থ রচনায় আমি সর্বজনবোধ্য একটি সহজ ভঙ্গি অনুসরণ করেছি এবং সামরিক পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষ শব্দাবলী পরিহার করার চেষ্টা করেছি।

এই গ্রন্থে বর্ণিত অনেক বিষয়ই হয়তো সাধারণ পাঠকের নিকট নতুন লাগবে, কিন্তু এর প্রতিটি ঘটনাই ঐতিহাসিকভাবে সঠিক। প্রতিটি চলাচল, প্রতিটি দ্বন্দ্বযুদ্ধ, প্রতিটি আঘাত ও প্রতিটি বক্তব্য প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকদের বর্ণনা হতে উদ্ধৃত হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যুদ্ধগুলোর বর্ণনাকালে অনেক ক্ষেত্রে বিচার-বিবেচনাকে প্রাধান্য দিয়েছি, তবে এরূপ ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব আমি আমার উদ্দেশ্যের প্রতি সৎ থাকার চেষ্টা করেছি। যুদ্ধসমূহের বর্ণনাকালে বিশেষ করে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধসমূহের ইতিহাস বর্ণনা করার সময় আমি ইসলামের প্রতিপক্ষকে যেখানে যতটুকু প্রাপ্য কৃতিত্ব দিয়েছি (যা প্রায়ই ঘটেছে) এবং সেই সংগে আমি মুসলমানদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহের উল্লেখ করেছি (যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য)।

প্রাথমিক যুগের ইতিহাসে প্রতিটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া গেলেও মতামতের ভিন্নতার কারণে অনেক বিষয় নিয়েই দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ আছে। সে সময়ে ঐতিহাসিকগণ একটি ঘটনার প্রত্যেকটি বর্ণনা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সংগে লিপিবদ্ধ করে, যদিও সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী, পাঠকের বিচার-বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছেন এই মন্তব্য সহকারে, "এবং আল্লাহই সবকিছু ভাল জানেন।" এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকটভাবে দেখা দেয় সিরিয়া অভিযানের বর্ণনাকালে। এই অভিযানের বর্ণনাসমূহ পাঠ করে পাঠক এতটুকু দ্বিধাদ্বন্দ্বের জালে জড়িয়ে পড়েন যে, তার পক্ষে আদৌ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না, কিভাবে অভিযানটি পরিচালিত হয়েছিল এবং যুদ্ধের ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহই বা কি ?

আমি যে বর্ণনাটিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত মনে করেছি তাই গ্রহণ করেছি ও সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করার চেষ্টা করেছি। আমি বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণের মতামতের পার্থক্যের বর্ণনা দিয়ে গ্রন্থটিকে পাদটীকা ভারাক্রান্ত করতে চাইনি। পাদটীকায় শুধুমাত্র উদ্ধৃত বক্তব্যের উৎসের কথা বলা আছে। পাদটীকার এই উৎসগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে ঐসব পাঠকের জন্য যাঁরা আরো গবেষণা করতে উদ্যোগী হবেন। সাধারণ পাঠক এর বাইরে অধ্যয়নে আগ্রহী না হলে পাদটীকাগুলো উপেক্ষা করতে পারেন। তদুপরি অধিকতর আগ্রহী পাঠকদের সুবিধার্থে গ্রন্থের শেষে সংযুক্ত পরিশিষ্টে কতিপয় গুরুত্ববাহী বিরোধপূর্ণ বিষয়ের উপর নোট দিয়েছি।

[আটার]

এই গ্রন্থের দ্বিতীয়ার্ধে উল্লিখিত কিছু যুদ্ধের বর্ণনা নতুন করে সাজানো হয়েছে, তবে তা করা হয়েছে প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণের প্রদত্ত ঘটনাপঞ্জী ও সুনির্দিষ্ট ইংগিতের উপর ভিত্তি করে। তাঁদের বর্ণনার সংগে আমার পার্থক্য এটুকু যে, তাঁরা যুদ্ধের কোনো ঘটনাকে যুদ্ধবিদ্যা ও কৌশলগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে উদ্যোগী হননি, অথচ আমি একজন সৈনিক ও একজন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে তা করার চেষ্টা করেছি। এখানে প্রতিটি যুদ্ধের অভিযান পরিকল্পনা ব্যাখ্যায় যে দর্শন ফুটে উঠেছে তা একান্তই আমার। ঘটনাপ্রবাহ নেয়া হয়েছে ইতিহাস থেকে। উজ্জ্বল পুষ্পরাজি ইতিহাসের সম্পদ, কিন্তু সেগুলোকে সাজানোর পরিকল্পনা ও গাঁথার সুতা আমার।

প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত যুদ্ধগুলোর বর্ণনা পাঠ করে অনেকের নিকট তা খালিদের না হয়ে বরং রাসূল (সা)-এর সামরিক জীবনের ইতিহাস বলে প্রতিভাত হতে পারে। এটা না হয়ে উপায় কি ? রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় আরবে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক যা কিছু ঘটেছে তাতে আল্লাহর সর্বশেষ বাণীবাহকের আকাশচুম্বী ব্যক্তিত্বের ও তাঁর প্রচারিত বার্তার প্রভাব এতো গভীর ছিল যে, তা উপেক্ষা করা কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব নয়। তদুপরি ইসলাম প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে মদীনাকেন্দ্রিক প্রাথমিক পর্যায়ের যুদ্ধগুলো হতে শুরু করে ইয়ারমুকের যুদ্ধে খালিদের জটিলতম সৈন্য পরিচালনার সময় পর্যন্ত মুসলমানদের যুদ্ধবিদ্যার কলাকৌশলগত অগ্রগতি উপলব্ধি করতে হলে রাসূলুল্লাহ (সা) পরিচালিত অভিযানগুলো অধ্যয়ন অপরিহার্য।

এই প্রকল্পে আমাকে সহায়তা করেছেন এমন অনেকের কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। আরো অনেকে আছেন যাঁরা আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন, কিন্তু জায়গার অভাবে সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। যাহোক, আমার স্ত্রী, যিনি ম্যাপগুলো অংকন করে ও খসড়া দেখে এবং আমার ব্যক্তিগত সহকারী নায়েব সুবেদার আব্দুস সাত্তার শাদ, যিনি পাণ্ডুলিপি টাইপ করে সহায়তা করেছেন–এঁদের প্রতি আমার ঋণ কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করছি।

পরিশেষে আমার এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের জীবনী ও সামরিক কৃতিত্বের ইতিহাস বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। এই উদ্দেশ্য সফল হলে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, না হলেও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই।

অক্টোবর, ১৯৬৯ — এ আই আকরাম

রাওয়ালপিণ্ডি
পাকিস্তান

আরবী নাম সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

আরবের একজন অধিবাসীকে একাধিক নামে সম্বোধন করা হতো। কেন এবং কিভাবে তা করা হতো পাঠকের উপলব্ধির সুবিধার্থে তা ব্যাখ্যা করা হলো।

আরবে জন্মগ্রহণকারী এক ব্যক্তি সাধারণত তিনটি নামে পরিচিত হতো (আরবের সমাজে কোথাও কোথাও এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে)। একটি তার নিজ নাম - ধরুন 'তালহা'। অন্যটি তার পিতার নাম অনুসারে। ধরুন তার পিতার নাম আব্দুল্লাহ। এক্ষেত্রে তার নাম হবে ইবনে অথবা বিন আব্দুল্লাহ অর্থাৎ আব্দুল্লাহর পুত্র। আর তৃতীয় নামটি হতো তার পুত্রের নাম অনুসারে। মনে করুন তার পুত্রের নাম জায়েদ। এক্ষেত্রে তার পরিচিতি হতো আবু জায়েদ অর্থাৎ জায়েদের পিতা হিসেবে। এভাবেই জনৈক ব্যক্তি তিনটি নামে অর্থাৎ তালহা অথবা ইবনে আব্দুল্লাহ অথবা আবু জায়েদ নামে পরিচিত হতো। শেষের নামটিকে বেশি সম্মানজনক বলে মনে করা হতো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবু-কে আবি হিসেবেও উচ্চারণ করা হয়।

যেহেতু পিতা পুত্রের নামে পরিচিত হতো এবং পুত্র পিতার নামে পরিচিত হতো তাই জনৈক পুত্রের পরিচিতি হতো এভাবে - তালহা বিন আবু উসমান অর্থাৎ উসমানের পিতার পুত্র তালহা (উসমান হলো তালহার ভাই)। এমনকি জনৈক ব্যক্তি এভাবেও পরিচিত হতো - তালহা বিন আবী তালহা অর্থাৎ তালহার পিতার পুত্র তালহা। এ ধরনের সম্বোধন অন্য কোনো ভাষায় শুনতে বেখাপ্পা লাগলেও আরবীতে শ্রুতিমধুর।

একই রীতি মহিলাদেরকে সম্বোধনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আসমা নামের একটি মেয়েকে আসমা বিনতে আব্দুল্লাহ অর্থাৎ আব্দুল্লাহর কন্যা নামে সম্বোধন করা হতো। মা হবার পর আবার ছেলে বা মেয়ের নামেও তার পরিচিতি হতো - যেমন উম্মে যায়েদ অর্থাৎ যায়েদের মা।

আরবী নামের বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় প্রচলিত উচ্চারণ বিধিকেই এ গ্রন্থে অনুসরণ করা হয়েছে।

সূচি

প্রথম খণ্ড (২৭-১৩৪)

দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৫-২১৭)

তৃতীয় খণ্ড (২১৯-২৯১)

চতুর্থ খণ্ড (২৯৩-৪৮৭)

মানচিত্রের তালিকা

প্রথম খণ্ড

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় খালিদ (রা)-এর উত্থান

বালক খালিদ

খালিদ ও দীর্ঘকায় বালকটি একে অপরকে তীব্র দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। তারা একে অপরের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় একটি বৃত্তের মধ্যে ধীরে ধীরে ঘুরছে। সেই সংগে তারা প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য কৌশল সম্পর্কেও সদাসতর্ক। তাদের চোখেমুখে শত্রুতার ছাপের পরিবর্তে আছে বিজয়ের দৃঢ় সংকল্প যদিও এটা কৌতুকোদ্দীপক বৈরিতা বৈ কিছুই নয়। খালিদের প্রতিপক্ষ বালকটি হচ্ছে বাঁহাতী, তাই তাকে থাকতে হচ্ছে অধিকতর সতর্ক। কেননা বাঁহাতীরা যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষের উপর সব সময় একটা বিশেষ সুবিধা ভোগ করে।

কুস্তি আরব বালকদের একটি প্রিয় খেলা এবং তারা প্রায়ই একে অপরের সংগে কুস্তি লড়ত। এই লড়াইয়ে কোনো হিংসা বা দ্বেষ কাজ করত না। এটা খেলা বৈ আর কিছুই নয়। আরবী পৌরুষের প্রতীক হিসাবে প্রতিটি বালককে কুস্তি শেখানো হতো। এই বালক দু'টি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সমবয়স্কদের নেতা। কাজেই বলতে গেলে এ লড়াইটি ছিল হেভীওয়েট খেতাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতোই। তারা একে অপরের যথার্থ প্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের বয়সও প্রায়ই সমান - সবেমাত্র একযুগ পেরিয়েছে। তারা উভয়ই লম্বা এবং হালকা। তাদের ঘর্মাক্ত দেহে সূর্যরশ্মির বিকিরণ হলে কাঁধ ও বাহুর নবগঠিত ও স্ফীত পেশীগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দীর্ঘকায় বালকটি খালিদের চেয়ে সম্ভবত এক ইঞ্চি লম্বা। তাদের মুখের গড়নে এতো মিল ছিল যে, সব সময় একজনকে অন্যজন বলে ভুল হতো।

খালিদ দীর্ঘকায় বালকটিকে শূন্যে তুলে নিক্ষেপ করে। পতনটি ছিল মারাত্মক। ফলে দীর্ঘকায় বালকটির পায়ের একটি হাড় ভেংগে-মুচড়ে অদ্ভুত আকার ধারণ করে। আহত বালকটি মাটিতে স্থির হয়ে পড়ে থাকে এবং খালিদও ভীতদৃষ্টিতে তার বন্ধুপ্রতিম ভাগিনার ভাংগা পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে (বালকটির মা হানতামা বিনতে হাশিম বিন আল-মুগীরা খালিদের চাচাতো বোন)।

সময়ের ব্যবধানে দীর্ঘকায় বালকটির পায়ের আঘাত সেরে উঠে এবং সে পুনরায় পূর্বের শক্তি ফিরে পায়। সে আবার কুস্তিতে অংশ নিয়ে সেরা কুস্তিগীরদের একজন

হিসেবে পরিগণিত হয়। বালক দু'টির বন্ধুত্বও অটুট থাকে। তারা উভয়ে ছিল বুদ্ধিমান, শক্তিশালী ও গতিময়, কিন্তু অভাব ছিল ধৈর্য ও কৌশলের। তাই তাদের মধ্যেকার যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হতো দীর্ঘস্থায়ী।

আমাদেরকে এই দীর্ঘকায় বালকটির কথা মনে রাখতে হবে। কেননা সে খালিদের ভবিষ্যৎ জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বালকটি ছিল আল-খাত্তাবের পুত্র এবং তার নাম ছিল ওমর।

কোরেশ বংশের অভিজাত পরিবারগুলোর প্রথামাফিক জন্মের পরপরই খালিদকে মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে মরুভূমির একটি বেদুঈন পরিবারে পাঠানো হয়। তাঁকে লালনপালনের জন্য একজন দুধমাতা ঠিক করা হয়। মরুভূমির শুষ্ক, মুক্ত ও নির্ভেজাল বাতাসের মধ্যে খালিদ সুন্দর ও সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে বেড়ে উঠতে থাকেন। পরবর্তী জীবনে তিনি যে অসাধারণ শক্তিশালী ও সুদৃঢ় দেহের অধিকারী হয়েছিলেন তার গোড়াপত্তন হয় এই বেদুঈন পরিবারের মরুজীবনের মুক্ত পরিবেশেই। মরুজীবনের সংগে খালিদের স্বভাবেরও যেন ছিল অনেক মিল, তাই এই পরিবেশকে তিনি অত্যন্ত আপন করে নিয়েছিলেন। শিশুকাল থেকে পাঁচ-ছয় বছর বয়স পর্যন্ত তিনি এই মরুবাসী আরব পরিবারে কাটানোর পর মক্কায় পিতামাতার কাছে ফিরে আসেন।

বাল্যকালে তিনি একবার গুটি বসন্তে আক্রান্ত হন। মুখে কয়েকটি দাগ ছাড়া এই বসন্তে আর তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। খালিদের চেহারা ছিল অত্যন্ত তেজদীপ্ত ও সুদর্শন। তাঁর সৌন্দর্য শুধু আরব সুন্দরীদেরই চিত্তদাহের কারণ ছিল না, মাঝে মাঝে তাকেও ঝামেলায় ফেলতো। বসন্তের দাগের ফলে তাঁর এই সৌন্দর্যের কোন ক্ষতি হয়নি।

বালক খালিদ কৈশোরে পদার্পণ করেই গৌরবের সংগে উপলব্ধি করেন যে, সে একজন গোত্রপ্রধানের সন্তান। খালিদের পিতা আল-ওয়ালীদ ছিলেন কোরেশদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজাত গোত্র বনী মাখযুমের প্রধান এবং মক্কায় তিনি আল-ওয়ালীদ অর্থাৎ অদ্বিতীয়, এই উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। দুধমাতার নিকট হতে ফিরে আসার পর পিতা স্বয়ং পুত্র খালিদের দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলেন পুত্রের মাঝে সাহসিকতা, সামরিক দক্ষতা, শক্তিমত্তা ও মহানুভবতার মতো আরবীয় পৌরুষের সকল প্রকার গুনের সমাবেশ ঘটানোর। বলাবাহুল্য, তার সে প্রচেষ্টা অদ্ভুতভাবে সফল হয়েছিল। আল-ওয়ালীদ তাঁর পরিবার ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করে খালিদকে বলতো যে, সে নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিদের বংশধর ঃ

খালিদ
↓
আল-ওয়ালীদ
↓
আলমুগীরা
↓
আব্দুল্লাহ
↓
ওমর
↓
মাখযুম (এই ব্যক্তির নামেই গোত্রটি পরিচিত)
↓
ইয়াকজা
↓
মাররা
↓
কা'ব
↓
লুব্যা
↓
গালিব
↓
ফিহর্ (কুরায়শ)
↓
মালিক
↓
আল-নজর
↓
কিনানা
↓
খুযায়মা
↓
মুদরিকা

ইলয়াস
↓
মুদার
↓
নিজার
↓
মা'আদ
↓
আদনান
↓
উদদ্
↓
মুকাবান
↓
নাহুর
↓
তেই'রাহ
↓
ইআরাব
↓
ইয়াশজুব
↓
নাবিত
↓
ইসমাঈল (আরবীয়দের পিতা হিসাবে বিবেচিত)
↓
ইব্রাহীম (নবী)
↓
আজর
↓
নাহুর
↓
সারুগ (অথবা আসরাগ)
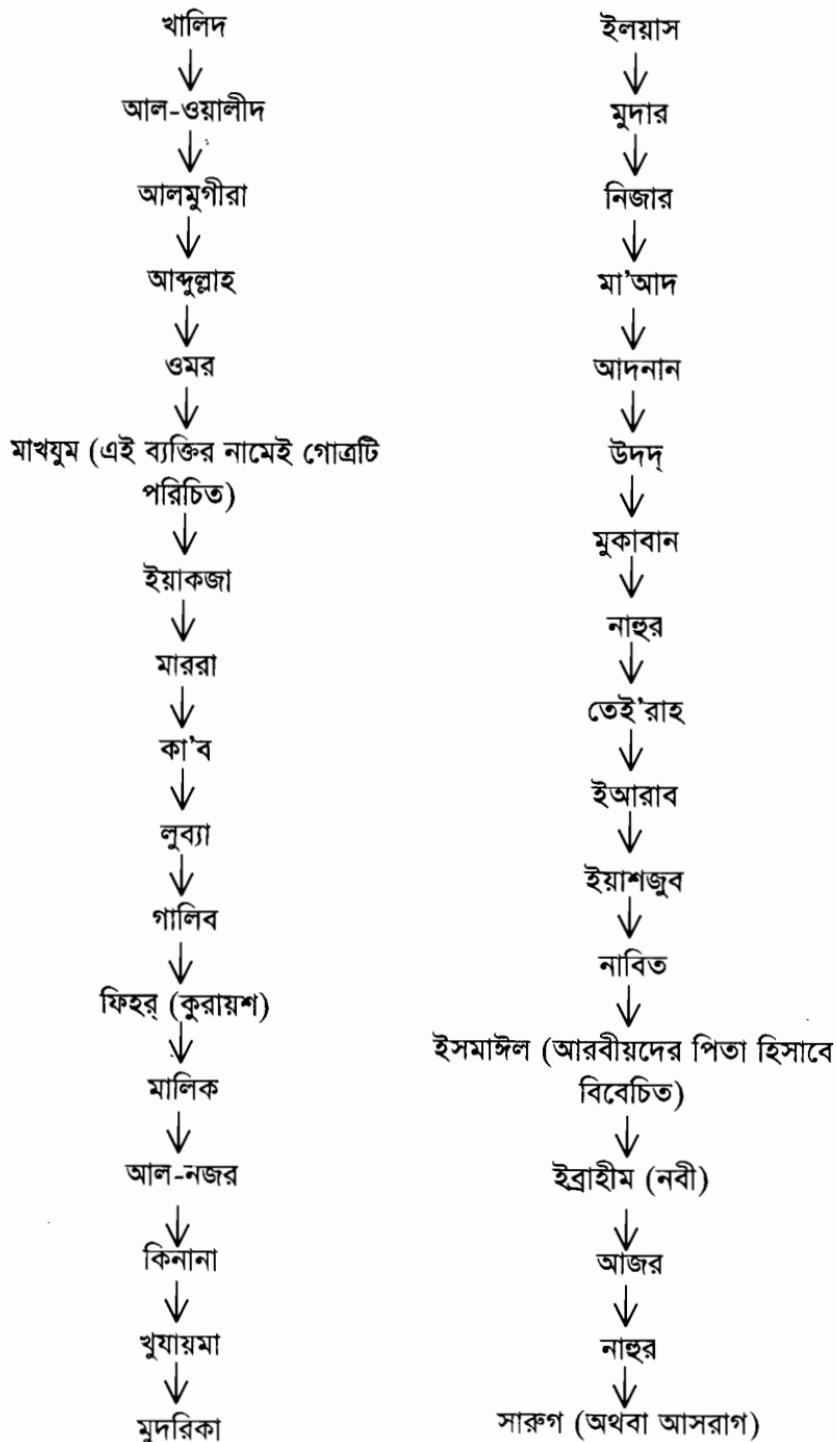
মক্কার কোরেশগণ নিজেদের গোত্রগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা ও দায়-দায়িত্ব বণ্টন করে নিয়েছিল। কোরেশদের মধ্যে বনী হাশিম, বনী আব্দুদ্দার (বনী উমাইয়ার একটি শাখা) এবং বনী মাখযুম ছিল প্রধান তিনটি গোত্র। যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিত দায়িত্ব ছিল বনী মাখযুমের উপর। এই গোত্রের লোকেরা কোরেশদের জন্য যুদ্ধের ঘোড়া জন্মাত ও প্রশিক্ষণ দিতো। তারা বিভিন্ন অভিযানের আয়োজন করতো এবং প্রায়ই যুদ্ধযাত্রী কোরেশ বাহিনীর দলগুলোর নেতৃত্ব দিতো। বনী মাখযুমের এই বিশেষ সামাজিক অবস্থান ও পরিবেশের মধ্যে খালিদ বড় হয়েছিলেন।

বালক অবস্থায় খালিদকে ঘোড়ায় চড়া শেখানো হয়। মাখযুমী হিসেবে তাঁর ঘোড়া চালনায় দক্ষতা অর্জন ছিল অপরিহার্য এবং তিনি খুব দ্রুত তা করতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁকে শুধু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়া চালানোতে দক্ষ হলেই চলবে না। তাঁকে চালাতে জানতে হবে যে কোনো ঘোড়া এবং লাগামহীন পুরুষ অশ্বশাবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে করতে হবে যুদ্ধের উপযোগী ও অনুগত। বনী মাখযুম গোত্রের লোকেরা ছিল আরবদের মধ্যে অশ্বচালনায় উত্তম আর খালিদ গড়ে উঠেছিলেন বনী মাখযুমের লোকদের মধ্যে উত্তম অশ্বচালক হিসেবে। আরবীয় যুদ্ধ ব্যবস্থায় ঘোড়া ও উট ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী। তাই কেউ শুধু অশ্বচালনা জানলেই একজন ভাল চালক হিসেবে দাবি করতে পারতো না। ভাল চালক হতে হলে তাকে সমানভাবে উটও চালাতে জানতে হতো। ঘোড়া ব্যবহার করা হতো যুদ্ধের সময় আর উট দীর্ঘ যাত্রার সময়।

অশ্বচালনার পাশাপাশি খালিদ যুদ্ধ বিদ্যায়ও পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি বর্শা, বল্লম, তীর ও তরবারিসহ সব অস্ত্র ব্যবহারেই দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি অশ্বে আরোহণ করেন এবং পায়দল যুদ্ধ চালনায়ও পারদর্শী হয়। সব অস্ত্র ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করলেও অশ্বারোহণ করে আক্রমণ রচনায় বল্লমের ব্যবহারে তাঁর দক্ষতা ছিল যেন আল্লাহ্প্রদত্ত। অনুরূপ আল্লাহ্প্রদত্ত দক্ষতা ছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধে তরবারির ব্যবহারে, অশ্বারোহণ করেই হোক বা পায়দলেই হোক। তরবারি আরবদের নিকট বীর ধর্মের অস্ত্র হিসেবে বিবেচিত। তরবারি যুদ্ধে অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারটি নির্ভর করে শক্তি ও দক্ষতার উপর। এ দু'টির অভাব থাকলে প্রতিপক্ষ থেকে দূরত্ব রক্ষা করেও টিকে থাকা সম্ভব হতো না। তরবারিই ছিল সে সময়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অস্ত্র।

যৌবনে পৌঁছার সংগে সংগে খালিদের উচ্চতাও বৃদ্ধি পেয়ে ছয়ফুট অতিক্রম করে। তাঁর কাঁধ চওড়া, সীনা স্ফীত এবং হালকা খেলওয়াড়ী শরীরের পেশীগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠে। মুখমণ্ডলে সমাবেশ ঘটে ঘন চাপ-চাপ দাড়ির। সুদর্শন চেহারা, তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব, অশ্ব চালনায় পারদর্শিতা ও অস্ত্র ব্যবহারে দক্ষতার কারণে শীঘ্রই তিনি মক্কায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। কুস্তিতেও তিনি চূড়ান্ত উৎকর্ষ ও অপরিসীম শক্তির সমন্বয়ে সফলতার শীর্ষে আরোহণ করেন।

পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরবীয় পিতারা অনেকগুলো বিয়ে করতো। আল-ওয়ালীদরা ছিল ছয় ভাই (আরও বেশি হতে পারে, মাত্র এই ছয়জনের তথ্যই পাওয়া গেছে) এবং আমাদের জানামতে আল-ওয়ালীদের পাঁচ পুত্র এবং দুই কন্যা ছিল। পুত্রগণ ছিল খালিদ, ওয়ালীদ (পিতার নামেই নাম), হিশাম, উম্মারা এবং আবদ্ শামস। কন্যারা হলেন, ফাখতা ও ফাতিমা।

আল-ওয়ালীদ ছিলেন একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। তাই খালিদকে জীবিকার জন্য কাজ করতে হতো না। ফলে তিনি অশ্বচালনা ও যুদ্ধবিদ্যা চর্চায় মনোনিবেশ করতে পারতেন। সম্পদশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে খালিদ মিতব্যয়িতাকে অবজ্ঞা করতেন এবং মুক্তহস্তে সাহায্য করার মহানুভবতার জন্য তিনি ছিলেন খ্যাত। এ সব কারণে এক সময় তাঁকে দারুণ আর্থিক সংকটে পড়তে হয়েছিল।

কোরেশগণ ছিল বিস্ময়করভাবে গণতন্ত্র ভাবাপন্ন। ফলে উপার্জনের জন্যই হোক বা সমাজের একজন স্বতন্ত্র সক্রিয় সদস্য হিসেবেই হোক প্রত্যেককেই কিছু না কিছু করতে হতো। আল-ওয়ালীদ বিত্তশালী ও অনেক লোকের নিয়োগকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজে কাজ করতেন। অবসর সময়ে তিনি কামারের[১] কাজ করতেন এবং নিজ গোত্রের লোকদের জন্য পশু জবাই[২] করতেন। তিনি ব্যবসাও করতেন এবং অন্যান্য

১. ইবনে কুতেবা, পৃষ্ঠা-৫৭৫
২. ইবনে বুসতা, পৃষ্ঠা-২১৫

গোত্রের সংগে পার্শ্ববর্তী দেশে ব্যবসায়ী দল পাঠাতেন। খালিদ (রা) একাধিকবার এই ব্যবসায়ী দলের সংগে সিরিয়া গমন করেন এবং রোমের মনোরম প্রদেশ ভ্রমণ করেন। এখানেই তাঁর সংগে সাক্ষাৎ হয় গাসসানের আরব খৃস্টান, টেসিফোনের পারসিক, মিসরের কপট্স (Copts) এবং বায়যানটাইন সাম্রাজ্যের রোমকদের সংগে।

খালিদের অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল। তিনি বন্ধু ও ভাইদেরকে নিয়ে ঘোড়া চালাতেন ও শিকারে যেতেন। বাইরের কাজে ব্যস্ত না থাকলে তারা কবিতা আবৃত্তি করতেন, বংশ তালিকা নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করতেন এবং কখনো কখনো পান করতেন। এই বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে খালিদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এদের মধ্যে ওমর ছাড়া আমর ইবনুল আস এবং আবুল হাকামের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবুল হাকামের প্রকৃত নাম ছিল আমর বিন হাশিম ইবনুল মুগীরা। পরবর্তীকালে সে আবু জহল নামেও পরিচিত ছিল। সে ছিল খালিদের চাচাতো ভাই এবং বয়সে বড়। এই আবুল হাকামেরই পুত্র ইকরামা ছিলেন খালিদের প্রিয় ভাতিজা ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

আল-ওয়ালীদ পুত্রদের নিকট শুধু পিতাই ছিলেন না, ছিলেন তাদের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ও সামরিক প্রশিক্ষকও। খালিদ (রা) পিতার নিকট হতেই যুদ্ধবিদ্যার কলাকৌশল সম্পর্কে প্রথম শিক্ষালাভ করেন। মরুভূমির বুক চিরে কিভাবে দ্রুত অগ্রসর হতে হয় এবং কিভাবে একটি শত্রু স্থাপনার দিকে অগ্রসর হয়ে তা আক্রমণ করতে হয় তাও শিখেন। শত্রুকে তার অজ্ঞাতে ধরতে পারা, তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রমণ করা এবং বিশৃংখল ও পলায়নপর প্রতিপক্ষকে তাড়া করার সামরিক গুরুত্বও তিনি পিতার নিকট থেকেই শিক্ষালাভ করেন। এই যুদ্ধকৌশল গোত্রবিশেষের হলেও আরবগণ যথার্থই যুদ্ধের ক্ষেত্রে ক্ষীপ্রতা, গতিময়তা, আকস্মিকতার মূল্য উপলব্ধি করতো। এই যুদ্ধকৌশল ছিল মূলত আক্রমণাত্মক।

বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে যুদ্ধ চর্চার প্রতি খালিদের আগ্রহও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং খুব শীঘ্রই তা বাতিকে পরিণত হয়। যুদ্ধছাড়া তাঁর আর যেন ভাববার কিছুই ছিল না। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল শুধু জয়ের, তাঁর গতি-প্রকৃতি ছিল প্রবল ও আবেগপূর্ণ এবং তাঁর সমগ্র চেতনাই ছিল সামরিকভাবাপন্ন। তিনি সব সময় বিশাল যুদ্ধ ও মহান বিজয়ের স্বপ্ন দেখতেন এবং নিজেকে এই যুদ্ধের বিজয়ী বীর ও সকলের প্রশংসনীয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসেবে কল্পনা করতেন। যুদ্ধই ছিল তাঁর জীবনের প্রতিজ্ঞা। জয় ছিল জীবনের ব্রত। আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রচুর রক্ত ক্ষরণের। আল-ওয়ালীদের পুত্র খালিদ কি তখন জানতেন যে, নিয়তি তাকে সেদিকেই নিয়ে যাচ্ছে!

নতুন বিশ্বাস

জনৈক আরব গভীর রাতে চিন্তাক্লিষ্ট মনে মক্কার রাস্তায় পায়চারি করছেন। তিনি মক্কার মহান গোত্র বনী হাশিমের সদস্য হলেও সম্পদশালী নন। তিনি মাঝারি গড়নের অত্যন্ত সুদর্শন ব্যক্তি। তাঁর কাঁধ চওড়া এবং মাথার কোঁকড়ানো কালো চুল কানের শেষ প্রান্ত বরাবর ঝুলে আছে। তাঁর উজ্জ্বল দ্যুতিময় চোখ দু'টো বেদনাক্লিষ্ট।

আরব সমাজে ও জীবনে এমন অনেক কর্ম ও বিশ্বাস ছিল যা তাঁর মনকে ব্যথিত করতো। তিনি তাঁর আশেপাশের সর্বত্রই দেখতেন পতনের চিহ্ন। গরীব ও অসহায়দের প্রতি অবিচার, অহেতুক রক্তপাত এবং মেয়েদেরকে গৃহপালিত পশুর মতো মনে করা ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। তিনি গভীরভাবে ব্যথিত হতেন যখন কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়ার খবর শুনতেন।

আরবের কিছু গোত্রে কন্যা সন্তান হত্যা করা একটা ধর্মীয় আচারে পরিণত হয়েছিল। কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাকে পাঁচ-ছয় বছর বয়স পর্যন্ত লালন-পালন করা হতো। তারপর একদিন তাকে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে ভাল কাপড়-চোপড় পরিয়ে লোকালয়ের বাইরে তার জন্য খনন করা কবরের পাশে নেয়া হতো। ভাগ্য সম্পর্কে নির্বোধ বালিকা তখনো ভাবতো হয়তো তার পিতা সত্যই তাকে বনভোজনে নিয়ে এসেছে। তাকে ধাক্কা দিয়ে কবরে ফেলে দিলে সে পিতার নিকট সাহায্যের জন্য চিৎকার করতো। সাহায্যের পরিবর্তে তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করা হতো যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কচি দেহ হতে জীবনপাখি বিদায় নিতো। কচি কন্যার ক্ষত-বিক্ষত অসার দেহকে মাটিচাপা দিয়ে পিতা বাড়ি ফিরতো। এই নিয়ে অনেক পিতাকে সগর্বে দম্ভোক্তি করতেও শোনা যেতো।

এই প্রথা অবশ্য আরবের সর্বত্র প্রচলিত ছিল না। বনী হাশিম, বনী উমাইয়া ও বনী মাখযুমের মতো বিখ্যাত পরিবারগুলোতে এরূপ শিশু কন্যা হত্যার একটি দৃষ্টান্ত ও ছিল না এটা সীমিত ছিল কতিপয় মরুগোত্র ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে। তা সত্ত্বেও এসব নিষ্ঠুর বেদনাদায়ক ঘটনা তৎকালীন আরবের বিবেকবান ও সত্যসন্ধানী লোকদের অন্তরকে পীড়া দিতো।

হযরত ইবরাহীম (আ) পবিত্র কাবা তৈরি করেছিলেন আল্লাহর ঘর হিসেবে, কিন্তু পরে তা কাঠ ও পাথরের দেবতার মূর্তি দিয়ে অপবিত্র করা হয়েছিল। আরবের লোকেরা বিশ্বাস করতো যে, এই কাঠ-পাথরের দেবতারা তাদের ক্ষতি বা উপকার

করতে পারে। তাই তারা তাদেরকে সবসময় বিভিন্ন নৈবেদ্য প্রদানের বিনিময়ে তুষ্ট করার চেষ্টা করতো। কাবার ভিতরে ও আশেপাশে ৩৬০ টি মূর্তি ছিল। এদের মধ্যে হুবাল, উজ্জা ও লা'ত ছিল বিখ্যাত। আরব পূজারীদের গৌরব 'হুবাল' ছিল দেবতাদের মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে মূল্যবান পাথরের খোদাই করা মূর্তি। মক্কার অধিবাসীগণ যখন হুবালকে সিরিয়া থেকে আনে তখন এর একটি হাত ভাঙ্গা ছিল। পরে তারা সোনা দিয়ে একটি হাত তৈরি করে বাহুর সংগে লাগিয়ে দেয়।

আরবদের ধর্ম-বিশ্বাসে বহুত্ববাদ ও একত্ববাদের অর্থাৎ প্রকৃত আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসের এক বিস্ময়কর সংমিশ্রণ বিদ্যমান ছিল। তারা বিশ্বাস করতো আল্লাহই প্রকৃত প্রভু ও স্রষ্টা। তবে তারা এটাও বিশ্বাস করতো যে, মূর্তির দেব-দেবীরা হচ্ছে আল্লাহর পুত্র ও কন্যা। দেবত্ব সম্পর্কে আরব ধারণাটা ছিল এরূপ যে, আল্লাহ একটি দেবতা পরিষদের সভাপতি আর অন্যান্য দেব-দেবী হচ্ছে উক্ত পরিষদের সদস্য সদস্যা। এই দেব-দেবীদের ঐশী ক্ষমতা থাকলেও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি তারা অনুগত। আরবগণ যেমন হুবাল ও অন্যান্য দেব-দেবীর নামে শপথ নিতো তদ্রূপ আল্লাহর নামেও শপথ নিতো। তারা তাদের সন্তানদের নাম আব্দুল উয্যা অর্থাৎ উয্যার দাস রাখার পাশাপাশি আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর দাসও রাখতো।

উপরে আরব ধ্যান-ধারণার যে চিত্র পাওয়া গেল তাতে এরূপ মনে করা ঠিক হবে না যে, আরব সংস্কৃতিতে সবকিছুই ছিল খারাপ। গর্ব করার মতো অনেক কিছুই তাদের সংস্কৃতিতে ছিল। আরবীয় চরিত্রে সাহস, আতিথেয়তা এবং ব্যক্তি ও গোত্রীয় সম্মানবোধ এমন প্রশংসনীয় ছিল যা আজকের দিনেও ঈর্ষার সৃষ্টি করে। প্রতিশোধ স্পৃহা ছিল আরবীয় চরিত্রের আর একটি দিক। এই স্পৃহা বংশানুক্রমে বহন করা হতো। অবশ্য আইন-শৃংখলা রক্ষার ব্যবস্থাবিহীন বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত একটি সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখার এছাড়া আর কিইবা উপায় ছিল।

এই সময়ে আরব সমাজের নৈতিকতা ও ধর্মবোধ ছিল সর্বকালের সর্বনিম্নমানের। এই সময়কে বলা হয় অজ্ঞতার যুগ। আর এই অজ্ঞতার যুগের সমস্ত কাজ ও বিশ্বাসকেও বলা হয় অজ্ঞতার কাজ ও বিশ্বাস। অজ্ঞতাই ছিল তাদের জীবন পদ্ধতি।

পূর্বে যে আরবীয় ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে তিনি মক্কার অদূরে পাহাড়ের গুহায় বসে ধ্যান করতেন। তিনি দিনের পর দিন ধ্যান করতেন আর অপেক্ষা করতেন - যদিও নিশ্চিত করে জানতেন না কি আছে তাঁর সামনে। অনুরূপ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় একদিন তিনি কিছু একটার অস্তিত্ব উপলব্ধি করলেন। যদিও কাউকে দেখা গেল না বা কোনো শব্দ পাওয়া গেল না তবু মনে হলো কেউ একজন এসেছে। তারপর একটি শব্দ ভেসে এলো, পড়ুন।

এই ঐশী শব্দে তিনি বিস্মিত হয়ে যান এবং কম্পিত কণ্ঠে বলেন, "আমি পড়তে জানি না।" শব্দটি আরও জোরে পুনরায় উচ্চারিত হলো, 'পড়ুন'। আবার বলেন, "আমি পড়তে জানি না।" শব্দটি আরও ভয়ংকর রূপ ধারণ করে, 'পড়ুন'। তারপর শান্ত স্বরে উচ্চারিত হয়,

"পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন,
মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাটবদ্ধ রক্ত হতে,
পড়ুন আপনার প্রভু অত্যন্ত দয়াময়,
যিনি কলমের দ্বারা শিক্ষা দান করেছেন,
মানুষকে সেই জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানতো না।"[৩]

এই ঘটনাটি ঘটে ৬১০ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসের এক মংগলবারে। উল্লিখিত ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা)। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর উপর পৃথিবীতে ওহী নাযিল হয় এবং একটি নতুন বিশ্বাসের জন্ম হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর ওহী নাযিলের প্রাক্কালে খালিদের বয়স ছিল ২৪ বছর।[৪]

ওহী প্রাপ্তির পর ফেরেশতা জিবরীলের পরামর্শে রাসূলুল্লাহ (সা) তিন বছর চুপে-চাপে ইসলাম প্রচার করেন। তারপর তাঁকে প্রকাশ্যে আল্লাহর বাণী প্রচার করার নির্দেশ দেয়া হলে তিনি স্বীয় পরিবার ও গোত্রের মধ্যে তা শুরু করেন। অধিকাংশই তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। এমন কি তারা এই নতুন বিশ্বাসকে নিয়ে হাসি-তামাশাও করতে থাকে।

একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নিকট-আত্মীয়-স্বজনদেরকে বাসায় দাওয়াত করার সিদ্ধান্ত নেন। উদ্দেশ্য ছিল খাওয়া-দাওয়ার পর যে আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে তাতে তিনি তাঁর মিশনকে উপস্থাপন করতে পারবেন এবং মেহমানদেরকেও তা শুনতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে মেহমানগণ আসেন এবং তৃপ্তি সহকারে আহার করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "ওহে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! আল্লাহর শপথ, আমি যে বাণী নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি, আমার জানা নেই আরবের কোনো লোক এমন কোনো বাণী এনেছে কিনা যা এর চেয়েও উত্তম। আমার এই বাণী ইহজগত ও পরজগতের জন্য উত্তম। আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদেরকে তাঁর পথে ডাকতে। তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ আছ যে এই কাজে আমাকে সাহায্য করবে, আমার ভাই এবং সহকারী হবে।"

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই আহ্বানে উপস্থিত সবাই নিশ্চুপ থাকে। একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে কেউ তাঁর সমর্থনে দাঁড়ায় কি না। এমন সময় বার-চৌদ্দ বছরের এক বালক তাঁর শীর্ণ দুপায়ের উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, "ওহে আল্লাহর রসূল আমিই আপনার সহযোগী হবো।"

---

৩. আল কুরআন ঃ ৯৫ ঃ ১-৫।
৪. খালিদের বয়স সম্পর্কে পরিশিষ্ট 'খ'-এর এক নম্বর নোটে বর্ণনা করা হয়েছে।

বালকটির এই কথায় উপস্থিত মেহমানদের মধ্যে হাসির ফোয়ারা বয়ে যায়। সে হাসিতে ছিল ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ ঝাঁঝ। তারা ধীরে ধীরে উঠে চলে যায়। কিন্তু বালকটি অবিচল দাঁড়িয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে গভীর ভালবাসায় অলিঙ্গন করেন এবং ঘোষণা দেন, " এই বালকই আমার ভাই এবং প্রতিনিধি।"[৫] বালকটি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আবু-তালিবের পুত্র আলী (রা)। তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম পুরুষ।[৬]

সত্যবাণী ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করতে থাকে। কিছু যুবক, দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তি নতুন বিশ্বাসকে গ্রহণ করে। সংখ্যায় কম হলেও তাদের মনোবল ছিল অত্যন্ত উঁচু। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাজের পরিধিও বিস্তার লাভ করে। কোরেশদের শত বাধা ও তিরস্কার সত্ত্বেও তিনি লোকদেরকে সত্যের পথে আহ্বান এবং বাতিল পথের পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করতে থাকেন। তিনি তাদেরকে কাঠ-পাথরের পুতুলের পরিবর্তে প্রকৃত আল্লাহর আনুগত্য করার আহ্বান জানান। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তৎপরতা বৃদ্ধির সংগে কোরেশদের প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিহিংসাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোরেশ পক্ষের নেতৃত্বে ছিল প্রধানত চার ব্যক্তি ঃ আবু সুফিয়ান (বনী উমাইয়ার নেতা এবং প্রকৃত নাম ছিল সাখর বিন হারব), আল-ওয়ালীদ (খালিদের পিতা), আবু লাহাব [রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা] এবং আবুল হাকাম। এঁদের মধ্যে আবু সুফিয়ান এবং আবুল হাকাম সম্পর্কে আমরা আরো অনেক জানতে পারবো।

আবু সুফিয়ান এবং আল-ওয়ালীদ ছিলেন মর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরোধিতা করার সময় তারা এমন কিছু করতেন না যাতে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তিতে খালিদের পিতা আল-ওয়ালীদের মর্যাদাবোধে আঘাত লাগে। তার বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ছিল, নবুয়ত যদি দিতেই হয় তবে মুহাম্মদকে কেন ? তাহলে আমি কোরেশদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ হয়ে কি পেলাম ? তাছাড়াও রয়েছে সাকীফ গোত্রের প্রধান আবু মাসুদ। নিঃসন্দেহে সে এবং আমিই হচ্ছি এই দুই শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।[৭] তার ধারণা ছিল পৃথিবীতে সব কিছুই হয় মানুষের জন্ম ও সামাজিক পদমর্যাদা থেকে। সে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পারিবারিক মর্যাদার কিছুটা অবমূল্যায়ন করেছিল। যদিও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিবার ও আল-ওয়ালীদ ছিল একই বংশের যা ছয় পুরুষ পূর্বে আলাদা হয়ে গেছে। তদুপরি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিবার কোন বিবেচনাতেই তার পরিবার হতে কম অভিজাত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সমসাময়িককালে রাসূলুল্লাহ (সা)-

---

৫. তারারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা -৬৩, ইবনে সাদ, ৯ম খণ্ড পৃষ্ঠা - ১৭১।

৬. ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২৪৫, তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৬, মাসঊদা ঃ মুরুজ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২৮৩।

৭. ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৩৬১।

এর পরিবারই ছিল সবচেয়ে বেশি খ্যাতিমান। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন মক্কার কোরেশগণের প্রধান।

ইবনে হিশামের বর্ণনা মতে আল-ওয়ালীদের উল্লিখিত উক্তির প্রেক্ষিতেই কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ "এবং তারা বলে, এই কুরআন কেন নাযিল হলো না বিখ্যাত শহর দু'টির প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের উপর"-(৪৩ ঃ ৩১)। শহর দু'টি বলতে মক্কা এবং তায়েফকে বুঝানো হয়েছে। মনে করা হয় যে, কুরআনের নিম্নের আয়াতগুলিতেও আল-ওয়ালীদের কথাই বলা হয়েছে। আল-ওয়ালীদ, আল-ওয়াহীদ অর্থাৎ অসাধারণ নামেও পরিচিত ছিল যা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে ঃ "তাকে আমিই দেখবো যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে এবং তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ এবং নিত্যসংগী পুত্রগণকে ও স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ। এর পরেও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দেই। না, তা হবে না, সে তো আমার নির্দেশসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করবো। .... সে আবার চেয়ে দেখলো এবং ভ্রু কুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করলো। তারপর সে পিছন ফিরলো এবং দম্ভ প্রকাশ করে ঘোষণা করলো, এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছুই নয় ঃ এতো মানুষের কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি তাকে নিক্ষেপ করবো আগুনে। কুরআন ঃ ৭৪ ঃ ১১-১৭, এবং ২১-২৬।

উল্লিখিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে আবুল হাকাম ছিল সবচেয়ে বেশি রক্তপিপাসু ও বিদ্বেষপরায়ণ। ইসলামের প্রতি তার এই চরম বিদ্বেষের জন্য মুসলমানগণ তাকে আবু জহল অর্থাৎ মূর্খের পিতা উপাধি দান করে এবং পরবর্তীকালে সে এই নামেই পরিচিত। বেটে-খাটো ও কর্কশ চেহারার এই লোকটি সম্পর্কে সমসাময়িককালের একজন লেখকের বর্ণনা এরূপ ঃ "সে এমন একটি মানুষ যার চেহারা ও জিভ ছিল লোহার তৈরি।"[৮] আবু জহল একটি কথা জীবনে কখনও ভুলতে পারেনি যে, ছোট বেলার এক কুস্তি প্রতিযোগিতায় মুহাম্মদ (সা) তাকে এমনভাবে আছাড় দিয়েছিলেন যাতে তার হাঁটুতে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল তার দাগ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ছিল।[৯]

কোরেশ বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ভয়ভীতি বা লোভ-লালসা দিয়ে মুহাম্মদ (সা)-কে ইসলাম প্রচারে বিরত করতে না পেরে তাঁর চাচা এবং বনী হাশিম গোত্রের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আবু তালিবের নিকট বিচার দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হয়তো হত্যাই করে ফেলতো, কিন্তু একাজ থেকে বিরত থাকে শুধু বনী হাশিম গোত্রের শক্তি ও প্রতিপত্তির ভয়ে। আরবদের গোত্রপ্রীতি ও পারিবারিক ঐক্যই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কোরেশদের হাত হতে রক্ষা করেছিল।

---

৮. ওয়াকিদী ঃ মাগাযী, পৃষ্ঠা ঃ ২০, ইবনে রুসতা ঃ পৃষ্ঠা - ২২৩।

৯. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড; পৃষ্ঠা - ১৫৫।

কোরেশদের প্রতিনিধিদল আবু তালিবের নিকট গিয়ে নালিশ করে, "ওহে আবু তালিব! আপনি আমাদের নেতা এবং আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনি তো দেখছেন আপনার ভাতিজা কি ভাবে আমাদের ধর্মের সংগে বিরূপ আচরণ করছে। সে আমাদের ও আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মকে নিন্দা করে এবং আমাদের খোদাকে তিরস্কার করে। আপনিও তো আমাদের ধর্মেরই একজন। হয় আপনিই এর প্রতিকার করুন, নয়তো আমাদেরকে অনুমতি দিন আমাদের ইচ্ছা মতো ব্যবস্থা গ্রহণের।"[১০]

আবু তালিব প্রতিনিধি দলের সংগে ভাল আচরণ করেন এবং বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়ে তাদেরকে বিদায় করে দেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই ঘটনা অবহিত করা ছাড়া তাঁকে ইসলাম প্রচার হতে বিরত করার কোন পদক্ষেপ নেননি। আবু তালিব একজন কবি ছিলেন। তার জীবনে কোনো ঘটনা ঘটলে তার অনুভূতি তিনি কবিতায় প্রকাশ করে রাখতেন।

আল-ওয়ালীদের বাসায় সার্বক্ষণিক আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তৎপরতা। সন্ধ্যার পর সে তাঁর পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয় নিয়ে বসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোটা দিনের তৎপরতা আলোচনার পাশাপাশি ইসলাম প্রতিরোধের জন্য কোরেশদের পদক্ষেপ পর্যালোচান করতো। এই সান্ধ্যকালীন পারিবারিক অধিবেশনেই খালিদ পিতার মুখে আবু তালিবের নিকট প্রেরিত কোরেশদের প্রথম প্রতিনিধিদলের অভিজ্ঞতার বর্ণনা শোনেন। কয়েক সপ্তাহ পরে একই বৈঠকে তিনি জানতে পারেন যে, কোরেশদের দ্বিতীয় প্রতিনিধিদলও আবু তালিবের নিকট হতে একই অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মিশন অব্যাহত রাখেন।

আল-ওয়ালীদের পরবর্তী পদক্ষেপটি ছিল অত্যন্ত সাহসী। সে মুহাম্মদ (সা) -এর বিনিময়ে স্বীয় পুত্র উম্মারাকে আবু তালিবের নিকট হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উম্মারা ছিল একজন সুদর্শন তরুণ যার মধ্যে অনেক গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। কোরেশ প্রতিনিধি দল উম্মারাকে আবু তালিবের নিকট নিয়ে বললো, "ওহে আবু তালিব! দেখুন আমরা আল-ওয়ালীদের পুত্র উম্মারাকে নিয়ে এসেছি। উম্মারা কোরেশ তরুণদের মধ্যে সর্বোত্তম ও মহৎপ্রাণ। তাকে আপনার পুত্র হিসেবে গ্রহণ করুন। সে আপনাকে পুত্রের মতোই সব ব্যাপারে সহায়তা করবে। বিনিময়ে মুহাম্মদকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করুন, যে আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষদের বিশ্বাসে আঘাত করেছে এবং আমাদের গোত্রের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছে। আমরা তাকে হত্যা করতে চাই–আমরা একজন মানুষের বদলে আর একজন মানুষ দিচ্ছি, এটা কি যথেষ্ট নয় ?"

---

১০. ইবনে হিশাম ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২৬৫, ইবনে সাদ ঃ পৃষ্ঠা - ১৮৬।

আবু তালিব এই প্রস্তাবে খুবই মর্মাহত হন। তিনি প্রতিনিধিদলকে বলেন, "তোমাদের এই প্রস্তাব মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। তোমরা তোমাদের সন্তানকে দিচ্ছ লালন-পালন করার জন্য আর বিনিময়ে আমার সন্তানকে নিতে চাচ্ছ হত্যা করার জন্য। আমি আল্লাহর কসম বলছি, এটা কখনই হতে পারে না"। প্রতিনিধি দল আবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। আমরা জানিনা এতে উম্মারা স্বস্তি বোধ করেছিল, না ব্যথিত হয়েছিল।

আবু তালিবের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বিরত করার কোন সম্ভাবনা না দেখে কোরেশগণ নিজেরাই তাঁর উপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাতে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। তারা রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর অনুসারীদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে থাকে। কোরেশগণ তাদের মুখে ময়লা বালু নিক্ষেপ করতো এবং পথে-ঘাটে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গৃহেও ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করতো। তাদের এই সব কাজে আবু লাহাব এবং আবু জহলও শরীক হয়। কোরেশদের প্রতিবন্ধকতা ক্রমান্বয়ে তীব্র হতে তীব্রতর রূপ লাভ করে।

মুসলমানদের উপর নির্যাতন বৃদ্ধির সংগে সংগে নির্যাতনের নিত্য নতুন কৌশলও উদ্ভব হতে থাকে। রুকানা বিন আব্‌দ ইয়াযীদ নামে একজন খ্যাতিমান কুস্তিগীর জনসম্মুখে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হেয়প্রতিপন্ন করার একটি মজাদার ফন্দি আঁটে। সে ছিল কুস্তিতে খুবই দক্ষ। মক্কার কেউ তাকে কখনও আছাড় দিতে পারেনি। তার ফন্দি ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কুস্তিতে চ্যালেঞ্জ জানাবে। তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে তাঁকে জীবনের মত একটি শিক্ষা দিয়ে দেবে আর চ্যালেঞ্জ প্রত্যাখ্যান করলে সবার সামনে তাঁকে ক্ষুদ্র হতে হবে। লোকটি ছিল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা। সে দর্পভরে চ্যালেঞ্জ করলো, "ওহে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! আমার বিশ্বাস যে তুমি একজন পুরুষ মানুষ। আমি আরও বিশ্বাস করি যে, তুমি মিথ্যুক নও। আসো আমার সংগে কুস্তি লড়ো, যদি আমাকে আছাড় দিতে পারো তাহলে আমি তোমাকে প্রকৃত নবী হিসেবে স্বীকার করবো।"[১১] লোকটি এই ভেবে তৃপ্তি বোধ করে যে, মুহাম্মদ (সা) হয় কুস্তি লড়তে অস্বীকার করবে নতুবা লড়ে পরাজিত হবে। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁকে হেয়প্রতিপন্ন হতে হবে। কিন্তু তার ভাবনা ভাবনাই থেকে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং প্রতিপক্ষকে পরপর তিন বার আছাড় দেন। কিন্তু প্রতারক লোকটি তার ওয়াদা হতে পিছপা হয়।[১২]

---

১১. ইবনে হিশাম ঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২৬৭, ইবনে সাদ ঃ পৃষ্ঠা- ১৮৬।

১২. ইবনে হিশামের মতে (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯০) রাসূলুল্লাহ (সা) রুকানাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থে ইবনুল আমির-এর বর্ণনা (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭, ২৮) উল্লেখ করা হয়েছে। এই বর্ণনাটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) তুলনামূলকভাবে কম দৈহিক আক্রমণের সম্মুখীন হন। কারণ কোরেশগণ তাঁর গোত্রের শক্তি ও তাঁর নিজের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সব সময় বিবেচনায় রাখতো। তাঁকে আঘাত করলে প্রতিঘাতে বেশি মার খেতে হতো। কিন্তু পারিবারিক ও শারীরিক দিক থেকে দুর্বল মুসলমানগণই ছিল কোরেশদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য। ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীগণও ছিল এই দলের অন্তর্গত। একজন ক্রীতদাসীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদে উমর এত ক্ষীপ্ত হন যে, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রহার করতে থাকেন যতক্ষণ নিজে ক্লান্ত হয়ে প্রহারে অক্ষম হয়ে না পড়েন এবং উমর ছিলেন একজন অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি।

কোরেশগণ অসংখ্য মুসলিম নর-নারীকে নির্যাতন করে। এদের মধ্যে আবিসিনিয়ার ক্রীতদাস বিলালের উপর তার মনিব উমাইয়া বিন খাল্‌ফ-এর নির্যাতনের কথা ইতিহাসের পাতায় বিশেষভাবে আসন দখল করে আছে। বিলালকে তাঁর মনিব আরব মরুর খর রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত বালুর উপরে চিত করে শুইয়ে বুকের উপর বিরাটকায় একটি পাথর চাপা দিয়ে রাখতো। মাঝে মাঝে কাছে গিয়ে সে তাঁর সীমাহীন দুর্দশা, যন্ত্রণাকাতর চেহারা ও পিপাসায় শুকনা জিভ ও ঠোঁট দেখে বলতো, "মুহাম্মদকে পরিত্যাগ করো এবং পুনরায় লাত ও উয্‌যার পূজা করো।" কিন্তু বিলাল (রা) ছিলেন তাঁর বিশ্বাসে অনড়। এই অত্যাচার করার সময় উমাইয়া বিন খাল্‌ফ কি ঘুণাক্ষরেও জানতো যে, একদিন বদর প্রান্তরে এই ক্রীতদাসই হবে তার এবং তার পুত্রের ঘাতক!

আবূ বকর (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগীদের মধ্যে সম্পদশালী। তিনি বিলাল (রা) এবং আরও কিছু নির্যাতিত মুসলিম দাস-দাসীকে তাঁদের প্রভুর নিকট হতে ক্রয় করেন। তিনি যখনই কোনো মুসলিম দাস-দাসীকে তাঁদের প্রভুর দ্বারা নির্যাতিত হওয়ার খবর শুনতেন তাদেরকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন।

সীমাহীন নির্যাতন সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) তার শত্রুদের প্রতি ভদ্র ও দয়াপূর্ণ আচরণ করেন। তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন, "হে প্রভু! তুমি উমর কিংবা আবুল হাকামকে দিয়ে আমার শক্তি বৃদ্ধি করে দাও।" এই প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ উমরকে সত্যের পথে নিয়ে আসেন। উমর চল্লিশতম ব্যক্তি হিসেবে ইসলামকে আলিঙ্গন করেন।[১৩] কিন্তু আবু জহল অবিশ্বাসী হিসেবেই মৃত্যুবরণ করে।

রাসূলুল্লাহ (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির দশ বছর পরে ৬১৯ খৃস্টাব্দে আবু তালিব মৃত্যুবরণ করেন।[১৪] তাঁর মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর চাপ আরও বৃদ্ধি পায়। কোরেশদের প্রতিহিংসা তীব্রতর রূপ লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) গুটিকয়েক সংগীকে নিয়ে ইসলাম প্রচারের কাজ অব্যাহত রাখেন। তাঁর সংগীদের মধ্যে দশজন ছিলেন খুবই ঘনিষ্ঠ। এই দশজন ইতিহাসে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ বলে পরিচিত।[১৫]

---

১৩. ইবনে কুতায়বা উমরকে ইসলাম গ্রহণকারী চল্লিশতম ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ১০০) কিন্তু তাবারী উল্লেখ করেছেন সাতষট্টিতম ব্যক্তি হিসেবে (৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৭০)।

১৪. চান্দ্র বছরের হিসেবে দশ বছর। চান্দ্রবছরে সৌরবছর হতে গড়ে ১১ দিন কম থাকে।

১৫. পরিশিষ্ট 'খ'-এর নোট-২-এ এই দশজনের নাম উল্লেখ আছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) অসহনীয় নির্যাতন সত্ত্বেও মক্কায় বসবাস করতে থাকেন। এই দুঃসময়ে মদীনার (সেকালে ইয়াসরীব নামে পরিচিত) কয়েকজন অধিবাসী তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিপদের কথা জানতে পেরে তাঁকে মদীনায় হিজরত করতে বলেন। এ ব্যাপারে আল্লাহর অনুমতিও মিলে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) অধিকাংশ মুসলমানকে মদীনায় পাঠিয়ে দেন।

৬২২ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কোরেশগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের পরিকল্পিত রাতেই রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ বকর, একজন ক্রীতদাস ও পথপ্রদর্শককে সংগে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন। এই ঘটনার ফলে মদীনা ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র এবং নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানীতে পরিণত হয়। নির্যাতনের যুগের এখানেই সমাপ্তি হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা ত্যাগের তিন বছর পর আল-ওয়ালীদ মৃত্যুশয্যায় তার পুত্রগণকে ডেকে বলে, "ওহে পুত্রগণ! তোমাদের জন্য তিনটি অসমাপ্ত কাজ রেখে গেলাম। তোমরা অবশ্যই এই তিনটি কাজ সম্পন্ন করবে। প্রথমত, খোজাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই তোমরা রক্তের প্রতিশোধ নিবে। দ্বিতীয়ত, সাকীফ গোত্রের নিকট আমার প্রাপ্য অর্থ আদায় করবে। তৃতীয়ত, আবূ উজেইহার-এর নিকট আমার ক্ষতিপূরণের অর্থ অথবা রক্ত প্রাপ্য আছে।[১৬] এই লোকটি আল-ওয়ালীদের মেয়েকে বিয়ে করেছিল। সে স্ত্রীকে তার থেকে দূরে রাখতো এবং পিতার নিকটও যেতে দিতো না।

অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশের পর আল-ওয়ালীদ মৃত্যুবরণ করে। তাকে কোরেশদের কৃতী সন্তান ও গোত্রপ্রধান হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

খোজাগণ রক্তের বিনিময়ে অর্থ প্রদান করলে প্রথম সমস্যাটি চিরতরে মিটে যায়। দ্বিতীয় সমস্যাটি শেষ পর্যন্ত সমাধান করা সম্ভব হয়নি। তৃতীয় সমস্যাটির ব্যাপারে খালিদের ভাই হিশাম সিদ্ধান্ত নেয় উজেইহারকে হত্যা করার। সুযোগের অপেক্ষায় এক বছর থেকে সে তার একজন লোককে হত্যা করতে সক্ষম হয়। ফলে সমস্যাটি আরও জটিল রূপ লাভ করে এবং দুই পরিবারের মধ্যে রক্তপাতের আশংকা দেখা দেয়। আবু সুফিয়ানের হস্তক্ষেপে রক্তপাত ছাড়াই সমস্যাটির নিষ্পত্তি হয়।

পিতার মৃত্যুর পরের বছরগুলোতে খালিদ (রা) তার সহায়-সম্পদ নিয়ে মক্কায় সুখে জীবন-যাপন করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি একটি বাণিজ্যিক দলের সংগে সিরিয়ার বিখ্যাত শহর বুসরা সফর করেন। বহু বছর পরে এই বুসরায় তিনি সামরিক অভিযান চালিয়েছিলেন।

এই সময়ে তার কতজন স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে ছিল তা জানা না গেলেও অন্তত দু'জন ছেলের কথা জানা যায়। বড়ছেলের নাম ছিল সুলায়মান এবং ছোটটির নাম ছিল আব্দুর রহমান। ছোট ছেলের জন্ম হয়েছিল আল-ওয়ালীদের মৃত্যুর ছয় বছর পূর্বে। আব্দুর রহমান পরবর্তী দশকগুলোতে সিরিয়ায় কমাণ্ডার হিসেবে খুবই খ্যাতি অর্জন করেন। অবশ্য আরব প্রথা অনুযায়ী সুলায়মানের নামেই খালিদ পরিচিত ছিলেন। তাকে বিভিন্নভাবে সম্বোধন করা হতো, যেমন নিজ নামে খালিদ, পিতার নামে ইবনুল ওয়ালীদ এবং পুত্রের নামে আবু সুলায়মান। অধিকাংশ লোক তাকে আবু সুলায়মান নামেই ডাকতো।

---

১৬. ইবনে হিশাম ঃ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা - ৪১০-৪১১।

ওহুদের যুদ্ধ

প্যালেস্টাইন থেকে বণিকদলটি নিরাপদে ফিরে আসায় মক্কাবাসী আনন্দ ও উল্লাসে উদ্বেল হয়ে ওঠে। কেননা এই বণিক দলটি গত কয়েকদিন ধরে মদীনার পার্শ্ববর্তী উপকূলীয় রাস্তা ধরে দারুণ বিপদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল এবং মুসলিম বাহিনীর হাতে প্রায় ধরা পড়ে যাচ্ছিল। শুধু আবু সুফিয়ানের দক্ষতা ও নেতৃত্বের কারণেই বণিক দলটি নিরাপদে ফিরতে সক্ষম হয়েছে। বণিক দলটির সংগে ছিল ১,০০০ উট ও ৫০,০০০ দীনার মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী। এই যাত্রায় আবু সুফিয়ানের মুনাফা হয়েছিল ১০০%। এই বাণিজ্যিক যাত্রায় মক্কার প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য পরিবারই বিনিয়োগ করেছিল। তাই এই দলটির আশাতীত মুনাফাসহ প্রত্যাবর্তন ছিল প্রতিটি মক্কাবাসীর নিকট আনন্দ-উল্লাসের বিষয়। ঘটনাটি ঘটেছিল ৬২৪ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে। আরবে তখন বসন্ত কাল।

মক্কার লোকেরা যখন উল্লাসে নাচ-গান করছিল এবং ব্যবসায়ীরা তাদের বিপুল মুনাফার অংশ নেয়ার জন্য হাত প্রসারিত করছিল ঠিক সেই সময় বদর যুদ্ধে পর্যুদস্ত ও ছিন্নভিন্ন কোরেশ বাহিনী মক্কার উদ্দেশে তাদের ক্লান্তিকর যাত্রা শুরু করে। আবু সুফিয়ান তার বণিকদলসহ মুসলিমদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা অনুমান করেই সাহায্যের জন্য মক্কায় খবর পাঠিয়েছিল এবং তখনই কোরেশ বাহিনী মক্কা ত্যাগ করেছিল। কিন্তু কোরেশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছার পূর্বেই আবু সুফিয়ান বণিকদলসহ নিরাপদে বিপজ্জনক এলাকা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং কোরেশ বাহিনীকে মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য সংবাদ পাঠায়। কিন্তু কোরেশ বাহিনীর কমান্ডার আবু জহল তাতে কর্ণপাত করে না। সে জীবনের সুদীর্ঘ পনেরটি বছর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তীব্র বিরোধিতায় ব্যয় করেছে। সে এই সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজী নয়। তাই মক্কায় প্রত্যাবর্তন না করে সে মুসলিম বাহিনীর সংগে বদর প্রান্তরে একটি যুদ্ধে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে।

এই দাম্ভিক বাহিনীই এখন দর্পচূর্ণ ভগ্নদশায় মক্কায় ফিরছে।

কোরেশ বাহিনী পথে থাকতেই একজন বার্তাবাহক একটি দ্রুতগামী উটে করে মক্কায় পৌঁছে যায়। সে শহরের উপকণ্ঠে থাকতেই পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়তে ছিঁড়তে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে বদর প্রান্তরের বিষাদময় ঘটনার বর্ণনা দিতে থাকে। মক্কার লোকেরা যুদ্ধের খবর জানার জন্য দ্রুত তার আশেপাশে সমবেত হয়। তারা তাদের প্রিয়জনদের কথা জিজ্ঞেস করতে থাকে এবং সে এক এক করে বলতে থাকে। তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান ও তার স্ত্রী হিন্দ উপস্থিত ছিল।

বার্তাবাহকের নিকট হতে হিন্দ তার প্রিয়জনদের ক্ষয়ক্ষতির খবর জানতে পারে। তার পিতা উতবা, চাচা শায়বা, ভাই ওয়ালীদ ও পুত্র হানজালা এই যুদ্ধে প্রাণ হারায়। এরা সবাই নিহত হয়েছে আলী ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা হামযার হাতে। সে হামযা ও আলীকে অভিশাপ দিতে থাকে এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় জ্বলতে থাকে।

বদরের যুদ্ধ ছিল শত্রুর সংগে মুসলিম বাহিনীর প্রথম বড় ধরনের সংঘর্ষ। ৩১৩ জন মুজাহিদের ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী ১,০০০ অবিশ্বাসীর বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে পাথরের মত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘন্টা দু'য়েকের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুসলিমগণ কোরেশ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফেলে এবং কোরেশগণ বিশৃংখলভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। কোরেশ বাহিনীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণ এই যুদ্ধে নিহত ও বন্দী হয়।

মুসলিম বাহিনীর মাত্র ১৪জন যোদ্ধার শাহাদতের বিনিময়ে বদর যুদ্ধে ৭০জন অবিশ্বাসী কোরেশ নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। নিহতদের মধ্যে ১৭ জনই ছিল বনী মাখযুম গোত্রের। এরা সকলেই ছিল খালিদের চাচাতো ভাই বা ভাতিজা। যুদ্ধে আবু জহলও নিহত হয়। খালিদের ভাই ওয়ালীদ মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়।

বার্তাবাহক নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারীর নাম বলছিল আর কোরেশগণ তা হিসেব করছিল। হত্যাকারীদের তালিকায় হযরত আলী ও হামযার নাম বার বার আসছিল। আলী নিজ হাতে ১৮ জনকে হত্যা করেন এবং অন্য ৪ জনকে হত্যায় অংশ নেন। আর হামযা নিজ হাতে হত্যা করেন ৪ জনকে এবং অন্য ৪ জনকে হত্যায় আলীর সংগে অংশ নেন। তাই কোরেশদের এই দুঃখ–ভারাক্রান্ত সমাবেশে হযরত আলীর নাম বার বার উচ্চারিত হয়।

দু'দিন পরে আবু সুফিয়ান নেতৃস্থানীয় কোরেশদের একটি বৈঠক ডাকে। উপস্থিতদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে বদর যুদ্ধে প্রিয়জনকে হারায়নি। তাদের কেউ হারিয়েছে পিতাকে, কেউ সন্তান ও কেউ ভাইকে। উপস্থিতদের মধ্যে সবচেয়ে হট্টগোলকারী ছিল সাফওয়ান বিন উমাইয়া ও আবু জহলের পুত্র ইকরামা।

ইকরামাকে সংযত করা ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার। তার পিতা বদর যুদ্ধে কোরেশ বাহিনীকে কমান্ড করার বিরল গৌরবের অধিকারী হয় এবং যুদ্ধে প্রাণ হারায়। অবশ্য ইকরামার সামান্য হলেও কিছু সান্ত্বনা ছিল এজন্য যে, বদর যুদ্ধে তার পিতা এবং সে নিজে একজন করে মুসলিম হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল। তদুপরি সে তার পিতার হত্যাকারীকেও জখম করতে পেরেছিল। কিন্তু এতেও তার প্রতিশোধের তৃষ্ণা তৃপ্ত হচ্ছিল না। সে বৈঠককে বরাবর এই মর্মে প্রভাবিত করছিল যে, মহান কোরেশ বংশের সম্মান রক্ষার্থে তাদের প্রতিশোধ নেয়া উচিত।

আবু সুফিয়ান তাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, "যুদ্ধে আমিও পুত্র হানজালাকে হারিয়েছি। আমার প্রতিশোধের তৃষ্ণাও তোমার চেয়ে কম নয়। মুহাম্মদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী অভিযান প্রস্তুত ও পরিচালনা করতে আমি হবো প্রথম ব্যক্তি।[১৭]

---

১৭. ওয়াকিদী ঃ মাগাযী, পৃষ্ঠা - ১৫৬ -৭।

এই বৈঠকে সকলে মিলে একযোগে চরম প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করে। সিদ্ধান্ত হয় যে, মক্কার প্রতিটি লোকের অংশগ্রহণে এমন একটি অভিযানের প্রস্তুতি নেয়া হবে যা পূর্বে কখনও হয়নি। স্থানীয় অন্যান্য গোত্রকেও এই মুসলিম নিশ্চিহ্নকরণ অভিযানে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত হয়। এই অভিযানের ব্যয় নির্বাহের জন্য বণিকদলের সম্পূর্ণ মুনাফা অর্থাৎ প্রায় ৫০,০০০ দীনার খরচ করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আবু সুফিয়ান নেতৃত্ব লাভের পর দুটি নির্দেশ দান করে, যার প্রথমটি প্রায় সকলেই বিনাবাক্যে গ্রহণ করে। প্রথমটি হলো, বদর যুদ্ধে নিহতদের জন্য কেউ কান্না-কাটি বা শোক প্রকাশ করবে না। কেননা চোখের পানিতে মনের তিক্ততা ধুয়েমুছে যেতে পারে। মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তিক্ততাকে সজীব রাখতে হবে। এমনকি যাদের ক্ষতি ছিল অপরিসীম ও দুঃখ ছিল অসহনীয় তারাও প্রকাশ্যে কাঁদতে পারবে না।

দ্বিতীয় নির্দেশটি ছিল মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দীদের সম্পর্কে। বন্দীদেরকে মুক্তির যে কোনো প্রচেষ্টাকে আবু সুফিয়ান নিষিদ্ধ করে দেয়। কেননা এতো তাড়াতাড়ি এই ধরনের উদ্যোগ নিলে মুসলিমগণ অধিক পরিমাণ মুক্তিপণ দাবি করে বসতে পারে। এই সিদ্ধান্তটি অবশ্য সকলে গ্রহণ করতে পারেনি। দু'দিনের মধ্যেই জনৈক ব্যক্তি তার পিতাকে পণের বিনিময়ে মুক্ত করার লক্ষ্যে গোপনে মক্কা ত্যাগ করে। এই খবর জানাজানি হলে অন্যরাও সিদ্ধান্ত নিজের হাতে তুলে নেয় এবং প্রিয়জনদেরকে মুক্ত করে আনে। দ্বিতীয় নির্দেশটি বাতিল করা ছাড়া আবু সুফিয়ানের কোনো উপায় ছিল না।

মুক্তিপণের মাত্রা ছিল বিভিন্ন রকমের। সর্বোচ্চ ছিল ৪,০০০ দিরহাম। অবশ্য দরিদ্রদের নিকট হতে সর্বনিম্ন ১,০০০ দিরহামও গ্রহণ করা হয়েছিল। কিছু বন্দী ছিল মুক্তিপণ দিতে অক্ষম কিন্তু শিক্ষিত। তারা মুসলিম বালক-বালিকাদেরকে লেখাপড়া শিখানোর বিনিময়ে মুক্তিলাভ করেছিল। কিছু দুর্দশাগ্রস্ত বন্দীকে রাসূলুল্লাহ (সা) মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর কখনও অস্ত্র ধারণ করবে না।

বন্দীমুক্তির তৎপরতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইকরামা, খালিদ ও তার ভাই হিশামও ছিল। খালিদ হিজাযে অনুপস্থিত থাকার কারণে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। খালিদ ও হিশাম তাদের ভাই ওয়ালীদের মুক্তির ব্যবস্থা করে। মুক্তিপণের অংক ৪,০০০ দিরহাম শুনে হিশাম দরকষাকষি শুরু করে। ফলে খালিদ তাকে তিরস্কার করেন। শেষ পর্যন্ত ওয়ালীদকে ৪,০০০ দিরহামের বিনিময়েই মুক্ত করা হয়। তিন ভাই মক্কার উদ্দেশে মদীনা ত্যাগ করে এবং কয়েক মাইল দূরে রাত যাপনের জন্য জুলহুলায়ফা নামক স্থানে তাঁবু ফেলে। ওয়ালীদ এখান হতে রাতে পালিয়ে মদীনায় ফিরে যান এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করে ইসলাম

গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও খালিদের সংগে তাঁর সম্পর্ক ছিল পূর্বের মতোই উষ্ণ ও প্রীতিময়।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিশোধের স্পৃহা প্রাধান্য পেলেও অর্থনৈতিক অস্তিত্বের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে কোরেশ বাণিজ্য দলের যাতায়াতের উপকূলীয় রাস্তাটি বদরের যুদ্ধের পর চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। সাফওয়ান বিন উমাইয়া নিরাপদ ভেবে অন্য একটি পথে সিরিয়ার উদ্দেশে একটি বণিকদল পাঠায়। এই দলটি ইরাকের পথে মক্কা ত্যাগ করে এবং কিছু দূর যাওয়ার পর মদীনাকে এড়িয়ে উত্তর-পশ্চিমে সিরিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করে। তারা এই রাস্তাটিকে নিরাপদ মনে করেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এই সংবাদটি জানতে পেরে যায়দকে ১০০ সৈনিকসহ পাঠান এবং তিনি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশমত বন্দী করে নিয়ে আসেন।

এই ঘটনার পর সাফওয়ান আবু সুফিয়ানের সংগে মিলিত হয়। দু'নেতা একমত পোষণ করে যে, সিরিয়ার সংগে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে যেহেতু তাদের অর্থনৈতিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নির্ভরশীল, তাই যতো তাড়াতাড়ি মুসলিমদেরকে ধ্বংস করে পথ উন্মুক্ত করা যায় ততোই মঙ্গল। ইকরামা অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং অভিযান দ্রুততর করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। আবু সুফিয়ান তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা হতে জানতো যে, একটি অভিযান প্রস্তুত করতে এবং উট, ঘোড়া, অস্ত্র ইত্যাদি ক্রয় করতে অনেক সময় দরকার। তবুও সে যতো দ্রুত সম্ভব সব কিছু করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

অভিযানের যথার্থ প্রস্তুতি শুরু হয়। প্রস্তুতি চলাকালে একজন সন্ধেহজনক অবিশ্বাসী একটি প্রস্তাব নিয়ে আবু সুফিয়ানের সংগে সাক্ষাৎ করে। লোকটি মদীনার আবু আমের। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় হিজরত ও তার আউস গোত্রের লোকদের দ্রুত ইসলাম গ্রহণ কোনটিকেই ভালভাবে নিতে পারেনি। ফলে সে মদীনা ত্যাগ করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানকার ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত ফিরে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মক্কায় সে কোরেশদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। এক সময় আবু আমের সাধু নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নাম দেন মুনাফিক (প্রতারক)।[১৮]

সে আবু সুফিয়ানকে বলে, "আমার সংগে আমার গোত্রের ৫০ জন সদস্য আছে। আমার আউস গোত্রের উপর আমার যথেষ্ট প্রভাব আছে। আমি মনে করি যুদ্ধ শুরুর পূর্বে মুসলিম বাহিনীর সংগে যোগদানকারী আমার গোত্রের লোকদের উদ্দেশে কিছু বলার সুযোগ দিলে তারা মুহাম্মদকে ত্যাগ করে আমার দলে যোগদান করবে।"[১৯]

১৮. ইবনে হিশাম ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬৭।
১৯. ওয়াকিদী ঃ মাগাযী, পৃষ্ঠা - ১৬১।

আবু সুফিয়ান এই প্রস্তাবটি আনন্দচিত্তে গ্রহণ করে। মদীনার প্রধান দু'টি গোত্রের মধ্যে আউস একটি এবং মুসলিম বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য ছিল এই গোত্রের।

পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে এবং কিনানা ও সাকীফ গোত্রের দু'টি শক্তিশালী দল কোরেশদের পক্ষে যোগদান করে। ৬২৫ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম দিকে মক্কায় অভিযানকারীদের সমাবেশ ঘটতে থাকে। এই সময় মক্কা থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আব্বাস তাঁকে কোরেশদের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে জানান।

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে কোরেশগণ মক্কা ত্যাগ করে। তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩,০০০। এর মধ্যে ৭০০ ছিল কর্মচারী। এছাড়াও ছিল ৩,০০০ উট ও ২০০ ঘোড়া। সংগে শিবিকায় করে ১৫ জন কোরেশ রমণীও যোগদান করে যাদের দায়িত্ব ছিল বদর প্রান্তরে নিহত প্রিয়জনদের কথা সৈনিকদেরকে মনে করিয়ে দেয়া ও তাদের মনোবল বৃদ্ধি করা। মহিলাদের এই দলের নেতৃত্ব দেয় হিন্দ। অন্যদের মধ্যে ছিল ইকরামার স্ত্রী, আমর ইবনুল আস-এর স্ত্রী ও খালিদের বোন। এই মহিলাদের মধ্য থেকে একজনের সম্পর্কে আমরা পরে আরো জানতে পারবো। তাদের মধ্যে কয়েকজন গায়িকাও ছিল, যারা সংগে নিয়েছিল তাম্বুরা ও ড্রাম।

মদীনার পথে যাত্রাকালে কোরেশদের জনৈক নেতা জুবায়ের ইবন মুতইম তার ক্রীতদাস ওয়াহ্শীকে (বিন হারব) প্রস্তাব দিল, "বদর প্রান্তরে আমার চাচার হত্যাকারী মুহাম্মদের চাচা হামযাকে তুমি হত্যা করতে পারলে তোমাকে মুক্ত করে দেবো।"[২০] ক্রীতদাসটি ছিল নিষ্ঠুর ও বর্বর প্রকৃতির জন্য বিখ্যাত। প্রভুর প্রস্তাবটি তার খুব পছন্দ হয়। বিশাল দেহের অধিকারী আবিসিনিয়ার এই কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসটি সব সময় তার মাতৃভূমি আফ্রিকার একটি বর্শা দিয়ে যুদ্ধ করতো। বর্শা নিক্ষেপে সে ছিল অত্যন্ত দক্ষ এবং তার নিক্ষেপ লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কথা কখনও শোনা যায়নি।

আরও কিছু দূর চলার পর বর্বর ক্রীতদাসটি দেখলো একটি শিবিকা বহনকারী উট তার পাশে এলো। শিবিকা হতে তার দিকে তাকিয়ে হিন্দ বললো, "ওহে কৃষ্ণ বর্ণের পিতা! সুস্থ থাকো এবং তোমার পুরস্কার জিতে নাও।"[২১] সেও তার দেহের সমস্ত গয়না দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় যদি সে তার পিতার হত্যাকারী হামযাকে হত্যা করতে পারে।

লোভে ক্রীতদাসটির চোখ জ্বল জ্বল করতে থাকে। সে লোভাতুর দৃষ্টিতে হিন্দের গয়নাগুলোর দিকে তাকাতে থাকে। গয়নাগুলো ছিল খুবই মূল্যবান এবং ওগুলো পাওয়ার সম্ভাবনায় তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কোরেশগণ মক্কা ত্যাগ করার পূর্বেই আব্বাস তাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কোরেশগণ মদীনার পথে থাকাকালে তিনি

---

২০. ইবনে হিশাম ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬১-৬২।
২১. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬১-৬২।

বন্ধুসুলভ গোত্রগুলোর নিকট হতে অনবরত খবরাখবর পেতে থাকেন। মার্চের ২০ তারিখে কোরেশগণ মদীনার কয়েক মাইল দূরে পৌঁছে ওহুদ পর্বতের পশ্চিমে গাছপালায় পরিপূর্ণ একটি এলাকায় ক্যাম্প করে। একই দিনে রাসূলুল্লাহ (সা) কোরেশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য দুজন স্কাউট পাঠিয়ে দেন এবং তারা শত্রুর প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে সঠিক তথ্য নিয়ে ফিরে আসে।

মার্চের ২১ তারিখে রাসূলুল্লাহ (সা) ১,০০০ সৈন্যসহ মদীনা ত্যাগ করেন। এদের মধ্যে ১০০ জন ছিল বর্মধারী। মুসলিম বাহিনীর ছিল মাত্র দুটি ঘোড়া যার একটি ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর। তাঁরা মদীনার এক মাইলেরও কিছু বেশি উত্তরে শায়খায়ন নামক একটি কৃষ্ণ বর্ণ ক্ষুদ্র পর্বতের পাশে রাত যাপনের জন্য ক্যাম্প করেন।

পরদিন সকালে যাত্রা শুরুর পূর্বেই আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের নেতৃত্বে ৩০০ জনের একটি মুনাফিক দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ ত্যাগ করে। তাদের অজুহাত ছিল যে, কোরেশদের সংগে মদীনার বাইরে যুদ্ধ করে জয়লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। অতএব তারা পরাজয় নিশ্চিত জেনেও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণে রাজী নয়। মুনাফিকরা ফিরে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০০ জনে এবং তিনি এই শক্তি নিয়েই ক্যাম্প ত্যাগ করেন। প্রকৃতপক্ষে মদীনার বাইরে যুদ্ধ করার ইচ্ছা রাসূলুল্লাহ (সা)-এরও ছিল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল মুসলিমগণ তাদের আবাস ভূমিতেই কোরেশদের জন্য অপেক্ষা করবে এবং মদীনার মাটিতে যুদ্ধ হবে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম মদীনার বাইরে গিয়ে কোরেশদের মুকাবিলা করার পক্ষে মতামত দেয়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) অধিকাংশের মতামতকে গ্রহণ করে মদীনার বাইরে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং যাত্রা শুরু করেন। তিনি উন্মুক্ত আকাশের নীচে যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হলেও কৌশলগত দিক থেকে তার পছন্দমত জায়গায় শত্রুকে পেতে চান। তাই ওহুদ পর্বতের পাদদেশে গিয়ে সৈন্য মোতায়েন করেন।

ওহুদ মদীনার ৪ মাইল উত্তরে (মদীনার মসজিদে নববী হতে এই দূরত্ব হিসাব করা হয়েছে) বিস্তৃত একটি বিশাল পাহাড়ী এলাকা। সমতল ভূমি হতে এর উচ্চতা ১,০০০ ফুট পর্যন্ত। এলাকাটি ৫ মাইল দীর্ঘ। এই শৈলশ্রেণীর পশ্চিম অংশ হতে একটি বৃহৎ আকৃতির পর্বত খাড়াভাবে মাটিতে নেমে গেছে এবং এর ডান দিকের (মদীনার দিক থেকে তাকালে) পাদদেশ হতে একটি উপত্যকা মৃদুভাবে উপরের দিকে উঠতে উঠতে ১,০০০ গজ দূরে সংকীর্ণ গিরিপথের রূপ লাভ করে। এই সংকীর্ণ গিরিপথটির পরে উপত্যকাটি প্রধান শৈলশ্রেণীর দেয়ালের সংগে মিশে যায়। খাড়া পর্বতটির পাদদেশে উপত্যকার মুখেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সৈন্য সমাবেশ করেন। উপত্যকাটি তার পেছনে বিস্তৃত হয়ে উঠে গেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিম বাহিনীকে ১,০০০ গজের সম্মুখ ভাগ নিয়ে নিবিড়ভাবে সংগঠিত করেন। তিনি তাঁর বাহিনীর দক্ষিণ বাহুকে মোতায়েন করেন খাড়া পর্বতটির পাদদেশে এবং বাম বাহুকে নীচু পাহাড়ের মূলে। আয়নায়ন নামের এই পাহাড়টি

প্রায় ৪০ ফুট উঁচু ও ৫০০ ফুট দীর্ঘ। মুসলিম বাহিনীর দক্ষিণ বাহু ছিল নিরাপদ, কিন্তু বামবাহু আয়নায়নের অপর পার্শ্ব দিয়ে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা ছিল। এই বিপদ মুকাবিলার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) ৫০ জন তীরন্দাজকে আয়নায়ন পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ দান করেন যাতে তারা মুসলিম বাহিনীকে শত্রুর দ্বারা পেছন দিক থেকে আক্রমণের হাত হতে রক্ষা করতে পারে। আব্দুল্লাহ বিন জুবায়রের নেতৃত্বে এই তীরন্দাজ বাহিনীর উপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ ছিল, "শত্রুর অশ্বারোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে তোমাদের তীর ব্যবহার করবে। আমাদের পেছন দিকে শত্রুর অশ্বারোহী আক্রমণমুক্ত রাখবে। তোমরা যতক্ষণ তোমাদের অবস্থান সুদৃঢ় রাখবে আমাদের পেছন দিক ততক্ষণ নিরাপদ থাকবে। কোন অবস্থাতেই তোমরা এই অবস্থান ত্যাগ করবে না। আমাদেরকে জয়ী হতে দেখলেও আমাদের সংগে যোগদান করবে না বা পরাজিত হতে দেখলেও আমাদের সাহায্যে অগ্রসর হবে না।"[২২] তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি এই নির্দেশটি ছিল অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। আয়নায়ন ছিল যুদ্ধ কৌশলের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পাহাড়, যেখান থেকে আশেপাশের এলাকাকে সহজেই প্রভাবিত করা যায়। তাই এটা শত্রুর হাত হতে রক্ষা করা ছিল খুবই অপরিহার্য।

মুসলিম বাহিনীর পেছনেই ছিল ১৪ জন রমণীর অবস্থান। তাঁদের কাজ ছিল তৃষ্ণার্তকে পানি দেয়া এবং আহত যোদ্ধাদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে নিয়ে সেবা করা। এঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা ও আলীর স্ত্রী ফাতিমা (রা)ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে তাঁর বাহিনীর বাম বাহুর সংগে অবস্থান নেন।

একটি সম্মুখ-অবস্থান যুদ্ধ সংঘটিত করার লক্ষ্যে মুসলিম বাহিনীকে বিন্যাস করা হয় এবং এই বিন্যাস ছিল অত্যন্ত চমৎকার ও সুচিন্তিত। এই বিন্যাস তাদেরকে সমস্ত শক্তি, সাহস ও দক্ষতাকে যথার্থভাবে ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়। এই বিন্যাসগত সুবিধার কারণেই তারা শত্রুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও অশ্বারোহী বাহিনীর প্রাধান্যকে মুকাবিলা করতে সক্ষম হয় এবং শত্রুও তাদের অশ্বারোহী বাহিনীর সুবিধাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া শত্রুর অশ্বারোহী বাহিনীর মুকাবিলা করার কোনো ব্যবস্থা মুসলমানদের ছিল না। আবু সুফিয়ানের জন্য সুবিধাজনক হতো যুদ্ধটি খোলা মাঠেই সংঘটিত হলে। এতে সে তার অশ্বারোহী বাহিনীকে মুসলিম বাহিনীর পার্শ্ব বা পিছন দিয়ে কৌশলে পরিচালনার সুযোগ করতে পারতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) আবু সুফিয়ানকে সে সুযোগ না দিয়ে বরং তাকে একটি সংকীর্ণ জায়গায় সম্মুখযুদ্ধে বাধ্য করেন যেখানে তার সৈন্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও অশ্বারোহী বাহিনীর প্রাধান্যের ব্যবহারও সীমিত হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, মুসলিম বাহিনী অবস্থান নিয়েছিল মদীনার দিকে মুখ করে এবং পিছনে ছিল ওহুদ পর্বতশ্রেণী। মদীনার পথ কোরেশদের জন্য ছিল উন্মুক্ত।

---

২২. ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬৫-৬৬, ওয়াকিদী ঃ মাগাযী, পৃষ্ঠা - ১৭৫।

কোরেশ বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হয়। তারা খাড়া পর্বতটির ১ মাইল দক্ষিণে যুদ্ধের তাঁবু স্থাপন করে এবং এখান থেকে আবু সুফিয়ান তার বাহিনীকে যুদ্ধসাজে বিন্যাস করে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি করে। সে মধ্যে পদাতিক ও দু-বাহুতে গতিময় অশ্বারোহী বাহিনী স্থাপন করে সৈন্য বিন্যাস করে। ডান বাহুতে খালিদ ও বাম বাহুতে ইকরামা এবং তাদের উভয়ের সংগে ছিল ১০০ করে অশ্বারোহীর শক্তিশালী বাহিনী। অশ্বারোহী বাহিনীর সার্বিক দায়িত্বে ছিল আমর ইবনুল আস, যদিও তার কাজ ছিল শুধু সমন্বয় সাধন করা। আবু সুফিয়ান ১০০ তীরন্দাজকে প্রাথমিক সংঘর্ষের জন্য সম্মুখ সারিতে মোতায়েন করে। কোরেশ বাহিনীর পতাকা ছিল বদর যুদ্ধ ফেরত তালহা বিন আবু তালহার হাতে। এই ভাবেই কোরেশগণ মদীনাকে পিছনে ফেলে এবং মুসলিম বাহিনী ও ওহুদ পর্বতশ্রেণীকে সম্মুখে নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। প্রকৃত পক্ষে তারা মুসলিম বাহিনী ও তাদের ঘাঁটি মদীনার মধ্যখানে অবস্থান গ্রহণ করে (দুই বাহিনীর অবস্থানের জন্য ১ নম্বর ম্যাপ দ্রঃ)।

কোরেশ বাহিনীর পশ্চাতেই অবস্থান নেয় তাদের রমণীরা। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে তারা হিন্দের নেতৃত্বে কোরেশদের সম্মুখ দিয়ে মার্চ করে তাদের বদর যুদ্ধে নিহত প্রিয়জনদের কথা মনে করিয়ে দেয়। তারপর রমণীরা কোরেশ বাহিনীর পেছনে অবস্থান গ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে হিন্দ অত্যন্ত পরিষ্কার ও দৃঢ় কণ্ঠে গেয়ে উঠে ঃ

ওহে আব্‌দুদ্দারের পুত্রগণ!
আমাদের জন্মভূমি রক্ষাকারী!
আমরা রজনীকন্যা,
তোমাদের শয্যার সংগিনী।
আলিংগন করবো যদি তোমরা সামনে চলো,
পিছু হটলে তোমাদেরকে পরিত্যাগ করবো,
ঘৃণা সহকারে পরিত্যাগ।[২৩]

বদর যুদ্ধের ঠিক একবছর এক সপ্তাহ পরে ২২শে মার্চ, ৬২৫ খৃস্টাব্দে (৭ই শাওয়াল, ৩ হিজরী[২৪]) শনিবার সকাল বেলা দুই বাহিনী যুদ্ধের ভংগিতে মুখোমুখি হয়। ৭০০ মুসলিম সৈনিকের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ৩,০০০ অবিশ্বাসী কাফির। এই প্রথমবারের মতো আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে তার বাহিনী কমান্ড করে। তার সংগে ছিল অনেক যোগ্য সহকারী এবং বিজয় সম্পর্কে সে ছিল নিশ্চিত। মুসলিমগণ বার বার কুরআনের বাণী উচ্চারণ করতে থাকে, "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং কতো উত্তম ত্রাণকর্তা তিনি"[২৫], এবং তারা আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

---

২৩. ইবনে হিশাম ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬৮, ওয়াকিদী ঃ মাগাযী, পৃষ্ঠা - ১৭৬।
২৪. কিছু কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন ওহুদ যুদ্ধ আরও এক সপ্তাহ পরে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু উল্লেখিত তারিখটিকেই সঠিক বলে মনে হয়।
২৫. কুরআন - ৩ ঃ ১৭৩।

দুই বাহিনী যুদ্ধের জন্য অবস্থান গ্রহণের পর প্রতারক আবু আমের তার আউস গোত্রের লোকদেরকে দলে ভেড়ানোর পদক্ষেপ নেয়। সে তার ৫০ জন অনুসারী ও কোরেশদের বহু সংখ্যক ক্রীতদাসসহ তাদের বাহিনীর সম্মুখের সারিকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়। আউস গোত্রের লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে সে বলে, "ওহে আউস গোত্রের লোকেরা! আমি আবু আমের, তোমরা নিশ্চয় আমাকে চেনো।" আউসের লোকেরা একবাক্যে উত্তর দেয়, "ওহে ভক্ত প্রতারক! তোমাকে স্বাগতম নয়।" সেই সংগে তারা তার ও তার সংগীদের উপর সজোরে বৃষ্টির মত পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। ফলে তারা দণ্ডায়মান কোরেশ বাহিনীর মধ্য দিয়ে দ্রুত পিছনে ফিরে যায়। কোরেশদের মুখে বিদ্রূপের চিহ্ন দেখে সে নবী-রসূলদের ভংগিতে বলে উঠে, "আমার মৃত্যুর পর আমার লোকেরা দুঃখ ভোগ করবে।"[২৬] কিন্তু কোরেশগণ তার কথায় আর গুরুত্ব দেয় না।

প্রতারক আবু আমেরের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর উভয় পক্ষের তীরন্দাজগণ তীর ছুঁড়তে শুরু করে। এটা ছিল অনেকটা উভয় পক্ষের গোলন্দাজ বাহিনীর গোলা নিক্ষেপের মতো। কোরেশ পক্ষে ছিল ১০০ তীরন্দাজ। মুসলিম পক্ষের কিছু তীরন্দাজ ছিল আয়নায়ন পাহাড়ের উপর আর কিছু ছিল সম্মুখ সারিতে। বেশ কিছু তীর নিক্ষিপ্ত হয়। তীরন্দাজদের ছত্রছায়ায় খালিদ তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীর বাম বাহুকে আক্রমণ করেন, কিন্তু মুসলিম তীরন্দাজদের নির্ভুল লক্ষ্যের কারণে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। তীরন্দাজদের সংঘর্ষ শেষ হওয়ার সংগে সংগে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে কোরেশ রমণীদের কণ্ঠে সেই গানটি আবার ভেসে আসে, "আমরা রজনীকন্যা.........।

পরবর্তী পর্যায়টি ছিল দুই বাহিনীর প্রধান যোদ্ধাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। কোরেশ বাহিনীর পতাকাবাহী তালহা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চিৎকার করে বলে, "আমি আবু তালহার পুত্র তালহা। এমন কেউ আছে যে আমার সংগে লড়তে চায়।"[২৭] তার এই আহ্বানে আলী (রা) এক লাফে সামনে অগ্রসর হয়ে তালহা আঘাত করার পূর্বেই তরবারির আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলেন। তালহা শুধু আহত হয়। আলী (রা) তাকে পুনরায় আঘাত করার জন্য তরবারি উঠানোর সংগে সংগে সে ক্ষমা ভিক্ষা করে। আলী (রা) আঘাত করা থেকে বিরত থাকেন। পরে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে আহত তালহাকে মুসলিমগণ সরিয়ে ফেলে। তালহার পতনের পর অন্য একজন অবিশ্বাসী সামনে আসে এবং কোরেশ পতাকা হাতে তুলে নেয়। হামযা এই লোকটিকে হত্যা করেন। এই দৃশ্যটি কোরেশ বাহিনীর পিছন হতে বর্বর ক্রীতদাসটি লক্ষ্য করে। সে হামযা (রা) কে পাশ থেকে আঘাত করার জন্য চুপি চুপি ডান দিকে অগ্রসর হয়। হামযা (রা) পাগড়ির মধ্যে একটি লম্বা উট পাখির পালক গুঁজে দিয়েছিলেন। তাই তাঁকে লক্ষ্য করা ছিল খুব সহজ।

---

২৬. ইবনে হিশাম ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬৭, ইবনে সাদ ঃ পৃষ্ঠা - ৫৪৩।
২৭. ওয়াকিদী ঃ মাগাযী, পৃষ্ঠা - ১৭৬।

ম্যাপ - ১ : ওহুদের যুদ্ধ - ১
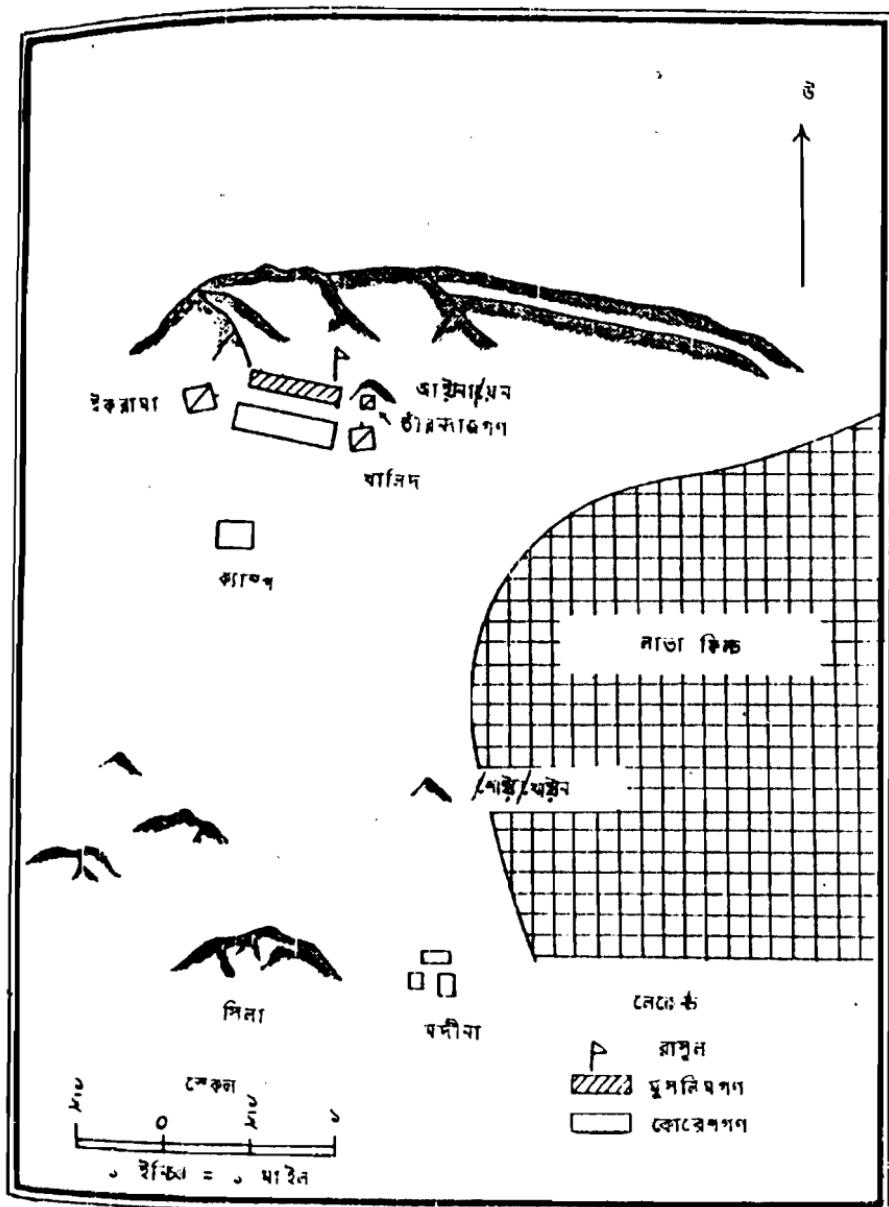
ক্রমান্বয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ব্যাপক রূপ লাভ করে। তালহার আত্মীয়-স্বজন একের পর এক কোরেশ পতাকা উত্তোলন এবং মুসলমানদের হাতে নিহত হতে থাকে। সবচেয়ে বেশি ধরাশায়ী হয় আলী (রা)-এর তরবারির আঘাতে। আবু সুফিয়ানও ঘোড়ার পিঠে থেকেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। হানজালা বিন আবু আমের তার মুকাবিলা করে। আবু সুফিয়ান বল্লম বা তরবারি ব্যবহার করার পূর্বেই হানজালা তার ঘোড়ার সামনের পায়ে আঘাত করে এবং সে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। আবু সুফিয়ান সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকে। তার একজন সংগী এগিয়ে আসে এবং সে হানজালাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। আবু সুফিয়ান দ্রুত নিরাপদ স্থানে চলে যায়।

আবূ বকরের পুত্র আব্দুর রহমান ছিল কোরেশ যোদ্ধাদের অন্যতম। সে সামনে অগ্রসর হয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানায়। তার আহ্বানে পিতা আবূ বকর (রা) তরবারি তুলে সামনে অগ্রসর হয়। কিন্তু রসূল (সা) তাঁকে বাধা দেন এবং বলেন, "তোমার তরবারি কোষবদ্ধ করো।[২৮] এই আব্দুর রহমান পরবর্তীকালে ইসলামের একজন বিখ্যাত সৈনিক হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন এবং সিরিয়া অভিযানে বিশেষ গৌরব অর্জন করেছিলেন।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর্ব শেষ হওয়ার সংগে সংগে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। উভয় বাহিনীই ভয়ংকর হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু করে দেয়। মুসলিমগণ অধিকতর সাহসী ও তরবারি চালনায় দক্ষ। কিন্তু কোরেশগণ তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে মুসলিম বাহিনীর এই দক্ষতার মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। সর্বাত্মক যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে খালিদ বাম দিকে আর একটি আক্রমণ রচনার উদ্যোগ নিলে আয়নায়নের তীরন্দাজগণ তা ব্যর্থ করে দেয়। মুসলিম বাহিনীর এই বাম বাহুতেই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থান।

রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং কোরেশদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেন। তাঁর পাশে ছিলেন সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস। তিনি ছিলেন পেশাগতভাবেই তীর নির্মাতা এবং সে সময়ের বিখ্যাত তীরন্দাজদের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (সা) সাদকে লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিতেন এবং তিনি অব্যর্থভাবে আঘাত করতেন।

হামযা (রা) মুসলিম বাহিনীর বাম প্রান্ত থেকে যুদ্ধ করছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি দু'জন কাফিরকে হত্যা করেছেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, আরও একজন অগ্রসর হচ্ছে। এই লোকটির নাম ছিল সাবা বিন আবু উরযা যাকে হামযা ভালভাবে চিনতেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, "ওহে খাতনাকারিণীর পুত্র! আমার নিকট এসো"[২৯] (সাবার মা মক্কায় খাতনা করে বেড়াতো)। সাবার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করে। সে তরবারি তুলে হামযার দিকে অগ্রসর হয়।

---

২৮. ওয়াকিদী ঃ মাগাযী, - ২০০।

২৯. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৭০।

এ দুজনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হলে বর্বর ক্রীতদাসটি ঝোপ ও পাথরের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে হামযার দিকে অগ্রসর হয়। লক্ষ্যবস্তু বর্শার আওতার মধ্যে এসে গেলে সে তার অভিজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে দূরত্ব মেপে নেয়। তারপর সে দাঁড়িয়ে বর্শা উত্তোলন করে। এই সময় হামযা (রা) সাবার মাথায় মরণ আঘাত হানেন এবং সে তাঁর পায়ের উপর এসে পড়ে। ঠিক এই মুহূর্তে বর্বর লোকটি বর্শা নিক্ষেপ করে। নিষ্ঠুর অস্ত্রটি অব্যর্থভাবে গিয়ে হামযার তলপেটে লাগে এবং বিদ্ধ হয়ে অপর দিকে ফুঁড়ে বের হয়। আঘাত পাওয়ার সংগে সংগেই হামযা (রা) বর্বর লোকটির দিকে ঘুরে দাঁড়ান এবং সিংহের মতো গর্জন করতে করতে কয়েক-পা অগ্রসর হন। লোকটি পাথরের আড়াল থেকে কেঁপে উঠে, কিন্তু হামযা (রা) বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। তিনি মাটিতে পড়ে যান।

বর্বর লোকটি হামযার শরীর নিথর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তারপর সে মৃতদেহের কাছে গিয়ে হেঁচকা টানে বর্শাটি বের করে। সে তখন অলসভাবে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে। কেননা সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে। বর্বর ক্রীতদাসটি হয়তো আরও অনেক যুদ্ধ করার সুযোগ পাবে কিন্তু মহান হামযার জীবনে সে সুযোগ আর আসবে না। হামযা ছিলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সিংহ।"[৩০]

এর পরপরই কোরেশদের অবস্থান টলমল হয়ে পড়ে এবং মুসলিমগণ তাদের আক্রমণের চাপ আরও বৃদ্ধি করে। কোরেশ পক্ষের বেশ কয়েকজন পতাকাবাহী নিহত বা আহত হলে একজন ক্রীতদাস তা তুলে নেয় এবং নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তার মৃত্যুতে পতাকাটি আবার পতিত হয়। ফলে কোরেশ বাহিনী ভেঙে পড়ে এবং বিশৃংখলভাবে পলায়ন শুরু করে।

এই সময়ে কোরেশ বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক ভীতির সৃষ্টি হয়। মুসলিমগণ কোরেশদেরকে ধাওয়া করতে থাকে। কোরেশদের দুর্দশা দেখে তাদের রমণীরা বিলাপ করতে থাকে। তারাও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাদের পুরুষদের পদাংক অনুসরণ করে। দ্রুত পলায়নের জন্য মহিলারা হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে দৌড়াতে থাকে যা বিজয়ের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল মুসলিম বাহিনীর সামনে একটা কৌতুকপ্রদ দৃশ্যের অবতারণা করে। য়ামরা ব্যতীত সব কোরেশ রমণীই পলায়ন করে। শুধু সে একা কোরেশদের যুদ্ধ রেখার পিছনেই দাঁড়িয়ে থাকে।

এই সুযোগে মুসলিমগণ কোরেশদের ক্যাম্পে তাদের সম্পদ হস্তগত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ক্যাম্পে তখন সম্পূর্ণ বিশৃংখল অবস্থা। মহিলা ও ক্রীতদাসরা মৃত্যুর ভয়ে কাতরাতে থাকে। এই অবস্থা দেখে মুসলিম সৈনিকরা উল্লাসে চিৎকার করতে থাকে। এই মুহূর্তে মুসলিম বাহিনীর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ও শৃংখলা ভেঙে পড়ে।

---

৩০. ওয়াকিদী ঃ মাগাযী, পৃষ্ঠা - ২২৫।

তারা ধরে নিয়েছিল যে, যুদ্ধ শেষ এবং তারা জয়ী হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের মাত্র প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়েছিল। এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল কম এবং কোরেশগণ স্পষ্টতই পরাজিত হয়েছিল। এখানেই ওহুদ যুদ্ধের সমাপ্তি হলে ভাল হতো, কিন্তু তা হয়নি।

কোরেশ বাহিনীর পলায়ন এবং প্রতিপক্ষের ধাওয়া ও ক্যাম্প লুট চলাকালীন সময়ে তাদের অশ্বারোহী বাহিনীর অংশদুটি অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। খালিদ ও ইকরামা উভয়ে পূর্বের অবস্থান থেকে কিছুটা পশ্চাদপদ হলেও তাদের বাহিনীর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। ফলে তাদের একজন অশ্বারোহীও পালানোর সুযোগ পায় না। খালিদ এই বিশৃংখল অবস্থাটি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। তিনি কখনও পলায়নপর কোরেশ বাহিনী, কখনও মুসলিম বাহিনীর কার্যকলাপ ও কখনও আয়নায়ন পাহাড়ের তীরন্দাজদেরকে লক্ষ্য করতে থাকেন। খালিদ ঠিক পুরোপরি বুঝতে পারছিলেন না কি করবেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অপরিসীম ধৈর্যশীল। ধৈর্যসহকারে তিনি সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। শীঘ্রই তার ধৈর্যের পুরস্কার পান।

কোরেশ বাহিনীর পরাজয় ও মুসলিমগণকে তাদের ক্যাম্প হতে সম্পদ হস্তগত করতে দেখে আয়নায়ন পাহাড়ের তীরন্দাজগণও অধৈর্য হয়ে পড়ে। কোরেশদের ক্যাম্প তাদেরকে প্রলুব্ধ করে। তারা তাদের কমান্ডার আব্দুল্লাহ বিন জুবায়রের নিকট হতে অন্যান্য মুসলিমের সংগে যোগদানের অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু আব্দুল্লাহ অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, “তোমরা আল্লাহর রসূলের নির্দেশ ভালভাবেই অবগত আছো। পুনরায় তাঁর কোন নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের এই পাহাড়ের উপরেই থাকতে হবে।” তীরন্দাজগণ উত্তর দিল, “হ্যা, আমরা তা জানি। যুদ্ধ চলাকালীন সময় পর্যন্ত আমাদের এই অবস্থানে থাকার কথা। এখন যুদ্ধ শেষ। তাই আর এখানে থাকার কোনো অর্থ হয় না।” কমান্ডারের নির্দেশ অমান্য করে অধিকাংশ তীরন্দাজ কোরেশদের ক্যাম্পের দিকে ধাবিত হয় এবং “লুটের মাল, লুটের মাল”[৩১] বলে চিৎকার করতে থাকে। আব্দুল্লাহর সংগে মাত্র নয়জন তীরন্দাজ থাকে। তীবন্দাজদের এই গতিবিধি খালিদের সন্ধানী দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তীরন্দাজদের কোরেশ ক্যাম্পে পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।

খালিদ সময় মতো চরম আঘাত হানেন। আয়নায়ন পাহাড় দখল করার লক্ষ্যে তিনি গুটিকয়েক তীরন্দাজের উপর অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেন। পাহাড়ের অবস্থানটি ছিল তার যুদ্ধ জয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খালিদের এই তৎপরতা লক্ষ্য করে ইকরামাও তার সংগে যোগদান করে। খালিদ পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে ইকরামাও তাকে অনুসরণ করে এবং মুসলিম তীরন্দাজদেরকে আক্রমণ করে।

৩১. ওয়াকিদী, মাগাযী, পৃষ্ঠা-১৭৮-৯; ইবনে সাদ ঃ পৃষ্ঠা-৫৪৫,৫৫১।

পাহাড়ে অবস্থানকারী গুটি কয়েক মুসলমান অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্ব সহকারে বাধা প্রদান করে। তাদের অনেকেই শাহাদাত বরণ করে এবং বাকীরা আহত অবস্থায় পাহাড় হতে বিতাড়িত হয়। আব্দুল্লাহ রাসূলের দেয়া দায়িত্ব পালনের জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যান। তার দেহ অসংখ্য আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ইকরামার হাতে শাহাদাত বরণ করেন। খালিদ দ্রুত মুসলিম বাহিনীর পিছনে চলে যান। ইকরামাও তাকে অনুসরণ করে। তারা উভয়ে একটু বামে ঘুরে মুসলিম বাহিনীকে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে। ইকরামা তার বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর নিরাপত্তায় নিবেদিত সংগীদের উপর আক্রমণ করে। তার বাহিনীর বাকি অংশসহ খালিদ কোরেশ ক্যাম্পে লুটের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত মুসলিমদের উপর চড়াও হন।

খালিদ মুসলিম বাহিনীকে তাদের অজ্ঞাতে পিছন হতে আক্রমণ করেন এই বিশ্বাস নিয়ে যে, সহজেই তাদেরকে পরাভূত করতে পারবেন। কিন্তু মুসলিম বাহিনী সহসা পরাভূত হওয়ার মত নয়। খালিদের অশ্বারোহী বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে হৈ চৈ-এর সূত্রপাত হয়। প্রথম আঘাতে অনেকে নিহত হয়। স্বল্পসংখ্যক যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। অধিকাংশই অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে যুদ্ধ চালাতে থাকে। আল্লাহর রাসূল থাকা অবস্থায় তারা যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। মুসলিম বাহিনী প্রতিরোধ রচনা করার সংগে সংগে 'য়ামরা' দৌড়ে গিয়ে কোরেশ পতাকাটি মাটি হতে হাতে তুলে নেয়। সে পতাকাটিকে হাতে নিয়েই মাথার উপরে তুলে দোলাতে থাকে এই আশায় যাতে পলায়নপর কোরেশগণ তা দেখে পুনরায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরে আসে।

ইতিমধ্যে আবু সুফিয়ান প্রায় গোটা পদাতিক বাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। সে দেখতে পায় তাদের অশ্বারোহী বাহিনী মুসলিমদেরকে পিছন হতে আঘাত হানছে। সে আরও দেখতে পায় কোরেশ পতাকা 'য়ামরার' হাতে আকাশে দুলছে। সে তার বাহিনীকে পুনরায় তৎপর করে তোলে। অশ্বারোহী বাহিনী মুসলিমদেরকে পিছন হতে আক্রমণ করেছে এই খবর শুনেই কোরেশগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছুটে আসে আর চিৎকার করতে থাকে, "আমরা যুদ্ধ করি উয্যার নামে, আমরা যুদ্ধ করি হুবালের নামে।"[৩২]

মুসলিম বাহিনী এখন পিছনে শত্রুর অশ্বারোহী ও সামনে পদাতিক বাহিনীর আক্রমণের শিকার। আবু সুফিয়ান নিজেই হামলা রচনা করে এবং একজন মুসলিমকে হত্যা করে। মুসলিমদের জন্য শীঘ্রই দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য অবস্থার সৃষ্টি হয়। তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে শত্রুর দ্বিমুখী আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে। পরিস্থিতি এতো ঘোলাটে ও বিশৃংখল হয়ে যায় যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুসলিমগণ একে

৩২. ওয়াকিদী ঃ মাগাযী, পৃষ্ঠা - ১৮৮, ইবনে সাদ ঃ পৃষ্ঠা - ৫৪৫।

অপরের সংগে লড়াই করতে থাকে। তাদের মধ্যে কিছুটা শংকা ছিল কিন্তু আতংক ছিল না। তাদের ক্ষতির পরিমাণ পর্বতপ্রমাণ হতে থাকে, কিন্তু তারা ক্ষতির তোয়াক্কা না করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চালাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যুদ্ধের এই পর্যায়ে খালিদ প্রথম বল্লমের আঘাতে আবু অসীরা নামের একজন মুসলিমকে হত্যা করেন এবং অন্য একজনকে ধরাশায়ী করে ফেলেন। লোকটি নিহত হয়েছে ভেবে খালিদ সামনে অগ্রসর হন। কিন্তু এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি সামান্য আহত হয়েছিল মাত্র এবং সে পুনরায় যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়ায়।

গোটা যুদ্ধটাই দৃশ্যত দু'অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে মুসলিম বাহিনীর প্রধান অংশ লড়ছে কোরেশ বাহিনীল প্রধান অংশের বিরুদ্ধে। আর অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দল লড়ছে ইকরামার অশ্বারোহী বাহিনীর সংগে। পরে কিছু পদাতিক সৈন্যও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আক্রমণ করার জন্য ইকরামার সংগে যোগ দেয়। শুরু হয় রাসূলের চরম ভাগ্য পরীক্ষা। (২ নং ম্যাপ দেখুন)।

যুদ্ধের প্রথম পর্যায় শেষে মুসলিমগণ যখন কোরেশদেরকে ধাওয়া করতে থাকে, রাসূলুল্লাহ (সা) তখনও তাঁর যুদ্ধের অবস্থানেই ছিলেন। এখানে তাঁর সংগে ছিল ৩০ জন সংগী যারা কোনো অবস্থাতেই প্রলুব্ধ হয়নি বা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগ ত্যাগ করেনি। এই ৩০ জনের মধ্যে আলী, আবূ বকর, সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ, আবু উবায়দা, আব্দুর রহমান বিন আউফ, আবু দুজানা এবং মুসআব বিন উমায়রসহ তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কিছু অনুসারী ছিলেন। এই দলের মধ্যে দু'জন মহিলাও ছিলেন যারা মুসলিমদের জন্য পানি বহন করতেন।

খালিদ (রা) কর্তৃক তীরন্দাজদের অবস্থান দখল ও মুসলিম বাহিনীর পিছন হতে কোরেশ অশ্বারোহীর আক্রমণের উদ্যোগ দেখেই রাসূলুল্লাহ (সা) পরিস্থিতি যে কি ভয়ংকর ও সংকটাপন্ন তা উপলব্ধি করেন। বাহিনীর প্রধান অংশ দূরে থাকায় তাঁর পক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছিল না এবং তিনি এও জানতেন যে, তাঁর ক্ষুদ্র দলটি শীঘ্রই আক্রান্ত হবে। তাঁর বর্তমান অবস্থান কোনো অবস্থাতেই ধরে রাখা সম্ভব ছিল না; তাই তিনি কিছুটা পিছিয়ে নিকটবর্তী খাড়া পাহাড়টির পাদদেশে অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন (এই পাহাড়টি প্রাথমিক অবস্থানের পার্শ্ববর্তী খাড়া পাহাড় নয়)। এই উদ্দেশ্যে তিনি ৩০ জন সংগীসহ ৫০০ গজ যেতে না যেতেই ইকরামা তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীসহ পথ রোধ করে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানেই অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে কোরেশদের একটি পদাতিক দলও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আক্রমণের জন্য ইকরামার সংগে যোগ দেয়।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দল সম্মুখ ও পেছন উভয় দিক থেকেই প্রচণ্ড আক্রমণের শিকার হয়। মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে রক্ষার জন্য তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে থাকে। যুদ্ধের তীব্রতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাসূলুল্লাহ

(সা) নিজেও তাঁর ধনুক ব্যবহার করতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত তা ভেঙে না যায়। তারপর নিজের তীরগুলো দিয়ে তিনি সাদ-এর শক্তি বৃদ্ধি করেন। সাদের নির্ভুল লক্ষ্য কোরেশদেরকে বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন করতে সক্ষম হয়। প্রতিটি মুসলিম অত্যন্ত সাহসিকতার সংগে তিন বা চারজন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে নিজের পতন বা শত্রুর পলায়ন না হওয়া পর্যন্ত।

কোরেশদের মধ্যে ইকরামাই প্রথম ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটবর্তী হতে পারে। ইকরামা তার বাহিনীর একটি দলকে সামনে পাঠিয়ে দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) আলীর দিকে ঘুরে ঐ দলটিকে দেখিয়ে বলেন, "তাদেরকে আক্রমণ করো।" আলী (রা) তাদেরকে আক্রমণ করে একজনকে হত্যা করেন এবং বাকিদেরকে পিছু হটিয়ে দেন। সংগে সংগে আর একটি অশ্বারোহী দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে অগ্রসর হয় এবং তিনি আবার আলী (রা)-কে নির্দেশ দেন আক্রমণ করার।[৩৩] আলী পূর্বের মতোই একজনকে হত্যা করেন এবং বাকিরা পিছু হটে যায়।

যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির সংগে কোরেশগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দলের উপর বৃষ্টির মতো তীর ও পাথর ছুঁড়তে থাকে। তারা কিছুটা দূর থেকে এই তীর ও পাথর ছুঁড়তে থাকে এবং সংগে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর দ্বারা তরবারির আক্রমণ পরিচালনা করে। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তীরের আঘাত থেকে রক্ষার জন্য আবু দুজানা কোরেশ পদাতিক বাহিনীর দিকে পিঠ দিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। এই পদাতিক বাহিনীর দিক থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবু দুজানার পিঠে এতো তীর বিদ্ধ হয় যে, তাঁকে দেখতে শজারুর মতো লাগে। এই অবস্থায় তিনি নিজের তীর একটার পর একটা সাদকে দিতে থাকেন। তালহাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশে দাঁড়িয়ে পড়েন। এক সময় একটি তীর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখমণ্ডল বরাবর আসতে থাকলে তালহা দ্রুত তার হাত তীরটির আগমন রেখায় বাড়িয়ে দেন এবং তীরটিকে থামাতে সক্ষম হন। ফলে তালহার একটি আংগুল চলে যায়, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) রক্ষা পান।

মুসলিম বাহিনীর প্রধান অংশের বিরুদ্ধে খালিদ একটার পর একটা আক্রমণ রচনা করেন এবং তাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হন। ইতিমধ্যে তিনি তার দ্বিতীয় ব্যক্তি সাবৃত বিন কাহদাহাকে বল্লমের সাহায্যে হত্যা করতে সক্ষম হন। এই যুদ্ধে খালিদ প্রধানত তার বল্লমের উপরই বেশি নির্ভর করেছিলেন এবং এর সাহায্যেই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে সক্ষম হন। একটা লোককে হত্যা করার সংগে সংগে চিৎকার করে বলতেন, "একে নাও এবং আমিই সুলায়মানের পিতা।"[৩৪]

---

৩৩ তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা -১৯৭।

৩৪. ওয়াকিদী ঃ মাগাযী, পৃষ্ঠা - ১৯৮।

ম্যাপ-২ঃ ওহুদের যুদ্ধ -২
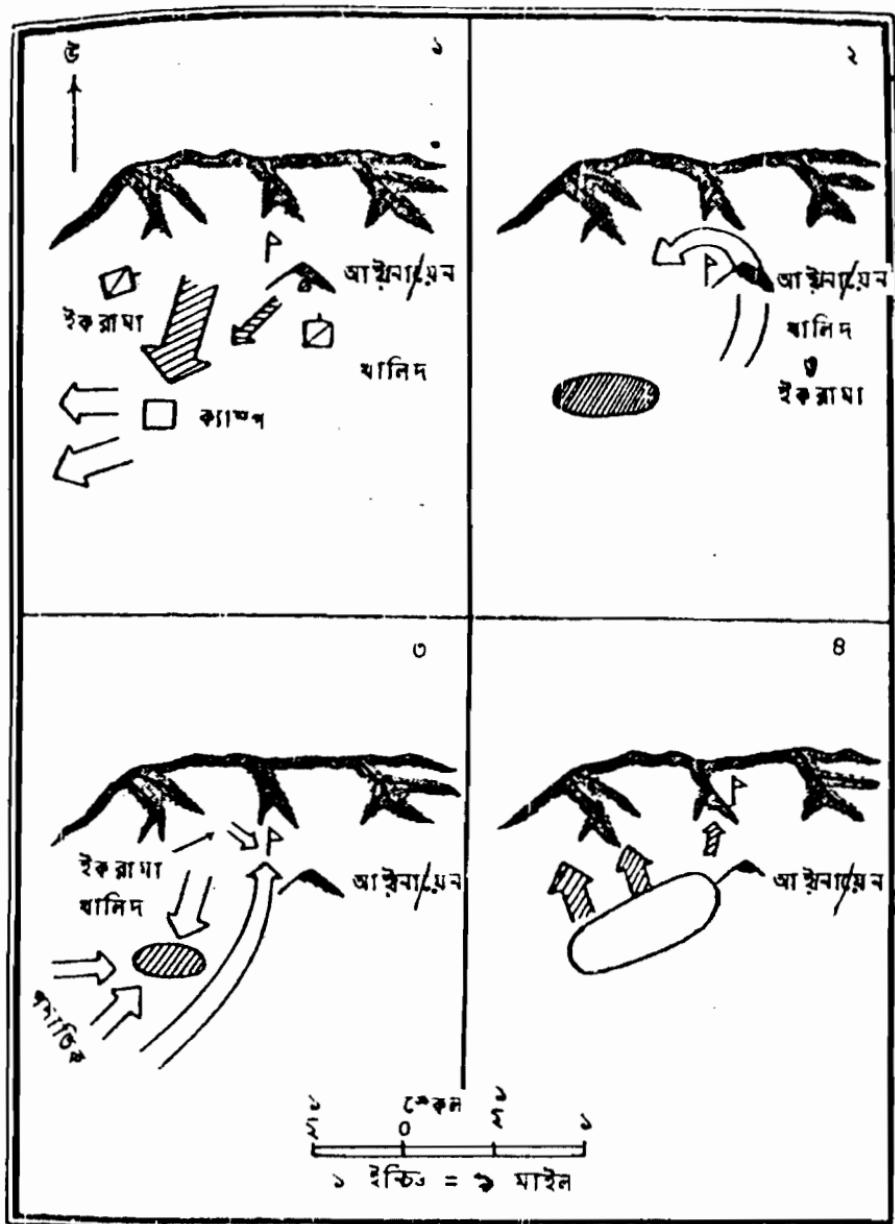
কোরেশদের পাল্টা আক্রমণের প্রথম পর্যায় শেষ হলে তারা পরবর্তী আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য কিছুটা পিছু হটে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগীরাও এই সময় কিছুটা উপশম বোধ করেন। একজন মুসলিম লক্ষ্য করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে খুব সতর্কতার সাথে কি যেন দেখছেন। লোকটি কারণ জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ (সা) স্বাভাবিকভাবে উত্তর দেন, "আমি উবাই বিন খাল্‌ফকে আশা করছি। সে পিছন দিক থেকে আমাকে আক্রমণ করতে পারে। তাকে আসতে দেখলে আমার নিকট পৌঁছতে দিও।" তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই একজন লোক ইকরামার দল থেকে বের হয়ে একটি অতিকায় শক্তিশালী ঘোড়ায় চড়ে ধীর পদক্ষেপে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সে চিৎকার করে বলে, "ওহে মুহাম্মদ আমি এসে গেছি, আজকের দিন তোমার অথবা আমার।" এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কিছু সংগী লোকটির মুকাবিলা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু তিনি বলেন, "তাকে আসতে দাও।"[৩৫] তাঁর সংগীরা দূরে সরে লোকটির আসার রাস্তা করে দেয়।

বদরের যুদ্ধে আবদুল্লাহ বিন উবাই (মুনাফিক দলের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই নয়) নামের একজন লোক মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। তার পিতা উবাই বিন খাল্‌ফ মদীনায় গিয়ে ৪,০০০ দিরহাম মুক্তিপণ দিয়ে পুত্রকে মুক্ত করে। পুত্রকে মুক্ত করে নিয়ে মদীনায় থাকতেই উবাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে। সে বলেছিল, "হে মুহাম্মদ! আমার একটি ঘোড়া আছে যাকে আমি প্রচুর ভাল ভাল খাবার দিয়ে শক্তিশালী করে তুলছি। কেননা পরবর্তী যুদ্ধে ঐ ঘোড়ায় চড়েই আমি তোমাকে হত্যা করবো।" রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর দিয়েছিলেন, "না, তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না; বরং আল্লাহর ইচ্ছা হলে আমিই [রাসূলুল্লাহ (সা)] তোমাকে তোমার ঘোড়ার পিঠে হত্যা করবো।"[৩৬] লোকটি অবজ্ঞাসূচক হাসি হেসে পুত্রকে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

এখন সেই উবাই বিন খাল্‌ফ ঘোড়ায় চড়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সে দেখলো তাঁর সংগীরা পথ ছেড়ে দিল। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তার জন্য অপেক্ষা করতে দেখে এবং আক্রোশভরা তৃপ্তি লাভ করে এই ভেবে যে, এই লোকটিকেই সে হত্যা করতে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন বর্ম দ্বারা সজ্জিত। তিনি একটি হেলমেট পরেছিলেন যার দু'পাশের ঝুলন্ত অংশ তাঁর গণ্ডদেশকে আবৃত করেছিল। তাঁর তরবারি কোষবদ্ধ অবস্থায় চামড়ার বেল্টের সংগে বাঁধা ছিল। হাতে ছিল বর্শা। উবাই রাসূলের শক্তিশালী ও চওড়া কাঁধ লক্ষ্য করলো। সে তাঁর দীর্ঘ ও কঠোর হাতের দিকে তাকালো যে হাত সহজেই একটি বর্শাকে দুটুকরো করতে সক্ষম। এই মুহূর্তে যোদ্ধা হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে খুব জাঁকজমকপূর্ণ দেখাচ্ছিল।

---

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১৯৫-৬, ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৮৪।

৩৬. ইবনে সাদ ঃ পৃষ্ঠা - ৫৪৯, ইবনে হিশাম ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৮৪।

আজকের দিনের খুব স্বল্প সংখ্যক লোক জানতো যে, নবী মুহাম্মদ (সা) তাঁর সময়ের শক্তিশালী মুসলিমদের একজন ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত শক্তিমত্তার সংগে ঐশী শক্তির যোগ হওয়ায় যে কোনো ব্যক্তির নিকট তিনি ছিলেন একজন ভয়ানক প্রতিপক্ষ। কিন্তু উবাই ছিল নির্ভীক। কিছুক্ষণ পূর্বেই সে একজন মুসলিমকে হত্যা করেছে তাই তার মনোবল ছিল অত্যন্ত উঁচু।

রাসূলুল্লাহ (সা) সহজেই তাঁর সংগীদেরকে বলতে পারতেন উবাইকে হত্যা করার জন্য এবং তারাও আদেশ পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারত। অথবা তিনি আলীকে বলতে পারতেন, "লোকটিকে হত্যা করো" এবং লোকটি সংগে সংগেই খতম হয়ে যেতো। কেননা আলী (রা) যাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হন কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সংগীদেরকে দূরে সরে দাঁড়ানোর আদেশ দিয়েছিলেন। এবারে তিনি কারও কাছ থেকে কোনো সাহায্য চাননি। এটা ছিল তাঁর আত্মমর্যাদা ও শৌর্যবীর্যের প্রশ্ন। তাই মুহাম্মদ (সা) একাই শৌর্যমণ্ডিত আরবের মতো প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তাঁর মুকাবিলা করবেন। এটাই স্বাভাবিক।

উবাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছে ঘোড়ার লাগাম টেনে ঘরে। তার মধ্যে তার তাড়াহুড়া ছিল না। সে মুহূর্তের জন্য ভাবতে পারেনি যে, মুহাম্মদ (সা) তার প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাই সে ধীরে সুস্থে তরবারি কোষমুক্ত করতে থাকে। কিন্তু তার বিলম্ব হয়ে যায়। কেননা ইতিমধ্যেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বর্শা তুলে উবাইর বুকের উপরের অংশ বরাবর আঘাত হানেন। উবাই সামনে ঝুঁকতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাতেও বিলম্ব হয়ে যায়। বর্শা তার ডান দিকে কাঁধে ঘাড়ের গোড়া বরাবর আঘাত হানে। আঘাত সামান্য হলেও উবাই ঘোড়া হতে পড়ে যায় এবং এর ফলে পাঁজরের একটি হাড় ভেঙে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) দ্বিতীয়বার আঘাত হানার পূর্বেই উবাই পিছনে ফিরে আর্তনাদ করতে করতে তার সহযোগীদের দিকে দৌড়াতে থাকে। তারা তাকে থামিয়ে কিভাবে কি ঘটেছে জানতে চাইলে সে কম্পিত কণ্ঠে বলে, "আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ আমাকে হত্যা করেছে।"

কোরেশগণ তার আঘাত পরীক্ষা করে বলে যে, এতে অস্থির হওয়ার কিছু নেই। কেননা আঘাতটির গভীরতা নেই এবং তা শীঘ্রই শুকিয়ে যাবে। উবাই উচ্চ কণ্ঠে আর্তচিৎকার করে বলে, "আমি মরে যাব।" কোরেশগণ তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলে উবাই নিজের উপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং ভীত-বিহবল কণ্ঠে বলতে থাকে, "আমি মরে যাব, মুহাম্মদ বলেছে যে, সে আমাকে হত্যা করবে। মুহাম্মদ আমার উপর থুথু নিক্ষেপ করলেও আমার মরে যাওয়ার কথা।"[৩৭] উবাই অশান্ত থেকে যায়।

---

৩৭. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৮৪

কোরেশগণ মক্কার পথে যাত্রা শুরু করলে উবাইও তাদের সংগে যায়। তারা মক্কার অদূরে সারাফ নামক স্থানে ক্যাম্প করে এবং সেখানে এই ঘৃণিত লোকটি মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর কারণ অবশ্যই শরীরের ক্ষত নয়, আল্লাহই সব কিছু ভাল জানেন।

মুসলিমগণ যুদ্ধ ত্যাগ না করে বরং মরণপণ লড়াই করে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকায় পরিস্থিতি আরও ভয়ানক রূপলাভ করে। আবু সুফিয়ান ও খালিদ চেয়েছিল যুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তি। কোরেশগণ প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি এবং রাসূলুল্লাহর উপর আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেয়। কেননা তাঁর মৃত্যু হলে যুদ্ধ শেষ হতে বেশি সময় লাগবে না।

এই সিদ্ধান্তের ফলে কোরেশ পদাতিক বাহিনীর একটি শক্তিশালী দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। প্রতিরোধকারী মুসলিমগণ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে এবং তাদের অনেকেই নিহত হয়। কোরেশদের তিনজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগীদের বেষ্টনী ভেদ করে তাঁর কাছাকাছি চলে যায়। এই তিনজন ছিল উৎবা বিন আবী ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ্ বিন শাহাব এবং ইবনে কামিয়া। তারা অল্প দূরত্বে থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে।

উৎবা (সাদ-এর ভাই) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে একটি পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে তাঁর নিচের দুটো দাত ভেঙে যায় এবং নিচের ঠোঁটটিও কেটে যায়। আব্দুল্লাহর একটি পাথরের আঘাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কপালে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। আর কামিয়ার নিক্ষিপ্ত পাথরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গণ্ডদেশ ফেটে যায় এবং তাঁর হেলমেটের দুটো আংটা হাড়ের মধ্যে বসে যায়।

আঘাতের পর আঘাত পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) মাটিতে পড়ে যান এবং তালহা (রা) তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এই মুহূর্তে অবশিষ্ট মুসলিমগণ তীব্রভাবে পাল্টা আক্রমণ করে কোরেশদেরকে হটিয়ে দেয়। সাদ ধনুক ফেলে তরবারি হাতে নেন এবং তার ভাইয়ের দিকে ছুটে যান। কিন্তু তার ভাই দ্রুত পলায়ন করে কোরেশ বাহিনীর মধ্যে আশ্রয় নেয়। পরে সাদ বলেছিলেন যে, সে তার ভাই উৎবাকে অত্যন্ত জঘন্যভাবে হত্যা করতে চেয়েছিল। কেননা সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আহত করেছিল।

সংঘর্ষ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে। এই সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মুখমণ্ডলের রক্ত মুছে ফেলেন। রক্ত মুছতে মুছতে তিনি বলেন, "একটি জাতি কিভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে যারা তাঁদের রাসূলের মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত করে যখন তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেন।"[৩৮] আবু উবায়দার কিছুটা শৈল্য চিকিৎসার জ্ঞান ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গণ্ডদেশ হতে হেলমেটের আংটা দু'টো টেনে বের করেন। আংটা দু'টো রাসূলুল্লাহর গণ্ডদেশের হাড়ের সংগে এমন ভাবে বসে

৩৮. ইবনে হিশাম ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৮০, ওয়াকিদী ঃ মাগাযী, পৃষ্ঠা - ১৯১।

গিয়েছিল যে, আবু উবায়দাকে তা বের করার জন্য দাঁত ব্যবহার করতে হয় এবং এর ফলে তাঁকে দুটো দাঁতও হারাতে হয়। পরবর্তীকালে তিনি আরবদের নিকট 'আল-আসরাম' নামে পরিচিত ছিলেন, যার অর্থ সম্মুখের দাঁতবিহীন ব্যক্তি।

এই বিরতির সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর শক্তি ফিরে পান এবং শরীরে আঘাতের ঝুঁকি কাটিয়ে ওঠেন। উম্মে আয়মন নামের একজন মহিলা, যিনি একসময় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লালন-পালন করেছিলেন, তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। হাবান বিন আল-আরকা নামের একজন লোক কোরেশ বাহিনী হতে অগ্রসর হয়ে ধনুকে তীর সংযোজন পূর্বক উক্ত মহিলাকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করে। মহিলাটি তার দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে তীরটি তাঁর পিছনে বিদ্ধ হয়। হাবান এটাকে ভয়ংকর কৌতুকের বিষয় মনে করে তীব্র হাসিতে ফেটে পড়ে এবং পিছন ফিরে কোরেশ বাহিনীর দিকে হাঁটতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) এই ঘটনা দেখে ক্রোধান্বিত হন। তিনি স্বীয় তূণীর হতে একটি তীর নিয়ে সাদের হাতে দিয়ে নির্দেশ দেন, 'ঐ লোকটিকে আঘাত হানো।'[৩৯] সাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দেয়া তীরটি তার ধনুকে লাগিয়ে সতর্কভাবে নিশানা ঠিক করে অবিশ্বাসী লোকটির প্রতি নিক্ষেপ করেন। তীরটি তার ঘাড়ে গিয়ে বিদ্ধ হয়। এবারে রাসূলুল্লাহ (সা) তা দেখে হেসে ওঠেন।

কোরেশগণ এখন চারদিক থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপরে শেষ বারের মতো মরণপণ আঘাত হানতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চারদিকে তাঁর সংগীদের তৈরী বেষ্টনী এই আঘাত প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু মাত্র একটি জায়গায় এই বেষ্টনী ভেংগে যায় এবং ইবনে কামিয়া আবার বেষ্টনীর ভিতরে ঢুকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে ছুটে যায়। এই আক্রমণের পূর্ববর্তী পর্যায়ে যে তিনজন লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করেছিল ইবনে কামিয়া ছিল তাদের একজন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশেই ডানদিকে মুসআব বিন উমাইর ও উম্মে আমারা নামের একজন মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। এই মহিলা আহতদের জন্য পানি বহন করা ত্যাগ করে মৃত ব্যক্তিদের একজনের শরীর হতে একটি ধনুক ও তরবারি নিয়ে প্রকৃত অর্থে যুদ্ধে শরীক হন। তিনি একটি ঘোড়া নিহত ও একজন কাফিরকে আহত করতে সক্ষম হন।

ইবনে কামিয়া মুসআবকে মুহাম্মদ (সা) বলে ভ্রম করে এবং তাঁর দিকে ছুটে যায়। মুসআব তরবারি উন্মুক্ত করে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তারা যুদ্ধ শুরু করে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে ইবনে কামিয়া একটি মরণ আঘাত হেনে মুসআবকে শহীদ করতে সক্ষম হয়।

মুসআব-এর পতনের সংগে সংগে উম্মে আমারা ইবনে কামিয়ার দিকে ছুটে যান এবং তরবারি দিয়ে তার কাঁধে আঘাত করেন। ইবনে কামিয়া বর্ম পরিধান করেছিল বলে মহিলা হস্তের দুর্বল আঘাতটি তেমন ক্ষতি করতে পারেন। জবাবে ইবনে

---

৩৯. ওয়াকিদী ঃ মাগাযী, পৃষ্ঠা - ১৮৯।

কামিয়াও আমারার কাঁধে তরবারির আঘাত হানে। ইবনে কামিয়া আঘাতটি তাড়াহুড়া করে হেনেছিল বলে তা মহিলাকে কাবু করতে ব্যর্থ হয়। তবে এতে তাঁর কাঁধে একটি ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তিনি মাটিতে পড়ে যান এবং কিছু সময় অচল হয়ে পড়ে থাকেন।

উম্মে আমারার পতনের পর পরই কাফির ইবনে কামিয়া লক্ষ্য করেন রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন। সে তাঁর প্রতি ছুটে যায়। সে তার তরবারি তুলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাথায় একটি বর্বর আঘাত হানে। তরবারি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হেলমেটের কয়েকটি আংটা কাটতে সক্ষম হলেও বিদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়। হেলমেটের উপর থেকে পিছলে তরবারিটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ডান কাঁধে গিয়ে আঘাত করে। আঘাতটির তীব্রতা এতো বেশি ছিল যে, রাসূলে আকরাম (সা) তাঁর পিছনের একটা ছোট গর্তে পড়ে যান। পরে আলী (রা) এবং তালহা (রা) তাঁকে গর্ত থেকে টেনে তুলে নেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পড়তে দেখে কামিয়া পেছনে ফিরে কোরেশদের দিকে ছুটতে ছুটতে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করতে থাকে, "আমি মুহাম্মদকে হত্যা করেছি, আমি মুহাম্মদকে হত্যা করেছি।" তার এই চিৎকার গোটা যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে ধ্বনিত হয় এবং কোরেশ ও মুসলিম উভয় বাহিনী তা স্পষ্ট শুনতে পায়। এই সংবাদে মুসলিম বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়ে এবং তাদের অধিকাংশই ওহুদ পর্বতের দিকে পালাতে থাকে। অল্প কিছুসংখ্যক মুসলিম ভাবলো যে, আল্লাহর রাসূলই যখন জীবিত নেই তখন আর বেঁচে থেকে কি হবে! তাঁরা কোরেশ অশ্বারোহী বাহিনীর দিকে বেগে ধাবিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সবাই খালিদ ও ইকরামার হাতে নিহত হয়। এখানে খালিদ তাঁর তৃতীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেন যার নাম রাফা বিন ওয়াকশ।

মুসলিম বাহিনী ওহুদ পর্বতের দিকে পালিয়ে গেলে কোরেশগণ যত্রতত্র পড়েথাকা মৃত দেহগুলো লুট করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগী মুসলিমগণ দেখলো যে, তাদের আশেপাশে আর কোনো কোরেশ নেই। লুটপাটের প্রলোভন মুসলিমদেরকে কিছুক্ষণ পূর্বে যেমন প্রলুব্ধ করেছিল এবার কোরেশদেরকেও তেমনি প্রলুব্ধ করলো। পথ বাধামুক্ত দেখে রাসূল (সা) তাঁর দলের জীবিতদেরকে নিয়ে উপত্যকার গিরিপথের দিকে অগ্রসর হন। এই প্রত্যাহারের সময় কয়েকজন কোরেশ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দলকে অনুসরণ করলে তাঁর সংগীগণ তাদেরকে তাড়িয়ে দেয় এবং এক অথবা দু'জনকে হত্যা করে। খালিদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই প্রত্যাহার লক্ষ্য করেছিলেন কিন্তু মুসলিম বাহিনীর প্রধান অংশকে ধাওয়া করতে ব্যস্ত থাকায় তাঁকে কোন বাধা প্রদান করেনি। ফলে গিরিপথটিতে পৌঁছতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন অসুবিধা হয়নি। তাঁর দলটি গিরিপথের পূর্ব পাশ দিয়ে পর্বতের কঠিন ঢাল বেয়ে উপরে উঠে এবং ৪০০ গজ উঁচুতে একটি খাড়া পাহাড়ের নিকটে থেমে যায়। এখানে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি পাথরের ফাটলে দাঁড়িয়ে পড়েন সামনে বিস্তৃত যুদ্ধ ক্ষেত্রের করুণ দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করার জন্য।

বিগত কয়েকটি সংঘর্ষে যে ৩০ জন মুসলিম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মাত্র ১৪ জন জীবিত ছিলেন এবং এঁদের অধিকাংশই ছিলেন আহত। বাকি ১৬ জন রাসূল (সা)-কে রক্ষার জন্য আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জন দেন।

এভাবেই মুসলিম বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে। কিছু সন্ত্রস্ত অবস্থায় দূরে চলে যায়, কিছু মদীনায় ফিরে যায় এবং কিছু পরবর্তী দুদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে যোগদান করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু যারা পাহাড়ী এলাকায় আশ্রয় নিতে চেয়েছিল, তারা ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে, এমন কি কোরেশ অশ্বারোহীর সংগে যুদ্ধের পর ওহুদের পাদদেশে পৌঁছার পথ করে নেয়। এখানে তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। কিছু আশ্রয় নেয় পাহাড়ের পাদদেশে, কিছু পর্বত চূড়ায় আর বাকিরা পর্বতমালার বিভিন্ন এলাকায়। কেউ জানতো না তারা পরে কি করবে। যুদ্ধক্ষেত্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল কোরেশদের হাতে।

গিরিপথে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দেহের আঘাতগুলোর প্রতি খেয়াল করার কিছু সময় পান। এখানে কন্যা ফাতিমাও তাঁর সংগে যোগ দেন। আলী (রা) তাঁর ঢালে করে নিকটবর্তী এলাকা থেকে পানি নিয়ে আসেন আর ফাতিমা (রা) পিতার মুখমণ্ডল হতে রক্ত পরিষ্কার করে ড্রেসিং করে দেন। এ সময় তিনি মৃদু কাঁদছিলেন। গিরিপথের এই দুর্গম আশ্রয়ে যেখানে কোরেশদের পক্ষে ব্যাপক আক্রমণ রচনা করা সম্ভব নয়, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ক্লান্ত দেহকে বিশ্রামের কোলে ঢেলে দেন।

ওহুদ পর্বতে আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলিমদের মধ্যে কিছু উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফিরা করতে থাকে। তাদের জানা ছিল না কোথায় যেতে হবে এবং কি করতে হবে। এদের মধ্যে কাব বিন মালিক নামের এক ব্যক্তি গিরিপথে ঘোরাফিরা করতে করতে হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখে চিনতে পারে। এই লোকটির কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। সে একটি উঁচু পাথরের উপরে উঠে তার জানামতে অধিকাংশ মুসলিমের আশ্রয় এলাকার দিক মুখ করে চিৎকার করে, "আনন্দ সংবাদ হে মুসলিমগণ, আল্লাহর রসূল এখানে।"[৪০] চিৎকার করার সংগে সংগে সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে তার আংগুল নির্দেশ করছিল। এই আহ্বানের ফলে মুসলমানদের বেশ কয়েকটি দল পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে মিলিত হয়। এদের মধ্যে উমর (রা)ও ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখে তাঁর আনন্দ ছিল সীমাহীন। অবশ্য কোরেশগণ এই আহ্বান শুনতে পারেনি।

ইতিমধ্যে আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মৃতদেহের সন্ধানে বের হয়। সে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি মৃতদেহ দেখতে থাকে এই আশায় যে, সে তার দুশমনের মৃতমুখ দেখতে পাবে। সে ঘন ঘন তার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতে থাকে,

---

৪০. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২০০, ওয়াকিদী ঃ মাগাযী, পৃষ্ঠা - ১৮৫।

"কোথায় মুহাম্মদের লাশ।" ঘুরতে ঘুরতে সে খালিদের দেখা পায় এবং তাকেও একই প্রশ্ন করে। খালিদ (রা) তাকে জানায় যে, সে মুহাম্মদকে সংগীদেরকে নিয়ে গিরিপথের দিকে যেতে দেখেছে। খালিদ আবু সুফিয়ানকে খাড়া পাহাড়টি দেখায়। আবু সুফিয়ান খালিদকে অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে উক্ত অবস্থান আক্রমণ করতে বলে।

খালিদ (রা) এলাকাটি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে। উপত্যকার খাড়া পাহাড় ও কঠিন ঢাল তার চোখে পড়ে। সে বুঝতে পারে যে, এই ধরনের ভূমিতে অশ্বারোহী বাহিনী পরিচালনা করা খুবই অসুবিধাজনক। কিন্তু সে আশা করতে থাকে যে, কোরেশদের প্রথম পরাজয়ের পর পাল্টা আক্রমণের যে সুযোগ এসেছিল তদ্রূপ কোনো আকস্মিক সুযোগ আবার তার সামনে হয়তো আসবে। খালিদ (রা) ছিল অসম্ভব আশাবাদী। সে খাড়া পাহাড়ের দিকে তার অশ্বারোহী দলকে পরিচালনা করে।

রাসূলুল্লাহ (সা) খালিদের এই তৎপরতা লক্ষ্য করে প্রার্থনা করেন, "হে আল্লাহ! ঐ লোকদেরকে এখানে আসতে দিও না।"[৪১] তারপর উমর (রা) একদল মুসলমানকে সংগে নিয়ে খালিদের মুকাবিলা করার জন্য ঢালু এলাকা দিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হন। অশ্বারোহী দল নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে খালিদ দেখেন যে, উমর (রা) অন্যান্য মুসলিমসহ উঁচু অবস্থানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। খালিদ (রা) বুঝতে পারেন যে, পরিস্থিতি প্রতিকূল। কেননা মুসলিমগণ যে শুধু ভাল অবস্থানে আছে তাই নয়, এই ভূমিতে অশ্বারোহী দল পরিচালনা করাও অসুবিধাজনক। তিনি তার বাহিনী প্রত্যাহার করেন এবং ওহুদের যুদ্ধে এটাই ছিল সর্বশেষ কৌশলগত তৎপরতা।

আবু সুফিয়ান এবং খালিদ (রা) অন্যাদেরসহ এমন একটি দৃশ্য দেখলো যা তারা কিছুতেই অনুমোদন করতে পারেনি এবং কখনও ভুলবে না। যুদ্ধ ক্ষেত্রের যে সব এলাকায় মুসলিমগণের লাশ পড়েছিল, হিন্দ এবং অন্যান্য কোরেশ রমণী সেখানে হামলা চালায়। হিন্দ হামযার দেহটি দেখে ছুরি হাতে নিয়ে তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হিন্দ ছিল বিশাল বপুর অধিকারিণী একজন মহিলা এবং মৃতদেহের অংগচ্ছেদ করতে তার কোনো অসুবিধা ছিল না। সে হামযার পেট কেটে কলিজা বের করে। এরপর কলিজাটি টুকরো করে কেটে মুখে দিয়ে চিবাতে থাকে। কিন্তু চিবিয়ে গিলতে না পেরে থু-করে ফেলে দেয়। সে তখন নিজে হামযার কান ও নাক কাটে এবং অন্যান্য মহিলাকে দিয়ে আরও কিছু লাশের নাক ও কান কেটে নেয়।

সেই বর্বর ক্রীতদাসটি পুরস্কারের আশায় হিন্দের সামনে হাজির হয়। হিন্দ তার শরীরের সমস্ত গয়না খুলে ক্রীতদাসটিকে দেয় এবং বলে, "মক্কায় পৌঁছে আমি তোমাকে ১০ দিরহাম দেবো।"[৪২] নিজের গয়না ক্রীতদাসকে দিয়ে সে শহীদ মুসলিমদের নাক ও কান দিয়ে গলার মালা ও পায়ের মল তৈরি করে পরিধান করে। তার পর এই অদ্ভুত মহিলা গেয়ে উঠে,

---

৪১. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৮৬।

৪২. ওয়াকিদী ঃ মাগাবী, পৃষ্ঠা - ২২২।

আমরা বদর দিবসের প্রতিশোধ নিয়েছি
রক্তের বদলে রক্ত।
আমি উৎবার অভাব ভুলতে পারছিলাম না,
অথবা আমার চাচা, ভাই ও পুত্রের অভাব।
আমার অন্তর এখন শান্ত, বাসনাপূর্ণ,
এবং ঐ ঘৃণিত ব্যক্তিটি আমার দুঃখের উপশম করেছে।
আমি তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো যতদিন জীবিত থাকবো,
এমন কি মৃত্যুর পরেও আমার হাড় মাটিতে না মেশা পর্যন্ত।[৪৩]

এই ভীতিকর পৈশাচিক অধ্যায়টি শেষ হলে আবু সুফিয়ান উপত্যকার দিকে হাঁটতে থাকে। তার এখনও মনে হয় যে, মুহাম্মদ হয়তো মৃত্যুবরণ করেছে, খালিদ তো ভুলও দেখতে পারে। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থান থেকে কিছু দূরে একটি উঁচু পাথরের উপর উঠে চিৎকার করে বলে, "তোমাদের মাঝে কি মুহাম্মদ আছে ?" রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সংগীদেরকে সাড়া না দেয়ার জন্য ইশারা করেন। আবু সুফিয়ান প্রশ্নটি দু'বার উচ্চারণ করে কিন্তু কোনো উত্তর পায় না।

তারপর আবু সুফিয়ান তিনবার জিজ্ঞেস করে, "তোমাদের মধ্যে কি আবু বকর আছে?" সে আরও তিনবার জিজ্ঞেস করে, "তোমাদের মধ্যে কি উমর আছে?" কিন্তু খাড়া পাহাড়টি থেকে নীরবতা ছাড়া কিছুই আসে না।

এখন আবু সুফিয়ান অদূরে অবস্থানরত কোরেশদের দিকে মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করে বলে, "বোঝা গেল এই তিনজনই মৃত। এরা আর তোমাদেরকে কখনও কষ্ট দেবে না।" এই কথায় উমরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তিনি আবু সুফিয়ানের প্রতি গর্জন করে উঠেন, "হে মিথ্যাবাদী আল্লাহর দুশমন, তুই যাদেরকে মৃত বলছিস তারা জীবিত। এখনও আমরা যারা আছি, তোদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্য তারাই যথেষ্ট।" এতে আবু সুফিয়ান উচ্চকণ্ঠে অবজ্ঞাসূচক হাসি হেসে উঠে। কেননা সে জানে যে, মুসলিমগণ এই মুহূর্তে কাউকে শাস্তি দেয়ার অবস্থায় নেই। উমরের উদ্দেশ্যে বলে, "ওহে খাত্তাবের পুত্র উমর, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন। সত্যই কি মুহাম্মদ জীবিত ?"
"আল্লাহর কসম, তিনি জীবিত এবং তুমি যা বলছো তা তিনি শুনতে পাচ্ছেন।"
"ইবনে কামিয়ার চেয়ে তুমি অধিক সত্যবাদী" -আবু সুফিয়ান উত্তর দেয়।

তারপর আবু সুফিয়ান ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে শেষ কথোপকথন হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর শত্রু আবু সুফিয়ানের সংগে সরাসরি কথা বলেননি। তিনি কথা বলেন উমরের মাধ্যম।

---

৪৩. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৯১।

আবু সুফিয়ান ঃ হুবালের জয়, উয্‌যার জয়![৪৪]
রাসূলুল্লাহ ঃ সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর জয়।
আবু সুফিয়ান ঃ আমাদের উয্‌যা ও হুবাল আছে। তোমাদের কোনো উয্‌যা ও হুবাল নেই।
রাসূলুল্লাহ ঃ আমাদের প্রভু আল্লাহ আছেন। কিন্তু তোমাদের কোনো প্রভু নেই।
আবু সুফিয়ান ঃ আমার কাজ হয়ে গেছে। বদর প্রান্তরের প্রতিশোধ আমি নিয়েছি। যুদ্ধের শেষ নেই আমরা আগামীবার আবার বদর প্রান্তরে মিলিত হবো।
রাসূলুল্লাহ ঃ আমরাও প্রতিজ্ঞা করছি। বদর প্রান্তরে আবার মিলিত হবো।
আবু সুফিয়ান ঃ তোমাদের কিছু মৃতদেহ কেটে ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে। তার জন্য আমাকে দায়ী করো না। কেননা আমি এ কাজের হুকুমও দেইনি বা অনুমোদনও করিনি।[৪৫] সর্বশেষ মন্তব্যটি করে আবু সুফিয়ান তার বাহিনীর নিকট ফিরে যায়।

কোরেশগণ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে তাদের পূর্বের দিনের পুরাতন ক্যাম্পে একত্রিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা)-কে কোরেশদের পিছনে পিছনে পাঠালেন, এটা দেখার জন্য যে তারা ঘোড়ায় না উটের পিঠে সওয়ার হচ্ছে। আলী (রা) খোঁজ-খবর নিয়ে এসে জানান যে, কোরেশগণ ঘোড়াগুলোকে সামনে দিয়ে উটের পিঠে সওয়ার হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) মন্তব্য করেন, "এর অর্থ হচ্ছে যে, তারা মদীনা আক্রমণ না করে মক্কায় ফিরতে চায়। মদীনা আক্রমণ করার পরিকল্পনা থাকলে তারা ঘোড়াগুলোকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতো। সে ক্ষেত্রে প্রভুর নামে বলছি, আমি এখনই তাদের সংগে আবার যুদ্ধ করতে যেতাম।"[৪৬]

কোরেশগণ মদীনা থেকে দশমাইল দূরে হামারাউ-আসাদে রাত যাপন করে।[৪৭] মুসলিমগণ মদীনায় ফিরে যায়। অবশ্য কিছু দলচ্যুত মুজাহিদ পরবর্তী দু দিন পর মদীনায় ফিরে।

পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুম থেকে উঠেই যুদ্ধের সাজ পরিধান করেন। তাঁর মুখমণ্ডলে যুদ্ধক্ষেত্রের আঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন। তাঁর গণ্ডদেশ, কপাল এবং ওষ্ঠ এখনও ফুলে আছে। কেননা এই জায়গাগুলো যুদ্ধে কেটে গিয়েছিল। দুটো দাঁত ভেঙে যাওয়ায় তিনি প্রচণ্ড ব্যথা বোধ করেন। ইবনে কামিয়ার তরবারির আঘাতে তাঁর ডান কাঁধে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। কাঁধের এই ক্ষতটি তাঁকে দীর্ঘ একমাস কষ্ট দিয়েছিল।

---

৪৪. আরব মন্দিরের দেব ও দেবী।
৪৫. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৩-৪, ওয়াকিদী ঃ মাগাযী পৃষ্ঠা - ২২৯-৩০, ইবনে সাদ ঃ পৃষ্ঠা - ৫৫১।
৪৬. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৯৪।
৪৭. এই স্থানটি মক্কাগামী প্রধান সড়কের উপর বর্তমানের বীর আলী নামক জায়গার পাশে।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মুয়াজ্জিন[৪৮] বিলাল (রা)-কে আদেশ দিলেন মুসলমানদের প্রতি যুদ্ধের আহ্বান জানাতে। যারা গত দিনের যুদ্ধে যোগদান করেছিল আজ শুধু তাদেরকেই অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হবে। বিলাল (রা) মদীনার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বজ্রকণ্ঠে এই সংবাদ মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই নির্দেশ শোনার সংগে সংগে মুসলিমগণ মাদুর ছেড়ে উঠে পড়েন। তাদের অধিকাংশই ছিলেন আহত। কারও কারও আঘাত ছিল অত্যন্ত বেশি। তারা ব্যথা ও যন্ত্রণায় নিদ্রাহীন রাত অতিবাহিত করেছে। গোটা রাতজুড়ে রমণীরা এই যুদ্ধফেরত সৈনিকদের সেবা করেছে - তাদের আঘাত পরিষ্কার ও ড্রেসিং করেছে। মুসলিমদের অনেকেই যুদ্ধে যাবার উপযোগী ছিলেন না। কিন্তু তবুও তারা বিছানা ত্যাগ করে বের হন। ব্যথা-বেদনার জন্য তাদের মধ্যে কোনো আর্তনাদ বা কান্নাকাটি ছিল না। কেউ খোঁড়াচ্ছিল, কেউ তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি ক্রাচে বা সংগীদের কাঁধে ভর করে পথ চলছিল। তারা খোঁড়াতে খোঁড়াতে ও টলতে টলতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে আসে। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখে চিৎকার করে বলে, লাব্বায়েক অর্থাৎ উপস্থিত হে রাসূল। এই ক্লান্ত ও আহত মুসলিমগণ শ্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষত আল্লাহর নবীর নেতৃত্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করে। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০ জন।

মুসলিমগণ যখন যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে কোরেশ ক্যাম্পে তুমুল বাকবিতণ্ডা চলছিল। ইকরামা পূর্বের দিনের মতোই উগ্র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুনরায় যুদ্ধে যাবার জন্য যুক্তি দেখাচ্ছিল। তার যুক্তি ছিল যে, গত দিনের যুদ্ধের কারণে মুসলিমগণ এখন খুব খারাপ অবস্থায় আছে। কাজেই এটাই উপযুক্ত সময় তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে নির্মূল করার। নতুবা তারা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হবে।

যথেষ্ট হয়েছে উত্তর দিল সাফওয়ান বিন উমাইয়া। "আমরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছি এবং এই বিজয়ই আমাদের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। মুসলিমগণ যদি খারাপ অবস্থায় থেকে থাকে তাহলে আমরাও ভাল অবস্থায় নেই। আমাদের অধিকাংশ ঘোড়া ও অনেক লোক আহত। এই শক্তি নিয়ে আবার যুদ্ধ করতে গেলে আমাদের ভাগ্য গতকালের মতো নাও হতে পারে।[৪৯]"

ইতিমধ্যে কোরেশ বাহিনীর নেতাগণ ৩০০ দলত্যাগী মুসলমানের খবরও পেয়ে গেছে। তারা ভীত এই ভেবে যে, এই দলত্যাগীরা যদি অনুতপ্ত হয়ে আবার মুসলিম বাহিনীর সংগে যোগ দেয় তাহলে নতুন সৈন্য দিয়ে তাদের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এই বাকবিতণ্ডা চলাকালে কোরেশগণ তাদের ক্যাম্পের পাশে দুজন মুসলিম

---

৪৮. মুয়াজ্জিন মুসলিমগণকে নামাযের জন্য আহ্বান জানায়।
৪৯. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ১০৪, ওয়াকিদী ঃ মাগাবী - পৃষ্ঠা - ২৩১-২,২৬৩।

সৈনিককে দেখতে পেয়ে ধরে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (সা) এই দু'জন মুজাহিদকে পাঠিয়েছিলেন কোরেশদের খবরা-খবর নেয়ার জন্য। কোরেশগণ এই দু'জনকে সংগে সংগেই হত্যা করে। তাদের উপস্থিতি আবু সুফিয়ান ও সাফওয়ানের এই ভীতির সত্যতা প্রমাণ করে যে, মুসলিমগণ এখনও আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আছে এবং তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আবু সুফিয়ান দ্রুত মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরুর নির্দেশ দেয় এবং তারা যতো দ্রুত সম্ভব চলে যায়।

বিকেলে মুসলিমগণ হামারাউ-উল-আসাদে পৌঁছে তা পরিত্যক্ত দেখতে পায়। তারা সেখানে ক্যাম্প করে এবং চার রাত অতিবাহিতের পর মদীনায় ফিরে যায়।

ওহুদের অভিযান এখানেই শেষ। যুদ্ধে মোট ৭০ জন মুসলিম শহীদ হন। এঁদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের হাতে শাহাদত বরণ করেন একজন এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়া, খালিদ ও ইকরামার হাতে তিনজন করে। কোরেশপক্ষের নিহত হয়েছিল মোট ২২ জন। এর মধ্যে আলী (রা)-এর হাতে ৬ জন ও হামযা (রা)-এর হাতে ৩ জন। এই যুদ্ধে মুসলিমগণ পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু এটা তাদের চূড়ান্ত পরাজয় ছিল না।

ওহুদের যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় প্রধান যুদ্ধ। আবু সুফিয়ান এই যুদ্ধেই মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম বারের মত সৈন্য পরিচালনা করে এবং এটাই ছিল খালিদের জীবনের প্রথম যুদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা) এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন এবং এই পরাজয়ের দায়দায়িত্ব বর্তায় ঐ দুর্বলচিত্ত তীরন্দাজদের উপরে যারা সম্পদের লোভে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ ও ঊর্ধ্বতন কমাণ্ডারের আদেশ অমান্য করেছিল। প্রকৃতপক্ষে আয়নায়ন পর্বতের অবস্থান ত্যাগ করে তীবন্দাজগণ ঐ সময়ের জন্য মুসলিমদের আনুগত্যবোধ থেকে দূরে সরে উপজাতীয় আরবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং লুটপাটে আত্মনিয়োগ করে।

অনেক লেখক এ ধরনের মতামত পোষণ করেছেন যে, ঐ সময়ের আরবগণ নিয়মিত যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ। সামরিকভাবে তারা লুট-পাটকারী বৈ আর কিছুই ছিল না। অনেক লেখক এমন মন্তব্যও করেছেন যে, আরবগণ যুদ্ধের কলাকৌশল শিক্ষা করে রোমান ও পারস্যবাসীর নিকট হতে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের পর এদের সংগে মুসলিমগণ সামরিক সংঘাতে এসেছিল।

আরবদের সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের এ মন্তব্য আদৌ সঠিক নয়। ইতিমধ্যেই আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সৈন্য বিন্যাস কৌশল পর্যালোচনা করেছি এবং দেখেছি সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা কি পরিমাণ বিবেচনা প্রসূত। আরো উল্লেখ্য যে, যুদ্ধক্ষেত্র নির্বাচন করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনাকে কোরেশদের আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। মদীনাগামী পথটি ছিল ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম অবস্থানের দক্ষিণ দিক দিয়ে এবং তা আবু সুফিয়ানের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল। আবু সুফিয়ান

সরাসরি মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলে পথে মুসলিমদের দ্বারা সামনা-সামনি আক্রান্ত হতো না। মদীনা ত্যাগের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রধান বিবেচনা ছিল এই যে, আবু সুফিয়ান সরাসরি মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেবে না। কারণ তাতে তাদের বাহিনীর পার্শ্ব ও পশ্চাতভাগ মুসলিম আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এবং তাই ঘটেছিল। পথের পাশে অবস্থান গ্রহণকারী মুসলিম বাহিনীর ভয়ে আবু সুফিয়ান সরাসরি মদীনা আক্রমণের চিন্তা ত্যাগ করে। মদীনা ছিল মুসলমানদের প্রধান ঘাঁটি এবং এই প্রধান ঘাঁটি রক্ষার্থে সেখানে অবস্থান নিয়ে শত্রুসৈন্যের সম্মুখ আক্রমণের অপেক্ষা না করে বরং শত্রুর আগমনপথের পার্শ্বদেশ থেকে হুমকি সৃষ্টির মাধ্যমে ঘাঁটি রক্ষা করার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই কৌশলটি ছিল অত্যন্ত উঁচুমানের এবং পরবর্তী কালে পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে বহুবার তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

আবু সুফিয়ানকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হলেও, তার সৈন্যবিন্যাস কৌশল অত্যন্ত দক্ষ। সে প্রধান পদাতিক বাহিনীকে মধ্যখানে রেখে শত্রুর পার্শ্ব ও পশ্চাদদেশে দ্রুত আক্রমণ চালনায় সক্ষম গতিশীল অশ্বারোহী বাহিনীকে দুই পাশে স্থাপন করে যা রোমান ও পারসিকদের অনুসৃত কৌশলের অনুরূপ। ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু সুফিয়ান যে পদ্ধতি ও কৌশলে যুদ্ধক্ষেত্র নির্বাচন ও সৈন্যবিন্যাস করেছিলেন কোনো রোমান ও পারসিক জেনারেল তা অন্য কোনো উত্তম পদ্ধতিতে করতে পারতেন বলে সন্দেহ আছে। আজ পর্যন্ত কোনো সমালোচকও এর চেয়ে কোনো উত্তম সমাধান দিতে পারেননি।

এই যুদ্ধ পর্যালোচনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো খালিদের সামরিক বিচক্ষণতা ও দক্ষতার বিষয়টি। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায় কোরেশ বাহিনীর প্রধান অংশ পলায়ন করলেও ক্ষুদ্র অশ্বারোহী অংশটি দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়ে থাকে। সাধারণত কোনো বাহিনীর প্রধান অংশ পলায়ন করলে ক্ষুদ্র কোনো অংশ অবস্থানে থাকে না। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, খালিদ (ও ইকরামা) অপরিসীম সাহসিকতার সংগে তাদের বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান নিয়েছিল, যদিও সাধারণ বিবেচনায় এতে কোনো সুবিধা হওয়ার কথা নয়। এতে একদিকে খালিদের চরম ধৈর্যশীলতা ও অন্য দিকে সহজে পরাজয়কে বরণ না করার তীব্র মানসিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মুসলিম তীরন্দাজদের স্বীয় অবস্থান ত্যাগের বিষয়টিও শুধুমাত্র খালিদের তীক্ষ্ণ ও সুযোগ সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এবং শত্রু বাহিনীর পেছন হতে আক্রমণ রচনার একটি দুর্লভ সুযোগের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে। গোটা পরিস্থিতিটি দ্রুত পর্যালোচনা করে তিনি প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করার লক্ষ্যে ত্বরিত গতিতে মুসলিম বাহিনীর পিছন হতে একটি পাল্টা আক্রমণ রচনার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা ছিল

খালিদের সৈন্য পরিচালনার অত্যন্ত প্রতিভাদীপ্ত সিদ্ধান্ত যা মুসলিম বাহিনীর নিশ্চিত বিজয়কে প্রায় পরাজয়ে রূপান্তরিত করে।

ওহুদ যুদ্ধে খালিদের ধৈর্য, মনোবল ও সাহসিকতা এবং মুসলিম বাহিনী পর্যুদস্ত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত চাপ সৃষ্টির ক্ষমতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুদ্ধে প্রতিপক্ষের তিনজন যোদ্ধাকে হত্যা করার মধ্য দিয়েও তার ব্যক্তিগত সাহস ও যুদ্ধকৌশলের প্রকাশ ঘটে। সাহসিকতা ও যৌবনের দীপ্তি এবং ধৈর্য ও বিচক্ষণতার প্রকাশ ঘটিয়ে খালিদ (রা) ভবিষ্যতে বৃহৎ সামরিক সফলতার সম্ভাবনার স্বাক্ষর রাখেন।

এটাই ছিল ইসলামের প্রথম যুদ্ধ যা দক্ষ সৈন্য পরিচালন কৌশলের জন্য ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এরপর থেকেই মুসলমানদের যুদ্ধগুলোতে সৈন্য পরিচালনা ও রণকৌশল উত্তরোত্তর গুরুত্ব পেতে থাকে। এখানে উল্লিখিত খালিদ, আমর ইবনুল আস, আবু উবায়দা, সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস প্রমুখ ব্যক্তি পরবর্তী দু'দশকে যোদ্ধা ও বিজেতা হিসেবে অমর খ্যাতির অধিকারী হবেন।

খন্দকের যুদ্ধ

মক্কায় ফেরার পরও বেশ কয়েকদিন ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলী খালিদের চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তিনি বার বার ভাবতে থাকেন মুসলিম তীরন্দাজগণ স্বীয় অবস্থান ত্যাগ করলে কি অদ্ভুত একটি সুযোগ তার সামনে উপস্থিত হয় এবং কতো দ্রুত ও দক্ষতার সংগে তার সদ্ব্যবহারকল্পে তিনি সৈন্য পরিচালনা করেন। পরবর্তী কালেও খালিদ (রা) অনেক যুদ্ধেই এরূপ পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু মুসলমানদের সাহস ও ধৈর্যের ব্যাপারটি তার অন্তরকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। এটা তার নিকট অস্বাভাবিক মনে হয় যে, কিভাবে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী কয়েকগুণ শক্তিশালী শত্রুর দ্বারা চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়েও তাদের নেতা ও বিশ্বাসের জন্য শেষমুহূর্ত পর্যন্ত পর্বতপ্রমাণ দৃঢ়তার সংগে যুদ্ধ করে যেতে পারে। মুসলমানরাও তো কোরেশ ও অন্যান্য আরব গোত্রেরই লোক। সম্ভবত নতুন বিশ্বাস ইসলাম তাদের মধ্যে এমন এক শক্তির সৃষ্টি করতে পেরেছে যা অন্য কোনো ধর্মবিশ্বাস পারে না। হয়তো মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন মোহনীয় শক্তি ছিল যা অন্য নেতাদের মধ্যে অনুপস্থিত। খালিদের অন্তরে এ জাতীয় চিন্তাভাবনা দানা বাঁধলেও এখন পর্যন্ত নতুন বিশ্বাসের প্রতি তিনি কোনো প্রকার দুর্বলতা প্রকাশ করেন না। তিনি পুনরায় মুসলমানদের মুকাবিলা করার চিন্তা করতে থাকেন, তবে পূর্বের ন্যায় গভীর তিক্ততা ও ঘৃণাসহকারে নয়। একজন খেলোয়াড় যেমন স্বাভাবিকভাবে তার পরবর্তী প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা করে তিনিও তদ্রূপ মুসলমানদের সংগে পরবর্তী যুদ্ধের কথা ভাবতে থাকেন।

খালিদ স্বভাবসিদ্ধভাবেই শৌর্যবীর্য সহকারে উত্তম জীবন যাপন করতে থাকেন।

পরবর্তী দু'বছর মুসলিম ও কোরেশদের মধ্যে কোনো সরাসরি সংঘর্ষ হয় না। অবশ্য এই সময়ের মধ্যেই রাজী নামক স্থানে একটি নির্মম ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে যা মক্কা ও মদীনার সম্পর্ককে তিক্ততর করে তোলে।

এই ঘটনাটি ঘটে ৬২৫ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে। একদিন কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে তাদেরকে নিজ গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিয়ে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং কুরআন ও ইসলামী জীবনধারা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম এমন কয়েকজন মুসলমানকে তাদের সংগে দেয়ার

অনুরোধ জানায় যারা তাদের গোত্রের নিকট সত্যবিশ্বাস ইসলামকে উপস্থাপন করবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এই কাজের জন্য তাঁর ছয়জন সংগীকে মনোনীত করেন। মনোনীত ব্যক্তিগণ ইসলাম প্রচারের সুযোগ পেয়ে গর্বিত চিত্তে উক্ত প্রতিনিধি দলের সংগে মদীনা ত্যাগ করেন। এই দলটি উসফানের অদূরে রাজী নামক স্থানে পৌঁছলে আমন্ত্রণকারী উক্ত গোত্রের ওত পেতে থাকা ১০০ জন যোদ্ধার দ্বারা আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়। যাত্রার প্রারম্ভে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না। তারা তরবারি কোষমুক্ত করে কিন্তু কোনো প্রকার প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। আক্রমণকারীগণ তাদের তিনজনকে সেখানেই হত্যা করে এবং বাকি তিনজনকে বন্দী করে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করে। পথে একজন মুসলিম নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয় এবং একাই প্রতারক দুশমনদের উপর চড়াও হয়। কিন্তু সে অল্প সময়ের মধ্যে শাহাদত বরণ করে। শেষপর্যন্ত যে দুজন মুসলিমকে বন্দী অবস্থায় মক্কায় নেয়া হয় তারা হলেন খুবায়ব বিন আদী এবং যায়দ বিন দাসনা। তারা উভয় পূর্ববর্তী যুদ্ধে কাফিরদেরকে হত্যা করেছিল। এই সব নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনগণ তাদেরকে খুব আগ্রহ সহকারে উচ্চমূল্যে ক্রয় করে প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা নিয়ে।

ঘটনাটি ছিল পবিত্র সফর মাসের। তাই সফর মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত বন্দীদের উপর কোন প্রকার নির্যাতন করা হয় না। সফর মাস শেষ হওয়ার সংগে সংগে তাদেরকে মক্কার উত্তর-পশ্চিম দিকে তানীম নামক একটি জায়গায় নেয়া হয়। সেখানে পূর্ব থেকেই শহরের দাস-দাসী, নারী, শিশুসহ সকল অধিবাসী একত্রিত হয়েছিল। বন্দীদেরকে মাঠের মাঝখানে দুটো কাঠের খুঁটির নিকট নেয়া হয়। তারা শেষবারের মতো নামায পড়তে চাইলে সে সুযোগ দেয়া হয়। নামায শেষ হলে বন্দীদেরকে খুঁটিদুটোর সংগে শক্ত করে বাঁধা হয়।

তাদের উভয়কে, পুনরায় মূর্তিপূজকের জীবনে ফিরে আসা অথবা মৃত্যুকে বরণ করা, এই দুটোর একটা বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। তারা উভয়ে মৃত্যুর পথকে বেছে নেয়। এরপর আবু সুফিয়ান উভয় বন্দীর নিকট গিয়ে প্রস্তাব করে, "তুমি কি চাওনা যে, তুমি তোমার বাড়িতে নিরাপদে থাকো এবং মুহাম্মদ বন্দী হয়ে এখানে তোমার জায়গায় আসে।" তারা উভয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিনাদ্বিধায় এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলে যে, পৃথিবীর কোনো শাস্তিই তাদের মনে মুহূর্তের জন্যও এই ধরনের চিন্তাকে স্থান দিবে না। বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়ে আবু সুফিয়ান ফিরে যায় এবং সংগীদের উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করে, "আমি কোনো জনগোষ্ঠীকে তাদের নেতাকে এতো ভালবাসতে দেখি নাই, মুহাম্মদের অনুসারিগণ মুহাম্মদকে যেমন ভালবাসে।"[৫০]

---

৫০. ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ১৭২ ।

প্রথম শহীদ হন যায়দ। একজন ক্রীতদাস তার বুক বরাবর বর্শা নিক্ষেপ করলে সে অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এরপর আসে খুবায়বের পালা। তাকে হত্যার দৃশ্যটি একটি প্রদর্শনীর রূপ লাভ করে। বস্তুত মক্কার অধিবাসীগণ এই প্রদর্শনী উপভোগ করার জন্যই এখানে সমবেত হয়েছে।

একটি সংকেতের সংগে সংগে ৪০ জন ছেলে তাদের বর্শা নিয়ে খুঁটিতে বাঁধা খুবায়বের নিকট ছুটে যায় এবং তাকে বর্শা বিদ্ধ করতে থাকে। কখনও কখনও তারা খুবায়বের নিকট হতে দূরে চলে যায় এবং আবার বর্শা উত্থিত করে তার দিকে অগ্রসর হয় যেন তাকে এখনই হত্যা করবে। কিন্তু তারা বর্শাকে সংযত করে এবং শেষমুহূর্তে হালকা করে আঘাত হানে যাতে শুধু শরীরের চামড়া কেটে বিদ্ধ হয় ও শত শত ক্ষতচিহ্ন হতে প্রবাহিত রক্তের ধারা খুবায়বের শরীরকে রঞ্জিত করে ফেলে। প্রত্যেকটি আঘাতের সময় তিনি ছটফট করতেন, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে একটিও শব্দ বের হয় না। দর্শকগণ তার দুর্দশা দেখে আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে।

এইভাবে কিছু সময় চলার পর একজন বয়স্ক লোক বর্শা হাতে নিয়ে খুবায়বের নিকট যায় এবং ছেলেগুলোকে সরিয়ে দেয়। সম্ভবত ইতোমধ্যে ছেলেরা ও দর্শকগণ এই কৌতুকময় খেলায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। লোকটি তার বর্শা তুলে খুবায়বের বুক বরাবর আঘাত হানে। ফলে তার সমস্ত যন্ত্রণার সমাপ্তি ঘটে। তারা মৃতদেহ দুটোকে ঐ খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায়ই পরিত্যাগ করে যেন সেখানেই পচে যায়।

এই গোটা ব্যাপারটির আয়োজন যে ব্যক্তিটি করে সে আবু জহলের পুত্র ইকরামা বৈ আর কেউ নয়। সে ছেলেদেরকেও উক্ত কৌতুকময় খেলাটি শিখিয়েছিল। ইকরামার বদর ও ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম নিধনের অপরাধ হয়তো ক্ষমার যোগ্য ছিল, কিন্তু এই বীভৎস প্রদর্শনীটির আয়োজন করে সে ক্ষমার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এইদিন থেকে ইকরামা যুদ্ধঅপরাধী হিসেবে পরিগণিত হয়।

উল্লেখ্য যে, ওহুদ যুদ্ধের শেষে আবু সুফিয়ান পরবর্তী বছর বদর প্রান্তরে পুনরায় মুসলিম বাহিনীকে মুকাবিলা করার একটি চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা)ও তা গ্রহণ করেছিলেন। আবু সফিয়ানের চ্যালেঞ্জ মাফিক এই সংঘর্ষটি হওয়ার কথা ৬২৬ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে। মার্চ মাস সমাগত হলে আবু সুফিয়ান নানান কারণে যুদ্ধের ব্যাপারে নির্লিপ্ত ভাব প্রকাশ করতে থাকে। শীতকালে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় শীত চলে যাওয়ার সংগে সংগেই তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। আবহাওয়া খুব উষ্ণ ও শুষ্ক রূপ লাভ করে এবং সামনে একটি খারাপ বছরের সমূহ আশংকা পরিলক্ষিত হতে থাকে। আবু সুফিয়ান বদর প্রান্তরের সম্ভাব্য যুদ্ধ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং মদীনায় একজন গুপ্তচর পাঠিয়ে এই মর্মে গুজব ছড়ায় যে, কোরেশগণ ওহুদের যুদ্ধের চেয়েও বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রার ব্যাপক প্রস্তুতি

নিচ্ছে। তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমগণকে ভীতসন্ত্রস্ত করা যাতে তারা মদীনা ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য সামনে অগ্রসর না হয়। কিন্তু কোরেশদের প্রস্তুতির এই খবর মদীনায় পৌছার পর রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা দেন, "প্রয়োজন হলে আমি একাই যাব তবু কাফিরদের সংগে নির্দিষ্ট সময়েই মুকাবিলা হবে।"[৫১]

মার্চ মাসের শেষের দিকে মুসলিম বাহিনী মদীনা ত্যাগ করে। তাদের সংখ্যা ছিল ১৫০০ এবং এর মধ্যে ৫০ জন অশ্বারোহী। এই বাহিনী ৬২৬ খৃস্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল (১লা যুকাদা, ৪ হিজরী) বদর প্রান্তরে পৌছে, কিন্তু সেখানে কোরেশগণের কোন চিহ্ন ছিল না। আবু সুফিয়ান মদীনা থেকে মুসলিম বাহিনীর যাত্রার খবর পেয়ে কোরেশদেরকে একত্র করে মক্কা ত্যাগ করে। কোরেশ বাহিনী গঠিত হয় ২০০০ পদাতিক ও ১ শত অশ্বারোহীর সমন্বয়ে। এদের সংগে থাকে খালিদ, ইকরামা ও সাফওয়ানের মতো বলিষ্ঠ ও সাহসী যোদ্ধাগণ। উসফানে পৌছার পর আবু সুফিয়ান যে কোনো ভাবেই হোক যুদ্ধ এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত নেয়। সে তার লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, "যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার জন্য চলতি বছরটি খুবই ভয়ংকর। একদিকে অনাবৃষ্টি ও সেই সংগে অভূতপূর্ব গরম। এই অবস্থায় কিছুতেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না। আমরা পরবর্তী বছরের জন্য অপেক্ষা করবো।"[৫২] যুদ্ধ না করার কারণ ব্যাখ্যা করে সে মক্কায় ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়। ইকরামা ও সাফওয়ান এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে, কিন্তু কেউ তাতে কর্ণপাত করে না। কোরেশগণ মক্কায় ফিরে যায়।

মুসলিম বাহিনী বদর প্রান্তরে ৮ দিন অবস্থান করে। আবু সুফিয়ানের সসৈন্যে মক্কায় ফিরে যাওয়ার খবর পেয়ে তারাও মদীনায় ফিরে আসে।

যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আবু সুফিয়ানের মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর কোরেশ ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তি বিরাজ করতে পারতো। কিন্তু কতিপয় ইহুদীর চক্রান্তের ফলে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই চক্রান্তের কারণ উপলব্ধি করার জন্য আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরত করে মদীনায় আগমনের সময়ে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় হিজরতের পর মদীনার মুসলমানগণ মুহাজির ও আনসার নামে দুটি দলে পরিচিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে মক্কা থেকে হিজরতকারী মুসলিমগণ পরিচিত হয় মুহাজির নামে এবং মদীনায় বসবাসকারী মুসলিমগণ, যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমন্ত্রণ করে এনেছিল তাদের সংগে বসবাস করার জন্য তারা আনসার অর্থাৎ সাহায্যকারী হিসেবে খ্যাত হয়। এছাড়াও মুসলমানদের মধ্যে ছিল আর একটি দল যারা ছিল মুনাফিক নামে পরিচিত। মুনাফিকগণ ছিল মদীনার অধিবাসী এবং তারা সময়ের সাধারণ প্রবণতার সংগে তাল

---

৫১. ইবনে সাদ ঃ পৃষ্ঠা - ৫৬৩।
৫২. ইবনে সাদ ঃ পৃষ্ঠা - ৫৬৩।

মিলানোর জন্যই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু প্রকৃত অর্থে অন্তরের দিক থেকে (মুসলিম) ছিল না। এরাই ছিল সেই মুনাফিক দল যারা ওহুদের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পরিত্যাগ করেছিল। এদের নেতা ছিল আব্দুল্লাহ বিন উবাই। এই লোকটি মদীনায় একটি সম্মানজনক অবস্থান ভোগ করতো। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনে তার অবস্থান ক্ষুণ্ন হয় বলে সে মনে করে। তাই সে ও তার দল সুযোগ পেলেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পথে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। কিন্তু তারা কখনই ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করতো না। বিশেষ করে কোন যুদ্ধের সময় সমাগত হলেই তারা বিভিন্নভাবে মুসলিম বাহিনীকে দুর্বল করার চেষ্টা করতো।

মদীনার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইহুদীরা ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক। তারা ছিল প্রধান তিনটি গোত্রে বিভক্ত ঃ বনী কায়নুকা, বনী নাযির ও বনী কুরায়জা। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে ইহুদীরা তাঁকে বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করে এবং নতুন বিশ্বাসের আগমনকে তাদের জন্য কোনো হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে না। তাদের প্রত্যেকটি গোত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে এমন একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যাকে মৈত্রীচুক্তি বা অনাক্রমণ চুক্তি বলা যায়। এই চুক্তির একটি ধারা এমন ছিল যে, এক পক্ষ আক্রান্ত হলে অন্যপক্ষ কোনো অবস্থাতেই তার শত্রুকে সাহায্য করবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মক্কায় অবস্থানকালে শুধু ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়েই কুরআনের আয়াত নাযিল হতো। ফলে সে সময় ইসলামের বৈশিষ্ট্য সীমিত ছিল স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণকারী ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের মধ্যে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় হিজরতের পর থেকে ইসলাম গতিশীল রূপ লাভ করে এবং মানব জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ অন্যান্য দিকেও প্রবেশ করে। ইসলাম মানুষকে সমাজের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে এবং সমাজকে মানুষের সুন্দর, প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার ধারণা উপস্থাপন করে। ইসলামের এই গতিশীল চিন্তার সংগে স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত জীবনধারা ও বিশ্বাসের বিরোধ সৃষ্টি হয়। পুরাতন ধর্মবিশ্বাসগুলোর মধ্যে ইহুদীবাদের সংগেই প্রথম বিরোধের সূত্রপাত হয়। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের পর হতেই ইহুদীরা তাদের অবস্থান সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে। এরপর বনী কায়নুকা চুক্তির শর্তাবলী ভংগ করে মুসলমানদের প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন এবং তারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। চুক্তি ভংগের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে মদীনা হতে বিতাড়িত করা হয় এবং তারা সিরিয়ায় চলে যায়।

ওহুদের যুদ্ধের পরপরই পরবর্তী ইহুদী গোত্র বনী নাযীর তাদের চুক্তি ভংগ করে। মুসলিমগণ একইভাবে তাদেরকে দমন করে। এই গোত্রের কিছুলোক সিরিয়ায় চলে যায় এবং কিছু মদীনার উত্তরে খায়বার এলাকায় বসবাস শুরু করে। এই ইহুদী

গোত্র দুটোর সংগে সংঘর্ষকালে মুনাফিক দলের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইর ভূমিকা ছিল খুবই রহস্যজনক। সে প্রথমে ইহুদীদের পক্ষ নিয়ে তাদেরকে গোপনে মুসলমানদের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে ও সক্রিয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু যুদ্ধের গতি মুসলমানদের পক্ষে দেখে সে ওয়াদা ভংগ করে ইহুদীদেরকে পরিত্যাগ করে।

তৃতীয় ইহুদী গোত্র বনী কুরায়জা মদীনায় শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে থাকে। মুসলমানদের সংগে তাদের সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ এবং তারা চুক্তির শর্তাবলী সঠিকভাবে পালন করে চলছিল। কিন্তু মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খায়বার এলাকায় বসবাসকারী বনী নাযীর গোত্রের অংশটি মুসলমানদের হাতে তাদের পরাজয় ও শাস্তির কথা ভুলতে পারেনি। ওহুদ যুদ্ধের পর তারা জানতে পারে যে, পরবর্তী বছর মুসলিম ও কোরেশ বাহিনী আর একটি যুদ্ধের জন্য অংগীকারাবদ্ধ। তারা ঐ সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে এই আশায় যে, যুদ্ধে মুসলমানগণ ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তী বছরের নির্ধারিত যুদ্ধটি সংঘটিত না হওয়ায় তারা নিজেরাই মুসলমানদের সরাসরি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়।

৬২৬ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মের শেষ নাগাদ খায়বারে বসবাসকারী ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল মক্কার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেয় বনী নাযীর গোত্রের মদীনায় অবস্থানকালীন নেতা হুই বীন আখতাব। মক্কায় পৌঁছে তারা আবু সুফিয়ানের সংগে সাক্ষাৎ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনার প্রস্তাব উপস্থাপন করে। হুই বিন আখতাব ইসলামের বিস্তারের ফলে কোরেশদের সম্ভাব্য বিপদের প্রসংগ তুলে তাদের ভীতি ও আবেগকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। সে আবু সুফিয়ানকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মুসলিমগণ ইয়ামামায় পৌঁছে গেলে তাদের ইরাক ও বাহরাইনের ব্যবসার পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে।

আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করে, "হে আখতাবের পুত্র, তুমিতো জ্ঞানী ব্যক্তিদের একজন। আমাকে বলো, তোমার মতে কি মুহাম্মদের নতুন ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে উত্তম ?" হুই নিমেষের মধ্যেই বিনা দ্বিধায় বলে, "আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি যে, মুহাম্মদের ধর্মের চেয়ে তোমাদের ধর্ম উত্তম। তোমরাই সঠিক পথে আছ।[৫৩] এ জবাবে কোরেশগণ খুবই খুশি হয় এবং তারা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সম্মত হয় যদি অন্যান্য আরব গোত্র তাদের সংগে যোগদান করে।

এরপর ইহুদী প্রতিনিধিদলটি গাতফান ও বনী আসাদ গোত্রের নিকট যায় এবং একই ধরনের কথাবার্তা হয়। তারাও প্রতিনিধিদলের প্রস্তাবে সম্মত হয়। এরা সকলে মিলে অন্য সব গোত্রকে সংগে নিয়ে একটি সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা করে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়।

---

[৫৩] ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৪

ওহুদের যুদ্ধের পর কোরেশগণ সিরিয়ার সংগে তাদের বাণিজ্য ঘাটতির ব্যাপারটিকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নিয়েছিল। মদীনার কর্তৃত্ব মুসলিমদের হাতে থাকায় মক্কাবাসীদের পক্ষে সিরিয়াগামী উপকূলীয় পথ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই মক্কার অধিবাসীগণ ইরাক, বাহ্রাইন ও ইয়েমেনের সংগে বাণিজ্য বৃদ্ধি করে সিরিয়ার সংগে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘাটতি কমবেশি পূরণ করার চেষ্টা করছিল। ইহুদী প্রতিনিধিদলের সংগে বৈঠকের ফলে আবু সুফিয়ান মক্কাবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে আরও সজাগ হয়ে ওঠে। মুসলিমগণ ইয়ামামায় পৌঁছে গেলে কোরেশদের জন্য ইরাক ও বাহ্রাইনের পথও বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে তাদের ব্যবসা সীমিত হয়ে পড়বে শুধু ইয়েমেনের সংগে। ব্যবসা-বাণিজ্যের এই সম্ভাব্য সংকোচন কোরেশদের জন্য হবে এমন একটি মারাত্মক অর্থনৈতিক আঘাত যার প্রভাব কাটানো তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। তদুপরি গত অভিযানে মুসলিমদের মুকাবিলা না করার জন্য সাফওয়ান বিন উমাইয়ার নিকট আবু সুফিয়ানকে তিরস্কৃত হতে হয়। এসব কারণে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হয়। ৬২৭ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে বিভিন্ন গোত্রের যোদ্ধাগণ একত্রিত হতে থাকে। কোরেশগণ ৪০০০ যোদ্ধা, ৩০০ অশ্ব ও ১৫০০ উটের সমন্বয়ে সর্ববৃহৎ বাহিনীর সমাবেশ ঘটায়। উয়াইনা বিন হিসনের নেতৃত্বে এর পরবর্তী বৃহৎ সমাবেশ ঘটায় গাতফান গোত্র। তাদের যোদ্ধার সংখ্যা ২০০০। এ ছাড়াও বনী সুলায়ম গোত্র ৭০০ ও তুলায়হা বিন খুওয়ায়ালদের নেতৃত্বে বনী আসাদ উপস্থিত করে অজ্ঞাতসংখ্যক যোদ্ধা। কোরেশ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র গোত্রগুলো মক্কায় সমবেত হয় এবং গাতফান, বনী আসাদ ও বনী সুলায়ম যথাক্রমে মদীনার উত্তর, উত্তর-পূর্ব এবং পূর্বে সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। এই সমাবেশ এলাকা থেকে তারা মদীনার উদ্দেশে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রগুলোসহ, যাদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি, মোট সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১০,০০০। আবু সুফিয়ান এই অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। বিভিন্ন গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত এই বাহিনীকে আমরা মিত্রবাহিনী বলে সম্বোধন করবো।

৬২৭ খৃস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার (১লা শাওয়াল, ৫ হিজরী) মিত্র বাহিনী তাদের বিভিন্ন সমাবেশ এলাকা থেকে অগ্রসর হয়ে মদীনার নিকটবর্তী এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করে। কোরেশগণ ওহুদ পর্বতের পশ্চিমে সেই জায়গাটিতেই ক্যাম্প স্থাপন করে যেখানে তারা ওহুদ যুদ্ধের সময়ও ক্যাম্প করেছিল। তাদের উত্তরে ছিল বনাঞ্চল ও পাশে ছিল ঝর্ণার সংযোগ স্থল। গাতফান ও অন্যান্য গোত্র ওহুদ পর্বতের ২ মাইল দক্ষিণে জনাব নাকমা নামক স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করে। ক্যাম্প স্থাপন শেষ হলে মিত্র বাহিনী মদীনার দিকে অগ্রসর হয়।

মক্কায় কোরেশ ও তার মিত্রদের সমবেত হওয়ার তৎপরতার প্রারম্ভিক পর্যায়েই এ খবর মদীনায় পৌঁছে যায়। কোরেশদের সংগে বিভিন্ন গোত্রের যোগদানের খবর আসতে থাকলে ক্রমান্বয়ে তা উদ্বেগজনক রূপ লাভ করে। সর্বশেষ খবরে রাসূলুল্লাহ (সা) জানতে পারেন যে, মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ১০,০০০ যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী মদীনার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে। এই খবরে মুসলমানদের মধ্যে উদ্বেগ ও হতাশা দেখা দেয়। মুসলিমগণ অবশ্য সবসময়ই সংখ্যায় কয়েকগুণ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে থাকে। বদর ও ওহুদ যুদ্ধে শত্রুসৈন্যের সংখ্যা ছিল তাদের তুলনায় যথাক্রমে তিন ও চার গুণ। বর্তমানে মদীনায় সক্ষম মুসলমানের সংখ্যা ৩০০০ হলেও এদের মধ্যে মুনাফিকের সংখ্যা ছিল কয়েক শ। অপরপক্ষে ১০,০০০ সৈন্যের সমাবেশ নিঃসন্দেহে একটি বিশাল ব্যাপার। হিজাযের ইতিহাসে কোন যুদ্ধে এত বিশাল সৈন্যের সমাবেশ কখনও ঘটেনি।

মুসলমানদের উদ্বেগ ও হতাশার মধ্যে আলোকবর্তিকা হিসেবে দেখা দেয় পারস্যবাসী সাহাবী হযরত সালমানের একটি পরামর্শ। তিনি বলেন যে, পারস্য বাহিনী বৃহত্তর শত্রুর আক্রমণ হতে নিজেকে রক্ষার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে শত্রুর আগমন পথে অনতিক্রম্য প্রশস্ত ও গভীর পরিখা খননের কৌশল অবলম্বন করে থাকে। আরবদের নিকট এই কৌশলটি ছিল অজ্ঞাত। কিন্তু তারা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে।

রাসূলুল্লাহ (সা) পরিখা খননের নির্দেশ দান করেন। এই অভিনব কৌশলটির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম এমন অনেককেই পরিখা খননের মতো কষ্টসাধ্য কাজে আত্মনিয়োগ করতে অসম্মত মনে হলো। আর মুনাফিকরাতো স্বভাবসিদ্ধভাবেই লোকদেরকে এই পরিশ্রমের কাজ হতে দূরে রাখার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) স্বহস্তে পরিখা খননের কাজে আত্মনিয়োগ করলে আর কোনো আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মুসলমানের পক্ষে দূরে থাকা সম্ভব হয় না। পরিকল্পিত পরিখাটির দৈর্ঘ হিসেব করে প্রতি দশজন মুসলমানের একটি দলকে ৪০ হাত করে খননের দায়িত্ব দেয়া হয়। মুসলমানরা ঘর্মাক্ত কলেবরে হাড়ভাংগা পরিশ্রমে নিয়োজিত থাকাকালে হাসসান বিন সাবিত ঘুরে ঘুরে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়ে সকলকে চাংগা রাখার চেষ্টা করছিলেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত বিষয় নিয়ে এতো সুন্দর কবিতা রচনা করতে পারতেন যে, তা বিশ্বাস করাই ছিল কষ্টকর। তাঁর কবিতা শ্রোতাকে সহসাই আবেগতাড়িত করতে পারতো।

পরিখাটির বিস্তৃতি ছিল শায়খাইন থেকে জুবাব পর্বত পর্যন্ত এবং সেখান থেকে জবাল বনী উবায়দ পর্যন্ত। এই পর্বতগুলো পরিখা দ্বারা সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে ছিল। জবাল বনী উবায়দ নামে পরিচিত পর্বতদুটির পশ্চিম দিকের এলাকা অর্থাৎ

মুসলিম বাহিনীর বামবাহুকে সংরক্ষণের জন্য পরিখার পশ্চিম বাহুকে দক্ষিণে বাঁকা করে বিস্তৃত করা হয়। শায়খাইনের পূর্ব ও জবাল বনী উবায়দের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে লাভাযুক্ত মাঠ। এই মাঠের উপরিভাগ অসমান এবং বৃহৎ আকৃতির কালো বোল্ডারে ভরা। ফলে এই এলাকাগুলো ছিল সামরিক অভিযানের জন্য অগম্য। পরিখার কেন্দ্রের একটু দক্ষিণে সিলা পাহাড়টি অবস্থিত। পাহাড়টির উচ্চতা ৪০০ ফুট, দৈর্ঘ্য ১ মাইল ও প্রস্থ তার চেয়ে সামান্য কিছু কম। পাহাড়টি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ হলেও খাড়া অংশগুলো বিস্তৃত ছিল চারদিকেই। ক্ষুদ্র জুবাব পাহাড়টি সিলার উত্তর-পূর্ব দিকের খাড়া অংশের কাছাকাছি অবস্থিত (৩ নং ম্যাপ দ্রষ্টব্য)।[৫৪]

পরিখা খনন সমাপ্ত হলে মুসলিম বাহিনী সিলা পাহাড়ের সম্মুখে তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। তাদের মোট সংখ্যা ছিল ৩০০০। এর মধ্যে ছিল মুনাফিকরাও যাদের শেষপর্যন্ত যুদ্ধ করার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিকল্পনা ছিল তাঁর বাহিনীর বৃহত্তর অংশকে কোথাও নিয়োজিত না করে মুক্ত রাখা যাতে শত্রু পরিখার যে কোনো এলাকা অতিক্রম করতে সক্ষম হলে দ্রুত তার উপর আঘাত হানা সম্ভব হয়। শত্রুর আকস্মিক অভিযান প্রতিহত করার জন্য ২০০ যোদ্ধাকে গোটা পরিখাটি পাহারা দেয়ার জন্য মোতায়েন করা হয়। তারা পিকেট হিসেবে পরিখার পার্শ্ববর্তী উঁচু পাহাড়ী এলাকাগুলোতে অবস্থান নেয়। ৫০০ জনের একটি গতিময় বাহিনীকে নিয়োগ করা হয় টহল দিয়ে মদীনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর উপর লক্ষ্য রাখা ও যে কোনো প্রকার অনুপ্রবেশকারীকে প্রতিরোধ করার জন্য। পরিখার দ্বারা সংরক্ষণ করা যায়নি এমন এলাকাগুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়। (তখন মদীনা শহর ছিল কিছু স্থাপনা ও দুর্গের সমন্বয়ে গঠিত। আর শহরের কেন্দ্রে ছিল মসজিদে নববী)। যুদ্ধক্ষেত্রটি ছিল মদীনা থেকে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমমুখী। মহিলা ও শিশুদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত দুর্গ ও বাড়িগুলোতে রাখা হয়েছিল।

সময়টি ছিল শীতকাল। অন্যান্য বারের তুলনায় শীত ছিল অত্যন্ত বেশি এবং তা পড়েছিল দীর্ঘদিন ধরে।

কোরেশগণ পরিখা দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। তারা যে শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিল তাতে বিজয় ছিল নিশ্চিত। আবু সুফিয়ানও খুব আনন্দঘনচিত্তে বিজয়ের প্রত্যাশা নিয়েই যুদ্ধ যাত্রা করেছিল। কিন্তু সেপথে বাদ সাধলো এই পরিখাটি।

---

৫৪. বলা হয় যে পরিখার পশ্চিম অংশও মাজাদে শেষ হয়েছে। একথা এ অর্থে সত্য যে, ৩নং ম্যাপে প্রদর্শিত পশ্চিম দিকের তিনটি পাহাড়কেও মাজাদ বলা হয়।

বিস্মিত আবু সুফিয়ানের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, “ও আল্লাহ! এই অভিনব কৌশলতো আরবদের নয়।”[৫৫] বীরধর্মে বিশ্বাসী সাধারণ আরবদের মনে এ ধরনের যুদ্ধকৌশলের কোনো স্থান ছিল না।

যাহোক মিত্রবাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে পরিখার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম এলাকা বরাবর সৈন্য মোতায়েন করে। তারা দীর্ঘ ২৩ দিন ধরে এলাকাটি অবরোধ করে রাখে। তারা দিনের বেলা পরিখার কাছাকাছি এসে তীর বিনিময় করতো এবং রাতে ক্যাম্পে ফিরে যেতো। মুসলিম বাহিনী মাত্র ২০০ যোদ্ধা মোতায়েন করে পরিখার নিজ পাড় পাহারা দিতো। সাধারণত দিনের বেলা এবং কখনও কখনও রাতেও মিত্র বাহিনী পরিখাটি অতিক্রম করার মতো উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে ব্যস্ত থাকতো। তারা ঘটনাক্রমে অনেক পরে অনুরূপ একটি স্থান খুঁজে পায়।

অবরোধের প্রথম ১০ দিন উভয়পক্ষের কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই অতিক্রম হয়। উভয় বাহিনীর মনোবল পরিস্থিতির দ্বারা খুব চাপের সম্মুখীন হয়। তবে তারা যে কোনো পরিস্থিতিতেই একে অপরের মুকাবিলা করার ব্যাপারে অটল থাকে। মুসলিমগণ ক্ষুধার তাড়না উপলব্ধি করতে থাকে। মদীনায় খাদ্য মজুদ তেমন একটা ছিল না। ফলে মুসলিম বাহিনীর রেশনের সরবরাহ অর্ধেকে নেমে আসে। এই সুযোগে মুনাফিকগণ প্রকাশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমালোচনা শুরু করে। পরিখার খনন চলাকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করা সম্ভব হবে এবং তাদের বিশাল সম্পদরাজ্য মুসলমানদের হস্তগত হবে। মুনাফিকরা এখন বলতে শুরু করে, মুহাম্মদ আমাদেরকে সিজারের সম্পদের অধিকারী করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অথচ আজ সে আমাদেরকে এই ক্ষুদ্র সমস্যা থেকে উদ্ধার করতে অক্ষম।[৫৬] প্রকৃত ঈমানদারগণ তাদের বিশ্বাসে এবং নেতার প্রতি আনুগত্যে অনড় থাকে।

পরিস্থিতির অবনতির কারণে মিত্র বাহিনীর সৈনিকদের মাঝেও অসন্তোষ দেখা দেয়। আরবগণ দীর্ঘস্থায়ী অবরোধের চেয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে দ্রুত ফলাফল লাভে অভ্যস্ত। খারাপ আবহাওয়ার কারণে মিত্র বাহিনীর অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরূপ দীর্ঘস্থায়ী অবস্থানের পরিকল্পনা না থাকায় তাদের মধ্যেও খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। তবে যেহেতু তারা নিজেরা অবরুদ্ধ ছিল না তাই আশেপাশের এলাকা থেকে খাদ্য সংগ্রহে তৎপর হয়ে ওঠে। আবু সুফিয়ান একটা উপায় বের করার জন্য সক্রিয়ভাবে চিন্তা শুরু করে। সে ইহুদী নেতা হুই-এর সংগে বৈঠকে বসে এবং তারা একটি সম্ভাবনাময় নতুন পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হয়।

---

৫৫. ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা - ২২৪।
৫৬. ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২২২।

ম্যাপ-৩ঃ খন্দকের যুদ্ধ
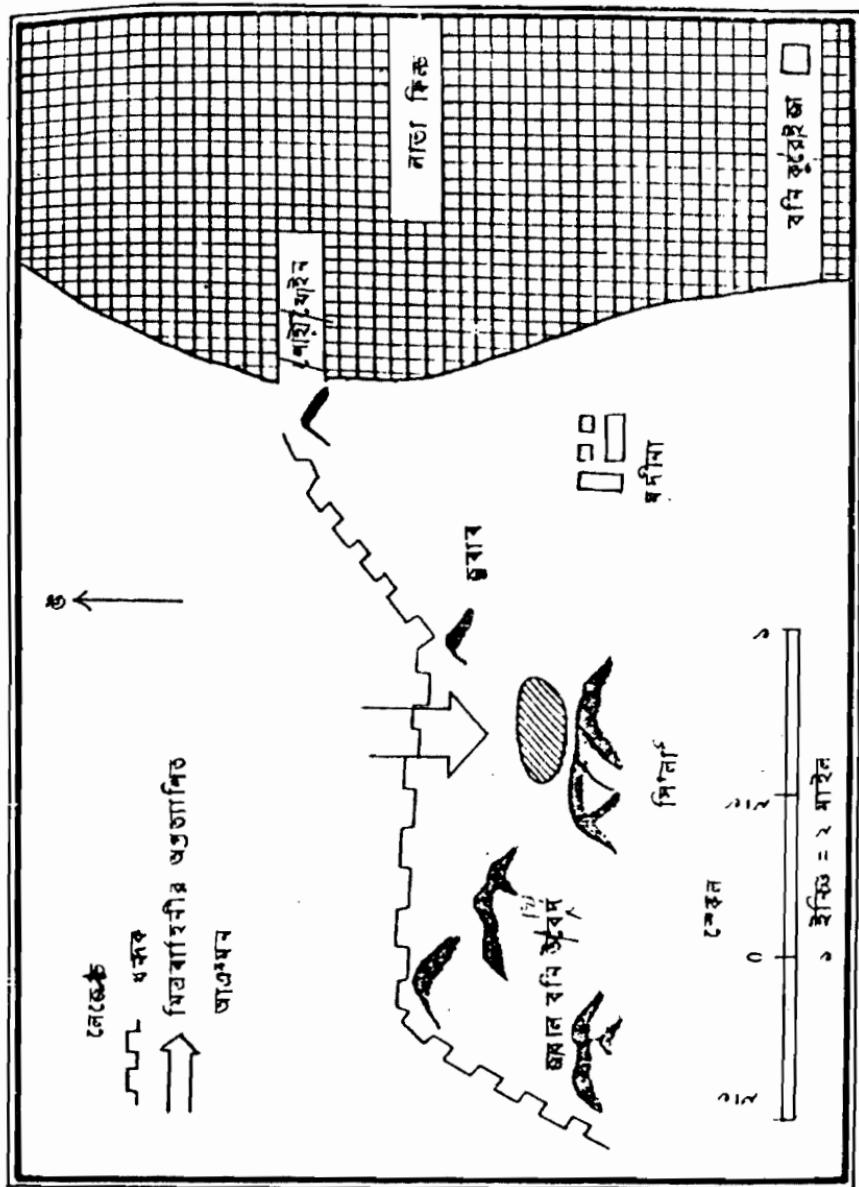
৭ই মার্চ শুক্রবার রাতে হুইএ চুপিচুপি বনি কুরাইজা গোত্রের আস্তানায় প্রবেশ করে। সে গোত্রের নেতা কাব বিন আসাদের সাক্ষাতপ্রার্থী হয়। কাব তার আগমনের উদ্দেশ্য অনুমান করে প্রথমে দেখা করতে অস্বীকার করে। কিন্তু হুইএর বারংবার অনুরোধের মুখে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়। হুই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং খুব ঠাণ্ডা মস্তিস্কে ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাব ও তার অনুসারী ইহুদীদেরকে মুসলমানদের পক্ষ ত্যাগ করে মিত্রবাহিনীতে যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। কাব প্রথমে অস্বীকার করে, "মুহাম্মদ আমাদের সংগে তার চুক্তির সবগুলো শর্তই মেনে চলছে এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ করার কোনো কারণ নেই।" সে হুইকে আরও বলে, "তাছাড়া তোমাদের যুদ্ধ জয়েরতো কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমি না হয় তোমার প্রস্তাবে রাজী হলাম কিন্তু অভিযান ব্যর্থ হলে তো তোমরা মক্কায় ফিরে যাবে। তখন আমি মুহাম্মদের চাপ কিভাবে সহ্য করবো?"[৫৭] কিন্তু হুই কখনও হুমকি, কখনও প্রলোভন ও কখনও সাহায্য ভিক্ষার মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রাখে এবং শেষ পর্যন্ত কাবকে মিত্রবাহিনীর সংগে সমঝোতায় আনতে সক্ষম হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মিত্রবাহিনী ও বনী কুরাইজা যুগপৎ আক্রমণ রচনা করবে। বনী কুরাইজার ক্যাম্প ছিল মদীনার দু'মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। তারা সেখান থেকে মুসলিম বাহিনীকে পিছন দিক হতে আক্রমণ করে কিছু মুসলিম তাদের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং এই সুযোগে মিত্রবাহিনী সম্মুখ দিক থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ রচনা করবে। প্রস্তুতির জন্য বনী কুরাইজা দশদিন সময় চেয়ে নেয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, এই দশদিন কোরেশগণ মুসলিম বাহিনীকে ব্যস্ত রাখার জন্য ছোট-খাট অপারেশন চালাবে।

এভাবে মদীনার ইহুদীদের সর্বশেষ দলটিও পূর্ববর্তীদের মতো মুসলমানদের সংগে চুক্তি ভংগ করলো। কিন্তু তারা কি জানতো যে, এর জন্য কত বড় ক্ষতিপূরণ তাদেরকে দিতে হবে?

রাসূলুল্লাহ (সা) এই চুক্তির ব্যাপারে নিশ্চিত হন অনেক পরে। তিনি এক রাতে কোরেশ ক্যাম্পে একজন গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন যেন এই চুক্তি সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা শুনে আসে। কিছু সময়ের মধ্যে এ ব্যাপারে গুজবও শোনা যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সাফিয়া ও জনৈক ইহুদীর ঘটনা থেকে চুক্তিটির সত্যতা নিশ্চিত হয়।

সাফিয়া ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফুফু। অন্যান্য মহিলা ও শিশুদের সংগে তিনিও মদীনার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি ক্ষুদ্র দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। উক্ত দুর্গে উপস্থিতদের মধ্যে কবি হাসসানই ছিল একমাত্র পুরুষ। একদিন সাফিয়া দুর্গের উপর থেকে দেখতে পান, একজন সশস্ত্র ইহুদী গোপনে দুর্গটির দেয়ালের পাশ দিয়ে পথ খুঁজছে। সাফিয়া সংগে সংগে বুঝতে পারেন যে, সে বনী কুরাইযার একজন স্কাউট এবং সে এসেছে তাদের আক্রমণ পরিকল্পনার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে। মুসলিম

---

৫৭. ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২২১, ওয়াকিদী ঃ মাগাযী, পৃষ্ঠা - ২১২।

বাহিনীর অরক্ষিত পশ্চাতে আক্রমণ রচনার সময় এই ইহুদীটাই হয়তো হবে বনী কুরাইযার গাইড।

সাফিয়া দ্রুত কবি হাসসানের নিকট গিয়ে বললেন, "হে হাসান! একজন ইহুদী গোপনে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে হয়তো এই পথ দিয়েই বনী কুরাইযাকে পরিচালিত করবে পিছন দিক থেকে আক্রমণের জন্য। তুমি তো জানো যে, আল্লাহর রাসূল যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখে ব্যস্ত এবং তাঁর পক্ষে কিছু সৈন্য সরিয়ে আমাদেরকে রক্ষার জন্য পাঠানো সম্ভব নয়। এই ইহুদীটিকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। যাও তাকে এখনই হত্যা করো।" কবি উত্তর দিলেন, "হে মুত্তালিবের কন্যা! তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তুমি তো জানই এ ধরনের কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়।" কবির প্রতি তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করে সাফিয়া অস্ত্র তুলে নিয়ে কোমর বন্ধনী পরে নিজেই ইহুদীর মুকাবিলা করার জন্য দুর্গ থেকে নীচে নামেন। এই অসীম সাহসিনী মহিলা ইহুদী গুপ্তচরটিকে হত্যা করতে সক্ষম হন। তিনি দুর্গে ফিরে হাসসানকে বলেন, "ওহে হাসান! যাও মৃতদেহটির শরীর হতে পরিধেয় বস্ত্র ও মালামালগুলো নিয়ে নাও। আমি তো আর মহিলা হয়ে পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রে হাত দিতে পারি না।" হাসসান উত্তর দিলেন, "হে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা! তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমার ওসব জিনিসের দরকার নেই।"[৫৮]

মুসলমানদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছার পর বনী কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে তাদের মনে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাপূর্ণ রূপ লাভ করে এবং মুনাফিকরাও অধিক সোচ্চার হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে মুসলমানদের খাবারের সরবরাহ অর্ধেক থেকে সিকিতে নামে এবং পরে তা শূন্যের কোঠায় দাঁড়ানোর উপক্রম হয়। তা সত্ত্বেও তাদের মনোবল ছিল অদম্য। কিন্তু অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ক্ষুধার তাড়না হয়তো মুসলমানদেরকে অবনত হতে বাধ্য করতো। আর এ সমস্যার কোনো সামরিক সমাধানও তাদের হাতে ছিল না।

সামরিক পদ্ধতিতে ফলাফল বিলম্বিত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা) পরিস্থিতি বিবেচনা করে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি শত্রুপক্ষের গাতফান অংশের কমান্ডার উয়াইনার সংগে গোপনে যোগাযোগ শুরু করেন। উয়াইনা ছিল খুব সাহসী, কিন্তু সরল প্রকৃতির। তার বাহুবলের তুলনায় বুদ্ধি ছিল কম। এই যোগাযোগের উদ্দেশ্য ছিল গাতফান গোত্রকে অবরোধ থেকে দূরে সরিয়ে মিত্রবাহিনী হতে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা। তা করতে পারলে হয়তো অন্য গোত্রগুলোও কোরেশদেরকে ত্যাগ করবে। আর তা না করলেও গাতফান গোত্রের ২০০০ যোদ্ধা দূরে সরে গেলে মিত্রবাহিনী যে পরিমাণ দুর্বল হবে তাতে তাদেরকে যুদ্ধের মাধ্যমে মদীনা ত্যাগে বাধ্য করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হবে।

---

৫৮. ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২২৮।

রাসূলুল্লাহ (সা) গাতফানদের নিকট প্রস্তাব পাঠালেন, "তারা মিত্রবাহিনীকে ত্যাগ করে ঘরে ফিরে গেলে মদীনায় উৎপাদিত খেজুরের এক-তৃতীয়াংশ তাদেরকে দেয়া হবে।" উয়াইনা এই প্রস্তাব গ্রহণ করে। কেননা সে ইতিমধ্যে যুদ্ধজয়ের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে। চুক্তিটি স্বাক্ষরের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) বিষয়টি কতিপয় নেতৃস্থানীয় মুসলিমকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত নেন। মুসলিমগণ চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে এবং বিস্মিত কণ্ঠে বলে, "খেজুর! এই অবিশ্বাসীরা আমাদের নিকট থেকে তরবারির আঘাত ছাড়া আর কিছুই পাবে না।"[৫৯] মুসলমানদের মধ্যে এই চুক্তির বিরোধিতা এতো ব্যাপক ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই চিন্তা পরিত্যাগ করতে হয়।

যুদ্ধ পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও কূটনৈতিক তৎপরতার গুরুত্ব রাসূলুল্লাহ (সা) যে ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, সরল বিশ্বাসী সাহসী মুসলমানগণ তা বুঝতে পারেনি। তিনি জানতেন যে, এই দীর্ঘস্থায়ী অবরোধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটাই পথ ছিল কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে মিত্রবাহিনীকে ভেঙে দেয়া। তিনি আর একটি সুযোগ খুঁজতে থাকেন এবং খুব শীঘ্রই তা পেয়ে যান।

নুঈম বিন মাসুদ নামের গাতফান গোত্রের একজন সদস্য ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তা গোপন রাখেন। মিত্রবাহিনীর তিনটি প্রধান শক্তি কোরেশ, গাতফান ও বনী কুরাইযার নিকট তিনি প্রভাবশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। তিনি প্রকৃতই ছিলেন দক্ষ ব্যক্তি।

নুঈম এক রাতে গাতফানদের তাঁবু থেকে পালিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হাজির হয় এবং ইসলামের সেবা করার আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, "আমাকে যেখানে খুশি পাঠাতে পারেন।"[৬০] রাসূলুল্লাহ (সা) এরকম একটি সুযোগই কামনা করছিলেন। তিনি নুঈমকে নিয়ে বসে বিস্তারিত আলোচনার পর তাঁকে কি করতে হবে তা বুঝিয়ে দেন।

একই রাতে নুঈম বনী কুরাইযার আস্তানায় গিয়ে কাবের সংগে সাক্ষাত করেন। তিনি পরিস্থিতির বিপজ্জনক দিকগুলো বিশ্লেষণ করে বলেন, "তোমাদের পরিস্থিতি তো কোরেশ ও গাতফানদের মতো নয়। তোমাদের ঘরবাড়ি ও পরিবার-পরিজন এখানে মদীনার পাশে আর তাদের পরিবার-পরিজন ও ঘরবাড়ি মদীনা থেকে অনেক নিরাপদ দূরত্বে মক্কায়। এই যুদ্ধে তাদের বড় ধরনের কোন ঝুঁকি নেই। কেননা তারা মুসলিম বাহিনীকে পুরাভূত করতে ব্যর্থ হলে মক্কায় ফিরে যাবে এবং তোমাদেরকে ফেলে যাবে মুসলমানদের কোপের মধ্যে। তাদের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় পরিবারগুলোর কিছু সদস্যকে পণবন্দী হিসেবে না দেয়া পর্যন্ত তোমাদের এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা উচিত হবে না। শুধু পণবন্দী পেলেই তোমরা তাদের উপর নির্ভর করতে পারো।"

---

৫৯. ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২২৩।
৬০. ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২২৯।

নুঈম এর পর কোরেশ ক্যাম্পে গিয়ে আবু সুফিয়ানের সংগে সাক্ষাত করেন। আবু সুফিয়ান তাঁকে পূর্ব থেকেই ভালভাবে জানতো এবং তার বিচক্ষণতাকে শ্রদ্ধা করতো। তিনি আবু সুফিয়ানকে বলেন, "তুমি এমন একদল লোকের সংগে চুক্তি করেছ যারা বিশ্বাসঘাতক ও অনির্ভরযোগ্য। আমি মদীনা থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি বনী কুরাইযার লোকেরা এই চুক্তির জন্য অনুতপ্ত এবং তারা মুহাম্মদের সংগে একটি নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। তারা শীঘ্রই তোমাদের নিকট হতে পণবন্দী দাবি করবে এবং মুহাম্মদের মনে আস্থা সৃষ্টির জন্য তাদেরকে তার হাতে সমর্পণ করবে। তারপর ইহুদীরা প্রকাশ্যে মুহাম্মদের সংগে যোগদান করবে এবং যৌথভাবে আমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। কোনো অবস্থাতেই ইহুদীদের নিকট পণবন্দী পাঠানো তোমাদের ঠিক হবে না।"

নুঈম গাতফানদের সঙ্গে সাক্ষাত করেও একই চিত্র তুলে ধরেন। অল্প সময়ের মধ্যে মিত্র বাহিনীর মধ্যে সন্দেহ ও ভুল বুঝাবুঝির সূত্রপাত হয়।

আবু সুফিয়ান ইহুদীদেরকে বিনাদ্বিধায় বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু নুঈমের সাক্ষাতের পর থেকে সে অনিশ্চয়তাবোধে ভুগতে থাকে। সে যুদ্ধ ত্বরান্বিত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ইহুদীদেরকে পরীক্ষা করার জন্য এই সিদ্ধান্তটি তাদেরকে অবহিত করে। নুঈমের সাক্ষাতের পরের রাতে অর্থাৎ ১৪ই মার্চ শুক্রবার সে ইকরামার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলকে বনী কুরাইযার নিকট প্রেরণ করে। ইকরামা তাদের ক্যাম্পে পৌঁছে প্রস্তাব করে, "পরিস্থিতি খুব ভয়ংকর রূপ লাভ করেছে। আর বিলম্ব করা সম্ভব নয়। আমরা আগামীকালই আক্রমণ করতে চাই। চুক্তি মোতাবেক তোমরাও একই সময়ে তোমাদের অবস্থান থেকে মুহাম্মদের উপর আক্রমণ চালাবে।"

ইহুদীগণ প্রথম আমতা-আমতা করে এবং শেষপর্যন্ত তাদের শর্তটি উপস্থাপন করে, "আমাদের অবস্থা তোমাদের চেয়েও অনেক নাজুক। তোমরা যুদ্ধে সুবিধা করতে না পারলে মক্কায় ফিরে যাবে এবং আমাদেরকে ফেলে যাবে মুহাম্মদের রোষের মুখে। এরূপ যাতে না হয় তার জন্য তোমরা তোমাদের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর কিছু সদস্যকে আমাদের নিকট পণবন্দী হিসেবে পাঠাবে যারা যুদ্ধের সফল সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবে। তাছাড়াও আগামীকাল হচ্ছে শনিবার। শনিবার দিনে ইহুদীদের জন্য যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ। যারা এই নিষেধ অমান্য করে তাদেরকে প্রভু শূকর ও বানরে পরিণত করে।" ইকরামা শূন্যহাতে ফিরে যায়। আবু সুফিয়ান ইহুদীদেরকে আগামীকালের যুদ্ধে যোগদানে রাজী করার জন্য আরও একটি উদ্যোগ নেয় এবং কাবের নিকট অন্য একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে ঃ

কোরেশ ঃ কোনো পণবন্দী দেয়া হবে না। আগামী কালের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করো।

ইহুদী ঃ শনিবার কোনো যুদ্ধ নয়। তাছাড়াও যুদ্ধের পূর্বে পণবন্দী দিতে হবে।

এই অভিজ্ঞতার পর মিত্রপক্ষ ও ইহুদীরা উভয়েই ভাবলো, "নুঈম ঠিক কথাই বলেছিল। সে আমাদেরকে কতো উত্তম পরামর্শ দিয়েছিল।"[৬১] নুঈম অত্যন্ত দক্ষতার সংগে বনী কুরাইযাকে সন্তর্পণে মিত্রপক্ষ থেকে আলাদা করতে সক্ষম হয়।

খালিদ ও ইকরামা অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মিত্রপক্ষের দ্বারা কোনো সমন্বিত ও চূড়ান্ত আঘাত হানার সম্ভাবনা না দেখে তারা সিদ্ধান্ত নিজেদের হাতে তুলে নেয়। ১৫ই মার্চ শনিবার তারা তাদের অশ্বারোহী দল নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে জুবাবের পশ্চিমে অবস্থান নেয়। এই এলাকায় পরিখাটি ছিল কিছুটা অপ্রশস্ত যা অশ্বপৃষ্ঠে থেকে বা পদযোগে অতিক্রম করা সম্ভব। স্থানটি ছিল মুসলিম ক্যাম্পের সামনে এবং সিলা পাহাড়ের পাদদেশে।

ইকরামার অশ্বারোহী দলটি প্রথমে অগ্রসর হয় এবং একটি ক্ষুদ্র অংশ লাফ দিয়ে পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। এদের সংখ্যা ইকরামাসহ ছিল মোট ৭ জন। এদের মধ্যে একজন বিশাল আকৃতির লোক ছিল যে তার বিশাল ঘোড়াটি নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে মুসলমানদের অবস্থান জরিপ করতে থাকে। মুসলমানগণ কোরেশদের আকস্মিক অনুপ্রবেশে বিস্মিত হয়ে পড়ে। শুরু হয় হাতাহাতি যুদ্ধ। এই দ্বৈতযুদ্ধ ইতিহাসে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ বিধায় বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হলো।

বিশাল আকৃতির লোকটি ছিল অত্যন্ত লম্বা ও মোটা। সে দাঁড়ালে তাকে একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো মনে হতো। তার ঘোড়াটিও ছিল বৃহৎ আকৃতির। এই ঘোড়ার উপর উঠে বসলে তাকে সত্যই অবাস্তব কিছু একটা মনে হতো। বিশাল, শক্তিশালী ও ভয়শূন্য এই লোকটির মুখের আকৃতিও ছিল ভয়ংকর। তার উপস্থিতি তার সংগীদেরকে যেমন আশ্বস্ত করতো, তদ্রূপ শত্রুদেরকে করতো ভীত-সন্ত্রস্ত।

এই লোকটির নাম ছিল আমর বিন আবুদ উদ। (আমরা তাকে পরবর্তীতে দৈত্য বলে উল্লেখ করবো)। সে অশ্বপৃষ্ঠে থেকে অবজ্ঞাভরে মুসলমানদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

দৈত্যটি হঠাৎ মাথা তুলে গর্জন করে উঠে। আমি আমর বিন আবুদ উদ। আমিই আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। আমি অপরাজিত ....।" নিজের সম্পর্কে তার ধারণা ছিল অতি উঁচু। "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছো যে আমার সংগে লড়তে চাও?"

মুসলমানগণ নীরবে তার চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে। তারা একে অপরের দিকে তাকায়। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকেও তাকায়, কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না। কারণ দৈত্যটি তার শক্তিমত্তা ও দক্ষতার জন্য ছিল বিখ্যাত। সে আজ পর্যন্ত দ্বৈতযুদ্ধে পরাজিত হয়নি এবং কোনো প্রতিপক্ষকেও অব্যাহতি দেয়নি। বলা হয় যে, সে একাই ছিল পাঁচশ অশ্বারোহীর সমান। আরও বলা হয় যে, সে জীবন্ত ঘোড়াকে তুলে মাটিতে আছাড় মারতে পারতো এবং একটি বাছুরকে বাম হাতে তুলে যুদ্ধের সময় ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারতো। তার সম্পর্কে এ ধরনের আরও অসংখ্য গল্প

---

৬১. ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২৩০-২৩১, ইবনে সাদ, পৃষ্ঠা - ৫৭৪

প্রচলিত ছিল। আরবদের তীব্র কল্পনা শক্তি তার অপ্রতিরোধ্য শক্তি সম্পর্কে অনেক কাহিনীই তৈরি করেছিল।

মুসলমানগণ এখনও নীরব। দৈত্যটি অবজ্ঞা সহকারে হেসে উঠলো এবং পরিখার অপর পারে দাঁড়ানো কোরেশগণও তার হাসির সংগে যোগ দিল। তারা পরিখার অপর পারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সবকিছুই লক্ষ্য করছিল ও শুনতে পাচ্ছিল।

"তাহলে তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মধ্যে পৌরুষ আছে। তাহলে তোমাদের ইসলামের কি হবে আর রাসূলেরই বা কি হবে।" দৈত্যটির বিদ্রূপাত্মক কথায় আলী (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে তার অবাধ্য জিভকে চিরতরে নীরব করে দেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর দিলেন, "বসে পড়ো, এ হচ্ছে আমর।" আলী (রা) তাঁর স্থানে ফিরে যান।

দৈত্যটি আবার তীব্র ব্যঙ্গাত্মক হাসি হেসে উঠে এবং চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করে। আলী (রা) আবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুমতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু তিনি আবার তাঁকে বিরত থাকতে বলেন। আমর আরও তীব্রভাবে ব্যঙ্গাত্মক হাসি হেসে উঠে। এবারে তীক্ষ্ণ ভাষায় তিরস্কার করে বলে, "কোথায় তোমাদের বেহেশত। তোমরা না বিশ্বাস করো যে, যারা যুদ্ধে নিহত হয় তারা বেহেশতে যায় ? অথচ আজ একজন লোককেও আমার সামনে পাঠাতে পারছো না।"

আলী (রা) তৃতীয়বার অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর চোখের চাহনি দেখেই বুঝতে পারেন যে তাঁকে আর বিরত রাখা সম্ভব নয়। তিনি আলী (রা)-এর প্রতি গভীর স্নেহভাবে তাকান। তাঁর নিকট আলীর মতো অন্য কেউই এতো প্রিয় ছিল না। তিনি নিজের পাগড়ি খুলে আলী (রা)-এর মাথায় পরিয়ে দেন। পরে নিজের তরবারি খুলে আলীর কোমরে বেঁধে দেন এবং প্রার্থনা করেন, "হে আল্লাহ আলীকে সাহায্য করো।"[৬২]

রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা)-কে যে তরবারিটি দিলেন, তা ছিল মুনাব্বাহ বিন হাজ্জাজ নামের জনৈক কাফিরের। এই লোকটি বদর যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর তার তরবারিটি মুসলমানদের হস্তগত হয়। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তা ব্যবহার করতেন। আলী (রা)-এর হাতে পড়ে এই তরবারিটি ইসলামের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট আসন দখল করতে সক্ষম হয়। এই তরবারিটিই 'যুলফিকার' নামে পরিচিত।

আলী (রা) সঙ্গে কয়েকজন মুসলমানকে নিয়ে কাফিরদের দিকে অগ্রসর হন। ক্ষুদ্র দলটি দৈত্যটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং আলী (রা) আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলে উভয়ে উভয়ের নাগালের মধ্যে এসে যায়। দৈত্যটি ছিল আলী (রা)-এর পিতা আবু তালিবের বন্ধু। তাই সে আলী (রা)-কে ভাল ভাবেই জানতো। সে

---

৬২. ইবনে সাদ ঃ পৃষ্ঠা - ৫৭২।

আলী (রা)-এর প্রতি তাকিয়ে এমন কৃপার ভঙ্গিতে হেসে উঠলো যেভাবে একজন বয়স্ক-লোক একটি বালককে কৃপা করে।

আলী (রা) বলে উঠলেনা, "ওহে আমর! এটা সবার জানা যে, তোমাকে কেউ দুটো প্রস্তাব দিলে তুমি তার অন্তত একটি গ্রহণ করো।"

"হ্যাঁ, তা সত্য ।"

তাহলে তোমার প্রতি আমার দুটো প্রস্তাব আছে। প্রথমটি হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং ইসলামকে কবুল করো।"

"তাদের আমার কোনো প্রয়োজন নেই।"

"তাহলে ঘোড়া থেকে নেমে আমার মুকাবিলা করো।"

"কেন? ওহে ভ্রাতুষ্পুত্র; তোমাকে হত্যা করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।"

"কিন্তু তোমাকে হত্যার ইচ্ছা আমার খুবই তীব্র।"[৬৩] আলী উত্তর দিলেন।

ক্রোধে দৈত্যটির চেহারা নীল হয়ে ওঠে। বিকট চিৎকারে সে লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। তার ক্ষীপ্রতা যেন দানবকেও বিস্মিত করে। সে তরবারি কোষমুক্ত করে আলীর দিকে ছুটে যায়। যুদ্ধ শুরু হয়।

আমর আলীর প্রতি অনেকগুলো আঘাত হানে, কিন্তু আলী (রা) অক্ষত থাকেন। তিনি তার প্রতিটি আঘাত সফলভাবে প্রতিহত করেন। ফলে দৈত্যটি কিছুটা পিছু হটে হতবুদ্ধি হয়ে হাঁপাতে থাকে। সে বিস্মিত হয়ে ভাবে, এটা কিভাবে সম্ভব। এর পূর্বে কখনও কেউতো তার সঙ্গে এতো দীর্ঘ সময় ধরে টিকতে পারেনি। অথচ এই বালকটি এখন তার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন সে তার সঙ্গে খেলা করছে।

পরবর্তী ঘটনাটি এতো দ্রুত ঘটে যায়, যে কেউ তা সহসা উপলব্ধি করতে পারে না, এমনকি দৈত্যটিও নয়। আলী (রা) তরবারি ও ঢাল ফেলে দিয়ে শূন্যের মধ্যে লাফ দিয়ে দৈত্যটির বুকে লাথি মারেন এবং দুহাতে তার গলা টিপে ধরেন। দৈত্যটি তাল সামলাতে না পেরে ধরাশায়ী হয়ে যায় এবং আলী (রা) তার বুকের উপর বসে পড়েন। সমস্ত ঘটনাটি ঘটে মুহূর্তের মধ্যে। উপস্থিত উভয়পক্ষই নিশ্বাস বন্ধ করে ঘটনাটি দেখতে থাকে।

অল্প সময়ের মধ্যেই দৈত্যটির মুখমণ্ডল হতে বিমূঢ়তা দূর হয়ে ক্রোধের সঞ্চার হয়। সে একটি যুবকের দ্বারা ধরাশায়ী হয়েছে সত্য, কিন্তু এখন পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়নি। সে ইচ্ছা করলেই যেন তার প্রতিপক্ষ যুবককে আংগুলের টোকায় শূন্যে উড়িয়ে দিতে পারে, যেমন শুকনো পাতাকে উড়ানো যায়।

দৈত্যটির চোখমুখ নীলবর্ণ ধারণ করে এবং গলার রগগুলো টান টান হয়ে ওঠে। সে তার বিশাল বাহুর সাহায্যে আলীর হাতের চাপমুক্ত হতে চায়, কিন্তু ব্যর্থ হয়। আলীর বাহুর পেশী ছিল ইস্পাতের মতো শক্ত। আলী দৈত্যটির বুকের উপর বসেই

৬৩. ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২২৫।

কোমর থেকে একটি ধারালো ছুরি বের করে তার গলার কাছাকাছি নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলেন, "শোনো হে আমর! জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় আল্লাহর ইচ্ছায়। ইসলাম গ্রহণ করো। তা হলে যে তুমি শুধু জীবনে রক্ষা পাবে তাই নয়, তোমার দুনিয়ার বাকি দিনগুলো ও আখিরাতের জীবনও শান্তিতে কাটবে।"

আলী (রা)-এর প্রস্তাব গ্রহণ করা দৈত্যটির পক্ষে ছিল অসম্ভব। আরবভূমি যাকে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলে বিবেচনা করে সে কি বাকি জীবন পরাজয় ও অসম্মানের গ্লানি নিয়ে বসবাস করতে পারে ? এটা কি কখনও হতে পারে যে, সে তার প্রতিপক্ষের নিকট পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল। না, তা হতে পারে না। আমর বেঁচে আছে তরবারি নিয়ে বিদায়ও নেবে তরবারির তলায়। সে মুখে থুতু সংগ্রহ করে আলী (রা)-এর মুখে সজোরে নিক্ষেপ করে।

সে পরিণতি সম্পর্কে ছিল নিশ্চিত। সে জানতো যে, মুহূর্তের মধ্যেই আলীর উত্তোলিত ধারালো ছুরি তার গলায় বসে যাবে এবং শেষ নিঃশ্বাসটি বের হয়ে যাওয়ার পথ করে দেবে। আমর ছিল খুবই সাহসী এবং মৃত্যুকে সে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারতো। সে তার থুঁতনি তুলে আলীর দিকে গলা বাড়িয়ে দেয়। তার ধারণা ছিল আলী (রা) এখনই ছুরি বসাবে। অবশ্য এছাড়া আর কিইবা সে ভাবতে পারতো ?

কিন্তু পরবর্তী ঘটনা তাকে আরও বিমূঢ় করে ফেলে। আলী (রা) ধীরে সুস্থে তার বুক হতে উঠে মুখটা মুছে নিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়ায় এবং প্রতিপক্ষের দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে বলেন, "না, হে আমর! আমি আল্লাহর উদ্দেশ্য ছাড়া ব্যক্তিগত আক্রোশে কাউকে হত্যা করি না। যেহেতু তুমি আমার মুখে থুতু নিক্ষেপ করেছ, তাই এখন তোমাকে হত্যা করলে তা হবে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণের নামান্তর। অতএব তোমার জীবন ভিক্ষা দিলাম। উঠো এবং তোমার সংগীদের নিকট যাও।"

দৈত্যটি উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু পরাজিত অবস্থায় সে সংগীদের কাছে ফিরে যেতে প্রস্তুত নয়। সে বেঁচে থাকলে বিজয়ী হয়েই থাকবে, নতুবা নয়। শেষ চেষ্টার উদ্দেশ্যে সে তরবারি তুলে নিয়ে দ্রুত আলীর দিকে ছুটে যায়। সম্ভবত সে আলী (রা)-কে অজ্ঞাত আঘাত করতে চেয়েছিল। আলী (রা)ও দ্রুত তরবারি ও ঢাল তুলে নিয়ে পুনরায় আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়। দৈত্যটি সমস্ত শক্তি দিয়ে আলী (রা)-কে একটি মরণপণ আঘাত করে। আঘাতটি ঢালের সংগে সংঘর্ষে তীব্রতা না হারালে হয়তো অপূরনীয় ক্ষতি হতো। আলী (রা) সামান্য আহত হন। দৈত্যটি পুনরায় তরবারি উঠানোর পূর্বেই যুলফিকার সূর্যের আলোয় ঝলসে উঠে এবং এর অগ্রভাগ নিমিষেই দৈত্যটির গলা কেটে ফেলে। তার গলা থেকে রক্ত তীব্র বেগে ঝর্ণার মত প্রবাহিত হয়।

কিছুক্ষণের জন্য দৈত্যটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পর সে নেশাগ্রস্তের মত টলতে থাকে এবং একসময় মুখ থুবড়ে পড়ে নিথর হয়ে যায়।

ভূমণ্ডল অনেক বিশাল। তাই হয়তো সে দৈত্যটির পতনে কম্পিত হয়নি। কিন্তু তার পতনে ২০০০ মুসলমানের মুখ হতে যে আল্লাহু-আকবর ধ্বনি নিঃসৃত হয় তা পার্শ্ববর্তী সিলা পর্বতকে প্রকম্পিত করে। এই অশ্রুতপূর্ব তকবীর ধ্বনি মরুর বুকে মিশে যাওয়ার পূর্বে আরব উপত্যকার চারদিকের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

মুসলমানগণ এখন বাকি ৬ জন কোরেশের প্রতি ধাবিত হয়। সংঘর্ষ শুরু হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই কোরেশগণ পালাতে শুরু করে। ইকরামা হাতের বর্শা ফেলে দিয়ে একলাফে পরিখা পার হয়ে যায়। খালিদের চাচাতো ভাই নুফাওল বিন আব্দুল্লাহ পার হতে গিয়ে পরিখার মধ্যে পড়ে যায়। মুসলিমগণ তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে থাকলে সে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে মিনতি করে বলে, "হে আরবগণ! এর চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল।"[৬৪] তখন আলী (রা) পরিখায় নেমে তাকে হত্যা করে বাধিত করেন।

মুসলমানরা ক্যাম্পে ফিরে যায় এবং পরিখার উক্ত স্থানে শক্তিশালী প্রহরী মোতায়েন করে।

পরদিন বিকালে খালিদ তাঁর অশ্বারোহী দল নিয়ে অগ্রসর হন। তাঁর ইচ্ছা ছিল ইকরামা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে সে সফল হবে। তিনি পরিখাটি অতিক্রম করার চেষ্টা করেন কিন্তু মুসলিম বাহিনী ছিল খুবই সজাগ। প্রচুর তীর বিনিময় হয়। উভয়পক্ষে একজন করে নিহত হয়। খালিদ (রা) পরিখা অতিক্রমে ব্যর্থ হন।

মুসলমানদের প্রতিরোধের তীব্রতা দেখে খালিদ (রা) ভিন্ন কৌশল অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার বাহিনী নিয়ে ফিরে পরিখা থেকে বেশ দূরে চলে যান এবং এমন ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেন যে, যুদ্ধ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছেন। খালিদের ফিরে যাওয়া দেখে মুসলমানগণ তাদের অবস্থান প্রত্যাহার করে বিশ্রাম করতে থাকে। এই সুযোগে খালিদ (রা) আকস্মিকভাবে আক্রমণ করেন এবং মুসলমানগণ বাধা সৃষ্টি করার পূর্বেই তার নেতৃত্বে কয়েকজন কোরেশ পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তারা বেশি দূর আগাতে না আগাতেই মুসলমানগণ সংগঠিত হয়ে বাধার সৃষ্টি করে। কিছুক্ষণ হাতাহাতি যুদ্ধ চলে। খালিদের হাতে একজন মুসলমান নিহত হয়। মুসলমানদের প্রতিবন্ধকতার তীব্রতা দেখে খালিদ (রা) প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটাই ছিল খন্দকের যুদ্ধের সর্বশেষ বড় সংঘর্ষ।

পরবর্তী দু'দিন তীর নিক্ষেপের দু'-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া নীরবেই কেটে যায়। মুসলমানদের মধ্যে খাদ্যের তীব্র সংকট দেখা দেয়। অবশ্য শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারায় তাদের মনোবল আরো বৃদ্ধি পায়। ক্ষুধার তীব্রতা সত্ত্বেও তারা

---

৬৪. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২৪০।

কাফিরদের মুকাবিলা করার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। অপর পক্ষে মিত্র বাহিনীর লোকদের মধ্যে অসন্তোষের বিস্তার ঘটে এবং তাদের মনোবল দুর্বল হতে থাকে। সবাই বুঝতে পারে তাদের জয়ের আশায় পরিচালিত অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তদুপরি কেউই এই অচল অবস্থা থেকে মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিল না।

মার্চের ১৮ তারিখ মংগলবার রাতে প্রচণ্ড ঝড় ও শৈত্যপ্রবাহে মিত্রবাহিনীর তাঁবু তছনছ হয়ে যায়। ভীষণ শীত পড়তে থাকে। মুসলিম ক্যাম্পের তুলনায় মিত্রবাহিনীর ক্যাম্প বেশি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। তারা কম্বল ও আলখাল্লা জড়িয়ে গাদাগাদি করে বসে ঝড় শেষ হওয়ার প্রতীক্ষা করতে থাকে। আবু সুফিয়ানের আর সহ্য হচ্ছিল না। সে তার পায়ের আংগুলের ডগায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলতে থাকে, "এখানে অবস্থান করা আর কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। খোলা আকাশের নিচে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকে সীমাহীন কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। বনী কুরাইযা প্রয়োজনের মুহূর্তে আমাদের সংগে প্রতারণা করেছে। ঝড়-বৃষ্টি ক্যাম্প তছনছ করে দিয়েছে। চলো আমরা মক্কায় ফিরে যাই–আমি চললাম।"

কথাগুলো বলেই আবু সুফিয়ান উটের পিঠে চড়ে তার সংগীদেরকে নিয়ে দ্রুত ক্যাম্প ত্যাগ করে। গাতফান ও অন্যান্য গোত্রও কোরেশদের ক্যাম্প ত্যাগের কথা জানতে পেরে বিলম্ব না করে তাঁবু গুটিয়ে ফেলে। খালিদ ও আমর ইবনুল আস তাদের অশ্বারোহীদল নিয়ে কোরেশ বাহিনীর পিছনে চলতে থাকে। মুসলমানগণ পিছন থেকে ধাওয়া করলে তা প্রতিহত করার দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত ছিল। ব্যর্থতার গ্লানি আবু সুফিয়ানের অন্তরকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করে ফেলে। সে ভগ্ন হৃদয় নিয়ে মক্কায় ফিরে যায়।

পরদিন সকালে মুসলিমগণ দেখতে পায় যে, মিত্রবাহিনী ক্যাম্প গুটিয়ে মক্কায় ফিরে গেছে। মুসলিমদেরকে পৃথিবী হতে নিশ্চিহ্ন করার এটাই ছিল কোরেশদের সর্বশেষ পদক্ষেপ। এর পর থেকে আক্রমণের চিন্তার পরিবর্তে তারা আত্মরক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে।

খন্দকের যুদ্ধের এখানেই সমাপ্তি। উভয়পক্ষে ৪ জন করে লোক নিহত হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় সাধিত হয়। তাঁরা তাদের আবাস স্থল মদীনাকে শত্রু বাহিনীর আক্রমণ হতে রক্ষা করতে সমর্থ হন। অপরপক্ষে মিত্রপক্ষ মুসলিমদেরকে নিশ্চিহ্ন করার যে লক্ষ্য নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেছিল তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। তারা মুসলমানদের সামান্য ক্ষতি করতেও ব্যর্থ হয়। দীর্ঘ ২৩ দিনের অবরোধ উভয় পক্ষের উপর ভয়ংকর মানসিক চাপের সৃষ্টি করেছিল। অবরোধ শেষ হয়েছিল ঝড়ের কবলে, কিন্তু ঝড় প্রত্যাহারের কারণ নয়, বরং উপলক্ষ ছিল মাত্র। প্রকৃত অর্থে

এটাকে যুদ্ধ বলার চেয়ে বরং একটি অবরোধ ও যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি হওয়া বলাই উত্তম। কেননা দুই বাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন সংঘর্ষই হয়নি।

ইসলামের ইতিহাসে এই প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে কূটনীতির ব্যবহার করা হয় এবং যুদ্ধ ও কূটনৈতিক তৎপরতা একইসংগে কিভাবে লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক হয় তাও এখানেই প্রতীয়মান হয়। জাতি লক্ষ্য অর্জনে রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ হলে সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহার করা হয় এবং এই সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহার হচ্ছে যুদ্ধের একটি দিক এবং ধ্বংসাত্মক দিক। সশস্ত্র সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়লে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে শত্রুকে দুর্বল ও বন্ধুহীন করে বিজয়ের নিশ্চিত লক্ষ্যে সৈন্য পরিচালনা করা হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা)ও তাই করেছিলেন। তিনি কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে শত্রুকে সংখ্যা ও মনের দিক থেকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলেন। অধিকাংশ মুসলিম প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই কৌশল বুঝতে পারেনি। পরবর্তীতে তারা তাদের নেতার নিকট হতে শিক্ষা লাভ করে, যুদ্ধ মানে হচ্ছে কৌশল।"[৬৫] রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই উক্তিটি পরবর্তী মুসলিম অভিযানগুলোতে বার বার স্মরণ করা হতো।

---

৬৫. ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২২৯, ওয়াকিদী ঃ মাগাযী - পৃষ্ঠা -২৯৫

খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হুদায়বিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৬২৮ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে (৬ হিজরীর যিলকদ মাসের শেষে)। মধ্যমার্চে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মনে এই ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরের কোনো অভিপ্রায় ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উমরা হজ পালন করা এবং সংগে ছিল ১৪০০ মুসলিম ও বহু সংখ্যক কুরবানীযোগ্য পশু।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মক্কা অভিমুখে যাত্রার খবর পেয়ে কোরেশগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এই ভেবে যে, মুসলিম বাহিনী তাদেরকে তাদের নিজ শহরে যুদ্ধের মাধ্যমে পদানত করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। কেননা খন্দকের যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। কোরেশগণ মক্কা ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী এলাকায় একত্রিত হয়ে ক্যাম্প স্থাপন করলো এবং সেখান হতে মদীনার রাস্তায় মুসলিম বাহিনীকে বাধা দেয়ার জন্য খালিদ (রা)-এর নেতৃত্বে ৩০০ অশ্বারোহীর একটি বাহিনী প্রেরণ করে। মাত্র ৩০০ অশ্বারোহী নিয়ে কিভাবে বিরাট মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধ করা সম্ভব তা খালিদের বোধগম্য হচ্ছিল না। তাই তিনি মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা বিলম্বিত করার যথাসম্ভব প্রচেষ্টা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি উসফান হতে পনের মাইল দূরের পার্বত্য এলাকা কুরা-উল-গামীম-এ পৌঁছে একটি পথের উপর প্রতিরোধ অবস্থান গ্রহণ করেন। এই গিরিপথটির মধ্য দিয়েই মদীনাগামী সড়কটি অতিক্রম করেছে[৬৬] (চার নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য)।

উসফানে পৌঁছার পর মুসলিম বাহিনী সম্মুখে ২০ সদস্যের একটি ক্ষুদ্র অশ্বারোহী পর্যবেক্ষক দলকে অনুসরণ করে চলতে থাকে। এই পর্যবেক্ষণকারী দলটি কুরা-উল-গামীম-এ খালিদের সম্মুখীন হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর অবস্থান ও শক্তি সম্পর্কে অবহিত করে।

রাসূলুল্লাহ (সা) এই স্থানে খালিদের সংগে যুদ্ধ করে সময় নষ্ট না করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি যে কোনো ভাবেই হোক রক্তপাত এড়ানোর জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কেননা

---

৬৬. বর্তমানকালে ম্যাপে চিহ্নিত কুরা ও উল্লেখিত কুরা-উল-গামীম এক নয়। ম্যাপের কুরা লোহিত সাগরের একটি প্রবেশ মুখে অবস্থিত। আর কুরা-উল-গামীম ছিল একটি পর্বতময় এলাকা যেখান হতে পর্বতমালা সমুদ্রের দিকে বিস্তৃত হয়েছে। এর অবস্থান ছিল উসফানের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।

এ দফায় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র হজ্জ পালন করা, যুদ্ধ করা নয়। তিনি অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষণকারী দলটিকে হুকুম দিলেন খালিদকে ব্যস্ত রাখার জন্য এবং নিজে প্রধান বাহিনী নিয়ে ডান দিক দিয়ে দুর্গম পাহাড়ী এলাকার স্বল্প ব্যবহৃত পথ ধরে সামনে অগ্রসর হলেন। উপকূলের অদূরবর্তী যে পথটি দিয়ে মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হয়েছিল তার নাম স্যানিয়াত উল-মারার।[৬৭] পাহাড়ী এলাকা দিয়ে এই অগ্রযাত্রাটি খুবই কষ্টসাধ্য হলেও খালিদের অবস্থানকে সফলভাবে এড়ানো সম্ভব হয়েছিল। মুসলিম বাহিনী পার্শ্ববর্তী এলাকা দিয়ে অতিক্রমকালে পথের উড়ন্ত ধূলা-বালি দেখে খালিদ গোটা ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে পারেন এবং দ্রুত অবস্থান প্রত্যাহার করে মক্কায় চলে যান। মুসলিম বাহিনী মক্কার ১৩ মাইল পশ্চিমে হুদায়বিয়ায় না পৌঁছা পর্যন্ত অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে এবং সেখানে পৌঁছে ক্যাম্প স্থাপন করে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রক্তপাত এড়ানোর একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও হুদায়বিয়ায় একটি যুদ্ধ অত্যাসন্ন হয়ে পড়ে। প্রাণনাশ ছাড়াই কিছু খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কয়েকদিন পর কোরেশগণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, মুসলিমগণ যুদ্ধ নয় বরং হজ করতে এসেছে। তার পর দু'দলের মধ্যে দূতের মাধ্যমে বাক্য বিনিময় হয় এবং শেষ পর্যন্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। চুক্তিটিতে মুসলিম পক্ষে স্বাক্ষর করেন রাসূলুল্লাহ (সা) এবং কোরেশদের পক্ষে সুহায়ল বিন আমর। চুক্তির শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক. পরবর্তী ১০ বছর কোরেশ ও মুসলিমদের মধ্যে কোনো প্রকার যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত অনুষ্ঠিত হবে না।
খ. মুসলিমগণকে আগামী বছর হজ্জ করার অনুমতি দেয়া হবে এবং তারা মক্কায় তিনদিন অবস্থান করতে পারবে।
গ. কোরেশদের যে কোনো দলত্যাগকারী সদস্যকে মুসলিমগণ ফেরত দিবে, কিন্তু কোরেশদের সংগে যোগদানকারী কোনো মুসলিমকে তারা ফেরত দিবে না।
ঘ. অন্য গোত্রগুলোও এই শর্তের আওতায় যে কোনো পক্ষে যোগদান করতে পারবে।

মুসলিমদের মধ্য থেকে কেউ কেউ দলত্যাগকারী সংক্রান্ত শর্তটি নিয়ে দ্বিমত পোষণ করে। বিশেষ করে হযরত উমর (রা) উক্ত শর্তটির কঠোর বিরোধিতা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) কারও আপত্তিতে কর্ণপাত করেন না। চুক্তিটিতে মুসলিমদের জন্য কিছু দীর্ঘমেয়াদী সুবিধার সম্ভাবনা নিহিত ছিল যা তাৎক্ষণিকভাবে অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেনি। এই চুক্তির শর্ত নির্ধারণের মধ্য দিয়ে মুসলিমদের যে মহানুভবতার প্রকাশ ঘটে তা আরব গোত্রগুলোর মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। এতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিমগণ অবিশ্বাসীদের সংগে

---

৬৭. এই পথটিকে যাত-উল-হান্‌জালও বলা হয় (আবু ইউসুফ ঃ পৃষ্ঠা - ২০৯)।

আচরণে কত আত্মবিশ্বাসী। দলত্যাগী মুসলিমদেরকে ফেরত না দেয়ার শর্তের ফলে মক্কায় শত্রুদের মধ্যে অবস্থানকারী মুসলিমগণ অনুসন্ধানকারীর ভূমিকা পালনে সক্ষম হয় এবং তারা তাদের আচরণের দ্বারা মক্কার অবিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। কোরেশদের মাঝে তাদের অবস্থান প্রকৃত অর্থে মুসলিমদের জন্য একটি শক্তির উৎসে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "যখন কেউ আমাদের দলে যোগদান করতে চায়, আল্লাহই তার উপায় ঠিক করে দেবেন।"[৬৮]

চুক্তির শেষ শর্তটি মোতাবেক মক্কা ও তার আশেপাশে বসবাসকারী দুটি গোত্র দুই পক্ষে যোগদান করে। খোজা গোত্র যোগদান করে মুসলিমদের সংগে এবং বনী বকর কোরেশদের সংগে। এই গোত্র দুটি অজ্ঞাতকাল ধরে পারস্পরিক শত্রুতায় লিপ্ত ছিল।

হুদায়বিয়ায় দু'সপ্তাহ অবস্থানের পর মুসলিমগণ মদীনায় ফিরে যায়। পরের বছর অর্থাৎ ৬২৯ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে (যিলকদ, ৭ হিজরী) তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নেতৃত্বে হজ্জ পালন করে। এই সময় কোরেশগণ তিন দিনের জন্য মক্কা ত্যাগ করে আশেপাশের এলাকায় চলে যায় এবং মুসলিমগণ মদীনার উদ্দেশে মক্কা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তথায় অবস্থান করে।

কিছুদিন থেকে খালিদের মনে একটা পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। প্রাথমিকভাবে তিনি সামরিক বিষয়াদি পর্যলোচনা করতে থাকেন। আপন সামরিক দক্ষতা ও পরাক্রম সম্পর্কে সচেতন খালিদ মনে করেন বিজয়ের গৌরব তার একান্ত প্রাপ্য, কিন্তু কেন যেন বিজয় তাকে এড়িয়ে চলছে। ওহুদের যুদ্ধে তার সময়োচিত ও সুচতুর সৈন্য পরিচালনা সত্ত্বেও মুসলিমগণ চূড়ান্ত পরাজয় এড়াতে সক্ষম হয়। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও রাসূলুল্লাহ (সা) যেভাবে যুদ্ধটি কোরেশদের উপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হন এবং সৈন্যবিন্যাসে যে দক্ষতা প্রদর্শন করেন তা খালিদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খন্দকের যুদ্ধেও বিজয় কোরেশদেরকে প্রবঞ্চনা করে। তারা যে বিপুল প্রস্তুতি ও বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিল তাতে বিজয় ছিল তাদের নিশ্চিত, কিন্তু প্রতিপক্ষের একটি সাধারণ কৌশল এই নিশ্চিত বিজয় তাদের হাতের মুঠো থেকে ছিনিয়ে নেয়। কোরেশ বাহিনী এই যুদ্ধে গিয়েছিল সিংহের মতো কিন্তু ফিরেছিল ইঁদুরের মতো। হুদায়বিয়ার অভিযানকালেও তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন মুসলিম বাহিনীকে পথে বাধা দিতে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত সফলভাবে একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর প্রতি তার দৃষ্টি আর্কষণ করে রেখে তার অবস্থানকে এড়াতে সক্ষম হন। খালিদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামরিক নেতৃত্ব, তাঁর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও বিরল গুণাবলীর প্রশংসা না করে পারেন না। তিনি তাঁর সংগে সাক্ষাতের জন্য মনস্থির করে ফেলেন।

---

৬৮. ওয়াকিদী ঃ মাগাযী, পৃষ্ঠা - ৩১০।

খালিদের স্বভাবে ছিল জংগী প্রেরণার প্রাধান্য। তার সবসময়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল যুদ্ধ এবং বিজয়। কোরেশদের সংগে থেকে তার সফল সামরিক অভিযানের সম্ভাবনা ক্ষীণরূপ লাভ করে। কেননা তাদের অভিযানে ছিল শুধু ব্যর্থতা। তার ধারণা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দলে যোগদান করলে সীমাহীন বিজয় ও সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছা যাবে।

মদীনায় তখন চলছিল প্রচুর সামরিক তৎপরতা। অবিশ্বাসী গোত্রগুলোর সামরিক সমাবেশ ভেঙে দেয়ার জন্য বা তাদের পশুসম্পদ দখল করার জন্য অহরহ অভিযান পরিচালিত হচ্ছিল। ওহুদের যুদ্ধ এবং ৬২৯ খৃস্টাব্দের হজ্জের মধ্যবর্তী সময়ে মুসলিমগণ ২৮টি অভিযান পরিচালনা করে। এসবের কিছু অভিযান পরিচালনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং এবং কিছু তাঁর মনোনীত ব্যক্তিগণ। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এর সবগুলো অভিযানেই মুসলিমগণ সর্বাত্মক বিজয় লাভ করে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো খায়বর অভিযান। এই অভিযানের ফলে ইহুদীদের সর্বশেষ শক্তিটুকু ধ্বংস হয়। এই অভিযান শুধু ইসলামের রাজনৈতিক সীমানাই বৃদ্ধি করেনি বরং প্রচুর ধনসম্পদও বৃদ্ধি করেছে। মুসলিম বাহিনীর কোনো সফলতার খবর মক্কায় পৌঁছলেই খালিদ (রা) ঐকান্তিকভাবে এই বিজয়ের কথা ভাবতেন। মুসলিম বাহিনীর বিজয় তার নিকট মজার খেলার মতো মনে হতো। তিনি ভাবতে শুরু করেন, তিনি যদি অভিযানমুখর মদীনায় থাকতে পারতেন!

৬২৯ খৃস্টাব্দে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হজ্জের পর স্বীয় ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে খালিদের মনে দারুণ সংশয়ের সৃষ্টি হয়। ধর্মের প্রতি তাঁর কখনই গভীর বিশ্বাস ছিল না বা কাবার দেবতাদের প্রতিও ছিল না কোন প্রকার অন্ধ ভক্তি। তাঁর চিত্ত সবসময় ছিল উদার। এখন সে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে মনে মনে ভাবতে থাকে, কিন্তু এই ভাবনার কথা কাউকে জানতে দেয় না। এক সময় আকস্মিকভাবেই তার মনে প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয় যে, ইসলামই হচ্ছে সত্যধর্ম। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হজ্জ সমাপনের দুইমাস পরে তার মনের এই পরিবর্তন ঘটে।

ইসলাম সম্পর্কে আপন মনকে প্রস্তুত করার পর খালিদ (রা) ইকরামা ও আরও দু-একজনের সংগে সাক্ষাত করে বলেন, "প্রতিটি বুদ্ধিমান লোকের নিকট এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, কোরেশদের অভিযোগ অনুযায়ী মুহাম্মদ কবি বা জাদুকর কিছুই নন। তাঁর বাণী প্রকৃতই ঐশী। প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য তাঁকে অনুসরণ করা।"

খালিদের কথা শুনে ইকরামা বিস্মিত হয়ে পড়ে এবং জিজ্ঞেস করে, "তুমি কি আমাদের সনাতন বিশ্বাস ত্যাগ করছো ?" ইকরামা যেন খালিদের কথা বিশ্বাসই করতে পারছিল না।

"আমি প্রকৃত আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে চাই।"

"এটা বিস্ময়কর যে, সব কোরেশের মধ্য থেকে তুমিই একথা বলছো।"

"কেন, তাতে ক্ষতি কি?"

"কেননা মুসলিমগণ যুদ্ধে তোমার অনেক প্রিয়জনকে হত্যা করেছে। আমি কোনো অবস্থাতেই মুহাম্মদকে গ্রহণ করতে পারি না। তুমি যদি এই অবাস্তব চিন্তা পরিত্যাগ না করো তাহলে তোমার সংগে পুনরায় কোনো কথা নেই। তুমি কি জান না যে, কোরেশরা মুহাম্মদের রক্তের জন্য পাগল হয়ে ঘুরছে ?"

"কোরেশরা তা করছে তাদের অজ্ঞতার কারণে", খালিদ উত্তর দিলেন।

আবু সুফিয়ান ইকরামার নিকট হতে খালিদের মনের পরিবর্তনের কথা জানতে পেরে তাকে ডেকে পাঠায় এবং জিজ্ঞেস করে, যা শুনছি তা কি সত্যি ? "

"কি শুনছেন ?"

"তুমি নাকি মুহাম্মদের দলে যোগদান করতে চাও? "

"নিশ্চয়। সেতো আমাদেরই একজন। আমাদেরই রক্ত তাঁরও শরীরে প্রবাহিত।"

আবু সুফিয়ান প্রচণ্ড কোপে উন্মুক্ত হয়ে খালিদকে ভয়ংকর পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু ইকরামা তাঁকে নিবৃত করে বলে, "হে আবু সুফিয়ান! শান্ত হোন। আপনার ক্রোধ আমাকেও মুহাম্মদের পথে ঠেলে দিতে পারে। খালিদ যে কোনো ধর্মমত পছন্দের ব্যাপারে স্বাধীন।"[৬৯] বিশ্বাসের পার্থক্য সত্ত্বেও খালিদের ভাইপো ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইকরামা তার পক্ষ সমর্থন করে।

সে রাতেই খালিদ (রা) তার বর্ম ও তরবারি নিয়ে ঘোড়ায় চেপে মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হন। পথে আমর ইবনুল আস এবং উসমান বিন তালহাকে (ওহুদের যুদ্ধে কোরেশদের পতাকাবাহীর পুত্র) একই গন্তব্যে এবং একই উদ্দেশ্যে গমনরত দেখতে পান। তারা একে অপরের উদ্দেশ্যের কথা জানতে পেরে বিস্মিত হয়ে পড়েন। কেননা তারা একে অপরকে ইসলামের ঘোর শত্রু মনে করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাতপ্রার্থী এই তিন ব্যক্তিই ৩১শে মে ৬২৯ খৃস্টাব্দে (৩রা সফর, ৮ হিজরী) মদীনা পৌঁছে তাঁর গৃহে গমন করেন। খালিদই প্রথম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে নিজেকে শান্তির ছায়াতলে সমর্পণ করেন। আমর এবং উসমান তাঁকে অনুসরণ করেন। তিনজনকেই রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে স্বাগতম জানান এবং তাঁদের অতীত কৃতকর্মকে ক্ষমা করে দেন যাতে তাঁরা জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে পারেন। খালিদ (রা) এবং আমর ইবনুল আস (রা) ছিলেন সে সময়ের সবচেয়ে উত্তম সামরিক ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের হাতেই ইসলামের বিজয় পতাকা পরবর্তী দশকগুলোতে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

খালিদের বয়স ৪৩। জীবনের মধ্যগগনে মদীনায় আসতে পেরে তিনি খুব আনন্দ বোধ করলেন। তিনি পুরনো বন্ধুদের সংগে সাক্ষাত করেন এবং সবাই তাঁকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে স্বাগতম জানান। সকলেই পূর্বের শত্রুতা ভুলে যান। মদীনায় সকলের মধ্যেই তখন নতুন প্রেরণা, অগ্রযাত্রার প্রেরণা। এখানকার কর্মচাঞ্চল্য, উদ্যম ও নতুন প্রেরণা খালিদ (রা)-এর অন্তরকে স্পর্শ করে। তিনি নতুন পরিবেশে নতুন বিশ্বাসের মুক্ত বাতাসে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

---

৬৯. ওয়াকিদী ঃ মাগাযী পৃষ্ঠা - ৩২১।

খালিদ (রা) উমর (রা):-এর সংগে সাক্ষাত করেন এবং পুনরায় একে অপরের বন্ধুত্ব লাভ করেন। অবচেতনভাবে তাঁদের অন্তরের নিভৃতকোণে পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বিতার অতি ক্ষীণতম একটু রেশ থেকে যায়। যদিও এটা কারোই মনে সুচিন্তিত বা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে স্থান পায়নি। খালিদ (রা) উপলব্ধি করতে পারেন যে, তুলনামূলক বিচারে উমরের চেয়ে তিনি কিছুটা নাজুক অবস্থায় আছেন। কেননা তিনি একজন নতুন মুসলিম আর উমর (রা) হচ্ছেন একজন হিজরতকারী যিনি মক্কায় ঘরবাড়ি সবকিছু ছেড়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুগামী হয়েছেন। তদুপরি উমর (রা) ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে চল্লিশতম ব্যক্তি। মক্কায় অবস্থানকালে উমর (রা) হয়তো তাঁর এই অবস্থানের জন্য তেমন গৌরবের অধিকারী ছিলেন না, যেহেতু সেখানে মুসলিমের সংখ্যা ছিল স্বল্প। কিন্তু আজ মদীনায় হাজার হাজার মুসলিমের মাঝে চল্লিশতম ব্যক্তিটি নিঃসন্দেহে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। খালিদ (রা)-কে আজ শুধু একজন সমকক্ষ ব্যক্তির সংগেই নয় বরং ইসলামের চল্লিশতম ব্যক্তির সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে।

খালিদ (রা) ঘন ঘন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে সাক্ষাত করতে থাকেন। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী শুনতেন। তিনি আল্লাহর বাণীবাহক মুহাম্মদ (সা)-এর প্রজ্ঞা ও সত্যের সুধা পানে মগ্ন হয়ে পড়েন। একদিন খালিদ (রা) ও ফযল বিন আব্বাস (রাসূলুল্লাহর চাচাতো ভাই) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রী মায়মুনার বাড়িতে তাঁর সংগে সাক্ষাত করেন। মায়মুনা ছিলেন খালিদের খালা। সে সময়ই রাসূলুল্লাহ (সা) একজন বেদুঈন বন্ধু উপঢৌকনস্বরূপ তাঁর নিকট কিছু রান্নাকরা খাবার পাঠায়। প্রথামাফিক তিনি মেহমানদেরকেও তাঁর সংগে খাবার অনুরোধ করেন। মাটিতে একটি কাপড় বিছিয়ে তাঁর চারদিকে মেহমানসহ রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর স্ত্রী গোল হয়ে বসেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) খাবারের দিকে হাত বাড়াতে গেলে মায়মুনা জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি জানেন এই খাবারটি কি ?" 'না'।

"এটা একটি ঝলসানো গিরগিটি।" রাসূলুল্লাহ (সা) হাত সংকুচিত করে বলেন, "এ খাবার আমি খাবো না।" খালিদ (রা) জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এ খাবার কি নিষিদ্ধ ?"

"না"।

আমরা কি খেতে পারি?

"হ্যাঁ, তোমরা খেতে পারো।"

মায়মুনাও খাবার হতে বিরত থাকেন। কিন্তু খালিদ (রা) ও ফযল পরিপূর্ণ তৃপ্তি সহকারে আহার করেন। ঝলসানো গিরগিটি ছিল মরুবাসী আরবদের খুব প্রিয় খাবার। খালিদেরও ছিল এটা অত্যন্ত প্রিয়[৭০]।

---

৭০. এই স্বল্প পরিচিত গল্পটি নেয়া হয়েছে ইবনে সাদ হতে ঃ পৃষ্ঠা - ৩৮১।

খালিদ (রা)-এর সোর্ড অব আল্লাহ (সায়ফুল্লাহ) উপাধি লাভ

নতুন বিশ্বাস ইসলামের জন্য যোদ্ধা ও কমান্ডার হিসাবে খালিদ (রা) কি করতে পারেন তা প্রদর্শনের সুযোগ এলো তাঁর মদীনা আগমনের তিনমাস পর।

বুসরার গাসসান[৭১] গোত্রের প্রধানের নিকট ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত জানিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি পত্র লিখেছিলেন। উক্ত পত্রবাহী দূত মূতা অতিক্রমকালে স্থানীয় গাসসান প্রধান শুরাহবীল বিন আমর তাকে বাধা দেয় ও হত্যা করে। আরবদের দৃষ্টিতে এটা ছিল একটি জঘন্যতম অপরাধ। কেননা সে সময়ে কূটনৈতিক দূতকে, সে যতো শত্রুভাবাপন্ন শক্তির প্রতিনিধিই হোক, সকল আক্রমণের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া হতো। এই খবরটি মদীনায় অগ্নিস্ফুলিংগের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

গাসসানদের উচিত-সাজা দেয়ার জন্য দ্রুত একটি অভিযানের প্রস্তুতি নেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) যায়েদ বিন হারিসাকে উক্ত অভিযানের কমান্ডার নিযুক্ত করেন। যায়েদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করলে জাফর বিন আবু তালিব নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন এবং জাফরও শহীদ হলে কমান্ড যাবে আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহার হাতে। এই তিনজনের উপর নেতৃত্বের ধারাবাহিক দায়িত্ব অর্পণের পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "যুদ্ধে এই তিনজনের সকলেই শহীদ হলে সৈনিকগণই তাদের মধ্য থেকে পরবর্তী কমান্ডার নির্বাচন করবে।"[৭২]

তিন হাজার যোদ্ধার সমন্বয়ে মুসলিম বাহিনী গঠিত হয় যার মধ্যে খালিদ (রা)ও ছিলেন একজন সাধারণ সৈনিক। রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিম দূতের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে তাকে হত্যা করার ও মূতার জনগণের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব যায়েদের উপর ন্যস্ত করেন এবং তিনি তাদের আশ্বাস দেন যে, মূতার জনগণ ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের কোনো ক্ষতি করা হবে না। অভিযানে যাত্রার প্রাক্কালে শত্রুসৈন্যের শক্তি সম্পর্কে মুসলিম বাহিনীর নিশ্চিত কোনো ধারণা ছিল না।

---

৭১. সিরিয়া ও জর্ডানে বসবাসকারী একটি শক্তিশালী গোত্র।

৭২. ইবনে সাদ ঃ পৃষ্ঠা - ৬৩৬।

মদীনা হতে যাত্রার প্রাক্কালে মুসলিম বাহিনীর মনোবল ছিল অত্যন্ত উঁচু। মা'ন নামক স্থানে পৌঁছার পর প্রথম খবর এলো যে, পূর্বরোমের সম্রাট হেরাক্লিয়াস ১,০০,০০০ রোমান সৈন্য নিয়ে জর্ডানে উপস্থিত এবং তার সংগে যোগদান করেছে গাসসানের ১,০০,০০০ আরব খৃস্টান। মুসলিম বাহিনী তাদের পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে বাকবিতণ্ডার মধ্যদিয়ে যাপন-এ দুদিন অবস্থান করে। তাদের মধ্যে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভীতি দেখা দেয়। অনেকে শত্রু সৈন্যের বিশালতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবহিত করার পরামর্শ দেয় যাতে তিনি পরবর্তী সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (ধারাবাহিক নেতৃত্বের তৃতীয় ব্যক্তি) এই পরামর্শ পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কারণ এতে অহেতুক বিলম্ব হবে এবং এর ফলে এমন ধারণার সৃষ্টি হবে যে, মুসলিমগণ ভীত। তিনি পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে সৈনিকদের মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবেগময় বক্তৃতা দান করেন। তিনি বক্তৃতার সমাপ্তি টানেন এভাবে, "সৈনিক যুদ্ধ করে বিশ্বাসের বলে, সংখ্যা বা অস্ত্র দিয়ে নয়। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা বিজয় অথবা শাহাদাত এ দু'টির যে কোনো একটি স্থায়ী লক্ষ্য অর্জন করতে পারি।"[৭৩] এই বক্তৃতা শুনে মুসলিম বাহিনীর সকলের মনের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান হয় এবং তারা দ্রুত সিরিয়ার উদ্দেশে অভিযান শুরু করে।

মুসলিম বাহিনী বর্তমান জর্ডানের পশ্চিমে বলকা জেলার সীমান্ত বরাবর পৌঁছে আরব খৃস্টানদের বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হয়। স্থানটি যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় মুসলিম কমান্ডারগণ তাঁদের বাহিনীকে প্রত্যাহার করে মূতায় নেন। আরব খৃস্টানগণ মুসলিম বাহিনীকে অনুসরণ করে এবং দুই বাহিনী মূতায় মুখোমুখি হয়। উভয় পক্ষই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সময়টি ছিল ৬২৯ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ (৮ হিজরীর জমাদি-উল-আউয়াল মাসের তৃতীয় সপ্তাহ)।

যায়েদ সাধারণ ভংগিতে মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে দু'বাহু বিস্তার করে সৈন্য সমাবেশ করেন। বাহিনীর দক্ষিণ বাহুর নেতৃত্বে ছিলেন কুতায়বা বিন কাতাদা এবং বামবাহুর নেতৃত্বে উবাইয়া ইবন মালিক। যায়েদ স্বয়ং ছিলেন মধ্যবর্তী অবস্থানের নেতৃত্বে এবং খালিদও ছিলেন এখানেই। যুদ্ধক্ষেত্রটি বর্তমান মূতা গ্রাম হতে পূর্বদিকে এক মাইল বিস্তৃত। সামান্য উঁচুনীচু ছাড়া জায়গাটি ছিল সমতল। মুসলিম বাহিনী উত্তরমুখী হয়ে আরব খৃস্টানদের মুকাবিলা করেছিল। তাদের পিছনে ছিল হালকা উঁচু পর্বতশ্রেণী।[৭৪]

---

৭৩. ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৩৭৫।

৭৪. এই যুদ্ধক্ষেত্রটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য জর্দান সরকার এখানে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করেছে।

খৃস্টান বাহিনীর নেতা মালিক বিন জাফিলা তার বাহিনীকে অনেকগুলো সারিতে সাজিয়ে মুসলিমদের মুকাবিলা করে। অনেক ঐতিহাসিক তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন ১,০০,০০০; অনেকে মনে করেন ২,০০,০০০। এই হিসাব কোনোটাই ঠিক নয়। শত্রু সংখ্যা ছিল সম্ভবত দশ থেকে পনের হাজারের মধ্যে। এই যুদ্ধে মুসলিমগণ বিজয় অর্জনে ব্যর্থ হয়। তাই অনুমান করা যায় যে, শত্রু সৈন্য সংখ্যা শুধু দ্বিগুণ হলেও মুসলিম বাহিনী তাদেরকে ঘায়েল করতে সক্ষম হতো। মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করার জন্য প্রতিপক্ষকে বহুগুণ শত্রুসৈন্যের সমাবেশ ঘটাতে হতো। মূলত এই বিবেচনার ভিত্তিতেই শত্রুর শক্তি সম্পর্কে উল্লেখিত সংখ্যার নির্ধারণ করা হয়েছে।

যুদ্ধ শুরু হলে উভয় বাহিনীই দ্রুত একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। যুদ্ধটি পরিচালিত হচ্ছিল সামরিক দক্ষতার পরিবর্তে সাহস ও শক্তির দ্বারা। যায়েদ স্বয়ং মুসলিম বাহিনীর পতাকা হাতে সম্মুখভাগে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং কিছুক্ষণ পর শাহাদত বরণ করেন। তাঁর হাত থেকে পতাকা পড়ে যাওয়ার সংগে সংগেই নেতৃত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি জাফর তা তুলে নেন এবং বাহিনীর সম্মুখ ভাগে থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। আঘাতে আঘাতে জাফরের শরীর ক্ষতবিক্ষত হলে জাফরও মাটিতে পড়ে যান এবং পতাকারও পতন ঘটে দ্বিতীয় বারের মতো। জাফরের পতন মুসলিম বাহিনীকে অত্যন্ত মানসিক ক্লেশের মধ্যে ফেলে দেয়। কেন না রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাতো ভাই হিসেবে তিনি ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পাত্র। এ সময় তাদের মধ্যে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কিন্তু নেতৃত্বের তৃতীয় ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা দ্রুত পতাকা হাতে তুলে নিয়ে বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব কায়েম করেন। তিনিও শাহাদতের পূর্ব পর্যন্ত সাহসিকতার সংগে যুদ্ধ করে যান।

আব্দুল্লাহর মৃত্যুর পর মুসলিম বাহিনীর মধ্যে প্রকৃত বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। তাদের কয়েকজন যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নের চেষ্টা করলে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হয়। অন্যেরা দু-তিন জনের বা আরও বড় দলে বিভক্ত হয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সহকারে শত্রুকে প্রতিহত করতে থাকে। ভাগ্যক্রমে শত্রু মুসলিম বাহিনীর এই নেতৃত্বহীনতার সুযোগকে কাজে লাগাতে পারেনি। তা করলে মুসলিম বাহিনীকে সহজেই বিতাড়িত করা সম্ভব ছিল। সম্ভবত মুসলিম নেতৃত্বের নির্ভীকতা ও সৈনিকদের কথা বিবেচনা করে শত্রুগণ সাহসী পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত ছিল।

আব্দুল্লাহর হাত হতে পতাকা পড়ে যাওয়ার সংগে সংগে সাবিত বিন আরকাম তা তুলে নিয়ে উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে বলেন, "হে মুসলিমগণ! নিজেদের মধ্য থেকে সর্বসম্মতিক্রমে একজন নেতা নির্বাচন করো।" খালিদ (রা) তাঁর পাশেই

দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাঁকে লক্ষ্য করে পতাকাটি এগিয়ে দিলেন। খালিদ (রা) এ ব্যাপারে সজাগ ছিলেন যে, নতুন মুসলিম হিসেবে তাঁর অবস্থান খুব উঁচুতে নয়। অপরপক্ষে সাবিত বিন আরকাম ছিলেন দীর্ঘদিনের মুসলিম। এই বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করে বললেন, "সাবিত! আমার চেয়ে তুমিই বেশি যোগ্য।" "আমি নই এবং তুমি ছাড়া আর কেউ নয়"[৭৫] সাবিতের উত্তর। খালিদ (রা) ছিলেন মুসলিমদের জন্য অপ্রত্যাশিত ভরসা, কেননা তারা তাঁর ব্যক্তিগত শৌর্য ও সামরিক দক্ষতা সম্পর্কে অবহিত ছিল। তাঁরা সকলে একবাক্যে এই মনোনয়নে সম্মতি জ্ঞাপন করে এবং খালিদ (রা) পতাকা হাতে নিয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

যুদ্ধের পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ এবং তা মুসলিম বাহিনীর জন্য যে কোনো সময় চরম পরাজয় ডেকে আনতে পারত। খালিদের পূর্বের কমান্ডারগণ যুদ্ধ পরিচালনায় কৌশলের চেয়ে সাহসিকতার প্রয়োগ বেশি করেছিলেন। খালিদ (রা) অতি দ্রুত তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুন্দরভাবে বিন্যস্ত শক্তিতে মোতায়েন করেন। তাঁর সামনে ছিল তিনটি পথ খোলা। প্রথমত গোটা বাহিনীকে যুদ্ধ হতে প্রত্যাহার করে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। কিন্তু এই প্রত্যাহারকে পরাজয় বিবেচনা করে তাঁর উপর গৌরবদীপ্ত মুসলিম বাহিনীকে কলংকিত করার অভিযোগ আসতে পারে। দ্বিতীয়, প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। এতেও পরাজয়ের আশংকা ছিল। কারণ শত্রু বাহিনী ছিল সংখ্যায় বহুগুণ। তৃতীয় এবং সর্বশেষ পথছিল প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে শত্রুকে বেসামাল করে পরবর্তী কৌশল নির্ধারণের জন্য সময় লাভ করা। খালিদ (রা) সর্বশেষ পথটিই অবলম্বন করেন। কেননা এটা ছিল তাঁর স্বভাবের সংগে সংগতিপূর্ণ।

মুসলিম বাহিনী সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে প্রচণ্ড আক্রমণ রচনা করে। তাঁরা খালিদের নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য তরংগের মতো সামনে অগ্রসর হয়। খালিদের সাহসী নেতৃত্ব মুসলিম সৈনিকদের মনে নতুন সাহসের সঞ্চার করে। যুদ্ধের গতি আরও প্রচণ্ড রূপ লাভ করে। এমনকি কিছু সময়ের জন্য হাতাহাতি মরণপণ যুদ্ধ চলে। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম বাহিনীর দক্ষিণ বাহুর কমান্ডার কুতায়বা সামনে অগ্রসর হয়ে খৃস্টান বাহিনীর কমান্ডার মালিককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত করেন। ফলে শত্রুসৈন্য অনেকটা দমে যায় এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে। তারা যুদ্ধরত অবস্থায় পিছনে হটতে থাকে। তাদের লক্ষ্য, পুনর্গঠনের জন্য সময় লাভ করা। এই সময়ে খালিদ (রা) প্রচণ্ড যুদ্ধে নয়টি তরবারি ভেঙে দশমটি হাতে নিয়েছেন।

---

[৭৫] ইবনে সাদ ঃ পৃষ্ঠা - ৬৩৮।

খৃস্টান বাহিনী পিছু হটলে খালিদ (রা) সংঘর্ষে বিরতি দিয়ে তাঁর বাহিনীকে কিছুটা পেছনে সরিয়ে নেন। উভয় বাহিনী এখন উভয়ের নাগালের বাইরে বিশ্রাম ও পুনর্গঠনের অপেক্ষায় রত। শেষ দফা যুদ্ধটি সমাপ্ত হয় মুসলিম বাহিনীর পক্ষে। এই যুদ্ধে ১২ জন মুসলিম শহীদ হন। প্রতিপক্ষের নিহতের কোনো হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে তা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা খালিদ (রা)-এর পূর্বের প্রত্যেক কমান্ডারই ছিলেন সাহসী ও দক্ষ যোদ্ধা এবং খালিদের হাতের নয়টি তরবারিই ভেঙে ছিল শত্রুসৈন্যের দেহের মধ্যে খালিদ পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখেন যে, যুদ্ধে চূড়ান্ত সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম। তিনি মুসলিম বাহিনীকে একটি লজ্জাজনক ও ভয়ানক পরাজয়ের কবল হতে ফিরিয়ে অসম্মান ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন। শুধু সাহস ও কৌশল দিয়ে এর বেশি আর কিছু করা যায় না। সে রাতেই তিনি মূতা হতে তাঁর বাহিনীকে প্রত্যাহার করে মদীনার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন।

মুসলিম বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের খবর মদীনায় পূর্বেই পৌছে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) ও মদীনায় অবস্থানকারী মুসলিমগণ তাঁদের সংগে সাক্ষাতের জন্য সামনে অগ্রসর হন। ওহুদের যুদ্ধের পর হতে মুসলিম বাহিনী কখনই শত্রুর মুকাবিলা হতে বিরত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র তাদের দখলে ফেলে আসেনি। তাই মূতা হতে প্রত্যাহারকারী বাহিনীর প্রতি মদীনা অবস্থানকারী মুসলিমদের মনোভাব ছিল খুবই খারাপ। তাঁরা এই বাহিনীর সম্মুখীন হওয়ার সংগে সংগেই সৈনিকদের মুখের উপর ধুলো নিক্ষেপ করতে শুরু করে। তাঁরা চিৎকার করতে থাকে, "তোমরা পালিয়ে এসেছো। তোমরা আল্লাহর পথ থেকে পালিয়ে এসেছো। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে বিরত করেন এবং বলেন, "তাঁরা পালিয়ে আসেনি। আল্লাহর ইচ্ছা হলে তাঁরা আবার যুদ্ধ করতে যাবে।"[৭৬] তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলেন, "খালিদ হলো আল্লাহর তরবারি।"[৭৭]

পরে খালিদের প্রতি অসন্তোষ দূরীভূত হয় এবং মূতার যুদ্ধে যে তিনি কি পরিমাণ প্রজ্ঞা, বিবেচনা ও সাহস প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন তা সকলে উপলব্ধি করেন। তাঁর নামের সংগে 'সাইফুল্লাহ' শব্দটি যুক্ত হয়ে যায়। তিনি হয়ে যান 'আল্লাহর তরবারি'। খালিদ (রা)-কে এই মহান উপাধিতে ভূষিত করার সময়ই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জীবনের ভবিষ্যৎ যুদ্ধগুলোর সফলতার নিশ্চয়তার ইংগিত দান করেছিলেন।

কিছু কিছু ঐতিহাসিক মূতার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে জয়ী বলে বর্ণনা করেছেন, আবার অনেকেই বলেছেন ভিন্ন কথা। প্রকৃত অর্থে এটা জয় বা পরাজয় কোনটাই ছিল না। এটা ছিল একটি অমীমাংসিত যুদ্ধ। তবে যেহেতু মুসলিম বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রের দখল খৃস্টান বাহিনীর হাতে রেখে প্রত্যাহার করেছিল তাই অমীমাংসিত ফলাফলটি ছিল তাদের পক্ষেই। এটা খুব বড় বা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল না। কিন্তু এই যুদ্ধে খালিদ (রা) একজন স্বতন্ত্র কমান্ডার হিসেবে তাঁর দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং এর ফলেই তিনি আল্লাহর তরবারি উপাধিটি লাভ করেন।

---

৭৬. ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৩৮২।
৭৭. ওয়াকিদী ঃ মাগাযী, পৃষ্ঠা - ৩২২।

মক্কা বিজয়

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মক্কার দুটি গোত্র খোজা ও বনী বকর হুদায়বিয়ার সন্ধিতে দুপক্ষে যোগদান করে; খোজা মুসলিম পক্ষে ও বনী বকর কোরেশদের পক্ষে। এই দুটি গোত্রের মধ্যে ইসলাম-পূর্ব যুগ হতেই বৈরিতা চলে আসছিল। গত ক'বছর ধরে তাদের এই বৈরিতা সুপ্ত ছিল। সন্ধিতে আবদ্ধ হওয়ার পর আশা করা গিয়েছিল যে, তাদের মধ্যে শান্তি বিরাজ করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বনী বকর খোজাদের বিরুদ্ধে একরাতে আকস্মিকভাবে একটি ক্ষণস্থায়ী আক্রমণ পরিচালনা করে। এই আক্রমণ পরিচালনায় কোরেশগণ তাদেরকে অস্ত্র ও যোদ্ধা দিয়ে সাহায্য করে। যোদ্ধাগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ইকরামা ও সাফওয়ান বিন উমাইয়া। এই আকস্মিক আক্রমণে খোজাদের ২০ জন সদস্য নিহত হয়।

এই ঘটনার পর পরই খোজাদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বনী বকরের চুক্তিভংগের বিষয়টি অবহিত করে। প্রতিনিধিদল মুসলমানদের সংগে তাদের মিত্রতার সূত্র ধরে সাহায্যের আবেদন জানায়।

বনী বকরকে সহযোগিতা করার ব্যাপারে আবু সুফিয়ান সরাসরি জড়িত ছিলেন না। বিষয়টি এখন তাকে ভাবিয়ে তোলে, কেননা তিনি এই মুহূর্তে প্রতিপক্ষের সংগে চুক্তি ভংগ করার ব্যাপারে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি মুসলমানদের পক্ষে সম্ভাব্য হুমকির কথা বিবেচনা করে একটি নতুন চুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য মদীনা গমন করেন। মদীনায় পৌঁছে তিনি তার কন্যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্নী উম্মে হাবিবার সংগে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু মেয়ের পক্ষ থেকে শিথিল আপ্যায়ন লাভ করেন। পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করে একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নিশ্চুপ থাকেন। এতে আবু সুফিয়ান আরও ঘাবড়িয়ে যান এবং তার মানসিক শান্তি অন্য যে কোনো হুমকির চেয়ে বেশি নষ্ট হয়।

উপায়ান্তর না পেয়ে আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রধান সাহাবাদের শরণাপন্ন হন। তিনি আবু বকর (রা)-এর নিকট এই নতুন চুক্তির ব্যাপারে রাসূলের সংগে কথা বলার অনুরোধ জানান। আবু বকর (রা) অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তারপর যান উমরের নিকট। উমর (রা) স্বভাবসিদ্ধভাবেই একজন সমরনায়কের মতো জবাব দান করেন, "আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার নিকট কিছু না হোক শুধু একটি পিপীলিকার বাহিনী থাকলেও, আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতাম।" আবু সুফিয়ান এর পর আলী (রা)-এর বাসায় গিয়ে প্রথমে ফাতিমার সংগে কথা বলেন। আলী (রা) তার বক্তব্য শুনে বলেন, "আল্লাহর রসূল যে সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করেছেন কেউ তাকে সে পথ থেকে বিরত রাখতে পারবে না।" "তাহলে আপনার পরামর্শ কি ?" - আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করেন। "হে আবু সুফিয়ান! তুমি হলে কোরেশদের নেতা। তোমার লোকদের মাঝে শান্তি বজায় রাখো।"[৭৮]

আলীর এই উপদেশের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা গেলেও অন্যদের সংগে কথা বলে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন সে তুলনায় কিছুটা হলেও মানসিক প্রশান্তি লাভ করেন। কোনো সুনিশ্চিত ফলাফল ছাড়াই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আবু সুফিয়ান মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

আবু সুফিয়ান বিদায়ের পর পরই রাসূলুল্লাহ (সা) একটি বড় ধরনের অপারেশনের দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিকল্পনা ছিল অত্যন্ত দ্রুত ও গোপনীয়তার সংগে এই অভিযান পরিচালনা করা, যাতে মুসলিম বাহিনী মক্কায় আঘাত হানার পূর্বে মক্কাবাসীরা জানতে না পারে। এতে কোরেশগণ মুসলমানদেরকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোর সংগে যোগাযোগ করে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সময় পাবে না। অভিযানের জন্য সৈন্য সমাবেশ চলাকালে রাসূলুল্লাহ (সা) জানতে পারেন যে, জনৈকা মহিলা মুসলমানদের অভিযানে প্রস্তুতির খবর সম্বলিত একটি পত্র নিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে গেছে। তিনি তাকে ধাওয়া করার জন্য আলী (রা) এবং যুবায়েরকে প্রেরণ করেন। তাঁরা অতি শীঘ্র পত্রসহ মহিলাকে মদীনায় ধরে নিয়ে আসেন।

৬৩০ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি (১০ই রমযান, ৮ হিজরী) মুসলিম বাহিনী মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। বিভিন্ন মুসলিম গোত্রের অনেকগুলো দল মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে যোগদান করে এবং পথে আরও কিছু দল তাঁর সংগে শামিল হয়। ফলে মুসলিম বাহিনীর আকার অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বৃহত্তর সংখ্যা দশ হাজারে দাঁড়ায়। এই বিশাল বাহিনীসহ রাসূলুল্লাহ (সা) কোরেশদের অজ্ঞাতে মক্কার দশ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে মা-উজ-জাহ্‌রানে উপস্থিত হন।[৭৯] এটি ছিল মুসলিম বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সর্বকালের দ্রুততম অভিযান।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আব্বাস (রা) ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের দলে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। মুসলিম বাহিনী জুহফায় পৌঁছে সপরিবারে মদীনা অভিমুখী আব্বাসের সাক্ষাৎ পায়। আব্বাসের ইসলাম গ্রহণকে রাসূলুল্লাহ (সা) খুব আনন্দচিত্তে গ্রহণ করেন। আব্বাসের সংগে রাসূলের সম্পর্ক ছিল বরাবরই আন্তরিক।

মুসলিম বাহিনী মার-উজ-জাহ্‌রানে অবস্থানকালে আব্বাস (রা) মক্কাবাসীর ভাগ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি আশংকা বোধ করেন যে, মুসলিম বাহিনীকে মক্কা

---

৭৮. ইবনে হিশাম ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৩৯৬-৭।

৭৯. মার-উজ-জাহ্‌রান একটি ছোট উপত্যকা, যার নিম্নের অংশ ওয়াদী ফাতিমা নামে মক্কা হতে ২০ মাইল দূরে বর্তমানের জেদ্দা-মক্কা মহাসড়ক অতিক্রম করেছে।

দখলে শক্তি প্রয়োগ করতে হলে কোরেশদেরকে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুমতিক্রমে তাঁর খচ্চরে চড়ে মুসলিম বাহিনীকে বাধা দানের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে কোরেশদেরকে সতর্ক করা ও তাদেরকে রাসূলের নিকট শান্তির দূত প্রেরণের আহ্বান জানানোর জন্য যাত্রা শুরু করেন। একই সময়ে আবু সুফিয়ানও মুসলমানদের কোনো আনাগোনা পাওয়া যায় কিনা তা স্বচক্ষে দেখার জন্য মক্কা থেকে বের হন। আব্বাস (রা) মাঝপথেই আবু সুফিয়ানের সাক্ষাত পেয়ে যান।

"ওহে ফযলের পিতা, তোমার নিকট কি সংবাদ আছে ?" আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করেন।

"আল্লাহর বাণীবাহক দশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীসহ অগ্রসর হচ্ছে।" আব্বাস (রা) উত্তর দান করেন।

"এ ক্ষেত্রে তুমি আমাদেরকে কি করতে পরামর্শ দাও।"

"মুসলমানদেরকে যদি বাধা অতিক্রম করে মক্কা জয় করতে হয়, তাহলে তারা তোমার মস্তক ছিন্ন করে ফেলবে। আমার সংগে রাসূলের নিকট চলো, আমি তাঁকে অনুরোধ করবো, তোমার প্রাণ ভিক্ষাদানের জন্য ।"

আবু সুফিয়ান একই খচ্চরের পিঠে আব্বাসের পিছনে বসে মুসলিম ক্যাম্পের দিকে যাত্রা শুরু করেন এবং সেখানে পৌঁছতে রাত হয়ে যায়। ঘটনাচক্রে ঐ রাতে উমর (রা) ছিলেন ডিউটি অফিসার। তিনি ক্যাম্পের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন প্রহরীরা সতর্ক আছে কিনা। তিনিই প্রথম আগন্তুকদেরকে দেখে চিনে ফেলেন এবং চিৎকার করে বলেন, "আহ! আল্লাহর শত্রু আবু সুফিয়ান। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাকে মুসলিম ক্যাম্পে পাঠিয়েছেন কোনো নিরাপত্তা ছাড়াই।" উমর (রা) দৌড়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তাঁবুর দিকে অগ্রসর হন। আব্বাস (রা) উমরের উদ্দেশ্য অনুমান করে খচ্চরকে দ্রুত চালিয়ে একই সময়ে রাসূলের তাঁবুতে উপস্থিত হতে সক্ষম হন। উমর ও আব্বাসের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। উমর (রা) আল্লাহর প্রধান শত্রুর মস্তক ছিন্ন করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু আব্বাস (রা) জানান যে, তিনি তাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে নিয়ে এসেছেন। কাজেই তার বক্তব্য না শুনে কিছু করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) তিনজনকেই পরদিন সকালে আসার নির্দেশ দিয়ে বিদায় করেন। আব্বাস (রা) আবু সুফিয়ানকে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে যান। আবু সুফিয়ান তার ভাগ্যের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে নিদ্রাহীন রাত যাপন করেন।

পরদিন সকালে আব্বাস (রা) ও আবু সুফিয়ানকে আসতে দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) মন্তব্য করেন, "এদের একজন মুসলমান হওয়ার জন্য আসছে, কিন্তু সে অন্তর থেকে মুসলিম নয়।" তাঁরা তাঁবুর নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, "ওহে আবু সুফিয়ান! তুমি কি জান না যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নাই।" "তা আমি এখন বুঝতে পারছি, আমি যে প্রভুদের বিশ্বাস করতাম, তাদের কোনো অস্তিত্ব থাকলে তারা আজ অবশ্যই আমার সাহায্যে এগিয়ে আসত।" "এবং তুমি কি জাননা যে, আমি আল্লাহর রসূল।"

ম্যাপ - ৪ : মক্কা বিজয় - ১
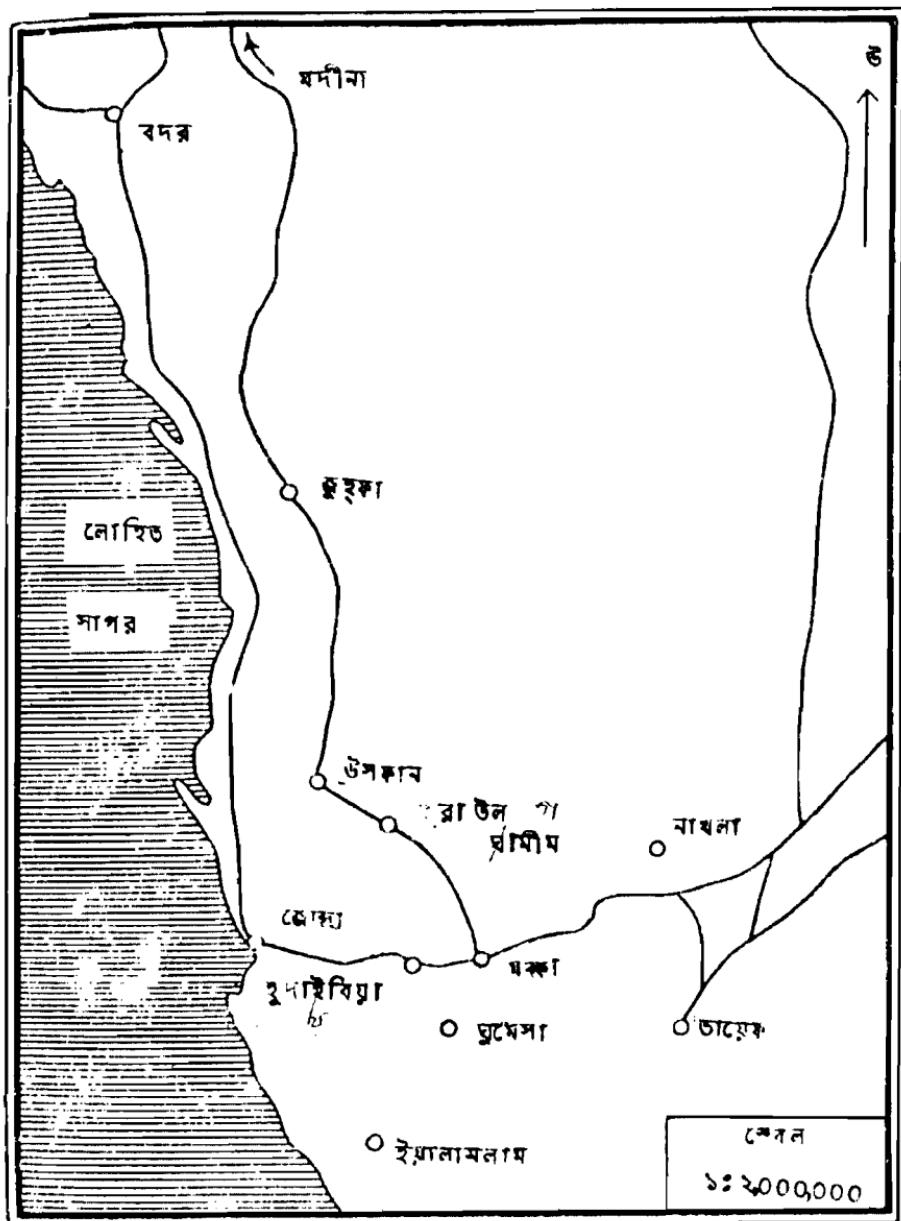
এই মুহূর্তটি ছিল আবু সুফিয়ানের জন্য কষ্টকর। তিনি ছিলেন বিখ্যাত উমাইয়া বংশের উত্তরাধিকার, স্বীয় গোত্রের একজন মহান ব্যক্তিত্ব ও কোরেশদের গর্বিত নেতা। তিনি সব সময় নিজেকে অদ্বিতীয় ভাবতেন এবং তার এ ভাবনা অমূলক ছিল না। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মক্কার শাসক - মক্কার লোকরা তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতো। এখন তিনি অসহায়ের মতো সেই ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে যাঁকে ধ্বংস করার জন্য তিনি বছরের পর বছর ধরে তার প্রতিটি শিরা উপ-শিরায় তীব্র উত্তেজনা সহকারে যুদ্ধ করেছেন ও সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছেন।

আবু সুফিয়ান উত্তর দেন, "এ বিষয়ে আমার মনে সামান্য কিছু সন্দেহ আছে।"

আব্বাস (রা) অগ্নিমূর্তিতে আবু সুফিয়ানের দিকে তাকিয়ে বলেন, "ওহে আবু সুফিয়ান! তোমার ভাগ্য খারাপ।" তিনি হিস্ হিস্ করে উঠেন, "আত্মসমর্পণ করো,নতুবা তোমার মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।"

আবু সুফিয়ান দ্রুত বলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।" আব্বাস (রা) রাসূলাল্লাহ (সা)-কে ফিস্ ফিস্ করে বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু সুফিয়ান একজন গর্বিত ও মর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি। তার ব্যক্তিত্বের সম্মান স্বরূপ সামান্য কিছু ছাড় দেয়ার মতো মহানুভবতা কি আপনি দেখাবেন না ? "

এর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল (সা) ঘোষণা দেন, "যে আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ।" এতে আবু সুফিয়ানের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠে। আল্লাহর রাসূল তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন, "যারা ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবে, তারা নিরাপদ। যারা কাবার ভিতরে থাকবে তারাও নিরাপদ।"

আবু সুফিয়ান মক্কায় ফিরে দেখেন লোকজন তাদের ভাগ্যের খবর জানার জন্য সমবেত হয়ে অপেক্ষা করছে। আবু সুফিয়ান জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, "ওহে কোরেশগণ! মুহাম্মদ যে শক্তি নিয়ে এসেছেন তোমরা কোনোভাবেই তার মুকাবিলা করতে পারবে না। আত্মসমর্পণ করে নিরাপদ হও। যারা আমার ঘরে আশ্রয় নেবে, তারা নিরাপদ।" এই কথা শুনে জনতার মাঝে হৈ চৈ পড়ে যায়। লোকজন ব্যঙ্গভরে জিজ্ঞেস করে, "তোমার ঘরে কতজনকে জায়গা দিতে পারবে বলে তুমি মনে করো ?" এরপর আবু সুফিয়ান যোগ করেন, যারা ঘরের দরজা তালাবদ্ধ করে ভিতরে থাকবে তারাও নিরাপদ। যারা কাবায় থাকবে তারাও নিরাপদ।"

এই ঘোষণা জনতাকে শান্ত করলেও, তার স্ত্রী হিন্দকে শান্ত করতে ব্যর্থ হয়। সে বন্য বিড়ালের মতো স্বামীর উপরে লাফ দিয়ে পড়ে, তার মুখে চড় মারে এবং গোঁফ টেনে ধরে। সে জনতার দিকে তাকিয়ে ক্ষিপ্তভাবে আহ্বান জানায়, "এই অথর্ব স্থূল বৃদ্ধকে হত্যা করো। সে আমাদের দল ত্যাগ করেছে।"

স্থূলাংগী হিন্দের আক্রমণে আবু সুফিয়ান দুঃখজনক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন কোনো রকমে তিনি তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে বাড়িতে চলে যান।[৮০]

---

৮০. ইবনে হিশাম ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪০২-৫,ইবনে সাদ ঃ পৃষ্ঠা - ৬৪৪, ওয়াকিদী ঃ মাগাযী পৃষ্ঠা - ৩২৭-৩১।

মুসলমানদের ধারণা ছিল মক্কায় প্রবেশের পথে তারা কিছুটা বাধার সম্মুখীন হবে। যদিও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইচ্ছা ছিল বিনা রক্তপাতে মক্কা জয়ের তবু এ অপারেশন যে এতো শান্তিপূর্ণ হবে তা তারা ভাবতে পারেনি। ইকরামা ও সাফওয়ানের মতো কঠোর ইসলাম বিদ্বেষীদের উপস্থিতির কারণে কিছুটা হলেও প্রতিবন্ধকতা হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিকল্পনা ছিল একটি সামরিক অপারেশনের মাধ্যমেই মক্কা জয় করার।

মক্কার অবস্থান আব্রাহাম উপত্যকায়। এর চারদিক ঘিরে আছে কালো ও অসমতল পাহাড়-পর্বত। এই পাহাড়গুলোর উচ্চতা কোথাও সমতল ভূমি হতে ১০০০ ফুট। পাহাড়ী এলাকার মধ্য দিয়ে চারটি রাস্তা চারদিক থেকে এসে শহরে প্রবেশ করেছে। এই রাস্তাগুলো এসেছে উত্তর-পশ্চিম (প্রায় উত্তর) দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব দিক হতে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বাহিনীকে চারটি দলে বিভক্ত করেন এই চারটি পথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশের জন্য। মক্কায় প্রবেশের প্রধান পথটি এসেছে মদীনার রাস্তা ধরে আজাখির হয়ে অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম দিক হতে। এই পথে প্রবেশ করবে মুসলিম বাহিনীর প্রধান দলটি। এই দলটির কমান্ডার ছিলেন আবু উবায়দা (রা) এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এই দলের সংগে ভ্রমণ করেন। যুবায়েরের কমান্ডে দ্বিতীয় দলটি প্রবেশ করবে মক্কার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে কুদা পাহাড়ের পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরে। তৃতীয় দলটি আলী (রা)-এর নেতৃত্বে কুদেই হয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবেশ করবে এবং চতুর্থ দলটি প্রবেশ করবে খালিদ (রা)-এর নেতৃত্বে লেইট এবং খান্দামা হয়ে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে (৫ নং ম্যাপ দেখুন)[৮১]।

অগ্রাভিযানটি পরিকল্পনা করা হয় একই লক্ষ্যবস্তুকে কেন্দ্র করে চারদিক থেকে অগ্রসর হয়ে চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে তাদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার সুযোগ না দিয়ে বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করতে বাধ্য করার কৌশল অবলম্বন করে। এতে ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত শত্রুকে নির্মূল করা অনেক সহজ হয় এবং শত্রুও কোনো পথে সম্মিলিত শক্তি নিয়ে বাধা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। তদুপরি এই পরিকল্পনার আরও সুবিধা ছিল যে, শত্রু কোনো একটি প্রবেশ পথে সফলভাবে বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও অভিযানকারিগণ অন্য পথে প্রবেশ করে একটি সুবিধাজনক অবস্থান গ্রহণ করতে পারে। এই সামরিক কৌশলকে প্রয়োগ করার জন্যই মক্কায় প্রবেশের প্রতিটি পথই ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এ পরিকল্পনা গ্রহণের পিছনে কোরেশদের পলায়ন রোধ করাও ছিল একটি কারণ। কিন্তু পরে কড়াকড়ি শিথিল করা হলে কিছু কোরেশ মক্কা ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। কোরেশদের পক্ষ থেকে সশস্ত্র বাধা না আসলে কোনো যুদ্ধ হবে না, এটাই ছিল আল্লাহর রাসূলের সিদ্ধান্ত। তাঁর হুকুম ছিল, কোনো আহত ব্যক্তিকে হত্যা করা, পলাতককে ধাওয়া করা ও ক্রীতদাসকে বধ করা যাবে না।

---

৮১. ৫ নম্বর ম্যাপে প্রদর্শিত গোটা এলাকাটি পাহাড়ী, এরূপ একটি ম্যাপে পাহাড়গুলো দেখানো সম্ভব নয়। তাই শুধু অভিযানের প্রবেশ পথগুলো দেখানো হয়েছে।

ম্যাপ-৫ : মক্কা বিজয়-২
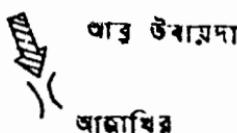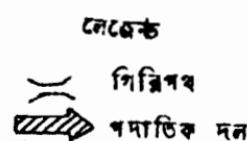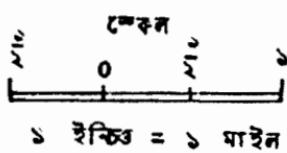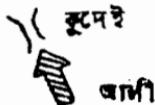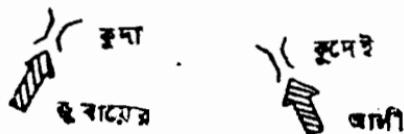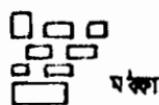
রাসূলুল্লাহ (সা) দলবলসহ ১১ই জানুয়ারি, ৬৩০ খৃস্টাব্দে (২০শে রমযান, ৮ হিজরী) মক্কায় প্রবেশ করেন। খালিদ (রা)-এর সেকটরে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এই অপারেশনটি ছিল শান্তিপূর্ণ ও রক্তপাতহীন। ইকরামা ও সাফওয়ান কোরেশ ও অন্যান্য গোত্রের কিছু যোদ্ধাকে নিয়ে একত্রিত হয়ে মুসলিম বাহিনীকে বাধা দানের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা খান্দামায় খালিদের সামনে দাঁড়ায়। খালিদ (রা)-এর জন্য এটা ছিল একটি নতুন ও অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান দুই সেনানায়ক–ইকরামা ও সাফওয়ান ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম। তদুপরি সাফওয়ান তাঁর বোন ফাখ্‌তার স্বামী। যা হোক, ইসলামের পতাকা তলে প্রবেশের ফলে অজ্ঞতার যুগের সব বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা শেষ হয়ে গেছে এবং মুসলিম নয় এমন কেউ শুধু অতীতের সম্পর্কের কারণেই কোনো কৃপা দাবি করতে পারে না।

কোরেশগণই প্রথম তীর ছুঁড়ে এবং তরবারি কোষমুক্ত করে। খালিদ (রা) এই সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি কোরেশদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং একটি সংক্ষিপ্ত ও প্রচণ্ড আঘাতেই কোরেশ বাহিনী পিছু হটে যায়। কোরেশপক্ষে নিহত হয় বারজন এবং মুসলিম পক্ষে দু'জন। ইকরামা ও সাফওয়ান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে সক্ষম হয়।

খালীদ (রা)-এর এই সংঘর্ষ ও রক্তপাতের খবর শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি একান্তভাবেই রক্তপাত এড়াতে চেয়েছিলেন এবং খালিদের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের কথা চিন্তা করে ভেবেছিলেন হয়তো তিনিই সংঘর্ষের সূত্রপাত করেছিলেন।

খালিদ (রা)কে যথারীতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে জবাবদিহি করতে হয়। তাঁর জবাব রাসূলুল্লাহ (সা) গ্রহণ করেন এবং স্বীকার করেন যে, খালিদের তৎপরতা যথার্থ ছিল। তিনিতো শুধু আক্রমণকারী শত্রুকে পাল্টা আঘাত করেছিলেন। আর এটাতো খালিদ (রা)-এর স্বভাবই যে, তিনি যখন আঘাত করেন, তখন অত্যন্ত কঠোরভাবেই তা করেন। আঘাত করার ক্ষেত্রে তাঁর চরিত্রে কোনো দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপার ছিল না।

মক্কায় প্রবেশ করেই রাসূলুল্লাহ (সা) কাবা ঘরে যান এবং আল্লাহর ঘর সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। এই মুহূর্তটি ছিল তাঁর জীবনে খুবই স্মরণীয়। প্রায় সাত বছরেরও বেশি সময় পূর্বে তিনি রক্তপিপাসু কোরেশদের দ্বারা ধাবিত হয়ে পলাতক বেশে মক্কা ত্যাগ করেছিলেন। তিনি আর পলাতক নন। তাঁর আহ্বান এখন জন-মানবশূন্য নীলিমায় বিলীন হয়ে যায় না। হযরত মুহাম্মদ (সা) মক্কায় ফিরেছেন এবং তিনি ফিরেছেন বিজয়ীর বেশে। মক্কা নগরী আজ তাঁর পদানত। আরবীয় প্রতিশোধ প্রবণতার কথা চিন্তা করে মসজিদে আশ্রয়গ্রহণকারী কোরেশগণ ভয়ে কম্পমান।

রাসূলুল্লাহ (সা) কোরেশদের দিকে ফিরে তাকালে তাদের মধ্যে এক ধরনের প্রাণহীন নীরবতার সৃষ্টি হয়। আশংকিত দৃষ্টিতে তারা রাসূলের দিকে তাকিয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) কোরেশদেরকে সম্বোধন করে বলেন, "ওহে কোরেশগণ ! তোমরা আমার নিকট হতে কিরূপ আচরণ আশা করো।"

"দয়াপূর্ণ, হে মহান ভ্রাতা ও মহান ভ্রাতার পুত্র!" জনতা সমস্বরে জবাব দান করে।

"তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই আজ যাও তোমরা এখন মুক্ত।"[৮২]

রাসূল (সা) এরপর কাবা ঘরে প্রবেশ করেন এবং বিভিন্ন আকারের মূর্তি দেয়ালে সাজানো অবস্থায় দেখেন। কা'বার ভিতরে ও আশেপাশে ৩৬০ টি কাঠ ও পাথরের তৈরি মূর্তি ছিল। এর মধ্যে ছিল ঐশী তীরধারী ইব্রাহীমের মূর্তিও। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলো ভাঙ্গতে শুরু করেন। এই কাজ শেষ করে তিনি বিরাট স্বস্তি বোধ করেন। আল্লাহর ঘর এখন পূত-পবিত্র এবং এখানে শুধু প্রকৃত আল্লাহর ইবাদত করা হবে। রাসূল (সা)) উচ্চৈঃস্বরে কুরআনের বাণী আবৃত্তি করেন, "সত্য সমাগত এবং মিথ্যা দূরীভূত।"[৮৩] আর মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

পরবর্তী ক'দিন বিজয় সংহত ও পুনর্গঠনের কাজে ব্যয় হয়। মক্কার অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করে এবং আল্লাহর রসূলের নেতৃত্ব স্বীকার করে।

মক্কায় প্রবেশের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা) ৬ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা মোট ১০ জনের নাম ঘোষণা করে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদেরকে দেখামাত্র হত্যা করার জন্য - এমনকি যদি তারা কা'বা ঘরেও আশ্রয় নেয়। এই ব্যক্তিবর্গ ছিল যুদ্ধ অপরাধী। এরা হয় ধর্মদ্রোহী নতুবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুসলমানদেরকে নির্যাতন করেছিল। এই ১০ জনের তালিকার শীর্ষে ছিল ইকরামার নাম। তালিকায় হিন্দের নামও ছিল।

খালিদের সংগে যুদ্ধ পরিত্যাগ করে ইকরামা শহরে গোপন আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলমানদের সতর্ক অবস্থা কিছুটা শিথিল হলে সে পালিয়ে ইয়েমেনে চলে যায়। তার উদ্দেশ্য নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আবিসিনিয়ায় যাওয়ার। এদিকে ইকরামার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট স্বামীর পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করে। রাসূল (সা) তার প্রার্থনা মঞ্জুর করে ইকরামাকে ক্ষমা করেন। ইকরামার স্ত্রী অতি দ্রুত ইয়েমেনে গমন করে স্বামীর সাক্ষাৎ পায় এবং তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। মক্কায় ফিরে ইকরামা সোজা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে বলেন, "আমি সেই ব্যক্তি, যে ভুলের মধ্যে ছিল এবং এখন অনুশোচনা করছে। আমি ক্ষমা প্রার্থী।[৮৪] রাসূলুল্লাহ (সা) তার আনুগত্যকে কবুল করেন এবং ইকরামা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন।

সাফওয়ান বিন উমাইয়ার নাম যুদ্ধ অপরাধীর তালিকায় না থাকলেও সে জীবনের ভয়ে জেদ্দায় পালিয়ে যায়। তারও উদ্দেশ্য ছিল, লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নেয়া। তার এক বন্ধু রাসূল (সা)-এর নিকট তার প্রাণ ভিক্ষা চায়। সাফওয়ানের প্রাণ নাশের কোনো পরিকল্পনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ছিল না বরং তিনি সাফওয়ানের প্রত্যাবর্তনকে আনন্দচিত্তে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। বন্ধুর প্রচেষ্টায় সাফওয়ান ফিরে আসে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

---

৮২. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪১২।
৮৩. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪১৭, কুরআন - ১৭ ঃ ৮১।
৮৪. ওয়াকিদী ঃ মাগাযী, পৃষ্ঠা - ৩৩২।

তবে তার এই আনুগত্য প্রকাশ ছিল ব্যক্তিক ও রাজনৈতিক। ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মনস্থির করার জন্য সে রাসূলের নিকট দু'মাস সময় প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে চার মাস সময় প্রদান করেন।

যুদ্ধ অপরাধীদের মধ্যে মাত্র তিনজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে হত্যা করা হয়। হিন্দসহ বাকিদেরকে ক্ষমা করা হয়। হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

কাবার মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) আশেপাশের মন্দিরের মূর্তিগুলো ধ্বংস করার জন্য ছোট ছোট অভিযান পরিচালনা করেন। খালিদ (রা)-কে নাখলায় প্রেরণ করা হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবী উয্‌যাকে ধ্বংস করার জন্য। তাঁর সংগে ছিল ৩০ জন অশ্বারোহী।[৮৫]

নাখলায় দুটো উয্‌যা ছিল। একটি আসল ও একটি নকল। খালিদ (রা) নকল উয্‌যাকে পেয়ে ধ্বংস করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দায়িত্ব সমাপনী প্রতিবেদন প্রদান করেন। "তুমি কি অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছিলে" রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন। না। "তাহলে তুমি আসল উয্‌যাকে ধ্বংস করতে পারনি। পুনরায় নাখলা গমন করো।" রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন।

স্বীয় ভুলে ক্ষিপ্ত খালিদ (রা) পুনরায় নাখলা গমন করেন এবং প্রকৃত উয্‌যার সন্ধান পান। উয্‌যার হেফাজতকারী প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যায় এবং পলায়নের পূর্বে দেবীর গলায় একটি তরবারি ঝুলিয়ে রাখে এই আশায় যে, হয়তো সে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। খালিদ (রা) মন্দিরে প্রবেশের সংগে সংগে একজন উলংগ কালো মহিলা তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ায় এবং বিলাপ শুরু করে। মহিলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাথা না ঘামিয়ে খালিদ (রা) তরবারির এক শক্তকোপে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন। তারপর তিনি মূর্তিটি ধ্বংস করে মদীনায় ফিরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট স্বীয় অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেন। সব শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে প্রকৃত উয্‌যা। এরপর তোমার জন্মভূমিতে আর কেউ তার পূজা করতে পারবে না।"[৮৬]

মক্কায় সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করার পর ৬৩০ খৃস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি অথবা কিছু আগে-পরে বনী জাযীমায় একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার আশেপাশে বসবাসকারী গোত্রগুলোর নিকট ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বেশকিছু দল প্রেরণ করেন। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, যারা দাওয়াত গ্রহণ করবে তাদের সংগে কোনো লড়াই নয়। এক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইচ্ছা ছিল রক্তপাত এড়ানোর।

---

৮৫. এক নাখলা উপত্যকা বর্তমানে ওয়াদী-উল-ইয়ামানিয়া নামে পরিচিত এবং মক্কা হতে তায়েফগামী প্রধান সড়কটির উপর দিয়ে গেছে এবং আর এক নাখলা, যেখানে উয্‌যা ছিল, সেটি ওয়াদী-উল-ইয়ামানিয়ার উত্তরে অবস্থিত। এটি বর্তমান বির-উল-বাখা হতে ৪/৫ মাইল দক্ষিণে।

৮৬. ইবনে সাদ, পৃষ্ঠা - ৬৫৭

মক্কার দক্ষিণে তিহামা এলাকায় গমনকারী দলটির নেতৃত্বে ছিলেন খালিদ (রা)। তাঁর দলে বিভিন্ন গোত্রের মোট ৩৫০ জন অশ্বারোহী ছিল। এদের অধিকাংশ ছিল বনী সুলায়ম গোত্রের, যাদের কজন ছিল আনসার। এই দলটির গন্তব্য ছিল মক্কার ৫০ মাইল দূরবর্তী ইয়ালামলাম (৪ নং ম্যাপ দ্রষ্টব্য)।

ইয়ালামলামের পথে মক্কার ১৫ মাইল দূরে আল-ঘুমেসায় পৌঁছে খালিদ বনী জাযীমা গোত্রের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই গোত্রের লোকেরা মুসলিমগণকে দেখেই হাতে অস্ত্র তুলে নেয় এবং একই সময়ে বলে, "আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, নামায কায়েম করেছি এবং একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছি।"

"তাহলে হাতে অস্ত্র কেন ?" খালিদ (রা) জিজ্ঞেস করেন।

"আরবের কোনো কোনো গোত্রের সংগে আমাদের বৈরিতা আছে এবং তাদের নিকট হতে আমাদেরকে আত্মরক্ষা করতে হবে।" খালিদ (রা) নির্দেশ দিলেন, "তোমরা অস্ত্র ত্যাগ করো। সব লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে, কাজেই তোমাদের আর অস্ত্র বহন করার দরকার নেই।"

বনী জাযীমা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি চিৎকার করে তার সংগীদেরকে বলে, "এই লোকটি হচ্ছে আল-ওয়ালীদের পুত্র খালিদ। তার ব্যাপারে সাবধান। অস্ত্র সমর্পণ করলে সে তোমাদের হাত বেঁধে ফেলবে এবং তারপর সবার মস্তক ছিন্ন করবে।"[৮৭]

খালিদের গোত্র ও বনী জাযীমার মধ্যে দীর্ঘদিনের বৈরিতা ছিল। ইসলামপূর্ব যুগে কোরেশদের একটি বাণিজ্যদল ইয়েমেন হতে ফেরার পথে বনী জাযীমার লোকেরা তাদের উপর চড়াও হয়ে সম্পদ লুট করে এবং দু'জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করে। এদের একজন আবদুর রহমান বীন আউফের পিতা আউফ ও অন্যজন খালিদের চাচা আল-মুগীরার পুত্র ফাকিহা। পরবর্তীকালে আবদুর রহমান তার পিতার হত্যাকারীর প্রাণ বধ করে পিতার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হন। কিন্তু ফাকিহার রক্তের প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব হয়নি। এসব ঘটেছিল অজ্ঞতার যুগে।

খালিদ (রা) সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণকারী লোকটির সংগে বনী জাযীমার লোকেরা দ্বিমত পোষণ করে। তারা বলে, "তুমি কি চাও, আমরা সবাই একসংগে নিহত হই? সকল গোত্রের লোকেরা অস্ত্র ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।"[৮৮] একটি সংক্ষিপ্ত বাদানুবাদের পর গোত্রটি অস্ত্র সমর্পণ করে।

বনী জাযীমার লোকেরা অস্ত্র সমর্পণের পর যে ঘটনাটি ঘটে তার কারণ পরিষ্কার নয়। সম্ভবত খালিদ (রা) ক্ষণিকের জন্য অজ্ঞতার যুগের গোত্রীয় প্রতিশোধ প্রবণতার মাঝে ফিরে গিয়েছিলেন (খালিদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন মাত্র ক'মাস পূর্বে) অথবা

---

৮৭. ইবনে সাদ, পৃষ্ঠা - ৬৫৯-৬০, ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা- ৪২৯

৮৮. ইবনে সাদ, পৃষ্ঠা - ৬৫৯-৬০, ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪২৯

তিনি বনী জাযীমার লোকদের সত্যধর্ম গ্রহণের ঘোষণাকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। তারা অস্ত্র সমর্পণ করলে খালিদ (রা) তার যোদ্ধাগণকে তাদের হাত পিছনে বাঁধার নির্দেশ দান করেন এবং হাত বাঁধা হলে সকলকে হত্যা করার হুকুম দেন। ভাগ্যক্রমে শুধু বনী সুলায়মের লোকেরা এই নির্দেশটি পালন করে এবং শুধু তাদের হাতে বন্দীদেরকে হত্যা করে যার সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। খালিদের সংগী অন্যান্য গোত্রের লোকেরা এই নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। উমরের পুত্র আব্দুল্লাহ এবং আবু কাতাদার নিকট হতে তীব্র প্রতিবাদ আসে। কিন্তু খালিদ (রা) তা কর্ণপাত করেননি। উপায় না পেয়ে আবু কাতাদা দ্রুত মক্কায় পৌঁছে খালিদ (রা)-এর কীর্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবহিত করেন।

এই খবর শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) আতংকিত হয়ে ওঠেন। তিনি আকাশের দিকে হাত তুলে আর্তচিৎকার করে ওঠেন, "হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে তার জন্য আমি দায়ী নই।"[৮৯] তিনি সংগে সংগে আলী (রা)-কে প্রচুর অর্থ দিয়ে প্রেরণ করেন বনী জাযীমার লোকদেরকে সান্ত্বনা দান ও তাদের রক্তের বদলা প্রদান করার জন্য। আলী (রা) অত্যন্ত মহানুভবতার সংগে এই দায়িত্ব পালন করেন এবং বনী জাযীমার লোকেরা সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন।

খালিদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে হাজির করা হয় জবাবদিহি করার জন্য। খালিদ (রা) জানান যে, বনী জাযীমার লোকদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণাকে তিনি সত্য হিসেবে ধরে নিতে পারেননি এবং ভেবেছিলেন যে, তারা প্রতারণা করছে। তাই তাদেরকে হত্যা করাটা সঠিক মনে করেই করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশে ছিলেন আবদুর রহমান বিন আউফ। তিনি খালিদের জবাব শুনে মন্তব্য করেন, "তুমি ইসলামের আলোর যুগে অজ্ঞতার কাজ করেছো।"

খালিদ (রা) এই নাজুক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের পথ পেয়েছেন ভেবে বলেন, "কিন্তু আমিতো তোমার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি।" আবদুর রহমান সংগে সংগে উত্তর দেন, "তুমি সঠিক বলোনি। আমি বহু পূর্বেই আমার পিতার হত্যাকারীকে বধ করে আমার পরিবারের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছি। প্রকৃতপক্ষে তুমি তোমার চাচা ফাকিহা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের মানসেই বনী জাযীমার লোকদেরকে হত্যার নির্দেশ দান করেছিলে।"

দু'জনের বাদানুবাদ উত্তপ্ত রূপ লাভ করে। এক্ষেত্রেও খালিদের বাড়াবাড়ি হয়। কেননা, আবদুর রহমান (রা) ছিলেন 'সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের' একজন। ফলে তাঁর অবস্থান এতো মজবুত ছিল যে, খুব কম সংখ্যক লোকই তা চ্যালেঞ্জ করতে

---

৮৯. ইবনে সাদ পৃষ্ঠা - ৬৫৯-৬০, ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪২১।

পারতো। দু'জনের বাদানুবাদ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা) হস্তক্ষেপ করে কঠোরভাবে বলেন, "আমার সংগীকে ছেড়ে দাও, ওহে খালিদ! তুমি যদি পর্বতসমান স্বর্ণের মালিক হও এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করো তবুও আমার সংগীদের মতো মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।"[৯০] রাসূলুল্লাহ (সা) অবশ্য এখানে ইসলামের প্রাথমিক যুগের সংগীদের কথা বলেছেন। কেননা খালিদও ছিলেন তাঁর সংগীদের একজন।

এভাবেই আলুাহর রাসূল খালিদের অবস্থান নির্দেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) খালিদ (রা)-কে ক্ষমা করেন। কিন্তু খালিদ (রা) একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেন যে, বিলম্বে ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে তিনি প্রাথমিক যুগের সাহাবীদের মতো বিশেষ করে সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের মতো মর্যাদার অধিকারী নন। ভবিষ্যতে অনেক ব্যাপারেই তাঁকে এই শিক্ষাটি মনে রাখতে হয়েছিল।

---

[৯০] ইবনে সাদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৩১।

হুনাইনের যুদ্ধ

মক্কা বিজয় সবেমাত্র সম্পন্ন হয়েছে। মক্কার অধিবাসিগণ তখনও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেনি এবং শহরের জীবনযাত্রাও স্বাভাবিক রূপ লাভ করেনি। এমন সময় পূর্বকোণ হতে যুদ্ধ প্রস্তুতির আওয়াজ ভেসে আসে। শক্তিশালী হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয়।

হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা বাস করতো মক্কার উত্তর-পূর্ব দিকে এবং সাকীফ গোত্রের লোকেরা তায়েফ এলাকায়। মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের পর হতে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং যে কোনো মুহূর্তে মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা করতে থাকে। অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হওয়ার চেয়ে তারা উদ্যোগী হয়ে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাতে প্রথম আঘাতকারী হিসাবে কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। গোত্র দু'টি হুনাইনের নিকটবর্তী আউতাসে একত্রিত হয়। এখানে তাদের সংগে পার্শ্ববর্তী এলাকার আরও কয়েকটি গোত্রের বেশ কিছু যোদ্ধা যোগদান করে। এখানেও ইসলামের শত্রুগণ খন্দকের যুদ্ধের মতো মিত্রবাহিনী গঠন করে। মিত্রবাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ১২,০০০ জনে[৯১] এবং তাদের কমান্ডার নির্বাচিত হয় ৩০ বছরের দুর্দান্ত যুবক মালিক বিন আউফ। এই যুবক সেনাপতি তার লোকদের সামনে এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায় যাতে তারা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করে। সে তাদের পরিবারের মহিলা, শিশু ও গবাদি-পশুগুলোকেও সংগে আনার নির্দেশ দান করে।

মিত্র বাহিনীতে দুরায়দ নামের একজন খুবই বিজ্ঞ সমরবিশারদ ছিল। বার্ধ্যক্যের কারণে যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার শক্তি হারিয়ে ফেললেও সে সবসময় তার গোত্রের বাহিনীতে যোগদান করতো। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং বিপুল অভিজ্ঞতার কারণেই যুদ্ধ সংক্রান্ত তার যে কোনো পরামর্শকে সবাই মূল্য দিতো। তার সামরিক প্রজ্ঞা ছিল অপরিসীম।

বিজ্ঞ দুরায়দ আউতাসে নারী, শিশু ও গবাদিপশুর শব্দ শুনতে পায়। সে যুবক মালিককে ডেকে জিজ্ঞেস করে, "আমি কেন উটের ডাক, ছাগলের ভ্যাঁ-ভ্যাঁ, নারীর চিৎকার ও শিশুর কান্না শুনতে পাই ?" মালিক উত্তর দেয়, "আমি সকলের পরিবারবর্গ ও গবাদিপশুসমূহকে সমবেত করতে বলেছি। ফলে প্রত্যেকটি সৈনিক তাদের পরিবার ও গবাদিপশুকে পিছনে রেখে অসীম সাহসিকতার সংগে যুদ্ধ করবে।"

---

৯১. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৩৮-৯।

জবাবে দুরায়দ বলে, "সৈনিক যুদ্ধ করে তরবারি ও বর্শা দিয়ে, নারী ও শিশু দিয়ে নয়। এদেরকে নিরাপদ দূরত্বে পাঠিয়ে দাও। আমরা জয়ী হলে তারা পরে আমাদের সংগে যোগদান করতে পারবে। আর আমরা পরাজিত হলে অন্তত তারা নিরাপদে থাকবে।"

মালিক দুরায়দের এই পরামর্শকে তার নেতৃত্ব ও যোগ্যতার প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে। সে প্রতিবাদ করে বলে, "আমি তাদেরকে দূরে পাঠাবো না। বয়সের কারণে তোমার মন ও মগজ দুর্বল হয়ে পড়েছে।" এই জবাব শুনে দুরায়দ নিশ্চুপ হয়ে যায়। মালিক তার অফিসারদের নিকট ফিরে গিয়ে বলে, "তোমরা আক্রমণ করবে, একক শক্তি হিসেবে। আর আক্রমণ শুরু হলে আমরা সমস্ত তরবারির কোষ ভেঙ্গে ফেলবো।" তরবারির কোষ ভেঙ্গে ফেলা হলো মরণপণ আক্রমণ শুরুর প্রতীক। আরবের লোকরা এটার অনুশীলন করতো।

শুধু হাওয়াযিনের লোকেরা তাদের পরিবারবর্গ ও গবাদিপশু যুদ্ধ ক্ষেত্রে এনেছিল। অন্যান্য গোত্র এই আদেশ অমান্য করেছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আর কোনো রক্তপাতে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নতুন শত্রুর মুকাবিলা করা ছাড়া আর কোনো বিকল্পও ছিল না। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে খন্দকের যুদ্ধের মতো আর একটি বড় ধরনের মোর্চা গঠনের সুযোগ দিতে চাচ্ছিলেন না। তাছাড়া তিনি মক্কায় প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে থাকলে এবং শত্রু আউতাসে অবস্থান নিয়ে তৎপরতা চালাতে থাকলে যে সার্বিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এবং এতো সময় অপচয় করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। মক্কা বিজয়ের প্রভাব আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকদের মনে সজীব থাকতে থাকতেই তাদের সংগে আলাপ-আলোচনা চালানো ও অন্যান্য সাংগঠনিক তৎপরতার তদারক করা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য খুব জরুরী হয়ে পড়েছিল। আউতাসে আক্রমণমুখী শত্রু সমাবেশকে উপেক্ষা করে তা করা সম্ভব হচ্ছিল না। এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের প্রতি যে কোনো ধরনের হুমকিই আরবদের মনে মক্কা বিজয়ের প্রভাবকে ক্ষুণ্ন করতে পারে। তাই এই হুমকিকে মুকাবিলা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তিনি মক্কা থেকে অগ্রসর হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৬৩০ খৃস্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি (৬ই শাওয়াল, ৮ হিজরী) মুসলিম বাহিনী মক্কা ত্যাগ করে। ১০,০০০ মক্কাবিজয়ী যোদ্ধা ও মক্কার ২০০০ নবদীক্ষিত মুসলমানের সমন্বয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়। নওমুসলিমগণের অন্তরে ইসলামের শাশ্বত মূল্যবোধ দৃঢ়তার সংগে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় না পাওয়ার কারণে তাদের যুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত ছিল অনেকটা স্রোতে গা-ভাসানোর মতোই। তাই তাদের নির্ভরযোগ্যতা সন্দেহমুক্ত ছিল না। তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান ও সাফওয়ান বিন উমাইয়াও ছিল। সাফওয়ানকে ইসলাম সম্পর্কে মনস্থির করার জন্য চার মাস সময় দেয়া হয়েছিল, কিন্তু সে এর মধ্যেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং মুসলমানদেরকে আসন্ন যুদ্ধের জন্য ১০০টি বর্ম ধার দেয়।

খালিদ (রা)-এর অধীনে বনী সুলায়ম গোত্রের ৭০০ যোদ্ধার একটি দল মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রার নেতৃত্ব দেয়। ৩১শে জানুয়ারি সন্ধ্যার দিকে মুসলিম বাহিনী হুনায়ন উপত্যকায় পৌঁছে ক্যাম্প স্থাপন করে।

হুনায়ন উপত্যকাটির বিস্তৃতি মক্কার ১১ মাইল পূর্ব-উত্তর-পূর্বদিকে শারাই-উল-মুজাহিদ (নতুন) হতে আরও ৭ মাইল পূর্ব দিকে শারাই-নাখলা (পুরাতন) পর্যন্ত। এ পর্যন্ত উপত্যকাটি অধিকাংশ স্থানেই প্রায় দু'মাইল প্রশস্ত। উপত্যকাটি এর পরও পূর্বদিকে আরও ৭ মাইল বিস্তৃত হয়ে উত্তরে জেইমার দিকে মোড় নিয়েছে (এই স্থানগুলোর কোনটাই তখন ছিল না)। কিন্তু এই এলাকাটুকু কোথাও আধামাইল এমনকি কোথাও সিকি মাইল প্রশস্ত। হুনায়ন উপত্যকার এই অংশটি একটি গিরিপথ হিসেবে জেইমায় মিলিত হয়েছে। জেইমার পরে তায়েফের রাস্তা ওয়াদি নাখলাত-উল-ইয়ামানিয়ার মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা হয়ে চলে গেছে (৬ নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য)।

উভয়পক্ষই একে অপরের শক্তি, অবস্থান ও গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপক গোয়েন্দাগিরি চালাতে থাকে। হুনায়নের পথে মুসলিম বাহিনীর যাত্রা চলাকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রেরিত একজন গোয়েন্দা আউতাসে হাওয়াযিন গোত্রের যোদ্ধাদের সংগে মিশে যায় এবং মিত্রবাহিনীর প্রকৃত সংখ্যা জেনে আবার গোপনে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

মুসলিম বাহিনীর হুনায়ন উপস্থিতির খবর মালিক বিন আউফ তার গোয়েন্দাদের নিকট হতে পেয়ে গিয়েছিল। সে অনুমান করলো যে, মুসলিমগণ জানে তার বাহিনী আউতাসে অবস্থান নিয়ে আছে এবং ঐ এলাকার আশেপাশেই যুদ্ধ সংঘটিত হবে। অতএব তারা আউতাসের দিকেই অগ্রসর হতে থাকবে। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সে মুসলিম বাহিনীকে ফাঁদে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৬৩০ খৃস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি (১১ই শাওয়াল, ৮ হিজরী) ভোর হওয়ার পূর্বেই মুসলিম বাহিনী আউতাসে শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য অভিযান শুরুর উদ্যোগ নেয়। তাদের লক্ষ্য ছিল শত্রু বুঝতে পারার পূর্বেই হুনায়ন গিরিপথ অতিক্রম করা। এবারেও মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তী দলে ছিল খালিদ (রা)-এর নেতৃত্বে বনী সুলায়ম গোত্রের সেই ৭০০ যোদ্ধা এবং পেছনে ছিল ২০০ মক্কাবাসীসহ অন্যান্য দল। হুনাইয়ের ক্যাম্পকে রাখা হয় অপারেশনের বেস হিসেবে।

পুব আকাশে আলোর প্রথম আভা দেখা দেয়ার সংগে সংগে মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তী দল জেইমার দুই মাইল পূর্বে গিরিপথে প্রবেশ করে। আউতাসে অপ্রস্তুত শত্রুর উপর আকস্মিক হামলা করার বাসনা নিয়ে খালিদ (রা) দ্রুত পা ফেলতে থাকেন। আর ঠিক এই মুহূর্তেই যেন বজ্রপাত ঘটে যায়। ওতপেতে থাকা শত্রুর প্রথম আঘাতটি খালিদ (রা)-এর উপরই আসে। শত্রুর অযুত কণ্ঠের গগণবিদারী শব্দে ভোরের নিস্তব্ধতা ভেংগে খান খান হয়ে যায় এবং বৃষ্টির মতো শত শত তীর

মুসলিম বাহিনীর উপর নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। তীরগুলো শাঁ শাঁ শব্দে এসে ঘোড়া ও মানুষের দেহে বিদ্ধ হতে থাকে। বনী সুলায়ম শত্রুর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে দ্রুত পলায়ন করতে থাকে। দৃঢ়তার সংগে শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য খালিদ (রা)-এর আহ্বান হৈ চৈ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ডুবে যায়। ভীষণভাবে আহত অবস্থায় খালিদ (রা) নিজেও পলায়নপর মানুষ ও ঘোড়ার স্রোতে পড়ে কিছুদূর চলে যান। এক সময় তিনিও ঘোড়া হতে পড়ে যান এবং আঘাতের কারণে নড়াচড়া করতে না পারায় সেখানেই পড়ে থাকেন।

ভীত-সন্ত্রস্ত পলাতক বনী সুলায়মের যোদ্ধারা তাদের পশ্চাদগামী অন্যান্য মুসলিম দলের মধ্যে ঢুকে পড়লে সকলে বুঝতে পারে যে, সামনে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে। মক্কাবাসী দুর্বল চিত্তের যোদ্ধাগণ ও আরও কিছু ক্ষুদ্র দল এই পলায়নপর যোদ্ধাদের সংগে যোগদান করে। সামান্য কিছু মুসলিম ক্যাম্পে ফিরে যায়, কিন্তু অধিকাংশই শত্রুর ওতপেতে থাকার এলাকা থেকে কিছু দূরে গিরিপথের উভয় পার্শ্বে আড়ালে অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের কেউ জানতো না আসলে কি ঘটেছে। উট, ঘোড়া ও মানুষ দিশেহারা অবস্থায় পলায়নের জন্য একে অপরকে ডিংগিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকলে দ্বিধাদ্বন্দ্ব আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মুসলিম বাহিনীর পরিকল্পনা ছিল মালিক বিন আউফকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করার, কিন্তু তারাই এখন আকস্মিক আক্রমণে দিশেহারা। মালিক রাতের বেলা তার বহিনীকে হুনায়ন গিরিপথের উভয়পার্শ্বে পাহাড়ের ফাটল ও বড় বড় প্রস্তর খণ্ডের আড়ালে মোতায়েন করে রাখে। সামনে ছিল হাওয়াযিন গোত্রের যোদ্ধাগণ। তাদের পিছনে ছিল সাকীফ ও তারও পিছনে অন্যান্য গোত্রের লোকজন। মালিক একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং কৌশলগত কারণে রাতের অন্ধকার না আসা পর্যন্ত তার বাহিনীর চলাচল স্থগিত রাখে। সে প্রতিপক্ষকে এমন একটা ধারণা দিতে চায় যে, তার বাহিনী এখনও আউতাসে অবস্থান নিয়ে আছে। রাতের অন্ধকারে ওতপাতা সম্পন্ন করে সে মুসলিম বাহিনীর গিরিপথে প্রবেশ ও আকস্মিক আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। তার পরিকল্পনা ছিল মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করা অথবা ভীত-সন্ত্রস্ত করে মক্কায় তাড়িয়ে দেয়া। পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে পিছন দিয়ে পালানোর মতো একটি রাস্তাও[৯২] মালিক ঠিক করে রেখেছিল। এই পথটি মালিকের নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর পক্ষে আউতাসের ঘাঁটি আক্রমণ করার কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না।

মুসলিম বাহিনীর এই বিপদ দেখে তাদের সঙ্গে যোগদানকারী মক্কার অধিকাংশ নওমুসলিম উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আবু সুফিয়ান মন্তব্য করে, "মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদপসরণ সমুদ্রে পতিত না হওয়া পর্যন্ত চলবে।" সাফওয়ান বিন উমাইয়ার জনৈক ভাই মন্তব্য করে, "মুহাম্মদের জাদুর কেরামতী এখন ফাঁস হয়ে যাবে।"

---

৯২. ম্যাপে এই পথটি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। সম্ভবত পথটি ছিল জেইমের আশপাশ দিয়ে।

সাফওয়ান তাকে থামিয়ে বলে, "আল্লাহ তোমার সুখকে ধ্বংস করে দিক। আমি মনে করি হাওয়াযিন গোত্রের কারও দ্বারা শাসিত হওয়ার চেয়ে কোরেশ বংশের যে কোনো ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নেয়া ভাল।"[৯৩]

রাসূলুল্লাহ (সা) আলী, আবু বকর, উমর এবং আব্বাসসহ নয়জন সংগী নিয়ে একটি পায়েচলা পথের উপর দাঁড়িয়েছিলেন। মুসলিমগণ তাঁর পাশ দিয়ে পলায়ন করতে থাকলে তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন, "ওহে মুসলিমগণ! আমি এখানে। আমি আল্লাহর নবী, মিথ্যা নয় তা; আবদুল মুত্তালিবের বংশধর, আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ।[৯৪] কিন্তু তার চিৎকার কোনো কাজে আসে না।

হাওয়াযিন গোত্রের অগ্রবর্তী কয়েকজন যোদ্ধা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছাকাছি এসে উপস্থিত হলে আলী (রা) তাদের একজনকে ধরাশায়ী করে ফেলেন। সেই ছিল হুনায়নের যুদ্ধে নিহত প্রথম কাফির। লোকটি একটি লাল উটের পিঠে চড়ে হাতে একটি দীর্ঘ বল্লম নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল যার ডগায় ছিল একটি পতাকা। এই লোকটি পলায়নপর মুসলিমগণকে ধাওয়া করতে থাকলে আলী তাকে পিছন থেকে ধরাশায়ী করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর পর সংগীগণসহ সামনে অগ্রসর হয়ে বাম দিকে ঘুরে একটি খাড়া পাহাড়ের আড়ালে অবস্থান গ্রহণ করেন। সাকীফ গোত্রের কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে অগ্রসর হলে তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়।

মালিক বীন আউফ মুসলিম বাহিনীকে এতটুকু বিপর্যস্ত করতে সক্ষম হয় যা অন্য কেউ এর পূর্বে করতে পারেনি। মুসলিমদের জন্য এটাই ছিল ফাঁদে পড়ার প্রথম ও তিক্ত অভিজ্ঞতা। ফলে তাদের অনেকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে। কিন্তু সাহসী যোদ্ধাগণ এরূপ পরিস্থিতিতেও ভীত-সন্ত্রস্ত হয় না।

মালিক অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সাথেই আক্রমণটি রচনা করেছিল। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে, তার সৈনিকগণ আশানুরূপ দক্ষতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়। তারা মুসলিম বাহিনীর প্রধান অংশের ফাঁদ এলাকায় প্রবেশ করা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে শুধু সম্মুখবর্তী দলকে অস্ত্রের নাগালের মধ্যে পেয়ে আক্রমণ করে বসে। পরবর্তী ভুলটি ঘটে স্বয়ং মালিকের দ্বারা। সে সামরিক সাফল্যে তৃপ্ত হয়ে পলায়নপর মুসলিম বাহিনীকে ধাওয়া করা থেকে বিরত থাকে। তা' না করলে এ যুদ্ধের ইতিহাস অন্যরকম হতো। তদুপরি হাওয়াযিনদের তীর চালনার দক্ষতা ছিল অত্যন্ত কম। এই যুদ্ধে মাত্র কয়েকজন মুসলিম ও তাদের বাহন (উট ও ঘোড়া) আহত হয়েছিল, কিন্তু কোনো প্রাণহানি ঘটেনি।

রাসূলুল্লাহ (সা) গোটা পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করে সম্ভাবনার আলো দেখতে পান। তিনি মালিকের এই সহজ ও তাৎক্ষণিক বিজয়ের আনন্দ নিয়ে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মুসলিমগণকে তাঁর চারদিকে সমবেত হওয়ার

---

৯৩. ইবনে হিশাম ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৪৩-৫।

৯৪. ইবনে হিশাম ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৪৩-৫।

আহ্বান জানানোর জন্য আব্বাসকে নির্দেশ দেন। আব্বাস ছিলেন একজন বিশাল আকৃতির মানুষ। বলা হয় যে, তাঁর কণ্ঠ এতো জোরালো ছিল যা কয়েক মাইল দূর থেকেও শোনা যেতো। তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে আহ্বান জানাতে থাকেন, "হে মুসলিমগণ! তোমরা আল্লাহর রসূলকে ফেলে কোথায় যাচ্ছ। তিনি এখানে, তাঁর নিকট একত্রিত হও।" তিনি প্রতিটি গোত্রকেই সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান।

এই আহ্বান প্রায় প্রতিটি মুসলমানের নিকট পৌঁছে যায় এবং তারা সংগে সংগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশে সমবেত হতে থাকে। প্রথমে শত খানেক লোক একত্রিত হওয়ার সংগে সংগে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে প্রতিআক্রমণের নির্দেশ দান করেন। তারা সংগে সংগে নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থানকারী হাওয়াযিনদের উপর আক্রমণ চালায় এবং তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করে। অল্প সময়ের মধ্যে সমবেত মুসলিমের সংখ্যা হাজারে পৌঁছে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) হাওয়াযিনদের উপর সর্বাত্মক আক্রমণের নির্দেশ দান কারেন।

এখন মালিকের বিস্মিত হওয়ার পালা। কেননা নিশ্চিত বিজয়ের আনন্দে অভিভূত সেনাপতি যদি ব্যাপক আক্রমণের সম্মুখীন হয় তার বিস্মিত না হয়ে উপায় কি? পরিস্থিতি এমন হয় যে, হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আর মুসলমানরাও চাচ্ছিল এটাই। কেননা সম্মুখ যুদ্ধের তরবারি চালনায় তাদের দক্ষতা সর্বজনবিদিত এবং এই দক্ষতার ফলে তারা যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম। হাওয়াযিনগণ ক্রমান্বয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে হাওয়াযিনগণ ব্যাপক হারে ধরাশায়ী হতে থাকলে রাসূলুল্লাহ (সা) দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র মুহাম্মদ প্রকৃতই আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।" তিনি তাঁর পাশে দাঁড়ানো যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বলেন, এটাই উপযুক্ত সময় চূড়ান্ত আঘাত হানার।[৯৫]

পরিস্থিতির প্রতিকূলতা বিবেচনা করে মালিক তার বাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হাওয়াযিনদের কিছু পিছনেই সাকীফ গোত্রের যোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছিল। তাদেরকে পশ্চাদরক্ষী হিসেবে ব্যবহার করে মালিক হাওয়াযিনদেরকে নিরাপদ দূরত্বে প্রত্যাহার করে নেয়। মুসলিমগণ সামনে অগ্রসর হয়ে সাকীফ গোত্রের যোদ্ধাদের মুকাবিলা করে তাদের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করার পর সাকীফ গোত্রের যোদ্ধারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মালিকের সংগে যোগদানকারী অন্যান্য গোত্রও, যাদের অনেকে আদৌ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, সাকীফের লোকদেরকে অনুসরণ করতে থাকে। ইতিমধ্যে মালিক হাওয়াযিনদেরকে নিরাপদে গিরিপথটিতে নিয়ে মোতায়েন করে এবং একটি প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। কেননা এই গিরিপথটিকে রক্ষা করতে পারলে তাদের পরিবার এবং গবাদিপশুগুলো নিরাপদ থাকবে।

---

৫. ইবনে সাদ ঃ পৃষ্ঠা - ৬৬৫।

মুসলিম বাহিনী যে শুধু ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি সামলিয়ে উঠেছে তাই নয়, বরং তারা প্রতিআক্রমণ করে শত্রু বাহিনীকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছে। এটা ছিল তাদের কৌশলগত বিজয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

যুদ্ধের প্রথম পর্যায় অতিক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিম বাহিনীর গুটিকয়েক পলাতক বাদে সকল যোদ্ধাকে পুনরায় একত্র করেন এবং অনুকূল পরিস্থিতির সমস্ত সুযোগ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি একটি শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনী সংগঠিত করে সম্মুখে পাঠিয়ে দেন যাতে মালিক হাওয়াযিনদেরকে পুনরায় সংগঠিত করার সুযোগ না পায়। বনী সুলায়মসহ বেশ কয়েকটি দল এই অশ্বারোহী বাহিনীতে যোগ দেয়। এর পূর্বেই খালিদ (রা) বনী সুলায়ম গোত্রের যোদ্ধাদের উপর তার নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। খালিদ অবশ্য মুসলিম বাহিনীর প্রতিআক্রমণে যোগদানের সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কেননা তিনি বনী সুলায়ম গোত্রের পলায়নের স্রোতের চাপে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রতিআক্রমণের পর্যায় শেষ হলে পবিত্র রাসূল (সা) তাঁর নিকট গিয়ে ক্ষত স্থানে ফু'দিলে তিনি সুস্থ বোধ করেন এবং উঠে দাঁড়ান। তারপর তিনি বনী সুলায়ম গোত্রের উপর পুনরায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

এই পুনর্গঠিত বাহিনীর কমান্ডার মনোনীত করা হয় যুবায়র ইবনুল আওয়ামকে। তিনি উপত্যকাটি ধরে অগ্রসর হয়ে গিরিপথে মালিকের মুকাবিলা করেন। একটি সংক্ষিপ্ত ও ক্ষীপ্র সংঘর্ষের পর মালিক গিরিপথটি ছেড়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। গোটা উপত্যকাটিই এখন মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে। রাসূলুল্লাহ (সা) যুবায়রের নেতৃত্বে অশ্বারোহী বাহিনীকে এই গিরিপথটি পাহারা দেয়ার জন্য মোতায়েন করেন যাতে হাওয়াযিনদের সম্ভাব্য প্রতিআক্রমণ রোধ করা যায় এবং আবু আমিরের নেতৃত্বে অন্য একটি দলকে আউতাসে পাঠিয়ে দেন। হাওয়াযিনগণ গিরিপথ থেকে বিতাড়িত হয়ে আউতাসে তাদের পরিবারবর্গ ও গরাদি পশুকে রক্ষার জন্য ক্যাম্পের চারদিক দিয়ে অবস্থান নেয়। আউতাসে মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের ফলে ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হয়। আবু আমির সম্মুখ যুদ্ধে নয়জন শত্রুকে খতম করার পর দশম ব্যক্তির হাতে নিহত হন। আবু আমিরের মৃত্যুর পর তার চাচাতো ভাই আবু মুসা নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং হাওয়াযিনগণ আউতাস ছেড়ে পালিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। হাওয়াজিনদের ক্যাম্প মুসলিমদের দখলে এসে যায়। এমন সময় যুবেরের অশ্বারোহী বাহিনীও তাদের সংগে যোগদান করে। খালিদের অবস্থান ছিল এই অশ্বারোহী বাহিনীর সম্মুখভাগে।

যুদ্ধের এই পর্যায়ে শত্রু বাহিনীর বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সমঝোতা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যায়। হাওয়াযিন ও অন্যান্য গোত্র তাদের বিভিন্ন আস্তানায় চলে যায়। এই সময় মালিকের নেতৃত্বে সাকীফ গোত্রের যোদ্ধারা তায়েফে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং মুসলিম বাহিনীকে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হুনায়নের যুদ্ধের এখানেই সমাপ্তি।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো যে, এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষের হতাহতের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুবই কম। বেশ কয়েকজন আহত হলেও নিহতের সংখ্যা মাত্র ৪ জন। প্রতিপক্ষের তীরন্দাজদের অদক্ষতা এবং অপরপক্ষে মুসলিম যোদ্ধাদের দক্ষতা ও সাহসিকতাই হয়তো এর কারণ। মুসলিম যোদ্ধাদের কেউ কেউ একাই তিন-চারজন প্রতিপক্ষের সংগে লড়াই করে তাদেরকে একের পর এক হত্যা করতে সমর্থ হয়। ফলে অমুসলিমদের নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় সত্তর-এ। বিজ্ঞ দুরায়দ ছিল নিহতদের মধ্যে একজন, যে মালিককে তাদের পরিবারবর্গ দূরে রাখার ব্যর্থ পরামর্শ দিয়েছিল। আউতাসের শত্রু ক্যাম্প হতে মুসলমানগণ ৬০০০ নারী, শিশু ও ক্রীতদাসকে বন্দী করে এবং হাজার হাজার গবাদি পশু হস্তগত করে।[৯৬]

এই প্রথমবারের মতো মুসলিম বাহিনী একটি বড় অপারেশনে শত্রুর ফাঁদের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধের (ফাঁদের) ইতিহাসে এটাই ছিল দ্বিতীয় ঘটনা যাতে একটি সম্পূর্ণ বাহিনী আর একটি সম্পূর্ণ বাহিনীর পাতা ফাঁদে পড়েছিল (খৃস্টপূর্ব ২১৭ সালে রোমান সেনাপতি হানিবল লেক ট্রাসিমিনে প্রথম এরূপ ফাঁদ পেতেছিলেন)।

মালিক প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য একটি অত্যন্ত মেধাবী ও ক্রটিহীন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল। কিন্তু তার লোকদের অদক্ষতার কারণেই নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। তার লোকদের অদক্ষতা সত্ত্বেও হয়তো মালিক একটি ঐতিহাসিক বিজয় লাভে সক্ষম হতো যদি তার শত্রুপক্ষ মুসলিম বাহিনী না হতো। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরাজয় বরণ না করার দৃঢ় সংকল্প এবং নেতার উপর মুসলিম যোদ্ধাদের গভীর ও অকৃত্রিম বিশ্বাস তাদের নিশ্চিত পরাজয়কে জয়ে রূপান্তরিত করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) মালিকের মতো সীমিত জয়ে তৃপ্ত ছিলেন না বরং তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের অনুকূল পরিস্থিতিকে শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করে শত্রুকে ছত্রভংগ করে সমস্ত মালামালসহ তাদের গোটা ক্যাম্প দখল করেছিলেন।

এই প্রথমবারের মতো খালিদ (রা) আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। খালিদ (রা) সব সময় শত্রুকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করাকে গুরুত্ব দিতেন এবং এবারে তিনি নিজেই আক্রান্ত হয়ে পড়েন। অনাকাঙ্ক্ষিত জায়গায় অসময়ে শত্রুর আকস্মিক আর্বিভাবে তাঁর সাহসী যোদ্ধাগণও কিভাবে আতংকিত হয়ে পড়েছিল তাও দেখার সুযোগ তাঁর হয়। তিনি ভবিষ্যতে কখনও শত্রুর দ্বারা অজ্ঞাতে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নেন এবং তাঁর শত্রুর সে সুযোগ আর কখনও হয়নি।

---

৯৬. আউতাসের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে বর্তমানে কেউ নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারে না। তবে তা উপত্যকাটির মাঝেই হওয়ার কথা। কেননা যোদ্ধাগণ ছাড়াও তাদের পরিবারের ৬০০০ সদস্য ও হাজার হাজার গবাদি পশুর জন্য ক্যাম্প পাহাড়ের পাদদেশে বা ক্ষুদ্র ওয়াদিতে স্থাপন সম্ভব নয়। আমি এটাকে জেইমার কিছু উপরে স্থাপন করেছি। তবে তা অন্য কোথাও হতে পারে।

তায়েফ অবরোধ

রাসূলুল্লাহ (সা) শত্রুকে প্রথম হুনায়নে ছত্রভঙ্গ করেন এবং পরে তারা পিছু হটে আউতাসে একত্রিত হলে সেখান থেকেও বিতাড়িত করেন। তিনি মালিক বিন আউফকে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার জন্য কোনো সময় দিতে নারাজ। তাই তিনি আউতাসে হস্তগত যুদ্ধবন্দী ও গবাদি পশুগুলোকে প্রহরাধীনে জিরানায় পাঠিয়ে দেন এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সেখানেই নিরাপদে রাখার নির্দেশ দান করেন। পরদিনই তিনি তায়েফের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। কারণ মালিক আউতাস হতে বিতাড়িত হয়ে তায়েফে আশ্রয় নেয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর বাহিনী নিয়ে খুব সাবধানে পথ চলতে হয়। কেননা তিনি আর হুনায়নের ফাঁদে পড়ার অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চান না। তায়েফের অবস্থান ছিল একটি উঁচু মালভূমিতে এবং আউতাস থেকে এই মালভূমি পর্যন্ত রাস্তাটি ছিল পাহাড়ী এলাকার মধ্য দিয়ে। রাস্তার পাশে অনেক স্থানেই খাড়া পাহাড় দাঁড়িয়েছিল। এই রাস্তার যে কোনো স্থানেই ফাঁদ পাতা মালিকের মতো একজন ধূর্ত কমান্ডারের পক্ষে ছিল খুবই স্বাভাবিক।

রাসূলুল্লাহ (সা) আউতাস থেকে নাখলা উপত্যকা হয়ে দক্ষিণদিকে ঘুরে ওয়াদী-উল-মুলেহর মধ্য দিয়ে সামনে অগ্রসর হন। তিনি ওয়াদী-উপ করণ অতিক্রম করে তায়েফের ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে উপনীত হন। এ যাবত মুসলিম বাহিনীকে কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি এবং অগ্রবর্তী দলের নিকট হতেও তায়েফের বাইরে শত্রুর আনাগোনার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। মালিককে অতর্কিত হামলা করার মানসে রাসূলুল্লাহ (সা) যাত্রাপথ পরিবর্তন করে তায়েফের পূর্বদিকে নিখব ও সাদিয়ার মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত পাহাড়ী এলাকা ধরে অগ্রসর হতে থাকেন।[৯৭] এই

---

৯৭. ওয়াদী-উল-মুলেহ বর্তমান তায়েফ বিমান বন্দর ও সায়ল-উল-কাবীরের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত। ওয়াদী-উল-করণ তায়েফের ৭ মাইল দূর দিয়ে বর্তমান তায়েফ-মক্কা মহাসড়ককে অতিক্রম করেছে। সাদিরা তায়েফের ২৫ মাইল পূর্বদিকে তুরাবা সড়কের উপর অবস্থিত এবং নিখবের অবস্থান হলো তায়েফের মাত্র ৩ মাইল পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী ওয়াদী-উল-নিখবকে ওয়াদী-উল-নমল অর্থাৎ পিপীলিকার উপত্যকা বলা হতো। কুরআন শরীফের ২৭ নম্বর সূরার ১৬-৪৪ আয়াতে বর্ণিত আছে যে, সুলায়মান এই উপত্যকার মধ্য দিয়েই রাণী সাবার মুকাবিলা করার জন্য ইয়েমেনের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।

ভাবে তিনি শহরের পেছন দিক দিয়ে তায়েফে উপনীত হন। এই অভিযানে খালিদ (রা) বনী সুলায়ম গোত্রকে নিয়ে অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্ব দেন (৬ নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য)।

মালিক বিন আউফ স্বল্প অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কমান্ডার হলেও আকস্মিকভাবে ধরা পড়ার মতো ব্যক্তিত্ব নয়। হুনায়ন ও আউতাসে মুসলিম বাহিনীর হাতে চরমভাবে মার খাওয়ার পর সে পরবর্তী যুদ্ধটি খোলা মাঠে না লড়ে নিজের পছন্দ মতো জায়গায় লড়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিল। শেষ পর্যন্ত সে তার বাহিনীকে দেয়াল ঘেরা তায়েফ শহরের মধ্যে মোতায়েন করে এবং দীর্ঘ অবরোধ মুকাবিলা করার জন্য খুব দ্রুত পর্যাপ্ত মজুদ গড়ে তোলে। এখানেই সাকীফের লোকেরা তাদের সাহসী তরুণ জেনারেলের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর জন্য অপেক্ষ করতে থাকে।

মুসলিম বাহিনী ৬৩০ খৃস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি (১৫ই শাওয়াল, ৮ হিজরী) তায়েফে উপনীত হয় এবং ১৮ দিন ব্যাপী দীর্ঘ অবরোধের সূচনা করে। তায়েফে পৌঁছে তারা শহর বেষ্টনকারী দেয়ালের কাছা-কাছি ক্যাম্প স্থাপন করে। তাদের এই ভুলের সুযোগ গ্রহণ করে সাকীফ গোত্রের তীরন্দাজগণ। তাদের বৃষ্টির মতো তীরবর্ষণে বেশ কয়েকজন মুসলিম শাহাদত বরণ করেন। ক্যাম্প স্থানান্তর করে বর্তমানের ইবনে আব্বাস মসজিদের অবস্থানে নেয়া হয়। দুর্গে সকল প্রকার প্রবেশ ও পলায়ন বন্ধ করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল মোতায়েন করা হয়। এই অবরোধ অপারেশন পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় আবু বকরের উপর।

অবরোধ চলাকালীন সময়ে উভয় দলের মধ্যে অধিকাংশ সময় তীরযুদ্ধ চলতে থাকে। এই যুদ্ধে সাকীফের যোদ্ধারা কিছুটা সুবিধা ভোগ করে। কেননা তারা শহর বেষ্টনকারী দেয়ালের আড়ালে থেকে তীর চালাতে থাকে। অপরপক্ষে মুসলিমগণ ছিল খোলা আকাশের নিচে। ফলে প্রতিপক্ষের তীরের আঘাতে তাদের অনেকেই আহত হন। আবু বকরের পুত্র আব্দুল্লাহ তীরের আঘাতে আহত হয়ে শেষ পর্যন্ত শাহাদত বরণ করেন।

এই ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হয়। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) দু'জন মুসলিমকে ইয়েমেনের জুরাসে পাঠিয়েছিলেন অবরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে ব্যাপক শিক্ষা লাভের জন্য। এই দু'ব্যক্তির তায়েফ অবরোধ চলাকালে প্রত্যাবর্তন না করায় এই যুদ্ধে কোনো ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু সালমান ফারসী (রা) খন্দকের যুদ্ধের মতো আবার মুসলিম বাহিনীর উপকারে আসেন। পারস্যের অধিবাসী হিসেবে যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল অপেক্ষাকৃত অধিক। তাঁর পরামর্শ মুতাবিক মুসলমানগণ নিজের অবস্থানে থেকে শহরের মধ্যে পাথর নিক্ষেপের জন্য একটি গুলতি নির্মাণ করে। কিন্তু মুসলমানগণ গুলতির সাহায্যে পাথর নিক্ষেপে পেশাদার না হওয়ায় উল্লেখযোগ্য ফলাফল লাভে ব্যর্থ হয়।

ম্যাপ-৬ হুনাইন ও তায়েফ
উ
নাখলা
আওতাস
ওয়াদি নাখলা
জিরাণা
মক্কা
মিনা
আরাফাত
তায়েফ
নিখব
সাদিরা
* সে সময় ছিলনা
১ ইঞ্চি = ৮ মাইল
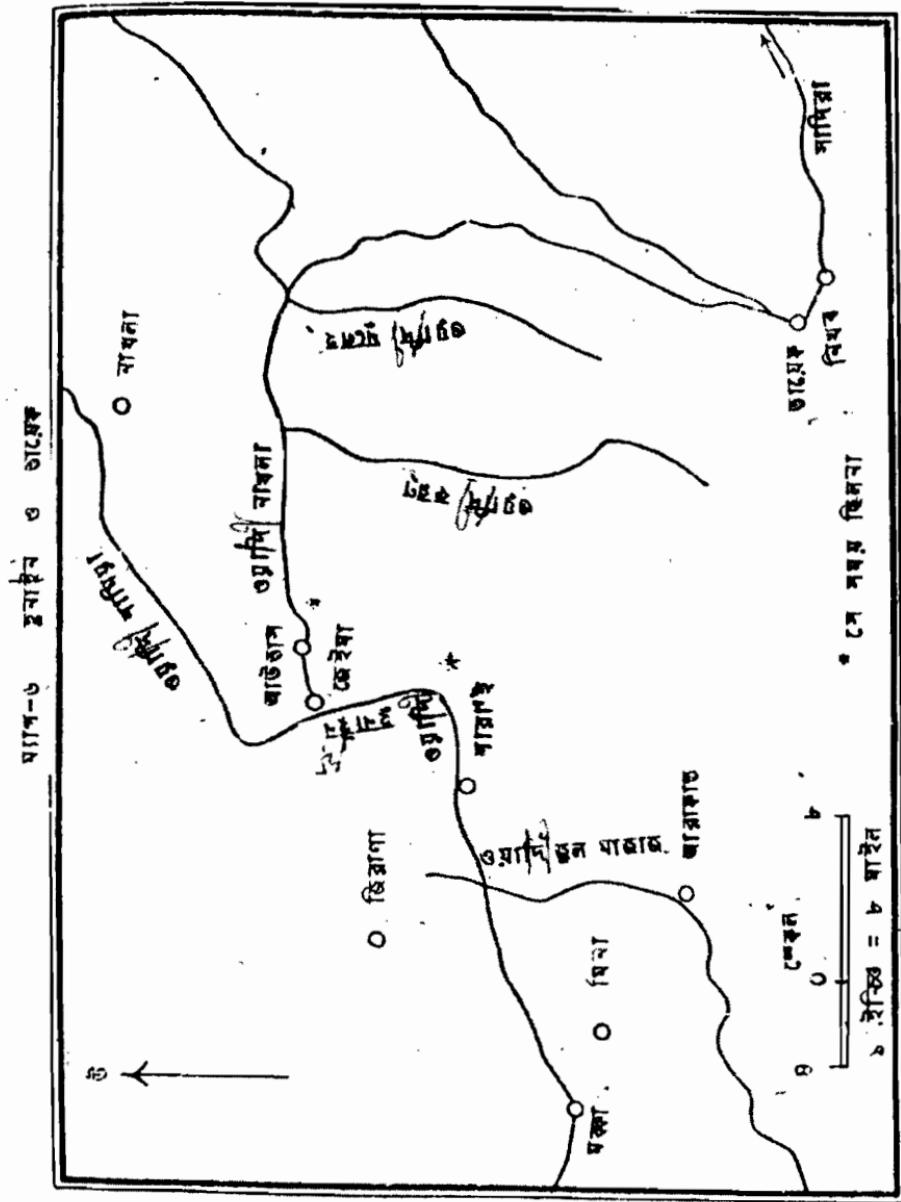
হযরত সালমান ফারসী (রা) পরবর্তীতে বিশেষ ধরনের ও বিশাল আকারের ঢাল (টেষ্টুত্তু) ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাধারণত কাঠ বা চামড়ার তৈরি এই বিশাল ঢালের আড়ালে একদল যোদ্ধা অবরুদ্ধ দুর্গ বা শহরের ফটক পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে সেটাকে ভেঙে ফেলার বা তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। সালমানের নির্দেশ মোতাবেক মুসলিমগণ গরুর চামড়া দিয়ে একটি ঢাল তৈরি করে এবং উক্ত ঢালের আড়ালে একদল যোদ্ধা তায়েফ নগরীর কাঠের ফটকে আগুন লাগানোর জন্য অগ্রসর হয়। তারা ফটকের নিকট পৌঁছামাত্র মালিক ও তার যোদ্ধারা গরম লোহার লাল টুকরো চামড়ার ঢালের উপর ফেলতে থাকে। লোহার গরম টুকরোগুলো চামড়া বিদ্ধ করে বহনকারীদের গায়ে পড়তে থাকে। ফলে ঢাল বহনকারী মুসলিম যোদ্ধাগণ দ্রুত তা ফেলে দিয়ে আত্মরক্ষার জন্য পিছু হটতে থাকে। এই সুযোগে সাকীফের লোকেরা তাদের উপর ব্যাপক তীর বর্ষণ করে এবং একজনকে শহীদ করতে সমর্থ হয়।

যুদ্ধ পরিস্থিতির অচলাবস্থা আরও দু'সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। এই সময়ে সাকীফের যোদ্ধাগণ শহরের বাইরে এসে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে এবং মুসলিমগণও কোন অর্থবহ আক্রমণ রচনায় ব্যর্থ হয়। তাদের শহরে প্রবেশের প্রত্যেকটি উদ্যোগই ব্যাপক তীর বর্ষণের মুখে পরিত্যক্ত হয়। অনুরূপ এক উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে আবু সুফিয়ানের একটি চোখ তীরবিদ্ধ হয় এবং বাকি জীবন সে একটি চোখ নিয়েই অতিবাহিত করেন।[৯৮]

অবরোধ চলাকালে আবহাওয়া ছিল খুবই খারাপ। তদুপরি ফেব্রুয়ারি মাসে তায়েফে ঠাণ্ডার প্রকোপও অত্যন্ত বেড়ে যায়। মুসলিম বাহিনী শহরের নিকটবর্তী আংগুর ক্ষেতের ক্ষতিসাধন করে সাকীফদেরকে দেয়ালের বাইরে আসতে বাধ্য করার চেষ্টা করে। কিন্তু সাকীফগণ দুর্গের নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে বাইরে আসা থেকে বিরত থাকে। মালিকের বুদ্ধিমত্তা এতো প্রখর ছিল যে, সে কোনো অবস্থাতেই প্রতিপক্ষকে সুবিধাজনক অবস্থানে রেখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত নয়। পরিস্থিতির অচলাবস্থা দূর করার জন্য শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর অফিসারগণকে নিয়ে পরামর্শে বসেন। তাঁদের একজন বলেন, "শিয়ালকে গর্তে ঢুকতে বাধ্য করে বাইরে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করলে তা ধরা সম্ভব। কিন্তু ঐ শিয়ালকে গর্তে রেখে চলে গেলে তা আর পরে ক্ষতি করার চেষ্টা করে না।"[৯৯] আবূ বকর (রা) মক্কা ফিরে যাবার পরামর্শ দেন এবং উমর (রা) তা সমর্থন করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষে তায়েফের পতনের জন্য অনির্দিষ্টকাল ধরে অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। কেননা এর চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি তাঁর

৯৮. কারও কারও মতে আবু সুফিয়ান তাঁর চোখ হারিয়েছিলেন ইয়ারমুকের যুদ্ধে, তায়েফে নয়।
৯৯. ইবনে সাদ, পৃষ্ঠা - ৬৭৫।

মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করে মক্কায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব দেন, কিন্তু কিছু অতি উৎসাহী মুসলিম এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্ররোচনা দান করতে থাকে। তাদের প্ররোচনার জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "তাহলে তোমরা আগামীকালই আক্রমণ রচনা করো।"[১০০]

পরদিন কিছু যুদ্ধ-পাগল মুসলিম যোদ্ধা তায়েফ দুর্গ বিজয়ের বাসনা নিয়ে আক্রমণ রচনা করে, কিন্তু সাকীফ গোত্রের তীরন্দাজদের তীরের ব্যাপক আক্রমণে পিছু হটতে বাধ্য হয়। এবারে তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে একমত হয় যে, শৃগালকে গর্তে রেখে যাওয়াই উত্তম।

৬৩০ খৃস্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি (৪র্থ যিকাদাহ, ৮ হিজরী) তায়েফ অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। এই অবরোধে ১২ জন মুসলিম যোদ্ধা প্রাণ দান করেন এবং বহুসংখ্যক আহত হয়। সাকীফগণ প্রতিরোধ অবস্থানেই অটল থাকে। অবরোধ প্রত্যাহারের দশ মাস পরে এই গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে একনিষ্ঠ বিশ্বাসী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে।

২৬শে ফেব্রুয়ারি জিরানায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সা) আউতাসে অর্জিত গনীমতের মাল সকলের মধ্যে বিতরণ করেন। তিনি মক্কাবাসী নওমুসলিমগণকেও গনীমতের মালের অংশ দান করেন, যদিও তারা অনেক বিলম্বে ইসলাম কবুল করেছিল। মালামাল বণ্টন শেষে নারী-শিশু ও পশু বিতরণ শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যে হাওয়াযিন গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপনীত হয়ে তাদের গোত্রের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে। এরপর প্রতিনিধিদল তাদের হৃত সম্পদ, নারী-শিশু ও পশুগুলোকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের হৃত সম্পদগুলো ফিরে পাওয়ার কথা নয়। কেননা ওগুলো তারা হারিয়েছিল অবিশ্বাসী হিসেবে, মুসলিম হিসেবে নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন অতিশয় মহানুভব। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমাদের নিকট কি তোমাদের নারী ও শিশুগণ অধিক প্রিয়, না সম্পদ।" উত্তরে তারা জানায়,"আপনি আমাদের নারী ও শিশুদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে বাকিগুলো রাখতে পারেন।"[১০১]

রাসূলুল্লাহ (সা) তার সৈনিকদের প্রতি আবেদন জানান নারী ও শিশুদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। প্রত্যেক সৈনিক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই আবেদনে সাড়া দিয়ে তাদের হাতে বন্দী হাওয়াযিন নারী ও শিশুদেরকে ফিরিয়ে দেয় শুধু সাফওয়ান বিন উমাইয়া ছাড়া। সে তার অংশ হিসেবে প্রাপ্য একটি বালিকাকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

---

১০০. ইবনে সাদ, পৃষ্ঠা - ৬৭৫।
১০১. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৮৯।

কয়েকদিন পর মালিক গোপনে তায়েফ দুর্গ ত্যাগ করে মুসলিম ক্যাম্পে উপস্থিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে প্রভূতভাবে পুরস্কৃত করেন। এটা অনেকটা দুঃখের বিষয় যে, এই চৌকশ যোদ্ধা পরবর্তী মুসলিম অভিযানগুলোতে কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার সুযোগ পাননি, যদিও তার নেতৃত্বের গুণাবলী ছিল আকর্ষণীয়।

রাসূলে আকরাম (সা) ৬৩০ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসের শেষার্ধে তাঁর বাহিনীসহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। সেই সংগে শেষ হয় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিজরতের অষ্টম বর্ষ। পরবর্তী বছরে আরবের অধিকাংশ গোত্রই মদীনায় রাসূল (সা)-এর নিকট তাদের প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে এবং তাঁর আনুগত্য কবুল করে। তাই এই বছরটিকে বলা হয় প্রতিনিধি দলের বছর। যদিও পরবর্তীতে দেখা যায় যে, এই প্রতিনিধি দলসমূহের বা তাদের গোত্রপ্রধানগণের কেউ কেউ প্রকৃত সত্য সন্ধানী ছিল না। তাদের অনেকেই ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে থাকলেও কেউ কেউ এসেছিল রাজনৈতিক কারণে। তাদের কেউ ছিল স্পষ্টতই ভণ্ড, আবার অনেকেই নেহায়েত কৌতূহলের বসেও প্রতিনিধি পাঠিয়ে থাকতে পারে।

দূউমাত-উল-জান্দাল অভিযান

হিজরী নবম বর্ষে রাসূলে আকরাম (সা)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম বাহিনীর একমাত্র প্রধান অপারেশন তাবুক অভিযান। এই অপারেশনটি ছিল শান্তিপূর্ণ। কিন্তু খালিদ (রা) শান্তিপূর্ণ অপারেশনের মাঝেও চমকপ্রদ কিছু একটা করার চেষ্টা করতেন।

৬৩০ খৃস্টাব্দের প্রচণ্ড গরমকালে মদীনায় সংবাদ আসে যে, রোমানগণ সিরিয়ায় যুদ্ধের জন্য সমবেত হচ্ছে এবং তাদের অগ্রবর্তী দল জর্ডান পৌঁছে গেছে। বায়যান্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস স্বয়ং হেমসে অবস্থান করছেন।

৬৩০ খৃস্টাব্দের অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিমগণকে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দান করেন। গরমের প্রখরতা কমে আসার পরও রাসূলুল্লাহ (সা) এই অভিযানের নির্দেশ দিতে পারতেন। তিনি চাচ্ছিলেন, মুমিন মুসলিমদের ঈমানের দৃঢ়তা পরীক্ষা করতে। তাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য শুধু রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নয় বরং মুসলিমগণের ঈমান পরীক্ষা করাও। কেননা গ্রীষ্মের প্রতিকূল গরম আবহাওয়ায় শুধু প্রকৃত বিশ্বাসীরাই কেবল সাড়া দিতে পারে।

শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। অধিকাংশ মুসলমান তাদের প্রিয় রাসূল (সা)-এর আহ্বানে উৎফুল্লচিত্তে সাড়া দিল। কিন্তু কিছু লোক প্রতিকূল আবহাওয়ায় যুদ্ধের আহ্বানকে নির্দয় বলে বিবেচনা করলো। এবারের অক্টোবরের গরম ছিল প্রকৃতই প্রখর। এই গরমে যুদ্ধের তুলনায় খেজুর বাগানের শীতল ছায়াই ছিল দুর্বলচিত্ত কিছু মুসলিমের জন্য অধিক লোভনীয়। এই সুযোগে ভণ্ড প্রতারকদের দল তাদের চিরাচরিত নিয়মে মুসলমানদেরকে ফুসলাতে থাকে। তারা অনেকটা সফলকাম হয় এবং কিছু পরীক্ষিত মুসলমানও তাদের প্ররোচনায় দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে।

অক্টোবরের শেষের দিকে (নবম হিজরীর রজব মাসের মাঝামাঝি সময়ে) মুসলিম বাহিনী তাবুকের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নেতৃত্বে সমবেত এটাই ছিল সর্ববৃহত বাহিনী। এতে ছিল মক্কা, মদীনা ও এযাবত ইসলাম গ্রহণকারী প্রতিটি গোত্রের যোদ্ধা। এই বাহিনীতে ছিল দশ হাজার অশ্বারোহীসহ মোট ত্রিশ হাজার যোদ্ধা।

তাবুকে পৌঁছে মুসলিম বাহিনী জানতে পারে যে, রোমকগণ পিছু হটে দামেশকে অবস্থান নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) আর সামনে অগ্রসর না হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে তিনি তাবুক ও তার আশেপাশের এলাকায় বসবাসকারী গোত্রসমূহকে ইসলামের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে আনার সিদ্ধান্ত নেন। এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ছিল আকাবা উপকূলবর্তী ঈলা (বর্তমান কালের আকাবার নিকটবর্তী) জারবা, আজরুহ ও মকনা। এসব স্থানে বসবাসকারী গোত্রগুলোর সংগে চুক্তি হয় এবং তারা জিযিয়া কর দানে সম্মত হয়।[১০২]

তাবুক থেকে কিছু দূরে অবস্থিত দূউমাত-উল-জান্দাল নামক একটি এলাকাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বশীভূত করার সিদ্ধান্ত নেন (স্থানটি বর্তমানে আল-জাউফ নামে পরিচিত)। কিন্দা গোত্রের খৃস্টান যুবরাজ উকেইদার বিন আবদুল মালিক এই এলাকার শাসক ছিল। শিকার করা ছিল তার নেশা। রাসূলুল্লাহ (সা) এই এলাকাকে জয় করে উকেইদারকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়ে চারশ অশ্বারোহীসহ খালিদ (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি খালিদ (রা)-কে বলেন, "তুমি সেখানে গিয়ে দেখবে সম্ভবত উকেইদার বন্য ষাঁড় শিকারে ব্যস্ত।"[১০৩]

খালিদ (রা) ৬৩০ খৃস্টাব্দের নভেম্বরের শেষ নাগাদ এক জ্যোৎস্নাস্নাত রাতে দেয়ালঘেরা দূউমাত-উল-জান্দাল শহরে উপনীত হন। খালিদ (রা) তাঁর বাহিনীকে মোতায়েন করে শেষ করতে পারেননি এমন সময় শহরের ফটক খুলে যায় এবং উকেইদার তার বন্ধু-বান্ধব ও শিকারের অস্ত্রসহ ঘোড়ায় চড়ে বের হয়ে আসে। সম্ভবত দিনের তাপের প্রখরতার কথা বিবেচনা করে উকেইদার রাতের ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও চাঁদ ঝলমল প্রকৃতিকে শিকারের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করেছিল এবং সেই চন্দ্রালোকিত রাতে তার শিকার ভালই হয়েছিল।

খালিদ (রা) ক'জন সংগীকে নিয়ে অতর্কিতে শিকারী দলের উপর আক্রমণ করেন। তিনি স্বয়ং উকেইদারকে আঘাত করে ঘোড়া থেকে ফেলে দেন। তাঁর সংগীগণ শিকারীদলের অন্যান্য সদস্যকে আক্রমণ করে। উকেইদারের ভাই হাসান বাধা দিতে গিয়ে প্রাণ হারায় এবং অন্যরা ঘোড়া হাঁকিয়ে পলায়ন করে। তারা শহরে প্রবেশ করে ফটক বন্ধ করে দেয়।

খালিদ (রা) উকেইদারকে বন্দী করে নিয়ে তাবুকে প্রত্যাবর্তন করেন। উকেইদার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং নিজের মুক্তির জন্য মোটা অংকের পণ দান করে ও জিযিয়া কর প্রদানে সম্মত হয়।

এই ঘটনার পরই মধ্য ডিসেম্বরের দিকে মুসলিম বাহিনী মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। ইতিমধ্যে আবহাওয়াও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

---

১০২. জিযিয়া অমুসলিমদের উপর আরোপিত এক প্রকার কর। এর বিনিময়ে তারা মুসলিম রাষ্ট্রের নিকট হতে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার সুযোগ লাভ করে।

১০৩. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫২৬।

তাবুক অভিযানের পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবিত অবস্থায় আর কোনো উল্লেখযোগ্য সামরিক অভিযান পরিচালনা হয়নি। এই সময়ে আরবের সব গোত্রের প্রতিনিধিগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে এবং কতিপয় গোত্র কর প্রদানে সম্মত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক গোত্রের ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একজন করে নেতা মনোনীত করে দেন। এভাবেই তিনি ইসলামের বিজয়কে সংহত করে নতুন রাষ্ট্রের সৌধকে গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। তিনি আরবের বিভিন্ন এলাকায় কয়েকটি ছোট অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানগুলোর মিশন ছিল গোত্রগুলোকে ডেকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো এবং কোনো গোত্র এই আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাদেরকে যুদ্ধের মাধ্যমে পদানত করা।

৬৩১ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে (দশম হিজরীর রবিউল আখির মাসে) রাসূলুল্লাহ (সা) খালিদ (রা)-এর নেতৃত্বে ইয়েমেনের উত্তর নজরানে বসবাসকারী বনী হারিসা বিন কা'ব গোত্রের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি খালিদ (রা)-কে নির্দেশ দান করেন, "গোত্রটির প্রতি তিনবার ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাবে, যদি তারা তাতে অনুকূল সাড়া দেয় তাহলে কোনো ক্ষতি করবে না, নতুবা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।"[১০৪] এই অভিযানে খালিদ (রা)-এর সংগে চারশ অশ্বারোহী অংশগ্রহণ করে।

নজরানে পৌঁছে খালিদ (রা) বনী হারিসা বিন কা'বের প্রতি ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালে তারা তা গ্রহণ করে। ফলে কোনো রক্তপাতের প্রয়োজন হয় না। খালিদ (রা) গোত্রটির সংগে ক'মাস বসবাস করে তাদেরকে ইসলামের জীবন যাপন পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন। তারা সন্তোষজনকভাবে ইসলামী জীবন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পত্র মারফত তাঁর মিশনের অগ্রগতির কথা অবহিত করেন। প্রতিউত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) খালিদ (রা)-কে একটি প্রশংসামূলক পত্র প্রেরণ করেন এবং বনী হারিসা বিন কা'বের একটি প্রতিনিধিদলসহ তাঁকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দান করেন। খালিদ (রা) ৬৩২ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে (শাওয়াল, দশম হিজরী) উক্ত প্রতিনিধি দলসহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যথাযথ সমাদরে প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান। তাদের নিকট আনুগত্যের শর্তসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়। পরিশেষে তাদের মধ্য থেকে একজন নেতা নির্বাচন করা হয় এবং তারা নজরানে ফিরে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় এটাই ছিল খালিদ (রা) পরিচালিত শেষ অভিযান।[১০৫]

---

১০৪. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৯২।
১০৫. এই সময়ে খালিদ (রা) পরিচালিত অন্যান্য অভিযান সম্পর্কে মতামতের জন্য পরিশিষ্ট 'খ'-এর ৩ নম্বর নোট দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড

স্বধর্ম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে অভিযান

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সময়

রাসূলুল্লাহ (সা) জীবিত থাকাকালেই স্বধর্মত্যাগীদের তৎপরতা শুরু হয় এবং তাঁর নেতৃত্বেই তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রধান তৎপরতাকে সফলভাবে দমন করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের পর এই স্বধর্মত্যাগীদের কার্যকলাপ অত্যন্ত ব্যাপক ও বিপজ্জনক রূপ লাভ করে। আরবের সর্বত্র ছড়িয়েপড়া এই অশুভ তৎপরতাকে সফলতার সংগে দমন করেন খলীফা আবূ বকর (রা)। এ গ্রন্থে স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলন এককভাবে আলোচনার লক্ষ্যে দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবেশিত হলো, যদিও এ আন্দোলনের সূত্রপাত প্রথম খণ্ডে বর্ণিত ইতিহাসের সময়কালের মধ্যে।

স্বধর্মত্যাগীদের প্রথম ও প্রধান উত্থান হয় ইয়েমেনে। এটি আসওয়াদ আল-আনসীর ঘটনা নামে পরিচিত। ইয়েমেনের পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারী এটি বৃহৎ গোত্রের অধিপতির নাম ছিল আসওয়াদ। তার প্রকৃত নাম ছিল আভালা বিন কাব, কিন্তু তার দেহের রং অত্যন্ত কালো হওয়ার কারণে তাকে আসওয়াদ বা কালো বর্ণের ব্যক্তি বলে ডাকা হতো। এই ব্যক্তিটির মাঝে ছিল ঈর্ষা জাগানোর মতো অনেক গুণের সমাহার। সে মানুষের ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারত।

হিজরীর দশম বর্ষে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে। এই সব অঞ্চলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁদের আন্তরিক ও ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও উক্ত এলাকার অধিবাসীরা ইসলামের মর্মবাণীকে উপলব্ধি করে আন্তরিকভাবে গ্রহণে ব্যর্থ হয়। তাদের পরিবর্তনটা ছিল মূলত বাহ্যিক।

ইসলামের ছায়াতলে আসার পূর্বে ইয়েমেনের শাসক ছিলেন পারস্যের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণকারী বাযান নামের এক ব্যক্তি। তিনি পারস্য সম্রাটের পক্ষে ইয়েমেন শাসন করতেন। এই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে উক্ত পদেই বহাল রাখেন। তাঁর প্রজ্ঞা ও দক্ষ নেতৃত্বে ইয়েমেনের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। বিদায়হজের কিছু পূর্বে বাযান আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পুত্র শাহরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। শাহরের নেতৃত্বেও ইয়েমেনে শান্তি বিরাজ করতে থাকে।

বিদায়হজের সময় আসওয়াদ নিজেকে নবী হিসেবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে তার গোত্রের লোকদেরকে একত্র করে কিছু চরণ আবৃত্তি করে দাবি করে সে আল্লাহর বাণীবাহক এবং এই চরণগুলো তার নিকট প্রেরিত কুরআনের অংশ।

আসওয়াদের একটি পোষা গাধা ছিল যেটাকে সে দীর্ঘদিন ধরে প্রশিক্ষণ দিয়ে তার কিছু কমান্ড পালন করতে শিখিয়েছিল। সে তার দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য এই গাধাটিকে ব্যবহার করে। সে গাধাটিকে তার প্রভুর নিকট মাথা নত করতে বললে তাই করতো বা হাঁটু গেড়ে বসতে বললে তাই শুনতো।[১০৬] এই কারণে আসওয়াদ ঐ অঞ্চলে গাধাওয়ালা বা যুল-হিমার নামে পরিচিত ছিল। অনেকে মনে করেন সে যুল-হিমার নয় বরং যুল-খুমার[১০৭] অর্থাৎ মদ্যপ নামে পরিচিত ছিল। এটাও সত্য হতে পারে। কেননা সে অধিকাংশ সময় মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে থাকত। তা সত্ত্বেও তার গোত্রের লোকেরা তাকে প্রকৃত নবী হিসাবে গ্রহণ করে এবং ইয়েমেনের আরও কিছু ক্ষুদ্র গোত্র তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

আসওয়াদ ৭০০ অশ্বারোহীর এক বাহিনী নিয়ে নজরান আক্রমণ করে এবং তা সহজেই দখল করে নেয়। এই সহজ বিজয়ে উল্লসিত হয়ে সে নজরান শাসনের জন্য নিজের লোক নিয়োগ করে এবং সানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ইয়েমেনের নতুন শাসক শাহর নাজরানের পতনের কথা জানতে পারেন। আসওয়াদ সানার দিকে অগ্রসর হচ্ছে জেনে তিনি একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে তাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। সানার কিছু উত্তরে উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সংক্ষিপ্ত যুদ্ধে আসওয়াদ জয়ী হয় এবং শাহর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি রেখে যান তাঁর সুন্দরী যুবতী স্ত্রী আযাদকে। পাঁচদিন পরে আসওয়াদ সানায় প্রবেশ করে। নিজেকে নবী ঘোষণার মাত্র ২৫ দিনের মধ্যেই আসওয়াদ দ্রুত এই সাফল্য অর্জন করে।

প্রায় সমস্ত ইয়েমেন এখন আসওয়াদের দখলে। বিজয়কে উপভোগ করার জন্য সে জোরপূর্বক বিধবা আযাদকে বিয়ে করে। এই ঘৃণ্য মদ্যপ গাধাওয়ালার নিকট নতি স্বীকার করা ছাড়া বেচারী বিধবার আর কোনো উপায় ছিল না।

নজরান ও সানা দখল করার পর আসওয়াদ তার বিজয়কে সংহত করে এবং গোটা ইয়েমেনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইয়েমেনের অনেক গোত্র তাকে শাসক ও নবী হিসেবে স্বীকার করে নেয়। ক্ষমতা বৃদ্ধির সংগে সংগে তার পক্ষে শুধু নবীত্বকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই সে নিজেকে ইয়েমেনের রহমান[১০৮] (খোদা) বলে দাবি করে। রহমান শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'দয়াময়'। এটি আল্লাহর একটি গুণ এবং মুসলমানগণ এই নামেই আল্লাহকে ডাকে। এই ভাবেই আসওয়াদ নিজেকে মহান আল্লাহ তা'আলার ঐশী ক্ষমতার শরীক করতে চায় যার পরিণতি কোনো মানুষের জন্যই কখনও ভাল হয়নি। যাহোক, সে তার অনুসারীদের নিকট ইয়েমেনের রহমান নামে পরিগণিত হয়। পাশাপাশি চলতে থাকে তার মদ্যপান ও বেচারী আযাদকে নিয়ে সীমাহীন আনন্দ উল্লাসের বাড়াবাড়ি। তার প্রতি আযাদের ঘৃণা এতো তীব্রতর হয়ে উঠে যে, সে এক বন্ধুকে বলেছিল, "আমার নিকট আর

---

১০৬. বালাযুরী, পৃষ্ঠা - ১১৩
১০৭. পূর্বোক্ত ।
১০৮. পূর্বোক্ত ।

কোনো ব্যক্তিই এতো ঘৃণ্য নয়।[১০৯]" আসওয়াদ তার জঘন্য মনোবৃত্তির কাল থাবা বাযানের পরিবারের জীবিত সদস্যদের প্রতি বিস্তার করে এবং তাদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার দুর্ব্যবহার করতে থাকে। তার এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরোয আল-দায়লামী নামের একজন বিশ্বস্ত ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী প্রকৃত মুসলিম প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে ওঠে। ফিরোয ছিল আযাদের চাচাতো ভাই এবং একই পারসিক পরিবারভুক্ত।

এদিকে মদীনা থেকে রাসূল আকরাম (সা) আসওয়াদের সমস্ত অপকর্মের খবর সংগ্রহ করে তাকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি কায়েস বিন যুবায়রাকে এই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। কায়েস সকলের অজ্ঞাতে সানায় প্রবেশ করে পারসিক ফিরোয়ের সহায়তায় প্রতারক আসওয়াদের বিরুদ্ধে একটি গোপন আন্দোলন সৃষ্টি করে। তারা তাদের পরিকল্পনা মুতাবিক অত্যন্ত সন্তর্পণে কাজ চালাতে থাকে।

আসওয়াদকে হত্যা করা খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। কৃষ্ণকায় আসওয়াদ তার বিশাল বপু, অসীম শক্তি ও দুর্ধর্ষতার জন্য বিখ্যাত ছিল। সে ইতিমধ্যেই ফিরোযকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। তদুপরি সে বাস করতো একটি উঁচু দেওয়াল ঘেরা প্রাসাদে। বহুসংখ্যক প্রহরী এই প্রাসাদের চারদিকে ও করিডোরে পায়চারি করতো। আসওয়াদের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত লোকদের মধ্য থেকে এই প্রহরী নিয়োগ করা হতো। এই প্রাসাদে প্রবেশের একমাত্র সম্ভাব্য উপায় হলো আযাদের কক্ষের পাশ দিয়ে দেয়াল টপকানো। ফিরোয আযাদের সংগে যোগাযোগ করে তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলে সে এটাকে মুক্তির একমাত্র উপায় ভেবে সংগে সংগেই রাজী হয়ে যায়।

৩০শে মে ৬৩২ খৃস্টাব্দে (৬ই রবিউল আউয়াল, ১১ হিজরী), মধ্যরাতের পর চাঁদ ডুবে গেলে ফিরোয প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে একটি রশির সাহায্যে প্রাচীর টপকিয়ে আযাদের কক্ষে প্রবেশ করে। আযাদ তাকে নিজের কক্ষের মধ্যে লুকিয়ে রাখে এবং দুই ভাই-বোনে মিলে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে।

প্রভাতের কিছু পূর্বে আযাদ অতি সন্তর্পণে আসওয়াদের কক্ষে প্রবেশ করে। আসওয়াদের কক্ষটি ছিল আযাদের কক্ষের পাশেই। সে দরজা খুলে আসওয়াদের অবস্থা দেখে আবার ফিরে আসে। তার চোখে প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে থাকে। সে ফিরোযকে ফিস্ ফিস্ করে বলে, "এখনই সময়, আসওয়াদ নেশায় বিভোর হয়ে পড়ে আছে।"

ফিরোয অতি সন্তর্পণে আংগুলের ডগায় ভর দিয়ে আসওয়াদের কক্ষের সামনে আসে। আযাদও তাকে অনুসরণ করে। আযাদ কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ফিরোয উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। আসওয়াদ হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে এবং ফিরোযের দিকে বিস্ময়ভরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সে সহজেই ফিরোযের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে। এই বিপদের মুখে মুহূর্তের মধ্যে আসওয়াদের নেশা ছুটে যায়। কিন্তু সে বিছানা ত্যাগ করার পূর্বেই ফিরোয ছুটে গিয়ে তরবারির সাহায্যে তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত হানে। আসওযাদ আহত অবস্থায় বিছানায় ঢলে পড়ে। ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা মতে, "সে ষাঁড়ের মতো গর্জন করতে থাকে।[১১০]"

---

১০৯. তাবারী দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা - ৪৬৭।

১১০. বালাযুরী, পৃষ্ঠা - ১১৪।

ম্যাপ – ৭ : আরবে মুর্তাদদের বিস্তার – ১
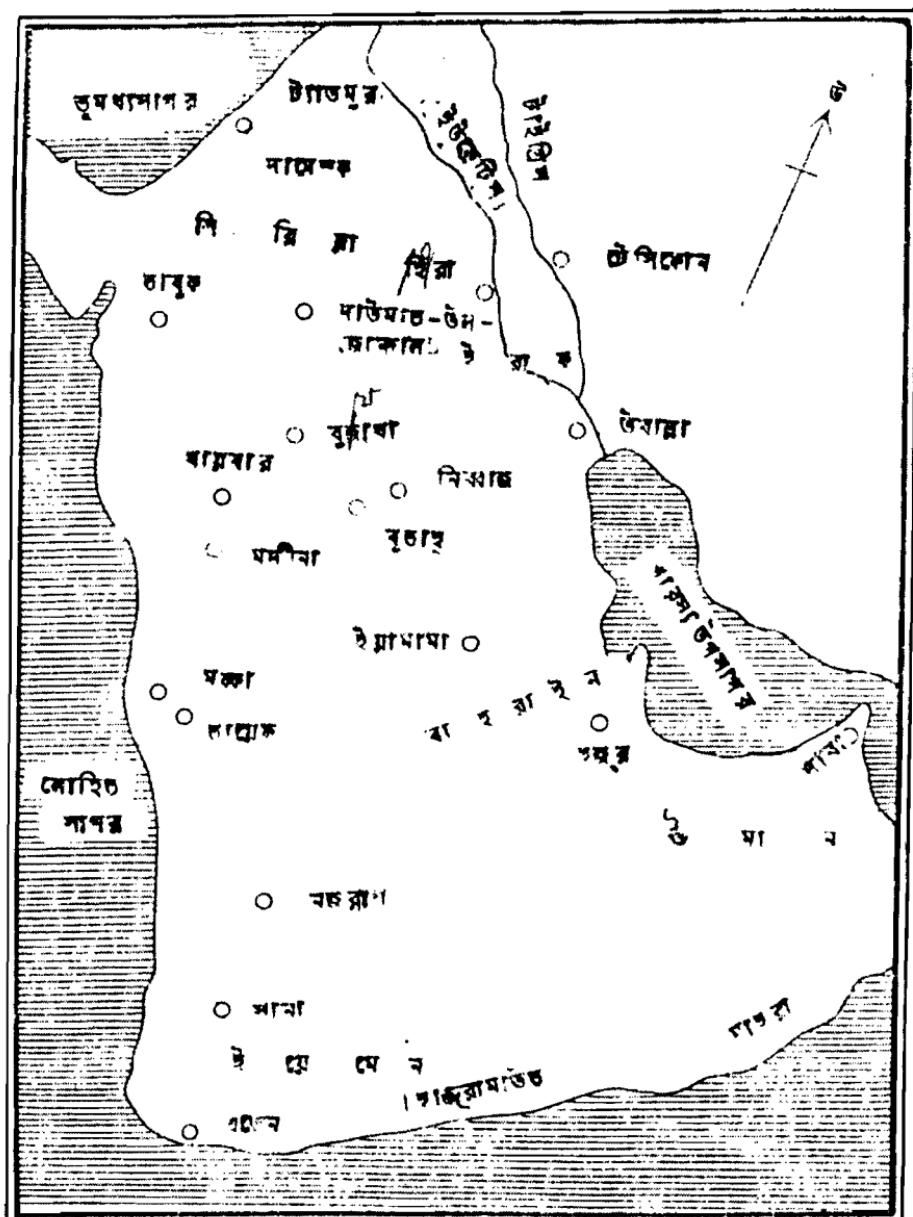
আসওয়াদের চিৎকারে প্রহরী ছুটে আসে এবং কক্ষের সামনে আযাদকে দেখে জানতে চায়, "ইয়েমেনের রহমানের কি হলো।" আযাদ তার ঠোঁটের উপর তর্জনি বসিয়ে প্রহরীকে কথা না বলার ইংগিত করে এবং ফিস্ ফিস্ করে বলে, তিনি আল্লাহর নিকট হতে বাণী লাভ করছেন।[১১১]" প্রহরী খুশী হয়ে তার প্রভুর আর্ত-চিৎকারকে উপেক্ষা করে প্রস্থান করে।

প্রহরী করিডোরের মোড় ঘুরে দৃষ্টির আড়ালে যেতেই আযাদ কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করে। ফিরোয পুনরায় আঘাত করার সুযোগের অপেক্ষায় বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর আসওয়াদ বিছানায় মোচড় খাচ্ছে ও হাত-পা ছুঁড়ছে। আযাদ দ্রুত বিছানার মাথার দিকে গিয়ে দু'হাতে আসওয়াদের চুল ধরে তার মাথাটা খাটের উপর চেপে ধরে। এই সুযোগে ফিরোয পর পর কয়েকটি আঘাত পরে ভণ্ডনবীর মাথাটি অতিকায় দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এই ভাবেই গাধাওয়ালা, মদ্যপ, প্রতারক আসওয়াদের জীবনের সমাপ্তি হয়। তার মিথ্যা নবুয়ত দাবির স্থায়িত্ব ছিল তিন মাস এবং এর সমাপ্তি হয় রাসূল আকরাম (সা)-এর ইহলোক ত্যাগের মাত্র ছয় দিন পূর্বে।

আসওয়াদের মৃত্যুর সংগে সংগেই আন্দোলনও শেষ হয়ে যায়। সানায় তার বিরুদ্ধে কায়েসের নেতৃত্বে গড়েওঠা মুসলমানদের প্রতিরোধ আন্দোলন মারমুখী রূপ ধারণ করে এবং তার কিছু অনুসারীকে প্রাণ দিতে হয়। এদের অনেকেই পালিয়ে অন্যত্র সরে পড়ে এবং পরবর্তী মুসলিম শাসকদের জন্য আবার ঝামেলা সৃষ্টি করেছিল। কেউ কেউ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেও পরবর্তীকালে আবার স্বমত ত্যাগ করেছিল। আসওয়াদকে হত্যার পর ফিরোযকে সানার শাসক নিযুক্ত করা হয়।

রাসূল আকরাম (সা) -এর ইন্তিকালের কয়েকদিন পরেই এই সুখবর বাহক মারফত মদীনায় পৌঁছে। আসওয়াদের পতনের খবর ভগ্নহৃদয় মুসলিমদের অন্তরে কিছুটা সান্ত্বনার বাতাস বয়ে আনে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের ফলে মুসলিমগণ বিভিন্ন সংকটের মধ্যদিয়ে সময় অতিবাহিত করতে থাকে। এ সংকট যেমন আবেগজনিত, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিকও বটে। প্রাণপ্রিয় রাসূল (সা)-এর বিদায়ে মুসলমানগণ নিজেদেরকে নিঃস্ব মনে করতে থাকে। কেননা বিগত দশ বছর ধরে রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন তাদের কমান্ডার, শাসক, বিচারক, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক, বন্ধু-সবকিছু। তাদের জীবনের এমন কোনো বিষয় পাওয়া যাবে না যার সংগে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। তারা তাদের সব সমস্যা নিয়েই তাঁর নিকট যেতো। আর তিনিও সব কিছুই সমাধান দেয়ার চেষ্টা করতেন, তাদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করতেন। তাঁর নেতৃত্ব ও ভালবাসার উষ্ণ আলোয় মুসলিমগণ ছিল সংকটমুক্ত ও নিরাপদ। তাদের মাথার উপর

---

১১১. পূর্বোক্ত।

থেকে এই আলোর অনুপস্থিতিতে তারা নিঃসঙ্গ ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। বর্ণনাকারীর মতে তাদের অবস্থা ছিল, "বৃষ্টি ভেজা ঠাণ্ডা রাতে অসহায় ভেড়ার মতো।[১১২]"

আরবের চারদিক থেকে বিদ্রোহের খবর আসতে থাকলে এই সংকট আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। তায়েফের সাকীফ এবং মক্কা ও মদীনায় বসবাসকারী গোত্রসমূহ ছাড়া আরবের অন্যান্য সব গোত্র মদীনার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ভণ্ড নবীগণ মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালতের অংশীদারিত্ব দাবি করতে থাকে। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ত্যাগ ও কষ্টের দিকটাকে উপেক্ষা করে শুধু তাঁর সফলতার দিকটা বিবেচনায় এনে নবুয়তকে খুব আকর্ষণীয় বিষয় বলে ভাবতে থাকে এবং এর সুফল ভোগের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। আসওয়াদ ছাড়াও আরও তিনজন ভণ্ডনবী (চারজনও হতে পারে, এদের মধ্যে একজন মহিলা) আত্মপ্রকাশ করে। অন্যান্য গোত্রপ্রধানও নবুয়তের দাবি না করলেও ভণ্ডনবীদের সংগে সংহতি প্রকাশ করে এবং ইসলামের আলোকে দূরীভূত করে অন্ধকার যুগের তথাকথিত স্বাধীনতা ভোগের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। স্বধর্মত্যাগের অগ্নিশিখা দাবানলের মতো সর্বত্র এতো দ্রুত বিস্তার লাভ করে যে, তা নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও কেন্দ্রভূমি মক্কা মদীনাকেও হুমকির সম্মুখীন করে।

ইসলামের প্রতি গভীর ও প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব থেকেই মূলত ধর্মত্যাগের ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের শেষ পর্যায়ে নবম ও দশম হিজরীতে অধিকাংশ গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করে রাজনৈতিক কারণে। তারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নতুন বাণীকে উপলব্ধি করার চেয়ে তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাবের বিষয়টিই বেশি করে বিবেচনা করে। মক্কা ও মদীনার বিশেষ করে মদীনার মুসলমানগণই ছিল বিশ্বাসের দিক থেকে দৃঢ়। কেননা তারা রাসূল (সা) -এর সাহায্য পেয়েছিল অধিক সময় ধরে। অপরপক্ষে মক্কা ও মদীনার বাইরের গোত্রগুলো তার আধ্যাত্মিক সাহচর্য লাভের সুযোগ থেকে ছিল বঞ্চিত। অনেক ক্ষেত্রেই গোত্রপ্রধানগণ ইসলাম গ্রহণের সংগে সংগে তার অনুসারিগণও তার প্রতি আনুগত্যবশত ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এসব ক্ষেত্রে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসের ব্যাপারটি ছিল অনুপস্থিত। তাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের পর পরই তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শুরু করে। কেননা তাদের আনুগত্য ছিল একজন ব্যক্তির প্রতি, ইসলাম বা মদীনার নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি নয়। ইসলাম স্ত্রীর সংখ্যা, গোত্রের স্বার্থে কর নির্ধারণ, নামায, রোযা ইত্যাদি সম্পর্কে যে বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল তা অমান্য করার ব্যাপারে তারা কোনো বাধা দেখতে পায় না।

আবু বকর (রা) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হওয়ায় মুসলমানগণ অনেকটা চিন্তিত হয়ে পড়ে। তিনি কি পারবেন চারদিকের বিদ্রোহের দাবানলকে নির্বাপিত করে

১১২. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৬১।

ইসলামের জয়যাত্রাকে অব্যাহত রাখতে? ইসলামের এই দুর্যোগের সময় সকলে আশা করেছিল একজন দুর্জয় শক্তি ও কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতৃত্বের। আবূ বকর (রা) ছিলেন হালকা-পাতলা গড়নের এবং বয়সের চাপে অনেকটা ন্যুব্জ। তাঁর চেহারায় ছিল বয়সের স্পষ্ট ছাপ যদিও দাড়িতে খেযাব লাগাতেন। তাঁর স্বভাব ছিল এতো ভদ্র ও অন্তর ছিল এমন নরম যে, সহজেই চোখে পানি এসে যেতো।

দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তিনি যে বক্তব্য রাখেন তার মধ্যেও তাঁর স্বভাবেরই প্রতিফলন ঘটে। তিনি বলেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমি তোমাদের নেতা নির্বাচিত হয়েছি, কিন্তু আমি তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। আমি যদি সঠিক পথে থাকি তোমরা আমাকে সাহায্য করবে আর আমি ভুল পথে চললে সংশোধন করে দিবে। সততাই আনুগত্য আর মিথ্যা বিদ্রোহের শামিল।'

'তোমাদের মধ্যে যে দুর্বল সে আমার নিকট শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি আল্লাহর হুকুমে তার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করি। আর তোমাদের মধ্যে যে শক্তিশালী আমার দৃষ্টিতে সে দুর্বল যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর ইচ্ছায় সে তার কর্তব্য পালন করে।'

'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হতে বিরত থেকো না, কেননা যারা জিহাদ থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তাদেরকে চরমভাবে অপমানিত করেন। কোনো সমাজে অনাচার সাধারণ রূপ লাভ করলে আল্লাহ তাদেরকে কঠোর শাস্তির মধ্যে ফেলেন।'

'আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশমাফিক চলবো তোমরা আমাকে অনুসরণ করবে এবং আমার মধ্যে তার ব্যতিক্রম দেখলে আমাকে অনুসরণ করতে বাধ্য নও।'

"নামায ত্যাগ করিও না! তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।[১১৩]"

আবূ বকরের সৎ গুণাবলী ও ইসলামের প্রতি তাঁর অসাধারণ দরদ ও খেদমতের কথা ছিল সর্বজনবিদিত। তাঁর ব্যক্তিগত সাহস, প্রিয় রাসূল (সা)-এর প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা, উন্নত নৈতিকতা এবং ইসলামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল প্রশ্নের অতীত। ইসলাম গ্রহণকারী তৃতীয় পুরুষ হিসেবে আল্লাহর নিকট হতে সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের মধ্যেও তাঁর আসন ছিল উঁচুতে।[১১৪] কিন্তু এসব গুণ থাকলেই কি দুর্যোগকালে নেতৃত্ব দেয়া যায়? মুসলমানদের আশংকাকে আরও ঘনীভূত করেছিল পূর্ব পরিকল্পিত একটি অভিযানে উসামা বাহিনীর মদীনা ত্যাগ।

৬৩২ খৃস্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ রাসূলুল্লাহ (সা) জর্দানে একটি বিশাল অভিযানের প্রস্তুতির নির্দেশ দান করেন। তখন তিনি শারীরিক অসুস্থতায়

---

১১৩. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৫০।

১১৪. আলী ছিলেন প্রথম এবং দ্বিতীয় যায়েদ বিন হারিসা।

ভুগছিলেন। তিনি প্রত্যেক মুসলিমকে এই অভিযানে যোগদানের নির্দেশ দেন। এই অভিযানের কমান্ডার হিসেবে তিনি তাঁর এক সময়ের ক্রীতদান যায়েদ বিন হারিসার ২২ বছরের যুবক পুত্র উসামাকে নিয়োগ করেন। যায়েদ মূতার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। উসামা একটি অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে আরবের অভিজাত গোত্রগুলোর বিশিষ্ট যোদ্ধাগণের উপর কমান্ডার নিযুক্ত করেন। মুসলিমগণ ওহুদের পশ্চিম প্রান্তে সমবেত হয়। এই বাহিনী উসামার বাহিনী নামে পরিচিত। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের শেষ অভিযানের নির্দেশ।

উসামাকে জর্দানের মূতা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করতে বলা হয়। তার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ ছিল, "তোমার পিতাকে যেখানে হত্যা করা হয়েছিল সেই এলাকায় আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করো। সংগে পথপ্রদর্শক নিয়ে নাও এবং সামনে স্কাউট ও গুপ্তচর প্রেরণ করো এবং দ্রুত যাত্রা করো।"[১১৫] ইন্তিকালের কিছু পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) এই অভিযানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "উসামার বাহিনীকে প্রেরণ করতে ভুলিও না।"[১১৬] ৫ই জুন ৬৩২ খৃস্টাব্দে (১২ই রবিউল আউয়াল, ১১ হিজরী) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শেষ বিদায়ের প্রাক্কালে উসামার বাহিনী ক্যাম্পেই ছিল। একই দিনে আবূ বকর (রা) খলীফা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

পরদিন খলীফা আবূ বকর (রা) উসামার বাহিনীকে অভিযান যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। সমস্ত বিশিষ্ট সাহাবাকে এমন কি খলীফার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বন্ধু উমরকেও যুবক উসামার নেতৃত্বে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হয়।

চারদিক থেকে স্বধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহের খবর আসা সত্ত্বেও অভিযানের প্রস্তুতি চলতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী খলীফার সংগে সাক্ষাৎ করে বলেন, "এই মুহূর্তে অধিকাংশ আরব গোত্র বিদ্রোহী হয়ে পড়েছে এবং চারদিক থেকে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার খবর আসছে। এরপরও কি আপনি উসামার বাহিনীকে অভিযানে পাঠাতে চান? মুসলিমগণ সংখ্যায় অল্প আর অবিশ্বাসীরা প্রচুর। এ অভিযান স্থগিত ঘোষণা করা উচিত।"

জবাবে হযরত আবূ বকর (রা) অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন, "আমি যদি জানতে পারি যে, চারদিক থেকে বন্যপ্রাণী এসে অরক্ষিত মদীনায় প্রবেশ করে আমার শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে তবু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশিত এ অভিযানে উসামার বাহিনী পাঠানো হবে।"[১১৭]

আরও কয়েকদিন অতিবাহিত হয়। চারদিক থেকে বিদ্রোহের ভয়াবহ খবর আসতে থাকে। উসামাও অন্যদের মতোই মদীনা ও ইসলামের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত

---

১১৫. ইবনে সাদ, পৃষ্ঠা - ৭০৭।

১১৬. পূর্বোক্ত।

১১৭. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৬১।

হয়ে পড়েন এবং উমরের সংগে সাক্ষাৎ করে অনুরোধ করেন, "খলীফার নিকট গিয়ে মুসলিম বাহিনীকে মদীনায় অবস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করুন। প্রত্যেকটি গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আমার সংগে। আমরা সকলে অভিযানে গেলে মদীনাকে কে শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করবে ?"

উমর (রা) খলীফার সংগে সাক্ষাৎ করতে সম্মত হন। ক্যাম্প ত্যাগের প্রাক্কালে একদল নেতৃস্থানীয় মুসলিম তার সংগে সাক্ষাৎ করে একই পরামর্শ দেন এবং বলেন, "তিনি যদি আমাদের মদীনায় অবস্থানের প্রস্তাব অনুমোদন না করেন, তাহলে অন্তত উসামার চেয়ে একজন বিজ্ঞ কমান্ডার নিয়োগের অনুরোধ করবেন।" [১১৮] উমর (রা) খলীফাকে এই প্রস্তাব দানেও সম্মত হন।

আবূ বকর (রা) তাঁর ঘরের মেঝেতে বসেছিলেন। তাঁর ঘাড়ে দুর্যোগময় মুহূর্তে খেলাফতের গুরু দায়িত্ব। বিশ্বাসের দৃঢ়তা না থাকলে চারদিকের প্রতিকূলতা হয়তো তাঁকে ঘাবড়িয়ে ফেলতো। উমর (রা) ধীরে সুস্থে ও দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে তাঁর বিনয়-নম্র ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর নিকট বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

আবূ বকর (রা) উমরের বক্তব্য শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। তিনি কমান্ডারের পরিবর্তন সংক্রান্ত উমরের মতামতও শ্রবণ করেন। তার পর তিনি পায়ের উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উমর (রা)-কে উদ্দেশ্য করে উচ্চকণ্ঠে বলেন, "ওহে খাত্তাবের পুত্র উমর, আল্লাহর রাসূল (সা)-ই উসামাকে কমান্ডার নিয়োগ করেছিলেন। আর তুমি চাও আমি তাঁকে কমান্ড থেকে সরিয়ে দেই?"[১১৯]

৬৩২ খৃস্টাব্দের ২৪শে জুন (১লা রবিউল আখির, ১১ হিজরী) উসামার বাহিনী ক্যাম্প ত্যাগ করে যাত্রা শুরু করে। আবূ বকর (রা) অশ্বারোহী উসামার সংগে পায়ে হেঁটে কিছুদূর অগ্রসর হন। উসামা (রা) ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটতে চাইলে তাকে বারণ করেন। তিনি বলেন, একজন মুসলিম সৈনিক আল্লাহর পথে প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য ৭০০ ভাল কাজের ফলাফল লাভ করে ও ৭০০ পাপ কাজের ক্ষতি হতে মুক্তি পায়।"[১২০]

আবূ বকর (রা) তাঁর উপদেষ্টা হিসেবে উমরকে রেখে যাওয়ার অনুরোধ করলে উসামা (রা) সংগে সংগে রাজী হয়ে যান। তারপর তিনি যুদ্ধগামী কমান্ডারের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দান করেন, "কুজার বিরুদ্ধে আকস্মিক আক্রমণের মধ্যদিয়ে তোমার অভিযান শুরু করবে। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর রাসূলের দেয়া এই মিশন থেকে তুমি বিরত হবে না।" [১২১] উসামার বাহিনী যাত্রা শুরু করে।

---

১১৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৬২।
১১৯. পূর্বোক্ত ঃ
১২০. পূর্বোক্ত ঃ
১২১. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা - ৪৬৩।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের পরবর্তী নাজুক পরিস্থিতিতে উসামার বাহিনীর মদীনা ত্যাগ ও অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্তকে অনেকে ভুল বলে মনে করেন। আবার অনেকে এটাকে আবূ বকরের একটি বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত বলেও মনে করেন। কেননা এই অভিযানের সিদ্ধান্ত বিদ্রোহীদেরকে হয়তো একটা ধারণা দিয়ে থাকবে যে, মুসলিমগণ খুব শক্তিশালী। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি ছিল ভিন্নরূপ। উসামা অত্যন্ত দক্ষতা ও দ্রুততার সংগে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন সত্য, কিন্তু তার অপারেশন স্বধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ দমনের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিল না। এই অভিযানের সিদ্ধান্তটি ছিল সদ্য ওফাতপ্রাপ্ত প্রিয় রাসূল (সা)-এর অন্তিম ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন মাত্র। এছাড়া এর সামরিক ও রাজনৈতিক কৌশলগত তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। সম্ভবত একারণেই অধিকাংশ মুসলিম নেতা ও ভবিষ্যতের ইতিহাসের বিখ্যাত জেনারেলগণ এই অভিযানের বিরোধিতা করেছিলেন।

এই অভিযান পরিচালনায় আবূ বকরের প্রধান বিবেচ্য ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্তিম ইচ্ছাকে চরিতার্থ করা। আবূ বকর সামরিক প্রজ্ঞার অভাবের কারণে মদীনায় তৎকালীন নাজুক পরিস্থিতিতেও উসামার বাহিনীকে অভিযানে পাঠিয়েছিলেন এমন মনে করা ঠিক নয়। কেননা তিনি পরবর্তীতে স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে এবং সিরিয়া ও ইরাকে সামরিক অভিযান পরিচালনায় প্রচুর প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন।

উসামার বাহিনীর বিদায়ের পর চারদিক হতে বিদ্রোহের ও বিদ্রোহী গোত্রগুলোর সমাবেশের খবর আসতে থাকে। মুসলমানদের আশংকাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপর পক্ষে স্বধর্মত্যাগীগণ আবূ বকরের খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ ও উসামার বাহিনীর মদীনা ত্যাগের সংবাদে উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। আবূ বকরের নেতৃত্বে পরিচালিত নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা তাদের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ মনে হতে থাকে। তাদের এটুকু সান্ত্বনা ছিল যে, উমর (রা) ও আলী (রা)-এর মতো কঠোর ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্বের তাদেরকে মোকাবিলা করতে হবে না। মোকাবিলা করতে হবে একজন ভদ্র ও বৃদ্ধ ব্যক্তিকে।

কিন্তু এই ভদ্র ও বৃদ্ধ ব্যক্তিটির তৎপরতায় অল্প সময়ের মধ্যেই শংকিত মুসলিমগণ হলো বিস্মিত এবং স্বধর্মত্যাগীগণ পেলো চরম আঘাত। একজন গোত্রপ্রধান আবূ বকরের বাহিনীর হাত হতে পালিয়ে ছুটতে ছুটতে আর্তনাদ করে বলেছিল, "আরবদের উপর অভিশাপ নাজিল হয়েছে আবূ কাহাফের পুত্রের পক্ষ থেকে।"[১২২]

---

১২২. বালাযুরী, পৃষ্ঠা - ১০৪।

আবূ বকর (রা)-এর অভিযান

স্বধর্মত্যাগের প্রবণতা এমন ব্যাপক রূপ লাভ করে যে, মক্কা ও মদীনার জনগণ ও তায়েফের সাকীফ গোত্র ব্যতীত আরবের অন্য সব গোত্রই এর দ্বারা আক্রান্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে গোটা গোত্রই স্বধর্মত্যাগী হয়ে পড়ে আবার কোনো ক্ষেত্রে অংশ বিশেষ। এই পরিস্থিতিতে অনেক মুসলমানকে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস অটুট রাখতে গিয়ে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছিল। তুলায়হা বিন খুওয়ালিদ ও মুসায়লামা বিন হাবীব নামের দু'জন ভণ্ড নবী এবং সাজাহ্ বিনতে আল-হারিস নামের জনৈকা ভণ্ড মহিলা নবী স্বধর্মত্যাগের এই অগ্নিশিখা চারদিকে প্রজ্বলিত করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অসুস্থতার সময়েই তুলায়হা নবুয়ত দাবি করে বসে। নবগঠিত রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনার প্রতি তুলায়হার পক্ষ থেকেই প্রবল হুমকি আসে এবং পশ্চিম-মধ্য ও উত্তর-মধ্য আরবের গোত্রসমূহ তাকে অনুসরণ করতে থাকে। গোত্রগুলো হলো গাতফান, তাঈ, হাওয়াযিন, বনী আসাদ এবং বনী সুলায়ম।

মদীনার ৭০ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে আবরাক ও ২৪ মাইল পূর্বদিকে যুকীসসা নামক স্থানদ্বয়ে স্বধর্মত্যাগীরা সংঘবদ্ধ হতে থাকে।[১২৩] এই সংঘবদ্ধ দলে ছিল গাতফান, হাওয়াযিন এবং তাঈ গোত্রের লোকজন। উসামার বাহিনী মদীনা ত্যাগের এক অথবা দু'সপ্তাহের মধ্যেই যুকীসসার স্বধর্মত্যাগীরা খলীফা আবূ বকরের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে প্রস্তাব দেয়, "আমরা নামায আদায় করবো কিন্তু যাকাত দিতে পারবো না।" আবূ বকর (রা) দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের নিকট যদি এক আউন্স পরিমাণ দ্রব্যও যাকাত হিসেবে পাওনা হয় এবং তোমরা যদি তা প্রদান না করো তাহলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করবো। আমি উত্তরদানের জন্য তোমাদেরকে একদিন সময় দিলাম।"[১২৪]

নতুন খলীফার প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস দেখে প্রতিনিধিদল হতভম্ব হয়ে যায় এবং জবাবদানের জন্য দেয়া চূড়ান্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তারা মদীনা থেকে

---

১২৩. আবরাক বর্তমানে হানাকিয়ার ৫ মাইল উত্তরে একটি প্রস্তরময় এলাকা। যুকীস্‌সার কোনো অস্তিত্ব বর্তমান নেই। তবে হানাকিয়ার ২০ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত রাবাজাগামী সড়কের উপরে এর অবস্থান ছিল (ইবনে সাদ পৃষ্ঠা - ৫৯০)। হানাকিয়ার পুরাতন নাম বতন নাখল।

১২৪. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৮৭, বালাযুরী, পৃষ্ঠা - ১০৩।

পালিয়ে যায়। তাদের পলায়নের অর্থ দাঁড়ালো খলীফার দাবির প্রত্যাখ্যান। তাদের পলায়নের পরপরই আবূ বকর (রা) প্রত্যেকটি ধর্মত্যাগী গোত্রের নিকট দূত পাঠিয়ে তাদেরকে ইসলামের প্রতি অনুগত থেকে সকল প্রকার যাকাত প্রদান অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

যুকীসসার স্বধর্মত্যাগী গোত্রের প্রতিনিধিগণ মদীনা ত্যাগ করার পূর্বেই সেখানে মুসলিম যোদ্ধাদের অনুপস্থিতির বিষয়টি লক্ষ্য করে। যুকীসসায় ফিরে তারা তাদের গোত্রের লোকদেরকে খলীফার সংগে কথোপকথনের বিষয় অবহিত করে এবং মদীনার নাযুক পরিস্থিতির কথাও বলে। ইতিমধ্যে ঐ সময় অবস্থানকারী তুলায়হা তার কৌশলী ও দক্ষ সমরনায়ক ভাই হিবালের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠিয়ে যুকীসসার স্বধর্মত্যাগীদের শক্তিকে বৃদ্ধি করে। প্রতিনিধিদলের মুখে সব কিছু বিস্তারিত শুনে স্বধর্মত্যাগীগণ অরক্ষিত মদীনার উপর চরম আঘাত হানার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। তারা তাদের বাহিনীকে যুকীসসা হতে যাত্রা করে জুহুসায়[১২৫] নিয়ে যায়। জুহুসাকে সমাবেশ এলাকা হিসেবে ব্যবহার করে একটি অগ্রগামী দল আক্রমণের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে মদীনার আরও কাছাকাছি গিয়ে তাঁবু ফেলে। সময়টি ছিল ৬৩২ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ (১১ হিজরীর রবিউল আখির মাসের শেষার্ধ)।

খলীফা গোপনসূত্রে খবর পেয়ে মদীনা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রধান মুসলিম বাহিনী উসামার নেতৃত্বে মদীনার বাইরে থাকলেও মদীনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ততোটা দুর্বল ছিল না—শত্রুরা যা ভেবেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোত্র বনী হাশিমের বেশ কিছু যোদ্ধা তাঁর ইন্তিকালে শোক প্রকাশের জন্য মদীনায় ছিল। তাদের সহযোগে আবূ বকর (রা) একটি বাহিনী গঠন করেন। আবূ বকরের আত্মবিশ্বাস ছিল অত্যন্ত কঠোর। তদুপরি আলী, যুবায়ের ইবনুল আওয়াম ও তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্র মতো সাহসী যোদ্ধাদের উপস্থিতি তাঁর আত্মবিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। তিনি তাঁদের প্রত্যেকের নেতৃত্বে নবগঠিত বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ করে ন্যস্ত করেন।

স্বধর্মত্যাগীরা কিভাবে আক্রমণ রচনা করবে, তা নির্ধারণ করতে না পারায় তিনদিন কোনো ঘটনা ছাড়াই অতিবাহিত হয়। আবূ বকরের নির্দেশে মুসলিম বাহিনী তীব্রগতিতে মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুর অগ্রবর্তী বাহিনীর ক্যাম্পে ঝটিকা আক্রমণ করে তাদেরকে পিছু হটিয়ে দেয়। স্বধর্মত্যাগীরা জুহুসায় প্রত্যাহার করে। মুসলিম বাহিনীর এই সফলতার খবর খলীফার নিকট পৌঁছলে তিনি তাদেরকে তথায় অবস্থান পূর্বক আদেশের অপেক্ষায় থাকতে বলেন।

পরের দিন আবূ বকর (রা) মালবাহী উটের একটি বিরাট বহর নিয়ে মদীনা ত্যাগ করেন। যুদ্ধের উটগুলো পূর্বেই উসামার বাহিনীর সংগে যাওয়ায় খলীফাকে বাধ্য হয়েই মালবাহী উট নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করতে হয়েছিল। খলীফার উটের বহর

---

১২৫. জুহুসার অবস্থান অজ্ঞাত।

শত্রুর পুরিত্যক্ত ক্যাম্পের নিকট পৌঁছলে মুসলিম বাহিনী উটগুলোতে আরোহণ করে জুহুসায় শত্রুর সমাবেশ এলাকার দিকে অগ্রসর হয়। জুহুসার শত্রুবাহিনী তুলায়হার ভাই হিবালের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর জন্য অপেক্ষারত ছিল। হিবাল এখানে তার সামরিক চাতুর্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। সে মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রার পথে তার সমাবেশ এলাকার কিছু সামনে একটি ঢালের পার্শ্ববর্তী খাড়া পাহাড়ের আড়ালে সৈন্য মোতায়েন করে রাখে (ফাঁদ পাতে)।

মালবাহী উটে আরোহণকারী শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞাত মুসলিম বাহিনী ঢালটি অতিক্রম করতে থাকে। তারা খাড়া পাহাড়টির নিকটবর্তী হলেই স্বধর্মত্যাগীরা দাঁড়িয়ে পড়ে এবং অসংখ্য পরিমাণ পানি ভর্তি ছাগলের চামড়া পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে দিতে থাকে। পানি ভর্তি চামড়াগুলো মুসলিম বাহিনীর পথের দিকে গড়িয়ে পড়তে থাকলে তারা বিকট শব্দে ড্রাম পিটাতে পিটাতে উচ্চ শব্দে চিৎকার ও তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ে। মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধের প্রশিক্ষণহীন মালবাহী উটগুলো বিকট শব্দ ও অপরিচিত অসংখ্য বস্তু গড়াতে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উল্টা ঘুরে দ্রুতবেগে ভাগতে শুরু করে। মুসলিমগণ তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত বাহনগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। অল্প সময়ের মধ্যে তারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

হিবালের অন্তর আত্মতৃপ্তিতে ভরে যায়। অবশ্য তার যথেষ্ট কারণও ছিল। কেননা, সে অতি সহজেই মুসলিম বাহিনীকে মদীনায় ঠেলে দিতে সক্ষম হয়। হিবালের এই কৌশলের প্রেক্ষিতে এটা ভাবা যায় যে, স্বধর্মত্যাগীদের মদীনার নিকটবর্তী অবস্থান হতে প্রত্যাহারটি হয়তো ছিল মুসলিম বাহিনীকে প্রলুব্ধ করে মদীনার বাইরে টেনে আনার ফন্দী। কিন্তু হিবাল এবারে ভুল করলো এই ভেবে যে, মুসলিমগণ ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত এবং তাদের মদীনায় দ্রুত পলায়ন ছিল দুর্বলতা। তার জানা ছিল না যে, মুসলিম বাহিনীর উটগুলো ছিল মালবাহী এবং ভীতসন্ত্রস্ত ছিল যুদ্ধে অন্তত এই বাহনগুলো—মানুষগুলো নয়। হিবাল তার যুকীসসায় অবস্থানকারী বাহিনীর নিকট এই সফলতার সংবাদ পাঠিয়ে তাদেরকে অগ্রসর হতে বলে। একই সন্ধ্যায় স্বধর্মত্যাগীদের গোটা বাহিনী অগ্রসর হয়ে মদীনার নিকটবর্তী যে অবস্থান থেকে তারা মাত্র একদিন পূর্বে প্রত্যাহার করেছিল, সেখানেই ক্যাম্প স্থাপন করে। তাদের মনোবল ছিল অত্যন্ত উঁচু।

অপরপক্ষে মুসলিম বাহিনীর প্রতিটি সদস্য ছিল ক্ষুব্ধ এবং পাল্টা আক্রমণের মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর। আবূ বকর (রা) জানতেন যে, স্বধর্মত্যাগীরা মদীনার নিকটবর্তী অবস্থানে ফিরে এসে ক্যাম্প স্থাপন করেছে। শত্রু যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পূর্বেই তিনি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর নির্দেশে মুসলিমগণ গোটা রাত তাদের ক্ষুদ্র বাহিনীকে পুনর্গঠন ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে ব্যয় করেন।

মধ্যরাতের পর আবূ বকর (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে মদীনা ত্যাগ করেন এবং শত্রু অবস্থানের নিকটবর্তী হয়ে আক্রমণ রচনার জন্য সৈন্যবিন্যাস করেন। তিনি তাঁর গোটা বাহিনীকে চার অংশে বিভক্ত করে দু'অংশ দু'বাহুতে, এক অংশ মাঝখানে এবং বাকি অংশকে বাহিনীর পশ্চাদভাগ রক্ষার (Rear guard) দায়িত্বে মোতায়েন করেন। তিনি মাঝখানে মোতায়েন সেনাদলের কমান্ড নিজের হাতে রাখেন এবং ডানবাহু, বামবাহু ও পশ্চাদরক্ষীদলের কমান্ড প্রদান করেন যথাক্রমে নোমান, আবদুল্লাহ ও মুওয়াইদ-এর হাতে। এরা তিনজনই মুকারিবণের পুত্র। ভোর হওয়ার পূর্বেই মুসলিম বাহিনী শত্রু ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হয়। এসময় শত্রুবাহিনী আসন্ন যুদ্ধে সহজ বিজয়ের বিশ্বাস নিয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল।

এবারে অজ্ঞাতে আক্রান্ত হওয়ার পালা হিবালের। ভোরের আলো ফুটে ওঠার পূর্বেই মুসলিম বাহিনী উন্মুক্ত তরবারি হস্তে রুদ্রমূর্তিতে স্বধর্মত্যাগীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শত্রুদের অনেকেই নিহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যাওয়াকেই নিরাপদ মনে করে। যুকীসসায় না পৌঁছা পর্যন্ত তাদের পলায়ন অব্যাহত থাকে। সেখানে পৌঁছে তারা পুনরায় সংগঠিত হলেও মনোবল আর পূর্বের মতো উঁচু ছিল না।

এ দফা বিজয় হয় খলীফার কৌশলের এবং তাঁর এ বিজয় ছিল খুবই অর্থবহ। এটি ছিল একটি রক্তক্ষয়ী কৌশলগত অভিযান যাতে শত্রুকে শুধু কৌশলের সাহায্যে নয়, বরং তরবারি ব্যবহার করে পিছু হটতে বাধ্য করা হয়। খলীফা তাঁর সৈন্যস্বল্পতার দুর্বলতাকে অতিক্রম করার জন্য শত্রুকে অজ্ঞাতে আকস্মিক আঘাত হেনে হতভম্ব করে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তিনি সফলকাম হয়েছিলেন। তাঁর একটি দ্রুত বিজয় প্রয়োজন ছিল এবং তিনি তা অর্জন করেন। কৌতুহলের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, মুসলমানদের ইতিহাসে এটাই রাত্রিকালীন আক্রমণের প্রথম দৃষ্টান্ত। অবশ্য আক্রমণের এই কৌশলটি বহুল প্রচলিত হতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

এ দফা বিজয়ের পর আবূ বকর (রা) ভাবলেন শত্রুকে সময় দেয়া ঠিক হবে না। আকস্মিক আক্রমণের ধাক্কা এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বিশৃংখল অবস্থা কাটিয়ে ওঠার পূর্বেই শত্রুকে আবার ধরতে হবে। সূর্য ওঠার সংগে সংগেই তিনি যুকীসসার দিকে যাত্রা শুরু করেন। যুকীসসায় পৌঁছে খলীফা পূর্বের রাতের ন্যায় সৈন্য বিন্যাস করে শত্রুর উপর আক্রমণ করেন। স্বধর্মত্যাগীরা মুসলিম বাহিনীকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের মনোবল এতো দুর্বল ছিল যে, কিছুক্ষণের মধ্যে তারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে আবরাকে পালিয়ে যায়। সেখানে গাতফান, হাওয়াযিন ও তাঈ গোত্রের আরও কিছু লোক সমবেত ছিল। যুকীসসা দখল করার পর আবূ বকর (রা) তালহা বিন উবায়দুল্লাহর নেতৃত্বে পলায়নপর শত্রুকে ধাওয়া করার জন্য একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন। তালহা কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দলছুট কিছু শত্রুকে খতম করতে সক্ষম হন।

খলীফা যুকীসসা দখল করেন ৬৩২ খৃস্টাব্দের ৩০শে জুলাই বা দু-একদিন আগে-পরে (৮ই জমাদিউল আউয়াল, ১১ হিজরী)। আবূ বকর (রা) নোমান বিন মুকাররিণের নেতৃত্বে একটি দলকে যুকীসসায় রেখে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। আগস্ট মাসের ২ তারিখে উসামা তার বাহিনীসহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে ইসলামের রাজধানীর নিরাপত্তার আর কোনো অসুবিধা থাকে না।

উসামা তার বাহিনী নিয়ে তাবুকে পৌঁছলে সেখানকার প্রায় প্রত্যেকটি গোত্র তাকে তীব্রভাবে বাধা দান করে। কিন্তু উসামা তাঁর যৌবনের তেজ ও ক্ষীপ্রতা নিয়ে সব বাধা পদানত করতে সক্ষম হন। তিনি আরবের উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে দূউমাত-উল-জান্দালে পৌঁছে যান (যেখানে খালিদ দু'বছর পূর্বে উকেইদারকে গ্রেপ্তার করেছিলেন)। অভিযানকাল উসামা বাধাদানকারী সকলকে হত্যা করে অগ্রসর হন।[১২৬]

উসামার অভিযানের ফলে কতিপয় গোত্র মদীনার প্রতি পুনরায় আনুগত্য প্রকাশ করে এবং ইসলামকে আবার আলিংগন করে। কিন্তু কুজা অবাধ্য থেকে যায়। ফলে কিছুদিন পরে আমর বিন আল আসকে আর একটি অভিযান পরিচালনা করতে হয়।

এরপর উসামা মৃতায় অভিযান চালিয়ে ক'র ও গাস্সান গোত্রের আরব খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। অবশ্য এখানে বড় ধরনের কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয় না। তিনি বিপুল সংখ্যক যুদ্ধবন্দী ও ধনসম্পদ নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই সম্পদের কিছু ছিল যাকাত হিসেবে সংগৃহীত অর্থ আর কিছু ছিল শত্রু কর্তৃক পরিত্যক্ত। আবূ বকর (রা) মদীনার মুসলিমগণসহ উসামার বাহিনীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এই বাহিনী চল্লিশ দিন মদীনার বাইরে ছিল এবং এর প্রত্যাবর্তনে স্বস্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসে।

যুকীসসায় স্বধর্মত্যাগীদের পরাজয়ের খবরে অন্যান্য ক'টি ধর্মত্যাগী গোত্রের লোকেরা মুসলিমদের উপর খুবই বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ওঠে। তারা তাদের গোত্রের মুসলিম সদস্যদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এমনকি তাদেরকে জীবন্ত দগ্ধ ও উঁচু পাহাড়ের উপর হতে ফেলে হত্যা করা হয়। আবূ বকর (রা) তীব্র ক্ষোভের সাথে এই খবর শুনেন এবং স্বধর্মত্যাগী প্রত্যেকটি গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে মুসলিম হত্যাকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে খতম করার শপথ গ্রহণ করেন।

পরিস্থিতি এখন মুসলিমদের অনুকূলে। খলীফার সাম্প্রতিক বিজয়গুলো চূড়ান্ত কিছু না হলেও মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মদীনার আশেপাশের ক'টি গোত্র অনুতপ্ত হয়ে ইসলামকে পুনরায় আলিংগন করে এবং যাকাত প্রদান করে। উসামার বাহিনী যুদ্ধবন্দীর সাথে সাথে প্রচুর ধনসম্পদও নিয়ে আসে। ফলে

---

১২৬. ইবনে সাদ ঃ পৃষ্ঠা - ৭০৯।

মদীনার ধনভাণ্ডার পুনরায় পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং খলীফা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনার আর্থিক সংগতি লাভ করেন।

কিন্তু তিনি তাড়াহুড়া না করে সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনার পূর্বে উসামার বাহিনীকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দান ও যুদ্ধসাজে সজ্জিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি উসামাকে তার বাহিনীসহ বিশ্রাম গ্রহণের ও সেই সংগে রাজধানীর নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দান করেন। খলীফার তাড়াহুড়া করে গঠিত বাহিনীটি ক্রমান্বয়ে সজ্জিত হয়ে পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। উসামার বাহিনী বিশ্রামরত থাকায় খলীফা এই নতুন বাহিনী দিয়ে আবরাকে একত্রিত স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। আবূ বকর (রা) এখন স্বধর্মত্যাগীদের ঘৃণ্য অপরাধের শাস্তি বিধান ও নির্দোষ মুসলমানদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুদ্ধ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

আবরাক অভিযানে আবূ বকর নিজেই মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁকে এই বলে বিরত করার চেষ্টা করেন, "হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আবরাক অভিযানে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া আপনার ঠিক হবে না। আল্লাহ না করুন, যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি নিহত হলে সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাবে। আপনার বেঁচে থাকাটাই অবিশ্বাসীদের জন্য ভীতির কারণ। বরং আপনি অন্য কাউকে কমান্ডার নিযুক্ত করুন। তিনি শহীদ হলে আপনি আবারও একজনকে মনোনীত করতে পারবেন।"

আবূ বকর (রা) খুব শীঘ্র মুসলিম যোদ্ধাদের উপর একটি গুরু দায়িত্ব চাপাতে যাচ্ছেন। তিনি তাদেরকে এমন মরণ আঘাত হানতে বলবেন যা তারা পূর্বে কখনও করেনি এবং এর ফলে তারা এমন বিপদের সম্মুখীন হবে যা তাদেরকে আতংকিত করে ফেলতে পারে। মুসলিম বাহিনীকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত ভূমিকায় অবতীর্ণ করতে নিজে নেতৃত্বদানের ঝুঁকি নেয়া ছাড়া অন্য কোনো উত্তম সমাধান তিনি আর দেখতে পান না। তিনি জবাব দেন, "না, আল্লাহর নামে বলছি, আমি তা করবো না। আমি কিছুতেই আমার বোঝা অন্যের কাঁধে চাপাবো না।" [১২৭]

শেষ পর্যন্ত আবূ বকরের নেতৃত্বেই একটি ক্ষুদ্র বাহিনী যুকীসসা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। নোমান সেখানে খলীফাকে অভ্যর্থনা জানান। (এই নোমান পরবর্তীকালে পারস্যের নিহাওয়ান্দ বিজেতা হিসেবে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেন)।

আবূ বকর (রা) তাঁর বাহিনীর বাহুদ্বয় ও পশ্চাদভাগ রক্ষাকারী দলের কমান্ড নোমান ও তার ভাইদের হাতে দেন, যেমন তিনি করেছিলেন রাত্রিকালীন আক্রমণের সময় এবং আবরাকের দিকে যাত্রা শুরু করেন। সময়টা ছিল আগস্ট মাসের দ্বিতীয় এবং জমাদি-উল-আউয়াল মাসের তৃতীয় সপ্তাহ।

---

১২৭. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৭৬।

মুসলিম বাহিনী আবরাকে পৌঁছে শত্রুকে যুদ্ধ বিন্যাসে প্রস্তুত দেখতে পায়। বিলম্ব না করে আবূ বকর (রা) তাঁর বাহিনীকে মোতায়েন করেন এবং শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

স্বধর্মত্যাগীদের মনোবল পক্ষকাল পূর্বে যেমন উঁচু ছিল এখন তেমন নয়। যুকীসসার পরাজিত ও পলাতক স্বধর্মত্যাগীগণ আবরাকে অবস্থানকারী স্বধর্মত্যাগীদের সংগে যোগদান করে। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই পরাজিতদের ভগ্ন মনোবলের দ্বারা আবরাকের স্বধর্মত্যাগীরাও প্রভাবিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে স্বধর্মত্যাগীরা কিছু সময়ের জন্য মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। কিছু পরেই তারা রণে ভংগ দিয়ে পলায়ন করা আবূ বকর (রা) আর একটি বিজয়ের গৌরব অর্জন করেন।

আবরাক হতে পলাতক এবং আশেপাশের এলাকার অন্যান্য গোত্রের স্বধর্মত্যাগীগণ বুযাখায় গমন করে। স্বধর্মত্যাগীদের নেতা তুলায়হাও সামীরা হতে তথায় হাজির হয়। অবশ্য এই এলাকার কিছু গোত্র খলীফার প্রেরিত একটি দলের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। খলীফা আবরাক বিজয়ের পর এই দলটিকে পাঠিয়েছিলেন আশেপাশের এলাকা পদানত করার জন্য। কিছু গোত্র অনুতপ্ত হয় এবং যাকাত প্রদান করতে থাকে।

যুদ্ধ বিজয়ের পরদিনেই খলীফা আবরাক হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। মদীনায় ফিরে তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে ক'দিন অতিবাহিত করেন। পরে তিনি উসামার বাহিনী নিয়ে যুকীসসা অভিমুখে যাত্রা করেন। অবশ্য এই বাহিনী এখন আর উসামার বাহিনী নামে পরিচিত নয়। কেননা উসামা তার দায়িত্ব পালন করেছে এবং তার কমান্ডের মেয়াদ শেষ হয়েছে। এই বাহিনী এখন খলীফার নেতৃত্বে ইসলামের বাহিনী নামে পরিচিত।

যুকীসসায় পৌঁছে আবূ বকর (রা) ইসলামের বাহিনীকে ক'টি কোরে বিভক্ত করেন আরবের বিভিন্ন এলাকা দখলকারী শত্রুদের মুকাবিলা করার জন্য। বস্তুত মুসলমানদের দখলে ছিল সামান্য এলাকা। এই প্রথমবারের মতো মুসলিম বাহিনীকে খলীফার কৌশলগত নির্দেশনার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র কমান্ডের অধীনে স্বতন্ত্র মিশন দিয়ে ক'টি কোরে বিভক্ত করা হয়। এর মধ্য দিয়ে মুসলিম কমান্ডারগণ যুদ্ধকৌশল চর্চার এমন এক বিশাল সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেন যেখানে তাঁরা তাঁদের দক্ষতা দিয়ে গোটা বিশ্বকে বিস্মিত করে ফেলেছিলেন।

৬৩২ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসের চতুর্থ সপ্তাহে (১১ হিজরীর জমাদিউল-আখির মাসের প্রথম দিকে) যুকীসসায় আবূ বকর স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার কৌশল নির্ধারণ করেন। যুকীসসা ও আবরাকে স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানগুলোর লক্ষ্য ছিল প্রাথমিকভাবে মদীনাকে রক্ষা করা ও শত্রুকে বৃহত্তর

অভিযান পরিচালনার সুযোগ না দেয়া। কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল শত্রুকে প্রতিরোধ করে হাতে কিছু সময় নিয়ে মূল মুসলিম বাহিনীকে সুসজ্জিত করা। এই অভিযানগুলোর সাহায্যে আবূ বকর (রা) শত্রুর প্রস্তুতিকে অকার্যকর করে নিজের জন্য এমন একটি ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম হন যেখান হতে পরবর্তী বিশাল অভিযানগুলো পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছিল। স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে আবূ বকরের ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁকে মুকাবিলা করতে হয় অনেককে—বুযাখায় ধর্মদ্রোহী তুলায়হা, বুশায় মালিক বিন নুওয়ারা এবং ইয়ামামায় মিথ্যাবাদী মুসায়লামাকে। তাঁকে আরবের পূর্ব ও দক্ষিণ উপকূলবর্তী বাহরাইন, ওমান, মাহরা, হাজরামাউত ও ইয়েমেনের ব্যাপক এলাকায় ধর্মদ্রোহীদের মুকাবিলা করতে হয়। মক্কার দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলেও বিদ্রোহ দেখা যায়। এমনকি উসামার প্রত্যাবর্তনের পরপরই উত্তর আরবের কুজাও পুনরায় স্বধর্মত্যাগীদের দলে ফিরে যায়।

এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদের অবস্থানকে তুলনা করা যায় অবিশ্বাসের বিশাল সমুদ্রের মাঝে বিশ্বাসের ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের সংগে, বিশাল অন্ধকারের মাঝে একটি জ্বলন্ত প্রদীপের সংগে। শুধু প্রদীপকে জ্বালিয়ে রাখা নয়; আবূ বকরের কাঁধে ছিল চারদিকে সংগঠিত অপশক্তিকে ধ্বংস করে অন্ধকার বিদূরিত করার দায়িত্ব। স্বধর্মত্যাগীরা ঐক্যবদ্ধ না হলেও সংখ্যায় ছিল মুসলমানদের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। আবূ বকরের সংগে ছিল মুসলমানদের মধ্য থেকে বাছাইকরা সে সময়ের উত্তম যোদ্ধাগণ। তাঁর সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল খালিদ বিন ওয়ালীদ আল্লাহর তরবারি।

আবূ বকর (রা) সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাঁর যুদ্ধকৌশল নির্ধারণ করেন এবং মুসলিম বাহিনীকে ক'টি কোরে বিভক্ত করেন। সবচেয়ে শক্তিশালী কোরের কমান্ডার নিযুক্ত করেন খালিদকে। এই কোরের দায়িত্ব ছিল শত্রুর সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটিতে আঘাত হেনে ধ্বংস করা। অন্যান্য কোরের উপরে দায়িত্ব ছিল, শত্রুর প্রধান বাধা ধ্বংস হওয়ার পর অপেক্ষাকৃত দুর্বল গোত্রগুলোকে আঘাত হেনে শায়েস্তা করা। দু'টি কোরকে সংরক্ষিত শক্তি হিসেবে রাখা হয়, খালিদ বা অন্য কারও প্রয়োজনে সহায়তা করার জন্য। পরিকল্পনা অনুযায়ী খালিদ প্রথম অভিযান পরিচালনা করবেন। তাঁর উপরে দায়িত্ব ছিল শত্রুর সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটিগুলো একের পর এক আঘাত হানার। তাঁর সাফল্যের উপর ভিত্তি করে অন্যান্য কোর অভিযান পরিচালনা করবে। আবূ বকরের পরিকল্পনা ছিল প্রথমে পশ্চিম-মধ্য আরবের (মদীনার নিকটবর্তী এলাকা) শত্রুমুক্ত করা। তারপর মালিক বিন নুওয়ায়রা এবং সর্বশেষে প্রধান শত্রু মিথ্যাবাদী মুসায়লামাকে দমন করা। এভাবেই আবূ বকর (রা) শত্রুর বিভিন্ন দলকে স্বতন্ত্রভাবে এবং দফায় দফায় মুকাবিলা করে শক্তির সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করেন এবং ধাপে ধাপে নিকট হতে দূরের শত্রুকে আঘাত হানার পরিকল্পনা নেন।

খলীফা স্বতন্ত্র কমান্ডের অধীনে ১১টি কোর গঠন করেন।[১২৮] প্রত্যেক কোরকে একটি করে পতাকা প্রদান করা হয়। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত জনশক্তিকে কোরগুলোতে ভাগ করে দেয়া হয়। কিছু কিছু কোরকে জরুরী ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনার মিশন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় এবং কিছু কোরকে এমন মিশন দেয়া হয় যে ক্ষেত্রে পরে অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত হয়। কমান্ডারগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয় পথ হতে সাহসী যোদ্ধাগণকে দলভুক্ত করে নিয়ে লক্ষ্যবস্তুর দিকে অগ্রসর হতে। ১১টি কোরের কমান্ডার ও তাদের লক্ষ্যবস্ত ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. খালিদ ঃ প্রথমে বুজাখায় তুলায়হা এবং পরে বুতায় মালিক বিন নুওয়ায়রা।
২. ইকরামা বিন আবু জহল ঃ ইয়ামামায় মুসায়লামাকে ব্যস্ত রাখা এবং আরও শক্তি সংযোজিত না হওয়া পর্যন্ত সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়া।
৩. আমর ইবনুল আস ঃ তাবুক এবং দাউমাত-উল-জান্দাল এলাকায় কুজা ও ওয়াদিয়া গোত্রের স্বধর্মত্যাগীগণ।
৪. সুরাহবীল বিন হাসানা ঃ ইকরামাকে অনুসরণ করে খলীফার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করা।
৫. খালিদ বিন সাঈদ ঃ সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকার কতিপয় স্বধর্মত্যাগী গোত্র।
৬. তুরায়ফা বিন হাজীজ ঃ মদীনা এবং মক্কার হাওয়াযিন ও বনী সুলায়মের স্বধর্মত্যাগী গোত্রগুলো।
৭. আলা বিন হাদরামী ঃ বাহরাইনের স্বধর্মত্যাগীগণ।
৮. হুযায়ফা বিন সিহসান ঃ ওমানের স্বধর্মত্যাগীগণ।
৯. আরাফজাবিন হারসামা ঃ মাহরার স্বধর্মত্যাগীগণ।
১০. মুহাজির বিন আবু উমাইয়া ঃ প্রথমে ইয়েমেনের স্বধর্মত্যাগী, পরে হাজরামাউতের কিন্দা।
১১. সুওয়াইদ বিন মুকাররিণ ঃ উত্তর ইয়েমেনের উপকূলবর্তী এলাকার স্বধর্মত্যাগীগণ।

কোর সংগঠন ও দায়িত্ব বন্টনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার সংগে সংগে খালিদ যাত্রা শুরু করেন। কিছু পরে ইকরামা ও আমর ইবনুল আসও যাত্রা শুরু করেন। বাকি

১২৮. কোর শব্দটিকে সাধারণ অর্থে একটি স্বতন্ত্র কমান্ড বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানকালের সেনাবাহিনীতে তিন ডিভিশন সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত কোরের সাংগঠনিক কাঠামোর সংগে এই কোর শব্দ প্রয়োগের কোনো সম্পর্ক নেই।

কোরগুলোকে খলীফা ক'সপ্তাহ এমনকি ক'মাস পরে যাত্রা করতে বলেন। খালিদের অপারেশনের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে খলীফা বাকি কোরগুলোকে ছাড়েন।

যুকীসসা হতে বিভিন্ন স্বধর্মত্যাগী গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার পূর্বে খলীফা তাদের নিকট দূত পাঠিয়ে ইসলামের শান্তির পথে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানান। দূতগণ খলীফার পক্ষ হতে বিদ্রোহী গোত্রগুলোর নিকট এই বাণী পৌঁছে দেয় যে, যারা ইসলামের ছায়াতলে প্রত্যাবর্তন করবে তাদেরকে ক্ষমা করে শান্তিতে বসবাস করতে দেয়া হবে; আর যারা মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধ করবে তাদেরকে যুদ্ধের মাধ্যমে নির্মূল করা হবে এবং তাদের মহিলা ও শিশুদেরকে দাসে পরিণত করা হবে। কোনো গোত্রকে আক্রমণ করার পূর্বে মুসলিম বাহিনী আযানের মাধ্যমে নামাযে আহ্বান জানাতো। কোনো গোত্র আযানে সাড়া দিলেই মনে করা হতো তারা ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করেছে।

কোর কমান্ডারগণকে খলীফা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়া ছাড়া নিম্নরূপ সাধারণ নির্দেশাবলী প্রদান করেন ঃ

ক. তোমার লক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট গোত্রের সংগে প্রথমে যোগাযোগ স্থাপন করো।

খ. আযানের মাধ্যমে নামাযের প্রতি আহ্বান করো।

গ. গোত্রের লোকজন আযানে সাড়া দিলে আক্রমণ করিও না। আযানের পর তাদেরকে জিজ্ঞেস করো তারা যাকাত প্রদানসহ ইসলামের পূর্ণ আনুগত্য করতে প্রস্তুত কিনা। তারা তা করতে রাজী হলে আক্রমণ করিও না।

ঘ. যারা আনুগত্য স্বীকার করবে তাদেরকে উৎপীড়ন করা হবে না।

ঘ. যারা আযানে সাড়া দিবে না এবং আযানের পরেও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিবে না তাদেরকে আগুন ও তরবারির সাহায্যে শায়েস্তা করা হবে।

চ. যেসব স্বধর্মত্যাগী মুসলমানদের হত্যা করেছে, তাদেরকেও হত্যা করা হবে এবং যারা মুসলমানদেরকে অগ্নিদগ্ধ করে মেরেছে, তাদেরকেও অগ্নিদগ্ধ করা হবে।[১২৯]

উপরিউক্ত নির্দেশসমূহ প্রদানের পর রাসূলুল্লাহ (সা) এক সময়ের নম্র, ভদ্র ও সদা বিনয়ী সহযোগী আবূ বকর (রা) অত্যন্ত কঠোরহস্তে ইসলামের শত্রুকে দমন করার লক্ষ্যে মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযানের সূচনা করেন।

---

১২৯. তারারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৮২।

ভণ্ড নবী তুলায়হা

আসওয়াদের মৃত্যুর পর অবশিষ্ট ভণ্ড নবীদের মধ্যে তুলায়হা বিন ওয়ালাদই প্রথম ব্যক্তি যে মুসলমানদের সংগে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। সে ছিল বনী আসাদ গোত্রের প্রধান এবং দীর্ঘ দিন ধরে সুযোগমতো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরোধিতা করে আসছিল।

ওহুদ যুদ্ধের তিন মাস পরে তুলায়হা প্রথম ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। যুদ্ধে মুসলমানগন খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভেবে এই সুযোগে মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে সে তার গোত্রের লোকদেরকে সমবেত করে। রাসূলুল্লাহ (সা) এই সংবাদ পেয়ে ১৫০ জনের এক অশ্বারোহী দলকে প্রেরণ করেন তাকে শায়েস্তা করার জন্য। তুলায়হা কিছু বুঝে ওঠার পূর্বেই অশ্বারোহী দল দ্বারা আক্রান্ত হয়। তার লোকজন বিচ্ছিন্নভাবে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। মুসলিমগণ তাদের পশুগুলোকে নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। এই ঘটনায় তুলায়হা তার গোত্রের নিকট এমন হেয়প্রতিপন্ন হয় যে, কিছুকাল সে নিশ্চুপ থাকে।

এরপর তুলায়হা খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ইহুদীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে বনী আসাদ গোত্রের একটি দল নিয়ে মদীনা অবরোধে অংশগ্রহণ করে। আবু সুফিয়ান অবরোধ প্রত্যাহার করলে বনী আসাদও তাদের আবাসস্থলে ফিরে যায়। এবারেও তুলায়হাহেয় প্রতিপন্ন হয়।

পরবর্তীতে ৬২৮ খৃস্টাব্দে (৭ হিজরী) মুসলিম বাহিনী খায়বারে ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করলে তুলায়হা তার গোত্রের লোকদেরকে নিয়ে ইহুদীদের পক্ষে যোগদান করে। মুসলিম বাহিনী খায়বারের পথে যাত্রাকালে তুলায়হা কয়েকদফা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে কিন্তু প্রত্যেকবারই ব্যর্থ হয়। শেষে সে ইহুদীদেরকে তাদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে তার বাহিনী প্রত্যাহার করে।

দুবছর পরে 'প্রতিনিধিদলের বছরে', বনী আসাদ গোত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে। অন্যান্য অনেক আরব গোত্রের মতো গোটা গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। এই ধর্মান্তরের পেছনে প্রকৃত বিশ্বাসের চেয়ে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান। তুলায়হাও লোক-দেখানো ইসলাম গ্রহণ করে। সে পূর্বের মতোই তার গোত্রে ভাগ্যগণনাকারী ও

গোত্রপ্রধান হিসেবে বিশেষ মর্যাদা ভোগ করতে থাকে। সে ভবিষ্যৎ ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সম্পর্কে বলতে পারত এবং সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করত।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের কয়েকদিন পূর্বেই তুলায়হা নিজেকে নবী হিসেবে ঘোষণা করে। সে তার গোত্রের লোকদেরকে ডেকে তাকে অনুসরণ করতে বলে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সে আরও তৎপর হয়ে ওঠে। স্বধর্মত্যাগের বহ্নিশিখা আরবের চারদিকে বিস্তার লাভ করলে গোটা বনী আসাদ গোত্র তার পতাকা তলে সমবেত হয় এবং তাকে গোত্রপ্রধান ও নবী হিসেবে স্বীকার করে নেয়। মদীনার সংগে সম্পর্ক বিচ্ছেদের প্রতীক হিসেবে তুলায়হা তার এলাকার মুসলিম কর আদায়কারী জাররার বিন আল-আযওয়ারকে বহিষ্কার করে।

নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করার পর তুলায়হা ধর্মের কিছু নিয়ম-কানুন পরিবর্তনের চিন্তা করে যাতে তার অনুসারীরা তাকে প্রকৃতই স্রষ্টার প্রেরিত পুরুষ মনে করে। এ ব্যাপারে সে নামায পড়ার পদ্ধতিকে পরিবর্তন করাই সবচেয়ে উত্তম বিষয় হিসেবে মনে করে। সে নামাযে রুকূ ও সিজদার বিলুপ্তি ঘোষণা করে। সে বলে, "আল্লাহ চান না যে আমরা আমাদের মুখমণ্ডল নীচু করি এবং পিছন দিক কুৎসিত ভাবে ভাঁজ করি। তোমরা দাঁড়িয়ে নামায পড়ো[১৩০] " এবং বনী আসাদ গোত্রের লোকেরা তুলায়হার পিছনে রুকূ ও সিজদা ছাড়া নামায পড়তে থাকে। স্বধর্মত্যাগের বিস্তারলাভের সংগে সংগে তুলায়হার সমর্থক সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। উত্তর-মধ্য আরবের গাতফান ও তেয় গোত্রের নিকট হতেও সে সমর্থন লাভ করে। বিখ্যাত হাওয়াযিন ও বনী সুলায়ম গোত্র দু'টিও স্বধর্মত্যাগীদের দলে যোগদান করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তবে তারা তুলায়হার পতাকা তলে শামিল হয়নি।

গাতফান গোত্রের একটি অংশের শক্তিশালী নেতা এক চক্ষুবিশিষ্ট উয়াইনা বিন হিসন তুলায়হাকে সমর্থন জানায়। এই লোকটিই খন্দকের যুদ্ধে গাতফান গোত্রের যোদ্ধাদেরকে কমান্ড করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বোকা উপাধি দিয়েছিলেন। উয়াইনা তুলায়হাকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস না করলেও তার বক্তব্য ছিল, "আমি কোরেশ গোত্রের কোনো নবীকে মানার চেয়ে সমমনা গোত্রের একজন নবীর অনুসারী হওয়াকে শ্রেয় মনে করি। তাছাড়া মুহাম্মদ মৃত কিন্তু তুলায়হা জীবিত।"[১৩১] তার সমর্থন তুলায়হার জন্য ছিল খুবই মূল্যবান। কেননা সে গোটা গাতফান গোত্রকে তুলায়হার পতাকা তলে একত্র করতে সমর্থ হয়েছিল।

তুলায়হা বনী আসাদ গোত্রকে সামীরায় একত্র করে। গাতফানরাও সামীরায় বনী আসাদের সংগে একত্রিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তে'য় গোত্রের সদস্যরাও তুলায়হাকে গোত্রপ্রধানদের প্রধান ও নবী হিসেবে স্বীকার করে নেয়। তাদের এক অংশ সামীরায়

---

১৩০. ইবন-উল-আছির ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ১৩১।
১৩১. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৮৭।

তুলায়হার সংগে যোগদান করে বাকি অংশ উত্তর ও উত্তর-পূর্ব খায়বারে অবস্থান করতে থাকে। তুলায়হা ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

আবরাক ও যুকীসসায় ধর্মদ্রোহী গোত্রগুলো সমবেত হওয়ার খবর শুনে তুলায়হা তার ভাই হিবালের নেতৃত্বে একটি দল পাঠিয়েছিল তাদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য। (আবরাক ও যুকীসসায় মুসলিম বাহিনীর অভিযানের বর্ণনা পূর্বেই দেয়া হয়েছে।) এই অভিযান চলাকালে তুলায়হা তার বাহিনী নিয়ে বুজাখায় উপস্থিত হয়। আবরাক যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলাতক স্বধর্মত্যাগীরা বুজাখায় তুলায়হার সংগে যোগদান করে।

বুজাখায় তুলায়হার যুদ্ধ প্রস্তুতি খুব দ্রুত চলতে থাকে। সে বহু গোত্রের নিকট দূত প্রেরণ করে তার সংগে যোগদান করার আহ্বান জানায় এবং কিছু কিছু গোত্র তার সংগে যোগদানও করে। উয়াইনা বনী ফাজারার ৭০০ যোদ্ধাসহ তুলায়হার সংগে যোগদান করে। সর্ববৃহৎ সমাবেশ ঘটায় বনী আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়। তে'য় গোত্রের একটি অংশও বুজাখায় সমবেত হয়, তবে প্রধান অংশটি বুজাখা থেকে দূরে থাকে। খালিদের যুকীসসা হতে অভিযান শুরুর প্রাক্কালে তুলায়হা যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হয়ে যায়।

খালিদ (রা) তুলায়হার বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর পূর্বেই আবূ বকর (রা) তুলায়হার শক্তি খর্ব করার পথ খুঁজতে থাকেন যাতে বিজয়ের অধিকতর সম্ভাবনা নিয়ে লড়াই শুরু করা যায়। বনী আসাদ ও গাতফান সম্পর্কে করার কিছুই ছিল না। কেননা তারা তুলায়হার পেছনে খুব শক্তভাবে ছিল। তবে তে'য় গোত্রের বিষয়টি ছিল কিছুটা ভিন্ন। তুলায়হার প্রতি তাদের সমর্থন এতো শক্ত ছিল না এবং তাদের গোত্রপ্রধান আদী বিন হাতিম ছিলেন একজন ভক্ত মুসলিম (আদীর আয়ু ছিল ১২০ বছর এবং তিনি এতো লম্বা ছিলেন যে, তিনি ঘোড়ায় চড়তেন তার পা মাটি স্পর্শ করতো[১৩২])। আদী তাঈ গোত্রের লোকদেরকে ধর্মদ্রোহিতা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ফলে তিনি তাঁর কিছু বিশ্বস্ত সমর্থককে নিয়ে খলীফার সংগে যোগদান করেন। আবূ বকর (রা) এই সময় তাঈ গোত্রকে তুলায়হা থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাদেরকে স্বধর্মত্যাগ থেকে বিরত করতে না পারলে তাদের প্রধান অংশকে বুজাখায় তুলায়হার সংগে মিলিত হওয়ার পূর্বেই বর্তমান অবস্থানে দ্রুত আক্রমণ করে ধ্বংস করা সম্ভব হবে। এতে তুলায়হার শক্তি খর্ব হবে।

আবূ বকর (রা) আদীকে প্রেরণ করেন তার গোত্রের লোকদেরকে প্রভাবিত করার জন্য। তিনি তার সংগে খালিদকেও প্রেরণ করেন ৪,০০০ মুজাহিদসহ। খালিদের প্রতি খলীফার নির্দেশ ছিল, "আদীর প্রচেষ্টা সফল না হলে, বর্তমান অবস্থানেই তাঈ গোত্রের প্রধান অংশের মুকাবিলা করো।"[১৩৩] তারপর খালিদকে বুজাখায় অগ্রসর হতে বলা হয়। (আট নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য)।

---

১৩২. ইবনে কুতায়বা ঃ পৃষ্ঠা - ৩১৩।

১৩৩. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৮৩

ম্যাপ - ৮ : আরবে মুর্তাদদের বিদ্রোহ - ২
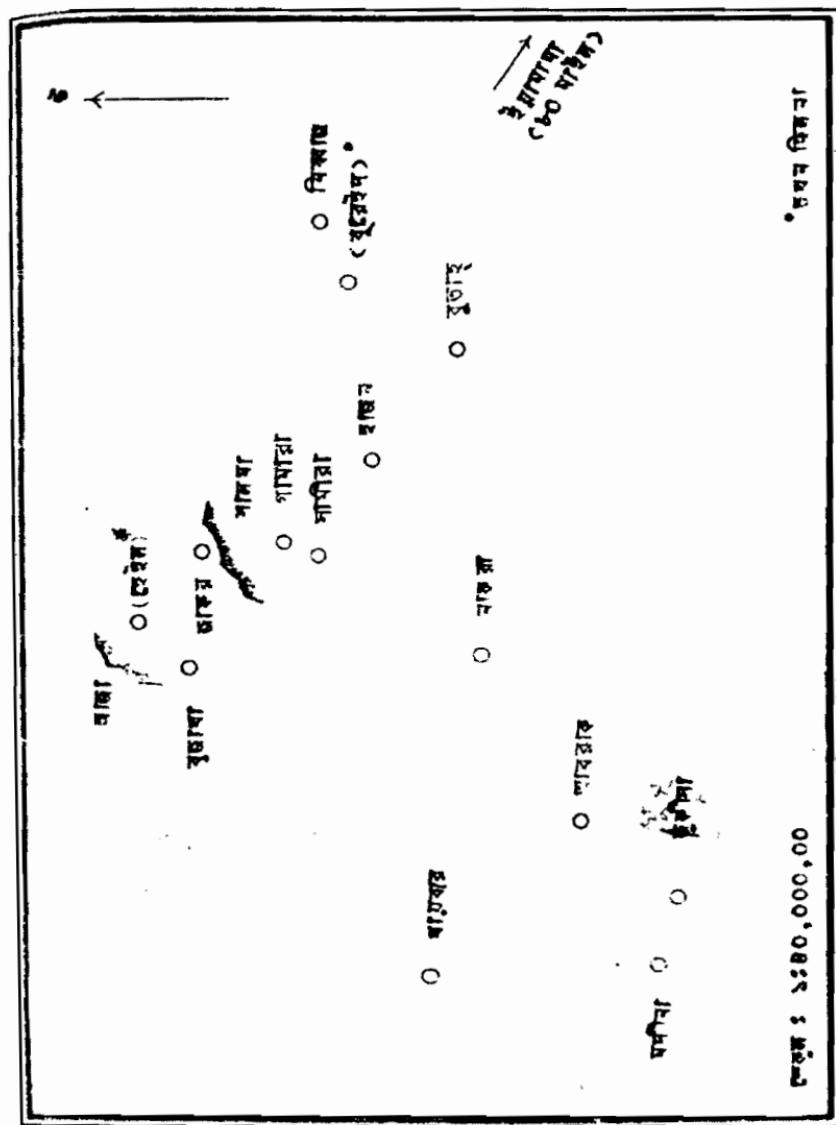
খালিদ (রা) যুকীসসা ত্যাগ করে বুজাখার দিকে যাত্রা করেন। বুজাখার কাছাকাছি পৌঁছে তিনি বামে মোড় নিয়ে আজা পর্বতের দিকে অগ্রসর হন। এ পর্বতটির পাশেই সমবেত হয়েছে তাঈ গোত্রের লোকেরা। আদী অগ্রসর হয়ে তাঁর গোত্রের লোকদের নিকট গিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, আখিরাতের শাস্তি ও ইসলামের উত্থানকে বাধাদানের প্রচেষ্টায় অনিবার্য ব্যর্থতার কথা বলে তাদেরকে সত্যপথে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে ব্যর্থ হন। উপায় না দেখে আদী হুমকি দিয়ে বলেন, "তাহলে এমন একটি বাহিনীর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হও, যে এসে তোমাদেরকে ধ্বংস করে তোমাদের মহিলাদেরকে বন্দী করে নিয়ে যাবে।"

এই হুমকিতেই কাজ হয়ে যায়। তাঈ গোত্রের বয়স্ক লোকেরা তাকে বলে, "এই বাহিনীকে দূরে রাখ যতোক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তুলায়হার সংগে যোগদানকারী আমাদের ভাইদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারি। তার সংগে আমাদের একটি চুক্তি আছে। এখন এই চুক্তি ভংগ করলে হয় সে আমাদের ভাইদেরকে হত্যা করবে, নয় তাদেরকে পণবন্দী হিসেবে আটক করবে। তুলায়হার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করার পূর্বেই তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে।"

আদী মুসলিম বাহিনীর ক্যাম্পে ফিরে খালিদ (রা)-কে সবকিছু অবগত করেন। খালিদ (রা) আলোচনা করে সময় নষ্ট না করার পক্ষে মত দান করেন। তিনি স্বধর্মত্যাগীদের প্রতি খুবই কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। আদী মাত্র তিন দিন অপেক্ষা করার জন্য বার বার অনুরোধ করে বলেন, "আমি আমার গোত্রের ৫০০ যোদ্ধাকে দেবো আপনার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য। এর চেয়ে কি তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারাটাই উত্তম কাজ হবে।"[১৩৪] খালিদ (রা) অপেক্ষা করতে সম্মত হন।

তাঈ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ একটি অশ্বারোহী দলকে তুলায়হার নিকট প্রেরণ করে দৃশ্যত তার শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য। তারা খালিদ (রা)-এর বুজাখায় পৌঁছার পূর্বেই গোত্রের যোদ্ধাদেরকে তুলায়হার নিকট হতে সরিয়ে নেয়ার জন্য গোপনে কাজ শুরু করে দেয়। একাজে তারা সাফল্য লাভ করে। তাঈ গোত্রের গুটিকয়েক লোক তুলায়হার সংগে থাকলেও বুজাখার যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

খালিদ (রা) তাঈ গোত্রকে আক্রমণ না করার ব্যাপারে সম্মত হলেও পার্শ্ববর্তী এলাকা জাদেলায় বসবাসকারী অন্য একটি স্বধর্মত্যাগী গোত্রকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই ঘোষণা শুনে আদী পুনরায় খালিদের নিকট গিয়ে রক্তপাতের পরিবর্তে আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের ছায়াতলে পুনরায় ফিরিয়ে আনার প্রেচষ্টা চালানোর প্রস্তাব রাখেন। খালিদ (রা) রক্তপাতের ব্যাপারে

১৩৪. পূর্বোক্ত।

আদৌ উদ্বিগ্ন না হলেও তার শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। আদীর প্রচেষ্টায় জাদেলাবাসীগণ ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসে এবং ১,০০০ যোদ্ধা খালিদের সংগে যোগদান করে। তাঈ গোত্রের ৫০০ অশ্বারোহী ও জাদেলার ১০০০ যোদ্ধার শক্তি সমন্বয়ে খালিদ (রা) এখন পূর্বের তুলনায় অনেক শক্তিশালী। তিনি বুজাখার দিকে অভিযান শুরু করেন এবং পথে আরও যোদ্ধা সংগ্রহ করেন।

বুজাখায় পৌঁছানের একদিনের রাস্তা বাকি থাকতেই শত্রু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য খালিদ (রা) সম্মুখে দুজন স্কাউট প্রেরণ করেন। এদের দু'জনই ছিল আনসার এবং এই দু'জনের একজন ছিল বিখ্যাত সাহাবী উক্কাসা বিন মিহসান। স্কাউটদ্বয় একই উদ্দেশ্য নিয়ে আগত দু'জন ধর্মদ্রোহীর সাক্ষাৎ লাভ করে। যাদের একজন ছিল তুলায়হার ভাই হিবাল। হিবাল সংঘর্ষে মৃত্যুবরণ করে এবং অন্যজন পালিয়ে গিয়ে এই দুঃসংবাদ তুলায়হার নিকট পৌঁছে দেয়।

ভাই-এর মৃত্যু সংবাদে ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে তুলায়হা অপর এক ভাই সালমাকে সংগে নিয়ে অগ্রসর হয়। উভয় দলের সাক্ষাত হলে তারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়। তুলায়হা ও উক্কাসা উভয়েই ছিল দক্ষ তরবারি চালক। সালমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অপর মুসলিম স্কাউট প্রাণত্যাগের পরেও উক্কাসা দীর্ঘ সময় ধরে তুলায়হার সংগে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত শাহাদৎ বরণ করেন। এই মৃতদেহ দু'টি মুসলিম বাহিনী এসে উদ্ধার করে কবর না দেয়া পর্যন্ত সেখানেই পড়ে থাকে। মুসলিম যোদ্ধাগণ তাদের এই দুই প্রিয় সাথীর শাহাদতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

খালিদ (রা) বুজাখার সমতল ভূমির দক্ষিণ অংশে পৌঁছে শত্রুশিবিরের অদূরে ক্যাম্প স্থাপন করেন। উভয় পক্ষ এই ক্যাম্প হতে বের হয়েই যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রটি ছিল বুজাখার সমতল ভূমির খোলা মাঠ এবং পশ্চিম ও উত্তর দিকের ক্ষুদ্র পাহাড়ী এলাকার সমন্বয়ে গঠিত। এই পাহাড়ী এলাকাটি ছিল আজা পবর্তমালার দক্ষিণ-পূর্ব অংশের বিস্তৃত অংশ।[১৩৫] (আট নম্বর ম্যাপ)

বুজাখার যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন। উভয় পক্ষ পরদিন প্রভাতের জন্য অপেক্ষমাণ। আল্লাহর তরবারি খালিদ (রা) প্রায় ৬ হাজার মুজাহিদসহ ইসলামের শত্রু তুলায়হার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত। তুলায়হার বাহিনীর সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া না গেলেও মনে করা হয় যে, তার সৈন্য সংখ্যা ছিল মুসলিম বাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি। সময়টি ছিল ৬৩২ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝা-মাঝি (১১ হিজরীর জমাদিউল আখির মাসের শেষ দিকে)।

---

১৩৫. বুজাখার কোন চিহ্ন বর্তমান নেই, তবে যে সমতল ভূমিটি বুজাখা নামে পরিচিত সেটি বর্তমান হেইল-এর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ২৫ মাইল দূর হতে শুরু হয়ে সামনে বিস্তৃত হয়েছে।

খালিদের উপস্থিতির পরবর্তী সকালে বুজাখার সমতল ভূমিতে উভয় বাহিনী যুদ্ধের বিন্যাসে মুখোমুখি হয়। খালিদ (রা) স্বয়ং তাঁর বাহিনী কমান্ড করেন এবং বাহিনীর সম্মুখভাগে অবস্থান গ্রহণ করেন। তুলায়হা অবশ্য তার বাহিনী পরিচালনার জন্য উয়াইনাকে মনোনীত করে। উয়াইনা তার গোত্র বনী ফাজারার ৭০০ যোদ্ধাসহ বাহিনীর মধ্যখানে স্থান নেয়। তুলায়হা তার বাহিনীর পিছনে কিছু দূরে তাঁবুতে আসন গ্রহণ করে। তার মাথায় পাগড়ি জড়ানো এবং কাঁধে দু'দিক দিয়ে নক্‌শা করা কাপড় ঝুলানো। তুলায়হা এমন ভংগিতে আসন গ্রহণ করে যার মাধ্যমে সে তার বাহিনীকে জানাতে চায় যে, সে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর বার্তাবাহক জিবরীলের নিকট হতে নির্দেশ লাভ করবে।

যুদ্ধ শুরুর সংগে সংগে খালিদ (রা) গোটা সম্মুখভাগ জুড়ে আক্রমণ পরিচালনা করেন। কিছু সময়ের জন্য ধর্মদ্রোহীরা শক্ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, বিশেষ করে বনী ফাজারার যোদ্ধারা। অল্প সময়ের মধ্যে মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের চাপে শত্রু বাহিনীর সম্মুখভাগে ভাঙ্গন ধরে। উয়াইনা আক্রমণের চাপে আতংকিত হয়ে পড়ে এবং তুলায়হার তাঁবুতে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, জিবরীল কি কোনো নির্দেশ নিয়ে এসেছে।" ধীর শান্তকণ্ঠে উত্তর আসে, "না"। উয়াইনা যুদ্ধে ফিরে যায়।

কিছু সময় পরে খালিদ (রা) প্রতিপক্ষের অবস্থানের মধ্যখানে একটি প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করেন, ফলে যুদ্ধের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায়। গোটা যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলতে থাকে। উয়াইনা আবার তুলায়হার নিকট ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, "জিবরীল কি তোমার নিকট এসেছে ?" না, আল্লাহর কসম! ভণ্ড তুলায়হা উত্তর দেয়। উয়াইনা আবার যুদ্ধে ফিরে যায়।

বিজয়ের সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে মুসলিম বাহিনী আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং আরও কিছু ভূমি নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়। স্বধর্মত্যাগীরা তাদের বাহিনীতে একটি পরিপূর্ণ ভাঙন রোধ করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। পরিস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক দেখে উয়াইনা তৃতীয়বারের মতো তুলায়হার নিকট ছুটে যায়। সে অধৈর্যসহকারে জিজ্ঞেস করে, "জিবরীল কি তোমার নিকটে এসেছে ? " তুলায়হা শান্তকণ্ঠে উত্তর দান করে, "হ্যাঁ"। "সে কি বলল", উয়াইনার প্রশ্ন।

তুলায়হা অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে উত্তর প্রদান করে, জিবরীল বলল, "তার মতো তুমিও ঐশীবাণীর বাহক এবং এই দিনটির কথা তুমি কখনও ভুলবে না।" উয়াইনা মুহূর্তের মধ্যে প্রকৃত অবস্থাটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। সে ঘৃণায় চিৎকার করে উঠে, "আল্লাহর কসম! আজকের এই দিনটির কথা অবশ্যই তুমি ভুলবে না।" সে তার গোত্রের যোদ্ধাদের দিকে ফিরে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলে, "ওহে বনী ফাজারার লোকেরা! এই লোকটি ভণ্ড। তোমরা যুদ্ধ পরিত্যাগ করো।"[১৩৬]

---

১৩৬. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৮৫।

তুলায়হার বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থান গ্রহণকারী বনী ফাজারার যোদ্ধাগণ দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। তাদের প্রস্থানের সংগে সংগে ধর্মদ্রোহীদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যায়। অবিশ্বাসীরা দলে দলে চারদিক দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে থাকে। যারা মুসলিম বাহিনীর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাদেরকে টুকরো করে কেটে ফেলা হয়। পলায়নপর অসহায় কিছু যোদ্ধা তুলায়হার নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করে, "তোমার নির্দেশ কি?" তুলায়হা জবাব দেয়, "যারা পারো আমাকে অনুসরণ করো এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করো।"[১৩৭]

এই শেষ নির্দেশ দানের পরেই তুলায়হা পূর্ব থেকেই প্রস্তুত রাখা একটি তেজী উটের পিঠে তার স্ত্রীকে বসিয়ে দেয়। সে নিজে স্প্রীং-এর মতো একলাফে তার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। চোখের নিমিষেই এই ভণ্ড লোকটি তার স্ত্রীসহ ধুলার অন্ধকারে হারিয়ে যায়। বুজাখার যুদ্ধ এখানেই সমাপ্ত হয়। খালিদ (রা) জয়লাভ করেন। ইসলামের দ্বিতীয় শক্তিশালী শত্রু পরাজিত হয় এবং তার বাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়।

তুলায়হা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় কাল্‌ব গোত্রের লোকদের সংগে বসবাস করতে থাকে। তার ধর্মদ্রোহিতার এখানেই সমাপ্তি হয়। তবে তার গোত্রের লোকেরা পুনরায় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেও অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামকে পুনরায় আলিংগন করে এবং তার গোত্রের সংগে মিলিত হয়। এমনকি সে আবূ বকর (রা)-এর শাসনকালেই মক্কায় হজ পালনের উদ্দেশ্যে গমন করে। কিন্তু খলীফা মক্কায় তার উপস্থিতির খবর জেনেও কোনো গুরুত্ব দেননি।

এর দু'বছর পরে তুলায়হা মদীনা গমন করে খলীফা উমর (রা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করে। উমর (রা) অবশ্য তুলায়হাকে কখনই ক্ষমা করেননি। তাকে দেখে তিনি বলেন, "তুমি উক্কাসা বিন মিহসানসহ দু'জন মহান মুসলিমকে হত্যা করেছো। আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে কখনই ভালবাসব না।"

তুলায়হার উপস্থিত বুদ্ধি ছিল খুবই প্রখর। সে উত্তর দেয়, "আল্লাহ আমার হাত দিয়েই তাদেরকে বেহেশতে পাঠিয়েছে। কিন্তু তাদের দ্বারা আমি কোনো ভাবেই উপকৃত হইনি। আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

উমর কঠোরভাবে জবাব দেন, "তুমি যখন বলেছিলে যে, আল্লাহ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তখন তুমি মিথ্যা কথা বলেছিলে।"

"আমার সে বক্তব্য ছিল অবিশ্বাসের ফসল, যা আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। এর জন্য আমাকে এখন দায়ী করা যায় না।"

---

১৩৭. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৮৫।

উমর এই ধূর্ত লোকটির সংগে কথায় সুবিধা করতে না পেরে শেষ চেষ্টা হিসেবে বলেন, "ওহে ধূর্তের রাজা! তোমার ভাণ্ডারে আর কি জাদু অবশিষ্ট আছে ?"

"প্রবল অভিব্যক্তি বৈ আর কিছুই নাই।"[১৩৮]

উমর আর কথা না বাড়িয়ে তুলায়হার নিকট হতে দূরে চলে যান।

তুলায়হা তার গোত্রের নিকট ফিরে যায় এবং ইরাকে তৃতীয় অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত তাদের সংগেই বসবাস করে। সে ইরাক যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করার আগ্রহ ব্যক্ত করে। সে কাদিসিয়া ও নিহাওয়ান্দের বিখ্যাত যুদ্ধে অত্যন্ত স্বাতন্ত্র্য, সাহসিকতা ও দক্ষতার সংগে যুদ্ধ করে শাহাদৎ বরণ করে। তুলায়হা এভাবেই তার ইসলাম বিরোধিতার মূল্য প্রদান করে।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার সংগে সংগে খালিদ (রা) তাঁর বাহিনীর ক'টি দলকে পলায়নপর স্বধর্মত্যাগীদেরকে বন্দী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা পদানত করার জন্য প্রেরণ করেন। একটি দল বুজাখার ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রুম্মানার পাহাড়ী এলাকায় ক'জন ধর্মদ্রোহীকে ধরে ফেলে। কিন্তু তারা কোনোরূপ প্রতিরোধ সৃষ্টি না করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে। খালিদ (রা) স্বয়ং উয়াইনার পেছনে ধাওয়া করেন। উয়াইনা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে বনী আসাদের কতিপয় সদস্যসহ তার গোত্রের লোকদেরকে নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পলায়ন করেছিল। সে মাত্র ৬০ মাইল[১৩৯] দূরে বামারায় (৮ নং ম্যাপ দ্রষ্টব্য) পৌঁছলে খালিদ (রা) তাকে পেছন হতে ধরে ফেলেন। তুলায়হা সম্পর্কে উয়াইনার মোহ ভংগ হলেও সে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য অনুতাপ না করে খালিদ (রা)-কে রুখে দাঁড়ায়। এই জায়গায় একটি ক্ষণস্থায়ী সংঘর্ষ হয়। এতে কিছু ধর্মদ্রোহী নিহত হয় ও কিছু পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। উয়াইনা বন্দী হয়।

উয়াইনার পিতা তার গোত্রের প্রধান ও অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। ফলে উয়াইনা নিজেকে রক্তের বিবেচনায় অদ্বিতীয় ভাবতো। গোত্র প্রধানদের এই তরুণ বংশধর অসহায় বন্দীর বেশে মদীনায় প্রবেশ করে, যদিও খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তার সংগে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

মদীনায় প্রবেশ করার সংগে সংগে ছেয়েমেয়েরা তার পরিচয় জানতে পেরে তার দুর্দশা দেখে তাকে ঘিরে ধরে। তারা তাকে ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে সমস্বরে বলতে থাকে, "ওহে আল্লাহর দুশমন! তুমি বিশ্বাস স্থাপনের পর আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলে।" উয়াইনা প্রতিবাদ জানায় এই বলে যে, "আল্লাহর কসম! আমি

---

১৩৮. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৮৯, বালাযুরী ঃ পৃষ্ঠা - ১০৫-৬।

১৩৯. ঘামরা সামীরা হতে ১৫ মাইল উত্তর-উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। গ্রামটির উপর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উঁচু পাহাড়টিও ঘামারা নামে খ্যাত। ইবনে সাদ এই স্থানটিকে ঘাম্বর নামে উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা - ৫৯০)

কখনই বিশ্বাসী ছিলাম না।” তার অর্থ এই যে, সে কখনোই মুসলমান ছিল না (এটা ছিল তার মিথ্যা দাবি) তাই তাকে ধর্মত্যাগের জন্য অভিযুক্ত করা যায় না।

উয়াইনা আবূ বকর (রা)-এর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে। খলীফা তাকে ক্ষমা করেন। সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার গোত্রের লোকদের সংগে দীর্ঘদিন বসবাস করে।

খলীফা উসমান (রা)-এর শাসনকালে বৃদ্ধ উয়াইনা মদীনায় উপস্থিত হয়ে খলীফার সংগে সাক্ষাৎ করে। সময়টি ছিল সূর্যাস্তের বেশ পরে। উসমান (রা) তাকে আতিথ্য গ্রহণ করে রাতের খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তিনি বিস্মিত হয়ে যান যখন উয়াইনা রোযা রাখার অজুহাতে আমন্ত্রণ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় (রোযা শুরু হয় সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং শেষ হয় সূর্যাস্তের পরে)। খলীফার চোখেমুখে বিস্ময়ের ভাব দেখে উয়াইনা দ্রুত জবাব দেয়, “আমি দিনের চেয়ে রাতে রোযা রাখতে আরাম বোধ করি।”[১৪০]

ঘামারার অভিযান শেষ করে খালিদ (রা) নাকরার দিকে যাত্রা শুরু করেন। নাকরায় বনী সুলায়ম গোত্রের কিছু লোক একত্রিত হয়ে ইসলামের বিরোধিতা অব্যাহত রাখে (৮ নং ম্যাপ)। এই দলটির নেতৃত্বে ছিল আমর বিন আবদুল উযযা নামের একজন হটকারী গোত্রপ্রধান, যে আবু শাজরা নামেই সাধারণভাবে পরিচিত। তুলায়হার পরাজয় হতে এই ব্যক্তিটি শিক্ষা গ্রহণ না করে বরং তার অনুসারীদেরকে ইসলামের বিরোধিতায় সুদৃঢ় রাখার জন্য নিম্নের চরণ ক'টি রচনা করে আবৃত্তি করতে থাকে ঃ

> “আমার বর্শা ধ্বংসের খেলা খেলবে
> খালিদের বাহিনীর সংগে।
> এবং আমার বিশ্বাস তারপর বর্শাটি
> অবশ্যই উমরকেও ধ্বংস করবে।”[১৪১]

নাকারায় পৌঁছেই খালিদ (রা) বনী সুলায়মের উপর একটি দুর্ধর্ষ আক্রমণ পরিচালনা করেন। আসলে বনী সুলায়মের যোদ্ধাদেরকে ঘিরে খালিদের মনে অনেক সুখময় স্মৃতি ছিল। তারা তাঁর অধীনে মক্কা বিজয়, হুনাইনের যুদ্ধ ও তায়েফ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল। শুধু হুনাইন গিরিপথে আকস্মিকভাবে শত্রুর ফাঁদে পড়ে পলায়ন করা ছাড়া (অবশ্য এক্ষেত্রে যে কোনো সৈন্যদলই তাই করতো)

---

১৪০. ইবনে কুতায়বা ঃ পৃষ্ঠা - ৩০৪।
১৪১. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৯৪।

সবক্ষেত্রেই তারা যথেষ্ট সাহসিকতা দেখিয়েছিল। কিন্তু এখন তারাই ধর্মত্যাগীদের দলে ভিড়েছে, কাজেই তাদেরকে ক্ষমা করা যায় না।

প্রাক্তন কমান্ডারের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বনী সুলায়মের যোদ্ধাগণ কিছু সময়ের জন্য ভয়ংকর প্রতিরোধের সৃষ্টি করে এবং কিছু মুসলিম যোদ্ধাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তারা অল্প সময়ের মধ্যে বুঝতে পারে যে, খালিদের শক্ত আঘাত প্রতিহত করা ও তাঁর বাহিনীতে ভাঙন ধরানো খুবই শক্ত কাজ। তাদের অধিকাংশই যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করে এবং বাকিরা পলায়নের মধ্যেই নিরাপত্তা খুঁজে পায়। তাদের কমান্ডার, সৈনিক কবি আবু শাজরা খালিদের হাতে বন্দী হন। তাকে মদীনায় নেয়া হলে সে আবূ বকর (রা)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় ইসলামকে আলিংগন করে।

শেষ জীবনে শাজরা দারিদ্র্যে আক্রান্ত হয়। একদিন সে কিছু সাহায্যের আশায় মদীনা গমন করে। উটটিকে শহরের উপকণ্ঠে বেঁধে রেখে সে মদীনায় প্রবেশ করে। শহরে ঢুকেই সে দেখতে পায় উমর (রা) দরিদ্রদের মাঝে সাহায্য বিতরণ করছেন। ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করে শাজরা উমরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বলে, "আমিও সাহায্যপ্রার্থী।" উমরা (রা) তাকে চিনতে ব্যর্থ হন, কেননা তার চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। উমরা (রা) জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কে?"

"আমি আবু শাজরা।"

মুহূর্তের মধ্যে উমরের স্মৃতিতে অতীতের সমস্ত স্মৃতি ভেসে ওঠে। তিনি গর্জন করে উঠেন, "ওহে আল্লাহর শত্রু! তুমিই কি সেই ব্যক্তি নও যে এই কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলে ?"

> "আমার বর্শা ধ্বংসের খেলা খেলবে
> খালিদের বাহিনীর সংগে।
> এবং আমার বিশ্বাস তারপর বর্শাটি
> অবশ্যই উমরকেও ধ্বংস করবে.....?"

উমর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে তাঁর চাবুক তুলে, (যা ছাড়া তিনি ঘর হতে বের হতেন না) আবু শাজরার প্রতি আঘাত করেন। আবু শাজরা হাত তুলে আঘাতটি প্রতিহত করে উত্তর দেয়, "ইসলামে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আমার সব অপরাধ মুছে যাওয়ার কথা।"[১৪২] এর মধ্যেই দ্বিতীয় আঘাতটি পড়ে।

আবু শাজরা উপলব্ধি করতে পারে যে, কোন যুক্তি দিয়েই উমরের চাবুককে প্রতিহত করা যাবে না। সে পিছন ফিরে যতো দ্রুত সম্ভব দৌড়াতে শুরু করে। উমর (রা)ও উত্থিত চাবুক নিয়ে তার পিছনে ধাওয়া করেন। কিন্তু তিনি ধরতে পারার

---

১৪২. বালাযুবী ঃ পৃষ্ঠা - ১০৭।

পূর্বেই আবু শাজরা উটের কাছে গিয়ে একলাফে পিঠে চড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

আবু শাজরা আর কখনও মদীনায় আসেনি।

বুজাখার যুদ্ধ চলাকালে ক'টি গোত্র নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের ফলাফল অবলোকন করছিল। এই গোত্রগুলো ছিল বনী আমির এবং হাওয়াযিন ও বনী সুলায়মের কিছু অংশ। তারা তুলায়হার প্রতি দুর্বল থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধিমত্তার সংগে যুদ্ধের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে।

যুদ্ধের ফলাফল শীঘ্রই নির্ধারিত হলেও বুজাখায় সহসা শান্তি ফিরে আসে না। উক্ত গোত্রসমূহের লোকেরা খালিদ (রা)-এর নিকট গিয়ে আত্মসমর্পণ করে বলে, "আমরা পুনরায় ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হচ্ছি। আমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি এবং আমরা আমাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে তার নির্দেশ পালন করবো।[১৪৩]

চারদিক হতে অনুতপ্ত আরব গোত্রসমূহের লোকেরা এসে বুজাখায় সমবেত হতে থাকে। তাদের সকলের মুখে একই কথা, "আমরা আত্মসমর্পণ করলাম।" কিন্তু খালিদের প্রতি খলীফার নির্দেশ ছিল প্রতিটি মুসলিম হত্যাকারীকে হত্যা করার। খালিদ (রা) তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, তাদের গোত্রের সকল হত্যাকারীকে হস্তান্তর না করা পর্যন্ত তাদের এই আনুগত্য গ্রহণ করা হবে না। গোত্রসমূহ এই শর্তেই রাজী হয়।

সমস্ত হত্যাকারীকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয়। খালিদ (রা) খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত দান করেন। প্রত্যেকটি হত্যাকারীকে সেভাবে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করা হয় যেভাবে তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করেছিল। কিছু মস্তক ছিন্ন করে, কিছু জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে, কিছু পাথর ছুঁড়ে ও তীর নিক্ষেপ করে এবং কিছু লোককে উঁচু পাহাড়ের উপর হতে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। কিছু লোককে কূপেও ফেলে দেয়া হয়।[১৪৪] প্রাণের বদলে প্রাণ।

দায়িত্ব শেষ করে খালিদ (রা) সব কিছুর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে খলীফার নিকট পত্র লিখেন। খলীফাও তাঁকে তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে এবং সব কাজের অনুমোদন দান করে উত্তর প্রদান করেন।

নাকরার অভিযান শেষ করে খালিদ (রা) বুজাখায় তিন সপ্তাহ অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি অনুতপ্ত ও প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে স্বাগত জানান এবং হত্যাকারীদের শাস্তি বিধান করেন। তারপর তিনি জাফর অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। সেখানে একজন মহিলা শাস্তির অপেক্ষায় ছিল।

---

১৪৩. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৮৬।

১৪৪. তাবারি ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৯০।

সালমা ওরফে উম্মে জিমল ছিল উয়াইনার চাচাতো বোন। তার পিতা মালিক বিন হুযায়ফাও ছিল গাতফান গোত্রের একজন বড় নেতা। তার মা উম্মে কিরফাও ছিল একজন দুর্দান্ত মহিলা এবং স্বীয় গোত্রের লোকদের নিকট তার যথেষ্ট মূল্য ও শ্রদ্ধা ছিল। রাসূল করীম (সা)-এর আমলে সে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বন্দী ও নিহত হয়। কিন্তু গাতফানদের অন্তরে তার স্মৃতি ছিল খুবই উজ্জ্বল। সালমাও যুদ্ধে বন্দী হয়। মদীনায় নেয়া হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে দাসী হিসেবে তাঁর স্ত্রী বিবি আয়েশা (রা)-কে উপহার দেন। সেখানে সালমা ভাল বোধ না করায় বিবি আয়েশা (রা) তাকে মুক্ত করে দেন এবং সে তার গোত্রে ফিরে যায়।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সালমা স্বীয় গুণে গোত্রের নিকট হতে ক্রমান্বয়ে মায়ের মতো শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। আরবের প্রথা অনুযায়ী মহিলাদের গোত্রপ্রধান হওয়াটা স্বাভাবিক না হলেও সালমা নিজ অধিকার বলে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হয়। তার মায়ের একটি চমৎকার উট ছিল। সালমা ঐ উটের পিঠে চড়লে তাকে ঠিক তার মায়ের মতো দেখাতো যা গাতফানদেরকে তাদের মৃত প্রিয় নেত্রীর কথা স্মরণ করিয়ে দিত।

সালমা স্বধর্মত্যাগীদের নেত্রী হিসেবে ইসলামের একজন অন্যতম শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। বুজাখা ও ঘামারার যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলাতক হাওয়াযিন ও বনী সুলায়ম গোত্রের কিছু শক্ত ধর্মদ্রোহী জাফর এলাকায় সালমার সংগে যোগদান করে (৮ নম্বর ম্যাপ দ্রঃ)।[১৪৫] পরাজয় বরণ ও উয়াইনাকে পরিত্যাগ করার জন্য সালমা তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে। তারা সালমার তিরস্কারকে নিঃশব্দে গ্রহণ করে। সালমা অত্যন্ত দৃঢ় হস্তে তার বাহিনীকে সুসংগঠিত করে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে ইসলামের জন্য কঠোর হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে জানতো যে, খালিদ (রা) এখন বুজাখার ঝামেলা থেকে মুক্ত এবং যেকোনো সময় তার মুকাবিলার জন্য অগ্রসর হবে। সে আল্লাহর তরবারির সংগে শক্তি পরীক্ষার জন্য ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করতে থাকে।

খালিদ (রা) বুজাখা ত্যাগ করে জাফরে পৌছার সংগে সংগেই দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়। যথারীতি খালিদ (রা) প্রথমে উদ্যোগী হয়ে আক্রমণ করেন।

খালিদ (রা) বুঝতে পারেন যে, শত্রুর প্রতিবন্ধকতা বেশ শক্ত। কিছু সময়ের মধ্যে তিনি প্রতিপক্ষের বাহুদ্বয়ে কিছুটা ভাঙন ধরাতে সক্ষম হলেও কেন্দ্রের অবস্থাকে

---

১৪৫. জাফরের সাধারণ এলাকা চিহ্নিত করা গেলেও প্রকৃত অবস্থানটি নিশ্চিত নয়। তাবারী জাফরকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বর্ণনা করেন এবং আর্ককে সালমার শহর হিসেবে উল্লেখ করেন। বর্তমানে আর্ক হেইল হতে ৩৫ মাইল দূরে সালমা পাহাড়ী এলাকার উত্তরাংশের পাদদেশে বিস্তৃত এবং রাক্ক নামের একটি গ্রাম হিসেবে পরিচিত। এই রাক্ক হতে ১২ মাইল দক্ষিণে পাহাড়ী এলাকাটির পশ্চিম ঢালে জাফর নামের একটি পর্বত অবস্থিত। আমি মনে করি এটিই সেই জাফর যেখানে আলোচ্য যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল।

খুবই মজবুত বলে মনে হয়। তিনি উপলব্ধি করেন যে, শত্রুবাহিনীর কেন্দ্রস্থলে সালমার অবস্থানের কারণেই এই শক্ত প্রতিবন্ধকতা। সালমা তার মায়ের উটের পিঠে স্থাপিত শিবিকায় বসে প্রচুর সংখ্যক সাহসী যোদ্ধা পরিবেষ্টিত হয়ে তার বাহিনী কমান্ড করছিল। তার নিরাপত্তায় নিয়োজিত যোদ্ধারা ছিল যে কোনো মূল্যেই তাদের প্রিয় নেত্রী ও তার উটকে রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কাজেই সালমার উপস্থিতি যুদ্ধকে প্রলম্বিত ও অহেতুক রক্তপাতে সহায়তা করবে। খালিদ (রা) তাকে দূর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি একদল মুজাহিদকে সাথে নিয়ে সালমার দিকে অগ্রসর হন। কিছু সময়ের তীব্র তরবারি যুদ্ধের পর তিনি উটটির কাছাকাছি পৌঁছতে সক্ষম হন। পরপর কয়েকটি আঘাতে উটটি মাটিতে পড়ে গেলে সংগে সংগে শিবিকাটিও পড়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে সালমা নিহত হয় এবং তার মৃতদেহের আশেপাশে তার নিরাপত্তায় নিয়োজিত আরও শতাধিক যোদ্ধার দেহ নিথর হয়ে পড়ে থাকে।

সালমার মৃত্যুর সংগে সংগে প্রতিপক্ষের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ভেঙে যায় এবং ধর্মদ্রোহীরা বিচ্ছিন্নভাবে চারদিকে ছুটে পালাতে থাকে। তুলায়হার পর সালমাই খালিদকে শক্ত প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি করেছিল।

সাধারণভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, হেইল শহরের ৪০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত সালমা পাহাড়ী এলাকাটির নামকরণ করা হয়েছিল এই সাহসী মহিলা সালমা ওরফে উম্মে জিমলের নামেই। সালমার কৃতিত্ব এজন্য স্মরণীয় যে, সে মহিলা হয়েও সে সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত ও সাহসী সেনাপতি খালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল।

জাফরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৬৩২ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষদিকে (১১ হিজরীর রজব মাসের শেষদিকে)। খালিদ (রা) তাঁর যোদ্ধাদেরকে কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে বলেন। তারপর তিনি মালিক বিন নুওয়ারার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য বুল্লা অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ প্রদান করেন।

সালমার মৃত্যুর সংগে স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়। তুলায়হার নেতৃত্বে উত্তর-মধ্য আরবের যে প্রধান গোত্রসমূহ ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তারা ইতিমধ্যে হয় পরাজিত নতুবা আনুগত্য স্বীকার করেছে এবং তাদের নেতারা হয় নিহত অথবা বন্দী অথবা হয় বিতাড়িত । এই অঞ্চলের কোনো গোত্রপ্রধান আর ইসলামের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে সক্ষম হয়নি।

কিন্তু একজন লোক মুসলমানদের জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে থাকে। তার নাম আয়াস বিন আবদ ইয়ালীল, যদিও সে সাধারণভাবে আল-ফাজাআ নামে পরিচিত। তাকে গোত্রপ্রধান না বলে দস্যুসর্দার বলাই ভাল।

খালিদ বুজাখায় তাঁর বিজয় সংহত করার প্রাক্কালে আল-ফাজাআ আবূ বকরের নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, "আমি একজন মুসলমান। আমাকে অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করুন, আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই।"[১৪৬]

একথা শুনে আবূ বকর (রা) আনন্দচিত্তে তাকে অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করে দেন। সে মদীনা ত্যাগ করে দস্যুদের একটি দল গঠন করে নিরীহ পথচারীদেরকেও লুটপাট হত্যা করতে থাকে। আল-ফাজাআ মক্কা ও মদীনার পূর্বদিকে তার তৎপরতা চালাতে থাকে এবং মুসলিম ও অবিশ্বাসী সকলেই আক্রান্ত হতে থাকে।

আবূ বকর (রা) এই খবর শুনে আল-ফাজাআকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি তাকে জীবিত ধরে আনার জন্য একটি দল প্রেরণ করেন। কয়েকদিন পরেই দস্যুটিকে বন্দী অবস্থায় মদীনায় আনা হয়।

আবূ বকর (রা) মসজিদের সামনে একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করার নির্দেশ দান করেন। আগুনের শিখা দাউ দাউ করে আকাশের দিকে উঠতে থাকলে আল-ফাজাআকে শিকল লাগানো অবস্থায় আগুনে নিক্ষেপ করা হয়।

আবূ বকর (রা) মুমূর্ষু অবস্থায় কয়েকটি বিষয়ে দুঃখ করেছিলেন। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন যে, তিনটি কাজ তিনি করেছেন যা করা উচিত হয়নি এবং তিনটি কাজ তাঁর করা উচিত ছিল যা তিনি করতে পারেন নি। তিনি আল-ফাজাআর সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমি মনে করি আল-ফাজাআকে আগুনে জীবন্ত দগ্ধ করা ঠিক হয়নি বরং তাকে এমনিতেই হত্যা করা যেতো।"[১৪৭]

---

১৪৬. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৯২।

১৪৭. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬১৯, বালাযুরী, পৃষ্ঠা - ১১২, মাসউদী ঃ মুরুজ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা -৩০৮।

ভণ্ড নবী ও মহিলা নবী

মালিক বিন নুওয়ায়রা ছিল বাহরাইনের উত্তরে আরবের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বসবাসকারী শক্তিশালী বনী তামীম গোত্রের একটি বড় অংশ বনী ইয়ারবুর প্রধান। এলাকাটি পারস্যের নিকটবর্তী হওয়ায় বনী তামীম গোত্রের কিছু লোক অগ্নি-উপাসকে রূপান্তরিত হলেও ইসলামের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অধিকাংশ লোক ছিল পৌত্তলিক। মালিকের গোত্রের লোকেরা বুতার[১৪৮] আশেপাশে বসবাস করতো। (৮ নং ম্যাপ দ্র.)।

মালিক একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সে ছিল মহানুভবতা ও আতিথেয়তার জন্য বিখ্যাত। সে সারারাত তার বাড়ির সামনে আলো জ্বালিয়ে রাখতো যাতে পথচারী আগন্তুকদের বুঝতে সুবিধা হয় কোথায় আশ্রয় ও খাবার পাওয়া যাবে। এমনকি সে রাতে উঠে খোঁজখবর নিতো আলো ঠিকমত জ্বালানো হয়েছে কিনা। মালিক ছিল অত্যন্ত সুদর্শন ব্যক্তি। তার মাথাভর্তি চুল ছিল এবং বর্ণনাকারীর মতে চেহারা ছিল 'চাঁদের মতো উজ্জ্বল'।[১৪৯] সে সাহসিকতা ও অস্ত্রচালনার জন্য বিখ্যাত ছিল। কবি হিসেবেও তার খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। মালিকের মধ্যে সে সময়ের একজন চৌকশ আরব পুরুষের সব গুণই ছিল।

লায়লা ছিল আল-মিনহালের কন্যা এবং পরে উম্মে তামীম নামে পরিচিত হয়। সে ছিল তৎকালীন আরবের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলাদের একজন। তার রূপের খ্যাতি আরবের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। লায়লার রূপের খ্যাতির মূলে ছিল তার অদ্ভুত দু'টি চোখ এবং সুদর্শন দু'খানি পা। অবশ্য তার সব অংগই ছিল সুন্দর।[১৫০]

বয়স হলে বহু পুরুষ লায়লার পাণি-প্রার্থী হয়। কিন্তু সকলেই প্রত্যাখ্যাত হয়। শেষ পর্যন্ত লায়লার সাক্ষাৎ ঘটে মালিকের সংগে। মালিকের সংগে তার নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা হবে হয়তো এটাই ছিল বিধির লিখন। মালিক লায়লাকে বিয়ে করে। এভাবেই মালিক তার সবগুণের পাশাপাশি সে সময়ের একজন আকর্ষণীয় মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করে।

---

১৪৮. বুতহ্ বর্তমানে রাস হতে ১৪ মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র বেদুঈন পল্লী। তবে এখনও প্রাচীন বসতির অনেক চিহ্ন বিদ্যমান।

১৪৯. বালাযুরী ঃ পৃষ্ঠা - ১০৮।

১৫০. ইস্ফাহানী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৫। বলা হয় যে, তার পায়ের মতো এতো সুন্দর পা আর কখনও দেখা যায়নি।

মালিক বিন নুওয়ায়রার সবকিছু থাকলেও ছিল না অমূল্য সম্পদ বিশ্বাস।

প্রতিনিধিদলের বছরে বনী তামীম গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলে মালিকও তাদের সংগে যোগদান করে মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়। তার সামাজিক মর্যাদা ও গুণাবলীর কথা বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বনী হানজালা গোত্রের অধিকর্তা নিয়োগ করেন। তার প্রধান দায়িত্ব ছিল কর আদায় করে তা মদীনায় প্রেরণ করা।

মালিক কিছুদিন এই দায়িত্ব অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সংগে পালন করে। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের খবর মালিকের নিকট পৌছার প্রাক্কালে তার হাতে সংগৃহীত করের একটি মোটা অংক ছিল। সে তার আনুগত্যের কথা ভুলে যায় এবং ঘোষণা দেয়, "ওহে বনী হানজালার লোকেরা! তোমরা তোমাদের সম্পদ ফিরিয়ে নাও।"[১৫১] মালিক স্বধর্মত্যাগীদের দলে যোগদান করে।

সাজাহ ছিল আল-হারিসের কন্যা। তার জন্ম হয়েছিল একটি গোত্রপ্রধানের পরিবারে এবং তার মতো নেত্রীত্বের গুণাবলী, ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা নিয়ে খুব কম মহিলাই জন্মগ্রহণ করে। সে ভবিষ্যৎ বলতে পারতো এবং তার কবি প্রতিভা এতো প্রখর ছিল যে, সে যা কিছু বলতো তাই কবিতা হয়ে যেতো। কেউ তার সংগে কথা বললে সে কবিতায় উত্তর দিতো।

সাজাহ পরে উম্মে সাদিরা নামে পরিচিত হয়। পিতৃ পরিচয়ের দিক থেকে সে মালিক বিন নুওয়ায়রার বনী ইয়ারবু গোত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিল। মায়ের দিক থেকে সে ইরাকে বসবাসকারী বৃহত্তর গোত্র রাবীআ'র এক অংশ তাগলিব গোত্রের উত্তরাধিকার। সাজাহ এই তাগলিবের লোকদের সংগেই বসবাস করতো এবং মায়ের প্রভাবে খৃস্ট ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। যদিও তাগলিবের অন্যান্য সদস্যের মতো তার মধ্যেও খৃস্ট মতবাদের প্রভাব তেমন একটা প্রকট ছিল না।

স্বধর্মত্যাগের বাতাস বইতে থাকলে সাজাহ জানতে পারে যে, তুলায়হা ও মুসায়লামা নবী দাবি করেছে। এই সংবাদ তার উর্বর মস্তিস্কে একটি চমকপ্রদ ধারণার সৃষ্টি করে। শুধু পুরুষরাই কেন নবী হবে, মহিলারা কেন এই পবিত্র জগত থেকে দূরে থাকবে। এরূপ একটি চমকপ্রদ আবেগ থেকেই সে নিজেকে নবী বলে দাবি করে এবং কবিতার শ্রুতিমধুর চরণের সাহায্যে এই ঘোষণা দেয়।

বিস্ময়কর হলেও তার মায়ের গোত্রের অধিকাংশ লোকই তাকে মহিলা নবী হিসেবে গ্রহণ করে। সে কিছু সংখ্যক সশস্ত্র ব্যক্তিকে নিয়ে আরবে বসবাসকারী তার পিতার গোত্রের লোকদের নিকট গমন করে। সেখানকার অনেকেই তার সংগে

---

১৫১. বালাযুরী পৃষ্ঠা - ১০৭।

যোগদান করে। তার সংগে অনেকেই যোগদান করেছিল লুটতরাজ ও উত্তর-পূর্ব আরবে বসবাসকারী কতিপয় গোত্রের সংগে তাদের পূর্ব শত্রুতা চরিতার্থ করার মানসে।

অনুসারী সংগ্রহের প্রাথমিক সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে একটি মাঝারি ধরনের বাহিনী নিয়ে আল-হাজনে[১৫২] উপস্থিত হয়ে মালিক বিন নুওয়ায়রার সংগে যোগাযোগ করে। সে তার নিকট যৌথভাবে প্রথমে তাদের পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক শত্রু ও পরিশেষে মদীনায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রস্তাব দেয়। মালিকের মনে তার সম্পর্কে আস্থা সৃষ্টির জন্য সে ঘোষণা দেয় যে, "আমি বনী ইয়ারবু গোত্রের একজন মহিলা মাত্র। বনী ইয়ারবুর ভূমি তোমারই।"[১৫৩]।

মালিক সাজাহর প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং উভয়ে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে। অবশ্য মালিক তাকে কিছুটা শান্ত করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা থেকে তাকে নিবৃত করতে সমর্থ হয়। এসব ঘটেছিল ৬৩২ খৃস্টাব্দের জুন মাসে।

মালিক ও সাজাহর যৌথবাহিনী তাদের বিরুদ্ধাচরণকারী গোত্রসমূহের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশোধ গ্রহণ ও লুটপাট করা। মালিক ব্যক্তিগতভাবে এই অভিযানে অংশগ্রহণ না করলেও তার সৈন্যরা সাজাহর সংগে সক্রিয়ভাবে শামিল হয়। যেসব গোত্র বাধাদান করে তাদেরকে যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত করে তাদের ধনসম্পদ লুট করা হয়।

এরপর সাজাহ নিব্বাজে গিয়ে আশেপাশের এলাকায় লুটতরাজ শুরু করে।[১৫৪] এখানে সে ভয়ংকর ক্ষতির সম্মুখীন হয়। স্থানীয় গোত্রসমূহ এই দুর্ধর্ষ মহিলার ভয়ে ভীত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য একতাবদ্ধ হয় এবং তার বাহিনীকে বাধা দান করে। ফলে একটি যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই যুদ্ধে সাজাহ খুব খারাপ অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং তার বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা প্রতিপক্ষের হাতে বন্দী হয়। সাজাহ তার বাহিনীসহ উক্ত এলাকা পরিত্যাগের প্রতিশ্রুতি না দেয়া পর্যন্ত তারা বন্দীদের মুক্তি দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। সাজাহ বাধ্য হয়ে এই শর্তে রাজী হয়।

এই ঘটনার পর সাজাহর অনুসারী গোত্রসমূহের বয়স্ক ব্যক্তিগণ তার নিকট হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এখন কোথায়'? ইয়ামামায়—সাজাহ উত্তর দেয়। "কিন্তু ইয়ামামার জনগোষ্ঠী খুবই শক্তিশালী এবং তাদের নেতা মুসায়লামাও অত্যন্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তি। 'ইয়ামামায়' সাজাহ আবার একই উত্তর দেয়। তারপর আবৃত্তি করে ঃ

---

১৫২. হাজনের সঠিক অবস্থান পাওয়া যায়নি। তবে হেইল-এ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সামীরা এবং বুতারের মধ্যবর্তী এলাকাটিই হাজন হতে পারে যা হাজম নামে বর্তমানে পরিচিত। ইয়াকুতের বক্তব্যও (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬৬১) অনুরূপ।

১৫৩. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪১৬।

১৫৪. বুরাইদার ২৫ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বর্তমানের নাবকিয়াই নিব্বাজ (স্থানীয় লোকেরা নাবজিয়াও বলে থাকে)। বর্তমানে এটি একটি গ্রাম কিন্তু সে সময় ছিল শহর।

ইয়ামামা অভিমুখে
উড়ন্ত কবুতরের মতো
যেখানে যুদ্ধ হবে ভয়ংকরতম
এবং এজন্য তোমরা দায়ী নও ইয়ামামা অভিমুখে।[১৫৫]

ভণ্ড মুসায়লামা ছিল ইসলামের শত্রুদের মধ্যে অন্যতম এবং সে নতুন রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। সে ছিল হানীফা গোত্রের হাবীবের পুত্র। ইয়ামামায় বসবাসকারী এই গোত্রটি ছিল আরবে বসবাসকারী গোত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ।

মুসায়লামা প্রথম দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয় নবম হিজরীর শেষের দিকে 'প্রতিনিধিদলের বছরে'। এই সময় সে বনী হানীফা গোত্রের প্রতিনিধিদলের সংগে মদীনা গমন করে। প্রতিনিধিদলে এমন দু'জন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিল মুসায়লামা ও তার গোত্রের উপর যাদের ছিল অত্যন্ত প্রভাব। এদের একজন মুসায়লামার উত্থানে সহায়তা ও অপরজন গোত্রকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করেছিল। তাদের নাম ছিল যথাক্রমে নহর আর রাজ্জাল বিন আনফুয়া[১৫৬] ও মুজাআ বিন মারারা।

প্রতিনিধিদল মদীনায় পৌঁছে উটগুলো আগন্তুকদের জন্য নির্দিষ্ট তাঁবুতে বেঁধে মুসায়লামাকে তা পাহারার দায়িত্বে রেখে শহরে প্রবেশ করে তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ইসলামকে আলিংগন করে। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতিনিধিদলের সাদস্যদের মধ্যে উপহার বিতরণ করেন। উপহার গ্রহণকালে একজন মুসায়লামার উপস্থিতির ব্যাপারে ইংগিত দিয়ে বলে, "আমরা আমাদের একজন সংগীকে উটগুলো পাহারা দেয়ার জন্য রেখে এসেছি।" রাসূল (সা) তার জন্যও উপহার দিয়ে বলেন, "সে তোমাদের মধ্যে নগণ্য ব্যক্তি নয় যে তাকেই উট পাহারার জন্য রেখে আসতে হয়েছে।"[১৫৭] পরবর্তীকালে মুসায়লামা রাসূল (সা)-এর এই উক্তিটির দ্বারা অনেক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করেছিল।

মদীনা থেকে ফিরে প্রতিনিধিদল বনী হানীফার লোকদের মাঝে ইসলামের বাণী প্রচার করে। গোটা গোত্রটিই ইসলাম গ্রহণ করে। তারা ইয়ামামায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে নিয়মিত নামায আদায় করতে থাকে।

এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মুসায়লামা নবুয়তের দাবি করে বসে। সে তার গোত্রের লোকদেরকে সমবেত করে রাসূলের সেই উক্তির বরাত দিয়ে বলে," মুহাম্মদ আমাকে নবুয়তের অংশীদার করেছে। তিনি কি আমাদের

১৫৫. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৯৮।
১৫৬. প্রথম যুগের অনেক ঐতিহাসিক এই ব্যক্তির নাম রাহ্হাল বলে উল্লেখ করেছেন।
১৫৭. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৭৬-৫৭৭।

প্রতিনিধিদলকে বলেন নাই যে, আমি তাদের মধ্যে নগণ্য ব্যক্তি ছিলাম না? একথার একটাই অর্থ হয় যে তিনি জানতেন তাঁর নবুয়তে আমার অংশ আছে।"[১৫৮]

সে উপস্থিত লোকদেরকে বিভিন্ন কলাকৌশল দেখিয়ে মুগ্ধ করে ফেলে। সে ছিল একজন দক্ষ জাদুকর। সে এমন সব জাদু দেখাতে পারতো যা পূর্বে কেউ দেখাতে পারেনি। সে বোতলের মধ্যে ডিম ঢুকাতে পারতো, পাখির পালক কেটে আবার এমন ভাবে বিদ্ধ করতে পারতো যাতে পাখি আবার উড়ে যেতো। এসব কলাকৌশল দেখিয়ে লোকদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করতো যে, সে ঐশী ক্ষমতা প্রাপ্ত।

সে লোকদের নিকট নিজেকে আল্লাহর দূত হিসেবে উপস্থাপন করে স্বরচিত কবিতার চরণ আবৃত্তি করতো এবং তাকে কুরআনের বাণী বলে উল্লেখ করতো। তার কবিতার চরণের মূল বিষয় ছিল কোরেশদের তুলনায় তার গোত্র বনী হানীফার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা। কিছু চরণ ছিল সত্যই হাস্যকর। যেমন-

আল্লাহ আমাকে প্রজ্ঞা দিয়েছেন
তা' অনুরূপ শক্তিশালী, যেমন দমকা বাতাস প্রবাহিত হয়
উদর এবং অস্ত্রের মধ্য থেকে।[১৫৯]

মানুষ তার প্রজ্ঞায় চমৎকৃত হয়ে তাকে অনুসরণ করতো। সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে, তারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তের ব্যাপারেও কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করতো না। তারা মুহাম্মদ (সা)-কে নবী হিসেবে স্বীকার করতো এবং মুসায়লামাকে মনে করতো সহকারী নবী যা সে নিজে দাবি করতো।

মুসায়লামার প্রভাব ও কতৃর্ত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে দশম হিজরীর শেষ দিকে। একদিন সে হযরত মুহাম্মদ (সা) -এর নিকট লিখল ঃ

"আল্লাহর বাণীবাহক মুসায়লামার নিকট হতে আল্লাহর রসূল মুহাম্মদের নিকট। আপনাকে অভিনন্দন। আমাকে আপনার নবুয়তে অংশীদার করা হয়েছে। পৃথিবীর অর্ধেকের মালিক আমরা ও বাকি অংশের মালিক কোরেশগণ। তবে কোরেশগণ হচ্ছে শর্তভংগকারী গোত্র।"

উত্তরে রাসূল আকরাম (সা) মুসায়লামাকে লিখেন ঃ

"পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর রসূল মুহাম্মদের নিকট হতে মিথ্যাবাদী ভণ্ড মুসায়লামার নিকট। অভিবাদন তাদেরকে যারা সত্যপথ

---

১৫৮. পূর্বোক্ত।
১৫৯. পূর্বোক্ত

অনুসরণকারী। দেখ, এই পৃথিবীর মালিক আল্লাহ। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে পছন্দ করেন তার উপর এর কর্তৃত্ব প্রদান করেন এবং ভবিষ্যৎ সত্যপথ অনুসারীদের জন্য।"[১৬০]

এই স্বধর্মত্যাগী লোকটি পরবর্তীকালে মিথ্যাবাদী মুসায়লামা (কাযযাব) নামে খ্যাত হয়।

নহর আর-রাজ্জাল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গমনকারী বনী হানীফার প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে, যার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, ... এখন তার ভূমিকা পালনের সুযোগ পায়। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যগণ ফিরে গেলেও সে মদীনায় থেকে যায় এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সান্নিধ্যে অবস্থান করে ইসলাম সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করে। সে কুরআনকে আয়ত্তে নেয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সান্নিধ্যে অবস্থান করে ইসলাম সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করে। সে কুরআনকে আয়ত্বে নেয় এবং রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর সান্নিধ্যে অবস্থান করে ইসলাম সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করে সে কুরআনকে আয়ত্তে নেয় এবং রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়। ক'মাসের মধ্যেই সে একজন ভক্ত ও সত্যসন্ধানী মুসলিম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে এবং আরবের অধিকাংশ এলাকায় তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

মুসায়লামার অপতৎপরতা আশংকাজনক রূপলাভ করলে রাসূলুল্লাহ (সা) তা প্রতিহত করার চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য ইয়ামামা ছিল অনেক দূরে, তাই তিনি একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে মুসায়লামার অনুসারীদের মাঝে তার বিরুদ্ধে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এ কাজের জন্য রাজ্জাল ছাড়া আর কে বেশি উপযুক্ত হতে পারে? সে ছিল বনী হানীফা গোত্রের প্রধান। সে কুরআনের উপর দক্ষতা অর্জন করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সান্নিধ্যে থেকে একজন প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিল। অতএব রাসূলুল্লাহ (সা) তাকেই মুসায়লামার মুকাবিলার জন্য ইয়ামামা প্রেরণ করেন।

ইয়ামামা পৌঁছেই এই বদমাশ লোকটি ঘোষণা দান করে যে, মুসায়লামা সত্যই একজন নবী। সে মিথ্যা বলে, "আমি মুহাম্মদকে এরূপ বলতে শুনেছি।"[১৬১] এবং তার মতো একজন প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তির কথা কে অবিশ্বাস করতে পারে? এই দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক লোকটির আগমনে মুসায়লামা অপ্রত্যাশিত সুবিধা লাভ করে। বনী হানীফার বিপুল সংখ্যক লোক আল্লাহর বাণীবাহক হিসেবে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

মুসায়লামা ও রাজ্জাল যৌথভাবে সত্যপথের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। রাজ্জাল মুসায়লামার প্রধান পরামর্শদাতায় পরিণত হয় এবং ভণ্ড মুসায়লামা তার পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করতো না।

---

১৬০. পূর্বোক্ত ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬০০-৯।
১৬১. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫০৫।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের পর মুসায়লামা বনী হানীফার উপর একক কর্তৃত্ব লাভ করে। সে নৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ করতে শুরু করে। সে মদপানকে বৈধতা দান করে। সে আরও নির্দেশ জারি করে যে, কোনো ব্যক্তি একবার পুত্র সন্তান লাভ করলে তার পর থেকে সে নারী সংশ্রব ত্যাগ করবে। অবশ্য ঐ পুত্র সন্তান মৃত্যুবরণ করলে সে পুনরায় নারীগমন করতে পারবে আর একটি পুত্র সন্তানলাভ না করা পর্যন্ত।

মুসায়লামার অনুসারীরা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, তার অনেক ক্ষমতা আছে এবং রাজ্জাল এই ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। একদিন রাজ্জাল তাকে পরামর্শ দিল যে, নবী মুহাম্মদের অনুকরণে সেও প্রতিটি নবজাতক শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করতে পারে—এই মর্মে নির্দেশ জারি করা হয়। তারপর হতে ইয়ামামার প্রতিটি নবজাতক শিশুকে মুসায়লামার সামনে হাজির করা হতো। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন যে, এই শিশুরা পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পরেও তাদের মাথায় কোনো চুল গজাতো না। এরূপ অনেক ঘটনা আছে যাতে দেখা যায় যে, মুসায়লামা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অনুসরণ করার ফলাফল খারাপ বা বিপরীত হতো।

বনী হানীফার সকলে মুসায়লামাকে অনুসরণ করলেও বুদ্ধিমান লোকেরা তার নবুয়তের বিষয়টি বিশ্বাস করতো না। কেউ রাজনৈতিক কারণে, কেউ ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার কারণে অথবা কেউ গোত্রপ্রীতির কারণে তাকে অনুসরণ করতো। একদিন মুসায়লামা একজন নতুন মুয়াজ্জিন মনোনয়ন করে তাকে নামাযের জন্য আহ্বান জানাতে বলে। জুবায়র বিন উমায়র নামের এই লোকটি ছিল সন্দেহবাদীদের একজন। সে আযান দিতে গিয়ে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল" এই উক্তিটিতে মুহাম্মদের নামের পরিবর্তে শুধু মুসায়লামার নাম ব্যবহার করার কথা থাকলেও তা না করে বরং সে উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে বলে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসায়লামা মনে করে সে আল্লাহর বাণীবাহক।"[১৬২]

একদিন জনৈক বুদ্ধিমান ব্যক্তি মুসায়লামার সংগে সাক্ষাৎ করতে এলো। সে পূর্বে কখনো মুসায়লামাকে দেখে নাই। মুসায়লামার ঘরের দরজায় উপস্থিত হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "মুসায়লামা কোথায়?" 'চুপ' প্রহরী জবাব দিলো, "তিনি হচ্ছেন আল্লাহর বাণীবাহক।" আগন্তুক লোকটি বলল, আমি তাকে চোখে না দেখা পর্যন্ত বাণীবাহক হিসেবে গ্রহণ করবো না। এই লোকটির নাম ছিল তালহা।

তালহা স্বধর্মত্যাগী লোকটির সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করে, "তুমিই কি মুসায়লামা ?"

"হ্যাঁ"।

"তোমার নিকট কে অবির্ভূত হয়েছিল?"

---

১৬২. বালাযুরী, পৃষ্ঠা - ১০০।

"রহমান" (আল্লাহর একটি নাম যার অর্থ দয়াময়)।

"আলোতে না অন্ধকারে ?"

"অন্ধকারে"।

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি", তালহা ঘোষণা করে-"তুমি একজন ভণ্ড ও প্রতারক এবং মুহাম্মদই প্রকৃত রাসূল। কিন্তু আমার নিকট কোরেশ গোত্রের একজন প্রকৃত রাসূলের তুলনায় স্বগোত্রের একজন ভণ্ড লোকই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।"[১৬৩] এই লোকটি পরবর্তীকালে মুসায়লামার সহযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হয়।

মুসায়লামার চেহারা ছিল ভয়ংকর রকমের কুৎসিত। খর্বাকৃতির এই লোকটির চেহারা মজবুত হলেও গায়ের রং ছিল পীতবর্ণের এবং নাকটি ছিল চ্যাপটা। আর পাঁচটা ভণ্ড লোকের মতো তাও ছিল মেয়ে মানুষের প্রতি অত্যধিক দুর্বলতা। কোনো নারী তাকে "না" বলতে পারতো না। কোনো নারী তার সংস্পর্শে এলেই সে যে কোনোভাবেই হোক তার বাসনা চরিতার্থ করতে সক্ষম হতো।

ইয়ামামার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে অবশ্য সাজাহ মুসায়লামার চরিত্রের এই দিকটি সম্পর্কে অবহিত ছিল না। সে শীঘ্রই একটি শিক্ষা লাভ করে।

সাজাহ তার বাহিনীসহ ইয়ামামার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। এই সংবাদ পেয়ে মুসায়লামা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা সাজাহর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে তখন পর্যন্ত কিছুই জানতো না। সাজাহর বাহিনীকে পরাজিত করা তার জন্য হয়তো কঠিন কিছু ছিল না, কিন্তু সমস্যা ছিল অদূরে অবস্থানকারী ইকরামার বাহিনীকে নিয়ে। মুসায়লামা যেকোনো মুহূর্তে মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে আক্রমণের অপেক্ষায় ছিল। এখন সাজাহর সংগে সংঘর্ষ শুরু হয়ে একই সময়ে যদি ইকরামাও আক্রমণ করে তাহলে তার অবস্থা হবে খুবই নাযুক। পরিস্থিতিটা দাঁড়াবে একই সংগে সাজাহ ও মুসলিম বাহিনী অর্থাৎ দুই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো। মুসায়লামা সাজাহকে কৌশলে জয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর সে ভালভাবেই জানতো কি করে একজন রমণীকে জয় করতে হয়।

সে সাজাহর নিকট সংবাদ প্রেরণ করে যে, সংগে কোনো সশস্ত্র ব্যক্তি আনার প্রয়োজন নেই। সে একাই আলোচনার জন্য আসতে পারে। সাজাহ তার বাহিনীকে পিছনে রেখে সংগে মাত্র ৪০ জন যোদ্ধাকে নিয়ে মিথ্যাবাদী মুসায়লামার সংগে সাক্ষাতের জন্য অগ্রসর হয়ে দুর্গের সামনে পৌঁছে সে দরজা বন্ধ দেখতে পায়। এমন সময় মুসায়লামা তাকে আহ্বান জানায় যোদ্ধাদেরকে বাইরে রেখে একা ভেতরে প্রবেশ করার। সাজাহ এই আহ্বানে সাড়া দেয় এবং একাই দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করে।

---

১৬৩. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫০৮।

মুসায়লামা তার ঘরের সামনে একটি বিরাটকায় তাঁবু খাটিয়ে সাজাহর অবস্থানের সুব্যবস্থা করে। আবহাওয়া ঠাণ্ডা ছিল বিধায় তাঁবুটিকে গরম রাখার ব্যবস্থা করা হয়। তাঁবুর ভিতরে সুগন্ধী জাতীয় উদ্দীপক পদার্থ জ্বালিয়ে এমন একটি আবহ সৃষ্টি করা হয় যা মুসায়লামাকে তার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করবে।

সাজাহ তাঁবুতে প্রবেশ করলে কিছুক্ষণ পরে মুসায়লামাও সেখানে উপস্থিত হয়। তাঁবুতে তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না। ভণ্ড লোকটি কথার জাল বিস্তার করতে শুরু করে। সে স্রষ্টা ও রাজনীতির কথা বলে এবং আরও বলে কোরেশদেরকে নিয়ে তার সমস্যার কথা।

ভূমিকা শেষ করে সে সাজাহকে উদ্দেশ্য করে বলে, "বলো তোমার প্রতি কি বাণী নাযিল হয়েছে।"

সাজাহ উত্তর দেয়, "নারীরা কখনও আগে শুরু করে না। তুমিই বলো তোমার প্রতি কি নাযিল হয়েছে।"

মুসায়লামা শুরু করে, যেন সে কুরআনের পংক্তিমালা আবৃত্তি করছে ঃ

তুমি কি তোমার প্রভুকে দেখ না ?

কিভাবে তিনি একটি জীবনকে আনেন ?

একজন গর্ভবতী মহিলার

উদর হতে।

"তারপর কি ?" সাজাহ উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে। "আমার প্রতি নাযিল হয়েছে, মুসায়লামা বর্ণনা করতে থাকে, "তিনি নারীকে সৃষ্টি করেছেন পুরুষকে ধারণ করার জন্য এবং পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন নারীর সংগী হয়ে তাকে আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে।"

সাজাহ মুগ্ধ হয়ে যায়। সে ফিসফিসিয়ে উঠে, "তুমি সত্যই একজন নবী।"

মুসায়লামা সাজাহর পাশে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে রাজী আছ ? তার পর তোমার ও আমার গোত্রের যোদ্ধাদেরকে নিয়ে আমরা আরবগণকে খতম করে ফেলবো।"

সাজাহ হ্যাঁ সূচক উত্তর দেয়।[১৬৪] মুসায়লামার জয় হয়।

সাজাহ মুসায়লামার সংগে তিনদিন অবস্থান করে। তারপর সে তার বাহিনীর নিকট ফিরে গিয়ে বয়স্ক লোকদেরকে একত্র করে ঘোষণা দেয়, আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি। আমি মুসায়লামাকে নবী হিসেবে গ্রহণ করেছি এবং তাকে বিয়ে করেছি।"

এই সংবাদ শুনে বয়স্ক লোকেরা বিস্মিত হয় না। তারা জিজ্ঞেস করে, "সে কি তোমাকে বিয়ের কোনো উপহার দিয়েছে ?" সাজাহ স্বীকার করে যে, না সে কোনো উপহার দেয়নি।

---

১৬৪. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৯৯।

এই বয়স্ক লোকেরা সাজাহর চেয়ে মুসায়লামাকে বেশি চিনতো। তারা আতংকিত হয় এই ভেবে যে, তাদের গোত্রের মেয়েটি প্রতারিত হচ্ছে। তারা তাকে পরামর্শ দান করে, তার নিকট ফিরে যাও এবং বিয়ের চিহ্নস্বরূপ কোনো উপহার না নিয়ে প্রত্যাবর্তন করো না।"[১৬৫]

সাজাহ আবার ৪০ জন যোদ্ধাকে নিয়ে ইয়ামামায় ছুটে যায়। মুসায়লামা তাকে অগ্রসর হতে দেখে দুর্গের গেট বন্ধ করে দেয়। সে দুর্গের ভেতর হতে রাগতস্বরে জিজ্ঞেস করে, "কি ব্যাপার ? কেন এসেছো ?"

"আমাকে একটি বিয়ের উপহার দাও," সে বাইরে থেকে আবেদন জানায়।

মুসায়লামা কিছুক্ষণ চিন্তা করে। তারপর উত্তর দান করে, "আমি তোমার সব লোকদের জন্য একটি উপহার দিচ্ছি। তুমি তোমার লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, আমি আল্লাহর বাণীবাহক মুসায়লামা বিন হাবীব মুহাম্মদ আরোপিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে থেকে ফজর ও এশা এই দু'ওয়াক্ত মাফ করে দিলাম।"[১৬৬]

এই উপহার নিয়ে সাজাহ তার বাহিনীর নিকট প্রত্যাবর্তন করে।

কিছুদিন পরে মুসায়লামা সাজাহর লোকদের সংগে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে একজন দূত প্রেরণ করে। সে সাজাহর সংগে রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রস্তাব দিয়ে জানায়, সে ইয়ামামার অর্ধেক শস্য গ্রহণ করতে পারে। সাজাহ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু মুসায়লামা পুনরায় দূত প্রেরণ করে তাকে অন্তত সিকিভাগ শস্য গ্রহণের আবেদন জানায়। সাজাহ এই প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ইরাকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এই ঘটনাগুলো ঘটে মুসায়লামার সংগে ইয়ামামার সংঘর্ষের কিছু পূর্বে ৬৩২ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে (১১ হিজরীর রজব মাসের শেষ পাদে)।

মুসায়লামার সংগে সাজাহর সম্পর্ক এখানেই শেষ। সাজাহও রাজনীতি ও নবুয়ত লাভের ধারণা ত্যাগ করে। সে তার মায়ের গোত্রের লোকদের সংগে জীবনের বাকি সময়টুকু বসবাস করে। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে খুব ধার্মিক জীবন যাপন করেছিল বলে জানা যায়। মুআবিয়ার খেলাফতের সময় সে কুফায় গমন করে এবং সেখানেই অতি বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুবরণ করে।

---

১৬৫. পূর্বোক্ত।
১৬৬. পূর্বোক্ত। মালিক বিন নুওয়ায়রার পতন।

মালিক বিন নুওয়ায়রার পতন

সালমার পতনের পর খালিদ (রা) মালিক বিন নুওয়ায়রাকে মুকাবিলা করার লক্ষ্যে বুতাহ অভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তিনি আদৌ ভাবতে পারেননি যে, তাঁর সংগীদের মধ্য থেকে কেউ এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করতে পারে। নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেও যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে তাঁর দলের একটি বড় অংশ এই অভিযানে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানায়।

এরা ছিলেন আনসার। তাঁদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা খালিদ (রা)-এর নিকট এসে জানায় যে, "এই অভিযানের বিষয়টি খলীফার নির্দেশে উল্লেখ ছিল না। তাঁর নির্দেশ ছিল বুজাখাকে স্বধর্মত্যাগীদের কবল থেকে মুক্ত করা। এখন আমাদের উচিত পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করা।"

তাদের বক্তব্যে খালিদ (রা) বিস্মিত হয়ে পড়েন। তিনি কোনো অবস্থাতেই এই অপারেশনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না, যদিও বিরোধিতা এসেছিল একদল সম্মানিত সাহাবার পক্ষ থেকে। তিনি তাঁদের বক্তব্যের জবাবে বলেন, "খলীফার এ নির্দেশ তোমাদের প্রতি হতে পারে। কিন্তু আমার প্রতি নির্দেশ হলো ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার। যাই হোক আমি এই বাহিনীর কমান্ডার। সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে আমার নিকট বেশি তথ্য থাকার কথা। কোনো সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহারের জন্য আমি খলীফার নির্দেশের অপেক্ষা করবো না। কোনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে তা মুকাবিলা করার জন্য কি আমরা খলীফার নির্দেশের অপেক্ষা করবো? আমি মালিক বিন নুওয়ায়রার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবো। মুহাজিরগণ ও অন্য যে কেউ ইচ্ছা করলে আমাকে অনুসরণ করতে পারে। অন্যদেরকে আমি বাধ্য করবো না।"[১৬৭]

খালিদ (রা) আনসারগণকে ছাড়াই যাত্রা শুরু করেন। খালিদের যাত্রা শুরুর ঘন্টাখানেক অতিবাহিত হতে না হতেই আনসারগণ মূল বাহিনীর সংগে যোগদান থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্তের খারাপ পরিণতি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তাদের একজন মন্তব্য করেন, "যদি তারা সফলকাম হয় তাহলে আমরা তার সুফল

---

১৬৭. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫০১। এই কথোপকথন থেকে মনে হয় যে, বুতাহ্ অভিযানের সিদ্ধান্ত খালিদের নিজের এবং তা খলীফার সার্বিক অভিযান পরিকল্পনার অংশ নয়। কিন্তু তাবারী ২য় খণ্ডের ৪৮০ ও ৪৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, খালিদের প্রতি খলীফার নির্দেশ-নামায় তুলায়হার পর মালিকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার উল্লেখ ছিল। সম্ভবত খালিদের সংগীদের খলীফার এই নির্দেশের কথা জানা ছিল না।

থেকে বঞ্চিত হবো।" অন্যেরা সায় দেয় এই বলে, "আর তারা যদি দুর্দশার মধ্যে পতিত হয় তাহলে কেউ আর আমাদের সংগে কখনও কথা বলবে না।" তারা অভিযানে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং দ্রুত খালিদ (রা)-এর নিকট এই বার্তা প্রেরণ করেন, "অপেক্ষা করুন আমরা আসছি।" খালিদ (রা) তাদের জন্য অপেক্ষা করেন এবং তারা যোগদান করলে পুনরায় বুতাহ্ অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন।

৬৩২ খৃস্টাব্দের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে (১১ হিজরীর মধ্যশাবান) খালিদ (রা) বুতায় উপস্থিত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু বুতায় এমন একজন যোদ্ধাও ছিল না যে, মুসলিম বাহিনীর সামনে দাঁড়ায়।

ভণ্ড রমণী সাজাহ ইরাকের উদ্দেশে আরব ত্যাগ করলে মালিক বিন নুওয়ায়রার মনের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। সে ইসলামের বিরোধিতা করার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করে। তার নিকট খবর আসে আল্লাহর তরবারি খালিদ (রা) কিভাবে তুলায়হার বাহিনীকে ধ্বংস করেছেন এবং মুসলমানদের হত্যাকারীদেরকে কতো কঠোরভাবে সাজা প্রদান করেছেন। মালিক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সাজাহ চলে যাওয়াতে সে একজন শক্তিশালী বন্ধুকে হারায় এবং নিজেকে অসহায়, পরিত্যক্ত ও প্রতারিত ভাবতে থাকে।

সে স্বধর্মত্যাগীদের সংগে জোট গঠনের ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং কোনোভাবে সান্ত্বনা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়। এমন সময় সে খবর পায় যে, খালিদ (রা) সালমাকে পরাজিত করে বুতাহ অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছেন। মালিক একজন সাহসী যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও খালিদ (রা)-এর মুকাবিলা করার মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলে।

মালিক নিজেকে অসহায় ভাবতে থাকে এবং নিজেকে চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই মুহূর্তে সে অনুশোচনা প্রকাশ ও আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পায় না। মালিক তার গোত্র বনী ইয়ারবুর লোকদেরকে একত্র করে বলে, "ওহে বনী ইয়ারবুর লোকেরা! আমরা আমাদের শাসকদেরকে অমান্য করেছি যখন তারা আমাদের প্রতি সত্যপথে অবিচল থাকার আহ্বান জানিয়েছিল। এমনকি আমরা অন্যদেরকে সত্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধা দান করেছিলাম। এর ফলাফল তেমন একটা ভাল হয়নি। আমি পর্যালোচনা করে দেখেছি পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং তাদের পক্ষে চলে যাচ্ছে। তাদের মুকাবিলা করার কঠোর পরিণতি সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। তোমরা নিজেদের ঘরে ফিরে যাও এবং তাদের সংগে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করো।"[১৬৮]

মালিকের এই নির্দেশ পেয়ে তার যোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সেও নিঃশব্দে বুতাহ্র অদূরে তার গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং সুন্দরী লায়লার নিকট হতে সান্ত্বনা খুঁজে।

স্বীয় মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে মালিক মদীনার প্রাপ্য কর সংগ্রহ করে খালিদের নিকট প্রেরণ করে। খালিদ (রা) বুতাহ্র পথে যাত্রাকালে কর

---

১৬৮. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫০১-৫০২

বহনকারী দূতের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি কর গ্রহণ করেন। কিন্তু এই কর প্রদানকেই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে মনে করেন না। কেননা কর এমনিতেই প্রাপ্য।

খালিদ (রা) দূতকে জিজ্ঞেস করেন, "কি উদ্দেশ্যে তোমরা সাজাহর সংগে জোট গঠন করেছিলে ?" "সামন্ত শত্রুদের বিরুদ্ধ গোত্রীয় প্রতিশোধ স্পৃহা ছাড়া আর কিছুই নয়"[১৬৯] দূত উত্তর দান করে।

খালিদ (রা) আর কিছু জিজ্ঞেস করেন না তবে তাঁর মনের সন্দেহ দূরীভূত হয় না। এটা প্রতিপক্ষের একটি চাতুরী হতে পারে যাতে মুসলিম বাহিনীকে অসতর্ক অবস্থায় ফাঁদে ফেলানো যায়। হুনাইনের অভিজ্ঞতার পর হতে খালিদ (রা) আর কখনই কোনো অভিযান পরিচালনাকালে সতর্কতাকে শিথিল করেননি। তিনি একটি সশস্ত্র প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সামরিক অপারেশন পরিচালনার মতো প্রস্তুতি ও সতর্কতাসহ অগ্রসর হতে থাকেন।

খালিদ (রা) বুতাহকে অরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পান। সেখানে নিয়মিত অনিয়মিত কোন যোদ্ধার উপস্থিতি ছিল না। তিনি বুতাহ দখল করেন এবং আশেপাশে অবস্থানকারী বনী তামীমের স্বধর্মত্যাগী সম্প্রদায়গুলোকে মুকাবিলা করার জন্য অশ্বারোহী দল প্রেরণ করেন। তিনি এই দলগুলোর কমান্ডারগণকে খলীফার নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দেন এই বলে যে, কোনো গোত্রের নিকটবর্তী হলে আযান দেবে। তারা আযানে সাড়া দিলে ছেড়ে দেবে নতুবা আক্রমণ করবে।

পরদিন জাররার বিন আল-আজওয়ারের নেতৃত্বে পরিচালিত দলটি মালিক বিন নুওয়ায়রার বাড়িতে প্রবেশ করে। জাররার মালিক লায়লা ও বনী ইয়ারবু গোত্রের ক'জন লোককে গ্রেপ্তার করেন। অন্যান্য দল কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় না, কেননা প্রতিপক্ষের সব গোত্রই বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করে।

মালিক ও লায়লাকে খালিদ (রা)-এর সামনে উপস্থিত করা হয়। মালিককে রাষ্ট্র ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী গোত্রের নেতা হিসেবে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হয়। খালিদ (রা)-এর সামনে মালিকের আচরণে ধৃষ্টতা প্রকাশ পায় এবং সে একজন গোত্রপ্রধানের স্বভাব মূলত গর্বিত ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণকে জয় করে যথেষ্ট বিনয়ী হতে ব্যর্থ হয়।

খালিদ (রা) মালিকের সংগে কথা বলেন। তিনি তার অপরাধের কথা বলেন এবং তার দ্বারা ইসলামের যে ক্ষতি হয়েছে তার বর্ণনা দান করেন। এরপর খালিদ (রা) তাকে কিছু প্রশ্ন করেন। উত্তরদানের এক পর্যায়ে মালিক রাসূলুল্লাহ (সা)-কে "তোমার নবী" বলে উল্লেখ করে। খালিদ (রা) মালিকের এই অনুশোচনাহীন আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি তাঁকে তোমার নবী হিসেবে গণ্য করো না ?"[১৭০]

---

১৬৯. পূর্বোক্ত।
১৭০. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫০৪।

খালিদ (রা)-এর মনে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, মালিক অপরাধী এবং এখনও অবিশ্বাসীই রয়ে গেছে। তিনি তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। জাররার নিজেই মালিককে দূরে নিয়ে যান এবং হত্যা করেন। এভাবেই মালিক বিন নুওয়ায়রার পতন হয়। লায়লা বিধবা হয়। কিন্তু তাকে বৈধব্যবেশে বেশিক্ষণ থাকতে হয় না। সে রাতেই খালিদ (রা) লায়লাকে বিয়ে করেন।

খালিদ (রা) লায়লাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই তা ভালভাবে নিতে পারেনি। কেউ কেউ এমনও ভাবতে থাকে যে, মালিক হয়তো অবিশ্বাসী ছিল না, বরং বিশ্বাসের পথে ফিরে এসেছিল। খালিদ (রা) হয়তো লায়লাকে পাবার জন্যই তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। আবু কাতাদা নামের একজন বিখ্যাত সাহাবী খালিদ (রা)কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। খালিদ (রা) তার সিদ্ধান্তের পক্ষে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আবূ কাতাদা খালিদের এই আচরণকে বাড়াবাড়ি বলে বিবেচনা করেন এবং পরদিন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে মদীনা যাত্রা করেন। মদীনায় পৌঁছেই তিনি সোজা খলীফার নিকট হাজির হন এবং তাঁকে জানান যে, মালিক বিন নুওয়ায়রা মুসলমান ছিল, খালিদ (রা) তার সুন্দরী স্ত্রী লায়লাকে বিয়ে করার সুযোগ সৃষ্টির জন্য তাকে হত্যা করেছেন। এই আবু কাতাদা (রা) ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরে রাসূলের নিকট গিয়ে অভিযোগ করেছিলেন যে, বনী জাজিমার লোকেরা আত্মসমর্পণের পরও খালিদ (রা) তাদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছেন। খালিদের সংগে তাঁর বিরোধ নতুন কিছু নয়। খলীফা আবু কাতাদাকে দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কেননা তিনি কমান্ডারের অনুমতি ছাড়াই বাহিনী ত্যাগ করেছেন। তিনি তাঁর প্রতি নির্দেশ দান করেন, "তোমার কর্তব্যস্থলে ফিরে যাও।" আবু কাতাদা বুতায় ফিরে যায়।[১৭১]

কিন্তু তাঁর মদীনা ত্যাগের পূর্বেই বিষয়টি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। উমর (রা) এই কথাটি শুনেই তৎক্ষণাৎ খলীফার নিকট উপস্থিত হন এবং বলেন, "আপনি এমন একজন লোককে কমান্ডার নিযুক্ত করেছেন যে মুসলিমকে হত্যা করে এবং মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে।"[১৭২] আবূ বকর (রা) এতে প্রভাবিত হন না। তাঁর নিকট এমন সব প্রমাণ আছে যাতে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, মালিক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের সংবাদ শুনেই মদীনার জন্য সংগৃহীত কর পুনরায় লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে সাজাহসহ জোট গঠন করে। তার স্বধর্মত্যাগের ব্যাপারে খলীফার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। জীবন্ত মানুষ দগ্ধ করার ব্যাপারে খলীফার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, যারা মুসলমানদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে শুধু তাদেরকে একইভাবে হত্যা করা হবে।[১৭৩] খালিদ (রা) অন্য কাউকে জীবন্ত দগ্ধ করেননি।

---

১৭১. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫০১-২।
১৭২. বালাযুরী, পৃষ্ঠা - ১০৭।
১৭৩. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৮২।

উমর (রা) পুনরায় বলেন, "খালিদের তরবারিতে অন্যায় নিষ্ঠুরতা আছে। তাকে পায়ে বেড়ি পরিয়ে ফিরিয়ে আনা উচিত। তাকে বরখাস্ত করুন।"

আবূ বকর (রা) জানতেন যে, এই দু'মহান ব্যক্তির মধ্যে সুসম্পর্কের কিছুটা ঘাটতি হয়েছে। উমরের প্রশ্নের উত্তরে তিনি দৃঢ়তার সংগে বলেন, "ওহে উমর! আপনি খালিদ সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন। যে তরবারিকে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কোষমুক্ত করেছেন, আমি তা কোষবদ্ধ করতে পারব না।" ইতিমধ্যে সকলের নিকট আল্লাহর তরবারি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

উমর (রা) তারপরও বলেন, "কিন্তু আল্লাহর এই শত্রুটি একজন মুসলিমকে হত্যা করেছে এবং তার স্ত্রীকে নিয়েছে।"[১৭৪] আবূ বকর (রা) বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে সম্মত হন। তিনি খালিদ (রা)-কে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দান করেন।

ইতিমধ্যে মদীনার প্রতিক্রিয়া খালিদ (রা)-এর নিকট পৌঁছে যায়। তিনি তা এই বলে উড়িয়ে দেন, "যখন কোনো ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম হয় তখন তা হয়ে যায়।"[১৭৫] সামান্য বিরূপ সমালোচনায় উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো ব্যক্তি খালিদ নন। এমন সময় খলীফার নিকট হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ আসে। খালিদ (রা) সহজেই বুঝতে পারেন যে, এই নির্দেশের সংগে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সম্পর্ক আছে। তিনি কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

মদীনায় পৌছেই খালিদ (রা) সোজা মসজিদে চলে যান। সে সময় মসজিদ শুধু প্রার্থনার জায়গা ছিল না। তখন মসজিদ ছিল দেখা-সাক্ষাতের জায়গা, সম্মেলন হল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্রামের জায়গা এবং নাগরিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। খালিদ (রা) তাঁর পাগড়ির সংগে অলংকার হিসেবে একটি তীর পরেছিলেন। ফলে তাঁকে খুব স্মার্ট লাগছিল। অধিকাংশ মুসলমান পোশাক পরিধানের বেলা জাঁক-জমক ভাব পরিহার করে স্বাভাবিকতা বজায় রাখাটা পছন্দ করে।

উমর (রা) মসজিদে ছিলেন এবং তিনি খালিদ (রা)-কে দেখতে পান। রাগে গর গর করতে করতে তিনি খালিদের সামনে উপস্থিত হন এবং তাঁর পাগড়ি হতে তীরটি খুলে নিয়ে দু'টুকরো করে ভেঙে ফেলেন। উমর (রা) চিৎকার করে বলেন, "তুমি একজন মুসলমানকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে কবজা করেছ। তোমাকে পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত।"[১৭৬] খালিদ (রা) জানতেন, আবূ বকরের উপর উমরের প্রভাব অপরিসীম। খলীফার মতামতও একইরূপ হতে পারে এই ভয়ে তিনি চুপচাপ ফিরে আসেন।

এরপর তিনি আবূ বকর (রা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করতে যান। খলীফা গোটা ব্যাপাটির ব্যাখ্যা দাবি করেন। তিনি সবকিছু খুলে বলেন। বিচার-বিবেচনার পর খলীফা সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, খালিদ (রা) নির্দোষ। তবে লায়লাকে বিয়ে করে নিজেকে সমালোচনার পাত্রে পরিণত করার জন্য তিনি তাঁর প্রিয় জেনারেলকে ভর্ৎসনা

---

১৭৪. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫০৩-৪। বালাযুরী পৃষ্ঠা - ১০৭।
১৭৫. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫০২।
১৭৬. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা - ৫০৪।

করেন। যেহেতু অনেকেই মনে করে মালিক ছিল একজন মুসলমান এবং খালিদের সিদ্ধান্তের মধ্যে সামান্য হলেও ভুলের আশংকা থাকতে পারে, তাই তিনি মালিকের উত্তরাধিকারগণকে ক্ষতিপূরণ দানের নির্দেশ দান করেন।

খালিদ (রা) খলীফার বাড়ি হতে বের হয়ে আসেন। তিনি হালকা পদক্ষেপে স্বাভাবিক ভংগিতে মসজিদের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন যেখানে বসে উমর (রা) সংগীদের সংগে কথা-বার্তা বলছিলেন। এখন উমর (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "ওহে বাঁ-হাতি ব্যক্তি! আমার নিকটে আস।"[১৭৭] উমর (রা) বুঝতে পারেন যে, খলীফা তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন এবং খালিদের সংগে একটি বাক্যও ব্যয় না করে স্থান ত্যাগ করেন।

মুসলিম ইতিহাসে মালিক ও লায়লার ব্যাপারটি একটি বহুল বিতর্কিত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত। আবু কাতাদার উদ্ধৃতি দিয়ে অনেকেই বলেন যে, মালিককে বন্দী করার পূর্বেই সে বিশ্বাসের পথে প্রত্যাবর্তন করে এবং তার ঘরের লোকেরা আযান দেয়। অন্যেরা বলেন যে, খালিদ (রা) কখনই মালিককে হত্যার নির্দেশ দান করেন নি। আবহাওয়া খুবই ঠাণ্ডা থাকায় তিনি বলেছিলেন, "বন্দীদেরকে গরম করো।" কোনো বর্ণনায় গরম করা ও 'হত্যা করা' বুঝানোর জন্য একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবেই হয়তো জাররার খালিদের নির্দেশের ভুল ব্যাখ্যা করে মালিককে হত্যা করেছিলেন।

সম্ভবত উল্লিখিত বর্ণনাগুলোর কোনটিই সত্য নয়। এসব বর্ণনার পিছনে উদ্দেশ্য হলো প্রথমত খালিদ (রা)-এর সংগে উমর (রা)-এর বিরোধের ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং দ্বিতীয়ত খালিদ (রা)-কে একজন মুসলিম হত্যার অভিযোগ হতে মুক্ত করা।

মালিক বিন নুওয়ায়রার স্বধর্মত্যাগী ও স্বীয় গোত্রের লোকদের মধ্যে মদীনার জন্য সংগৃহীত কর বিলিয়ে দেয়া এবং সাজাহর সংগে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জোট গঠনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সকল ঐতিহাসিক এই ঘটনাকে সত্য বলে বর্ণনা করেছেন। আমার মনে এই ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই যে, খালিদ (রা) প্রকৃতই মালিককে হত্যার নির্দেশ দান করেছিলেন এই বিশ্বাস নিয়ে যে, সে ছিল একজন ধর্মত্যাগী ও বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু উমর (রা) সহ কিছু লোকের মনে এ বিষয়ে কিছুটা সংশয় থেকেই যায়। উমরের এই ধারণা আরও শক্তিশালী হয় যখন মালিকের ভাই তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করে বলে যে, মালিক মানুষ হিসেবে ছিল খুবই চমৎকার। কিন্তু দুঃখজনক হলো যে, সে খালিদের লালসার শিকার হয়েছে।

গোটা বিষয়টির সার কথা হলো যে, মালিক নিহত হয় এবং সুন্দরী লায়লা তার সুদর্শন দু'টি চোখ ও চমৎকার দু'টি পাসহ খালিদের স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করে। খালিদ (রা)-কে এই বিষয়টির জন্য ভবিষ্যতে উচ্চ মূল্য দিতে হয়েছিল।

---

১৭৭. পূর্বোক্ত।

ইয়ামামার যুদ্ধ

আবূ বকর (রা) যুকীসসায় মুসলিম বাহিনীকে ১১টি কোরে বিভক্ত করে আবু জহলের পুত্র ইকরামাকে তার একটির কমান্ডার নিযুক্ত করেন। ইকরামার প্রতি নির্দেশ ছিল, ইয়ামামায় গিয়ে মুসায়লামার সংগে সর্বাত্মক যুদ্ধে না জড়িয়ে ছোট-খাট সংঘর্ষের মাধ্যমে তাকে ব্যস্ত রাখা। আবূ বকর (রা) মুসায়লামার দক্ষতা ও শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই তিনি অপর্যাপ্ত শক্তি নিয়ে তার সংগে যুদ্ধে জড়াতে প্রস্তুত ছিলেন না। যেহেতু খালিদ (রা) ছিলেন মুসলিম জেনারেলদের মধ্যে উত্তম তাই খলীফার সিদ্ধান্ত ছিল ইসলামের অন্য শত্রুদের দমন করার পর তাঁকে দিয়েই মুসায়লামার মুকাবিলা করার।

ইকরামাকে এই মিশনে প্রেরণের পিছনে খলীফার উদ্দেশ্য ছিল মুসায়লামার তৎপরতা ইয়ামামার মধ্যে সীমিত রাখা। ইয়ামামায় ইকরামার উপস্থিতির কারণে মিথ্যাবাদী মুসায়লামা যে কোনো মুহূর্তে মুসলিম বাহিনীর পক্ষ হতে আক্রমণের আশংকা নিয়ে দেশ ত্যাগ করার চিন্তা হতে বিরত থাকবে। মুসায়লামাকে ইয়ামামায় ব্যস্ত রাখতে পারলে খালিদের পক্ষে সহজেই উত্তর-মধ্য আরবের ধর্মত্যাগী গোত্রগুলোকে দমন করা সম্ভব হবে। খলীফা ইকরামার মতো একজন মারমুখী লোককে এই কাজের জন্য নির্বাচন করে। তদুপরি ইকরামা (রা) নতুন বিশ্বাস ইসলামের জন্য বড় কিছু একটা করতে ও পবিত্র রাসূলের বিরুদ্ধে কঠোর বিরোধিতার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন।

ইকরামা (রা) তাঁর কোর নিয়ে যাত্রা করে ইয়ামামার কোনো এক এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করেন। তাঁর ক্যাম্পের অবস্থানটি সঠিক জানা যায়নি। এই ক্যাম্প থেকেই তিনি বনী হানীফার লোকদের উপর দৃষ্টি রাখেন এবং খলীফার নির্দেশের অপেক্ষা করতে থাকেন। ইকরামার উপস্থিতির কারণেই মুসায়লামাকে ইয়ামামায় আটক রাখার লক্ষ্য অর্জিত হয়। যদিও তার আদৌ ইয়ামামা ত্যাগ করার ইচ্ছা ছিল কিনা তা আমাদের জানা নেই।

খালিদ (রা)-এর হাতে তুলায়হার পরাজয়ের খবর শুনে ইকরামা (রা) যুদ্ধের জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েন। অপেক্ষা করতে করতে তাঁর যুদ্ধংদেহী স্বভাবে বিরক্তির সৃষ্টি হয়। তিনি ছিলেন একজন ভয়ভীতিশূন্য শক্তিশালী জেনারেল। কিন্তু তাঁর মধ্যে

খালিদ (রা)-এর শান্ত বিচারবুদ্ধি ও ধৈর্যের অভাব ছিল যা দ্বারা একজন সাহসী কমান্ডারকে একজন হঠকারী কমান্ডার হতে পৃথক করা যায়।

ইকরামা (রা) জানতে পারেন যে, শুরাহবীল বিন হাসানা তাঁর সংগে যোগদানের জন্য অগ্রসর হচ্ছেন। খলীফা শুরাহবীলের কমান্ডেও একটি কোর ন্যস্ত করে ইকরামা (রা)-কে অনুসরণ করার আদেশ দিয়ে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর ইকরামার সংগে মিলিত হওয়ার কথা।

ইকরামা (রা) জানতে পারেন যে, খালিদ (রা) সালমা নামের জনৈকা ভণ্ড মহিলা নবীকে সফলভাবে নির্মূল করেছেন। ইকরামার পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। খালিদই কেন শুধু বিজয়ের গৌরব লাভ করবেন? শুরাহবীলের জন্য কেন তাকে অপেক্ষা করতে হবে? সে নিজেই কেন মুসায়লামার উপর আঘাত হানবে না? সে যদি একাই মুসায়লামাকে পরাজিত করতে পারে তাহলে তার বিজয় গৌরব অন্য সকলের খ্যাতি ম্লান করে দিবে এবং খলীফার জন্যও এটি হবে একটি বড় মধুর বিস্ময়। ইকরামা (রা) তাঁর বাহিনীকে অগ্রযাত্রার নির্দেশ দান করেন। এই ঘটনা ৬৩২ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে (১১ হিজরীর রজবের শেষ)।

কয়েকদিন পরেই ইকরামা (রা) মুসায়লামার নিকট হতে একটি বড় ধরনের আঘাত পেয়ে ক্যাম্প প্রত্যাবর্তন করেন। অনুতপ্ত হয়ে তিনি খলীফাকে বিস্তারিত জানিয়ে পত্র লিখেন। শুরাহবীলও এই খারাপ সংবাদটি পেয়ে যান এবং ইকরামার ক্যাম্পের অল্প দূরে যাত্রাবিরতি করেন।

আবূ বকর (রা) ইকরামার হঠকারিতা ও খলীফার নির্দেশের প্রতি অবাধ্যতার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর নিকট লিখিত পত্রে খলীফার রাগ ও ক্ষোভ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তিনি পত্রের শুরুতেই লিখেন, "ওহে ইকরামার মায়ের পুত্র! (এটি ছিল সম্বোধনকৃত ব্যক্তির পিতৃপরিচয়ের প্রতি সন্দেহ প্রকাশের ভদ্র উপায়) আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না। তোমার এই লজ্জাজনক প্রত্যাবর্তন সবার মনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে হুযায়ফাকে সাহায্যের জন্য উমান অভিমুখে যাত্রা কর। হুযায়ফার মিশন অর্জিত হলে আরাফজাকে সাহায্যের জন্য মাহরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করো এবং তারপরে মুহাজিরকে সহায়তার জন্য ইয়েমেনে গমন করো। তুমি তোমার দক্ষতা প্রমাণ না করা পর্যন্ত তোমার সংগে কোনো কথা নেই।"[১৭৮] উল্লিখিত তিনজন কমান্ডারই ছিলেন ১১ জন কোর কমান্ডারের অন্তর্ভুক্ত।

মুসায়লামার দ্বারা বিতাড়িত হওয়ার ও খলীফার নিকট হতে কঠোর তিরস্কারের গ্লানিবোধ নিয়ে ইকরামা (রা) তাঁর বাহিনীসহ ওমানের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

শুরাহ্বীল ইয়ামামা এলাকায় অবস্থান নিয়ে থাকেন। তিনিও যাতে ইকরামার মতো ভুল না করেন তাই খলীফা লিখলেন, তোমার নিজ অবস্থান থেকে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করো।"[১৭৯]

---

১৭৮. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫০৪, ৫০৯।
১৭৯. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা - ৫২২।

মালিক বিন নুওয়ায়রার উত্তরাধিকারগণকে ক্ষতিপূরণদানের নির্দেশ প্রদানের পর খলীফা খালিদ (রা)-কে নতুন মিশন দান করেন। আর তা হলো ইয়ামামায় গিয়ে মিথ্যাবাদী মুসায়লামাকে ধ্বংস করা। নিজ বৃহৎ বাহিনী ছাড়াও খালিদ (রা)-এর কমান্ডে শুরাহবীলের কোরকেও ন্যস্ত করা হয়। তদুপরি খলীফা মদীনার আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য হতে যোদ্ধা সংগ্রহ করে একটি বাহিনী গঠন করে শীঘ্রই ইয়ামামায় প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। এভাবে খালিদের কমান্ডে ইসলামের প্রধান বাহিনীকে ন্যস্ত করা হয়।

খালিদ (রা) দ্রুত বুতায় তাঁর বাহিনীর নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। খলীফা শুরাহবীলের নিকট লিখেন,"খালিদ ইয়ামামায় তোমার সংগে যোগদান করলে তুমি তাঁর কমান্ড অনুসরণ করবে। ইয়ামামার সমস্যার সমাধান হলে তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে আমর ইবনুল আসের সংগে যোগদান করে কুজাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।"[১৮০] এটি হচ্ছে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকার একটি ধর্মত্যাগী গোত্র যাকে উসামা পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু তারা বশে আসেনি।

মদীনা হতে আনসার ও মুহাজিরদের নতুন বাহিনী ইয়ামামায় পৌঁছলে খালিদ (রা)ও বুতাহ হতে ইয়ামামার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। তাঁর দলে শুরাহবীলের নতুন সৈন্য যোগদানের বিষয়টি তাঁকে আনন্দিত করে। পূর্বে শুরাহবীল ইকরামার মতো বিজয় গৌরব অর্জনের লোভ সামলাতে না পেরে মুসায়লামার সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি গোটা বিষয়টির জন্য খালিদ (রা)-এর নিকট অপরাধ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেন। খালিদ (রা) তাঁকে নিন্দা করেন।

খালিদ (রা) ইয়ামামা থেকে কিছু দূরে থাকতেই তাঁর স্কাউটগণ খবর নিয়ে আসে যে, মুসায়লামা ওয়াদী হানীফার উত্তর তীরে আকরাবার সমতলভূমিতে ক্যাম্প স্থাপন করেছে যেখান দিয়ে ইয়ামামাগামী রাস্তাটি অতিক্রম করেছে। খালিদ (রা) উপত্যকাটির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে শত্রুর মুকাবিলা করতে অনিচ্ছুক। তাই তিনি আকরাবার কয়েক মাইল পশ্চিমে থাকতেই রাস্তা ত্যাগ করে দক্ষিণ দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে জুবায়লা শহরের বিপরীত দিকে ওয়াদি হানীফার একমাইল দক্ষিণের উঁচু ভূমিতে উপস্থিত হন।[১৮১] এই উঁচু ভূমি হতে খালিদ (রা) আকরাবার গোটা সমতল ভূমিটি অবলোকন করতে সক্ষম হন। এই সমতল ভূমির সম্মুখ সীমানা দিয়ে বিস্তৃত হয়ে আছে বনী হানীফার ক্যাম্পগুলো। খালিদ (রা) এই উঁচু ভূমিতেই ক্যাম্প স্থাপন করেন। তাঁর বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩,০০০-এ।

খালিদ (রা) বুতাহ ত্যাগ করার পরপরই মুসায়লামা মুসলিম বাহিনীর যাত্রার খবর পেয়ে যায়। সে এও জানতে পারে যে, এটাই হচ্ছে মুসলমানদের প্রধান

---

১৮০. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা - ৫০৯।

১৮১. জুবায়লা বর্তমানে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, স্থানীয় লোকদের মতে একসময় এটি একটি বড় শহর ছিল।

বাহিনী। বুতাহ থেকে ইয়ামামাগামী রাস্তাটি ওয়াদী হানীফা দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং এই ওয়াদী হানীফার উত্তর তীর বরাবর জুবায়লার পিছনে বিস্তৃত আকরাবা সমতল ভূমি। এই সমতল ভূমিটিই আকরাবা থেকে ইয়ামামা হয়ে আরও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃত উর্বর এলাকার বহিঃসীমানা নির্ধারণ করে এই এলাকাটি ছিল চাষাবাদ ও ফলের বাগানে পূর্ণ। প্রকৃত অর্থে ইয়ামামা ছিল একটি প্রদেশ যার রাজধানী ছিল হিজর। হিজরকেও সাধারণভাবে ইয়ামামা নামে উল্লেখ করা হতো। সেকালের হিজর এলাকায় আজকের রিয়াদ অবস্থিত।[১৮২]

মুসায়লামা চায়নি যে, মুসলিম বাহিনী তার শহর ও গ্রামগুলো তছনছ করুক। তাই সে তার বাহিনীকে ইয়ামামা হতে উত্তর-পশ্চিম দিকে ২৫ মাইল অগ্রসর করে নিয়ে জুবায়লার পাশে, যেখানে সমতলভূমি আরম্ভ হয়েছে, ক্যাম্প স্থাপন করে। এই অবস্থান থেকে মুসায়লামা শুধু ইয়ামামার উর্বর সমতল ভূমিই রক্ষা করতে পারবে না বরং অভিযানকারী শত্রুর পার্শ্বদেশকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। খালিদ (রা) যদি ওয়াদী হানীফা ধরে যাত্রা করার মতো ভুল করে তাহলে বনী হানীফা সহজেই তাদের বাম বাহুর উপর চড়াও হওয়ার সুযোগ পাবে এবং খালিদের পক্ষে যুদ্ধ উপেক্ষা করে ইয়ামামা অভিমুখে যাত্রা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে না, কেননা সেক্ষেত্রে মুসায়লামাও পেছন হতে খালিদের বাহিনীকে আক্রমণ করার সুযোগ পাবে [সৈন্য মোতায়েনের ক্ষেত্রে ওহুদের যুদ্ধে রাসূল আকরাম (সা)-এর কৌশলই এখানে অবলম্বন করা হয়েছে]।

মুসায়লামা তার ৪০,০০০ যুদ্ধ-পাগল সৈন্য নিয়ে আকরাবা সমতল ভূমিতেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। ইকরামা ও শুরাহবীলের দু'টি ব্যর্থ আঘাত মুসায়লামার যোদ্ধাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছে এবং তারা ধরে নিয়েছে যে, মিথ্যাবাদী মুসায়লামার শক্তি দুর্ভেদ্য। তার অনুসারীরা এখন মানসিক দিক থেকে তাদের নেতা ও তার আদর্শের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। মুসায়লামার মধ্যেও এমন প্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে ইকরামা ও শুরাহবীলের মতো খালিদকেও বিতাড়িত করতে সক্ষম।

খালিদের আগমনের কয়েকদিন পূর্বে মুসায়লামা একজন অত্যন্ত দক্ষ গোত্রপ্রধান ও কমান্ডারকে হারায়। তার নাম ছিল মুজাআ বিন মারারা, যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রেরিত বনী হানীফা গোত্রের একজন অন্যতম সদস্য ছিল। সে ৪০ জন অশ্বারোহী নিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি গোত্রকে রেইড করার জন্য গিয়েছিল, যাদের সংগে তার পূর্ব শত্রুতা ছিল। রেইড করে ফেরার পথে এই দলটি আকরাবা থেকে একদিনের দূরত্বে সানিয়াত-উল-ইয়ামামা নামের একটি গিরিপথে রাত্রিযাপনের জন্য

---

১৮২. রিয়াদের ৫০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আল খজরের নিকটবর্তী ইয়ামামা গ্রামটি ইতিহাসের বা এই যুদ্ধের ইয়ামামা নয়।

যাত্রাবিরতি করে। মুজাআর লোকেরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং এটাই ছিল তাদের শেষ নিদ্রা। ভোরবেলা গোটা দলটি খালিদ (রা)-এর অগ্রবর্তী অশ্বারোহী দলের হাতে বন্দী হয়। তাদেরকে আল্লাহর তরবারির সামনে হাজির করা হয়।

খালিদ (রা) তাদেরকে তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারা নবী হিসেবে কাকে বিশ্বাস করে ঃ মুহাম্মদকে না মুসায়লামাকে ? তাদের কারও মধ্যে অনুশোচনার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি বরং কেউ কেউ খালিদের নিকট প্রস্তাব করে, "তোমাদের মধ্য থেকে একজন ও আমাদের মধ্য থেকে একজন নবী থাকতে পারে।"[১৮৩] খালিদ (রা) এদের পিছনে আর সময় নষ্ট করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি মুজাআ ব্যতীত বাকি সকলকে হত্যা করেন। তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। গোত্রপ্রধান মুজাআ যুদ্ধবন্দী হিসেবে হয়তো কাজে লাগতেও পারে। এই ধারণায় তাকে বন্দী অবস্থায় নিয়েই মুসলিম বাহিনী আকরাবার পার্শ্ববর্তী এলাকায় উপস্থিত হয়ে ক্যাম্প স্থাপন করে যা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

ওয়াদী হানীফার উপত্যকাটিই যুদ্ধের সম্মুখভাগ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উত্তর তীরের উচ্চতা সাধারণভাবে ১০০ ফুট। এই উচ্চতার মাত্রা কোথাও স্বাভাবিক খাড়া এবং কোথাও খুবই খাড়া। দক্ষিণ দিকে এই উচ্চতার মাত্রা তীর হতে শুরু করে স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি হয়ে এক মাইল দূরে ২০০ ফুট হয়, সেখানে খালিদ (রা) তাঁর ক্যাম্প স্থাপন করেছেন। উত্তর তীরে আরও আছে জুবেলা শহর যার পশ্চিম পাশ দিয়ে একটি সংকীর্ণ পরিখা এসে ওয়াদী হানীফায় মিলিত হয়েছে। দক্ষিণ-তীরের প্রায় ৩ মাইল এলাকা জুড়ে মুসলিম বাহিনীর সম্মুখভাগ বিস্তৃত এবং প্রতিপক্ষ স্বধর্মত্যাগীদের অবস্থান হচ্ছে উত্তর তীরে। জুবেলা শহর ও সংকীর্ণ পরিখাটিকে কেন্দ্র করে মুসায়লামার বাহিনী অবস্থান নেয়। মুসায়লামার বাহিনীর পিছনে বিস্তৃত আকরাবা সমতলভূমি এবং এই সমতল ভূমির মাঝে ওয়াদী হানীফা থেকে দু'মাইল দূরে অবস্থিত আবাজ নামে খ্যাত দেয়ালঘেরা একটি বিশাল বাগান। এই যুদ্ধের কারণেই বাগানটি ইতিহাসে 'মৃত্যুর বাগান'[১৮৪] নামে পরিচিতি লাভ করে (নয় নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য)।

পরদিন সকালে উভয় বাহিনী যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি হয়। মুসায়লামা তার ৪০,০০০ সৈন্যকে দুই বাহু ও মধ্যবর্তী অবস্থানে বিন্যস্ত করে। বাম-বাহুর কমান্ডে ছিল দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক রাজ্জাল, ডান বাহুতে মুহাকিম বিন তুফায়ল এবং মধ্যবর্তী অবস্থানের কমান্ড ছিল সরাসরি তার হাতে। যোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি ও

---

১৮৩. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫১০।

১৮৪. মৃত্যুর বাগানের সঠিক অবস্থান জানা যায়নি। তবে যুদ্ধের গতি বিশ্লেষণ করে আমি উল্লিখিত অবস্থান নির্ধারণ করেছি।

তাদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য মুসায়লামার পুত্র, যার নামও ছিল শুরাহবীল, ঘোড়ায় চড়ে বাহিনীর সম্মুখ দিয়ে ঘুরে ঘুরে বলতে থাকে, "ওহে বনী হানীফা! স্বীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য সাহসিকতার সংগে লড়াই করো। তোমরা যদি পরাজিত হও তাহলে শত্রুগণ তোমাদের নারীদেরকে বন্দী অবস্থায় অপহরণ করে নিয়ে যাবে। তোমাদের নারীদেরকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করো।"[১৮৫]

মুসায়লামা সিদ্ধান্ত নেয় খালিদের পক্ষ থেকে আক্রমণ আসার জন্য অপেক্ষা করার। সে প্রথমে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করবে, তারপর শত্রুর প্রাথমিক আঘাতকে প্রতিহত করে তার অব্যবস্থার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আক্রমণাত্মক অভিযান চালাবে।

মুসলিমগণ গোটারাত নামাযে অতিবাহিত করেন। তারা এর পূর্বে প্রতিপক্ষের এতো বৃহৎ ও নেতার প্রতি এতো অন্ধ কোনো বাহিনীর মুকাবিলা করেনি। তদুপরি এই বৃহত্তর শত্রুবাহিনীর কমান্ডার হচ্ছে একজন ধূর্ততম দুশ্চরিত্র ব্যক্তি। ফজরের নামাযের পর খালিদ (রা) তার ১৩,০০০ সৈন্যের বাহিনীকে দক্ষিণ তীরে যুদ্ধের জন্য মোতায়েন করেন। তিনিও তাঁর বাহিনীকে একই কৌশলে দু'বাহু ও মধ্যবর্তী অবস্থানে বিন্যস্ত করেন। তার বাম বাহুর কমান্ডে ছিলেন আবু নুযায়ফা ও ডান বাহুতে যায়দ (উমরের বড় ভাই) এবং মধ্যবর্তী অবস্থান ছিল সরাসরি তার কমান্ডে। এই যুদ্ধে খালিদ (রা) তাঁর বাহিনীকে চিরাচরিত গোত্রীয় দলের পরিবর্তে যুদ্ধের প্রয়োজন অনুযায়ী রেজিমেন্ট ও বাহুতে বিভক্ত করে যাতে বিভিন্ন গোত্রের যোদ্ধাগণকে মিশ্রিত করা হয়।

খালিদ (রা) তাঁর স্বভাব অনুযায়ী প্রথমে আক্রমণ রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যাতে প্রাথমিক আঘাতেই শত্রুকে কোণঠাসা করে তাকে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে বাধ্য করা যায়। এর ফলে মুসায়লামার সৈন্য পরিচালনার স্বাধীনতাও সীমিত হবে এবং তার পক্ষে অসহায় অবস্থায় প্রতিপক্ষের চাপ প্রতিহত করা ছাড়া আর করার কিছুই থাকবে না। অবশ্য বিষয়টি নিয়ে খালিদের মনে কোনো ভাবালুতা ছিল না। তিনি জানতেন সামনে এমন একটি তিক্ত ও রক্তস্নাত যুদ্ধ অপেক্ষা করছে যা মুসলিম বাহিনী কখনও মুকাবিলা করেনি। তদুপরি প্রতিপক্ষের সংখ্যা হচ্ছে তিনগুণ এবং তাদের কমান্ডার হচ্ছে একজন কৌশলী ও সাহসী জেনারেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও খালিদ (রা) বিজয়ের ব্যাপারে ছিলেন প্রত্যয়ী। তাঁর নিজের উপর যেমন ছিল বিশ্বাস তদ্রূপ আস্থা ছিল সহযোদ্ধা অফিসার ও সৈনিকদের দক্ষতার উপর। তিনি তাঁর যোদ্ধাদের কথা চিন্তা করে গৌরব বোধ করেন। এই বাহিনীতে এমন কিছু যোদ্ধা আছেন যারা পরবর্তীতে ইতিহাস-খ্যাত হয়েছিলেন। এই বাহিনীতে আছেন উমরের বড় ভাই

---

১৮৫. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫০৯।

যায়দ ও পুত্র আব্দুল্লাহ, আছেন আবু দুজানা, যিনি ওহুদের যুদ্ধে পবিত্র রাসূলের দেহকে শত্রুর তীর হতে রক্ষার জন্য নিজের দেহকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। খলীফার পুত্র আব্দুর রহমান এবং আবু সুফিয়ানের পুত্র মুআবিয়াও যিনি উমাইয়া বংশের প্রথম খলীফা ছিলেন, এই বাহিনীতে আছেন। আরও আছেন সপুত্রক উম্মে উমারা নামের সেই মহিলা যিনি ওহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশে থেকে যুদ্ধ করেছিলেন এবং আরও আছেন ওহুদ যুদ্ধের সিংহপ্রাণ হযরত হামযার হত্যাকারী ওয়াহশী তাঁর ভয়ংকর বর্শাটি নিয়ে।

মুসলিম বাহিনীর অফিসারগণ তাদের রেজিমেন্টের সামনে অবস্থান নেয় এবং মুখে পবিত্র কুরআনের বাণী উচ্চারণ করতে থাকেন। তাঁরা মুসলমানগণকে মনে করিয়ে দেন যে, যুদ্ধে শাহাদৎ বরণকারীদের জন্য রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ এবং দুর্বলচিত্তদের জন্য রয়েছে দোযখের আযাব।

৬৩২ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শীতের এক সকালে (১১ হিজরীর শাওয়াল মাসের প্রথম দিকে) ইয়ামামার যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

খালিদ (রা) তাঁর বাহিনীকে একযোগে আক্রমণের নির্দেশ দান করেন এবং মুসলিম বাহিনী গোটা সম্মুখ জুড়ে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে শত্রুর উপরে চড়াও হয়। খালিদ (রা) ও দু'বাহুর কমান্ডারগণ স্বীয় যোদ্ধাদের সম্মুখে থেকে প্রতিপক্ষের উপরে চার্জ করেন। দু'বাহিনীর সংঘর্ষ শুরু হলে আকাশের শূন্যতা যোদ্ধাদের চিৎকার, হৈ-চৈ ও অস্ত্রের ঝনঝনানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। খালিদ (রা) তরবারির সামনে যাকে পাচ্ছিলেন তাকেই খতম করছিলেন। মুসলিম যোদ্ধাগণ সাহসিকতার ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছেন। খালিদ (রা) অনুভব করলেন তাঁর বাহিনী শীঘ্রই শত্রুর রক্ষাব্যূহ ভেঙে ফেলতে সক্ষম হবে।

কিন্তু অবিশ্বাসীদের বাহিনী পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর তরবারির আঘাতে অসংখ্য যোদ্ধা প্রাণ দিলেও তাদের সম্মুখভাগে ভাঙনের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। স্বধর্মত্যাগীরা অন্ধের মতো যুদ্ধ করে যাচ্ছে। এক ইঞ্চি জায়গার দখল ত্যাগ করার চেয়েও তারা প্রাণ ত্যাগ করাকে শ্রেয় মনে করছে। মুসলিম বাহিনী কিছুটা বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করছে যে, তারা কিছুতেই সামনে এগুনোর পথ করতে পারছে না। প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মুসলিম বাহিনীর মধ্যে কিছুটা বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় এই কারণে যে, তারা সামনে এগুনোর ও প্রতিপক্ষের রক্ষাব্যূহকে ভাঙার চেষ্টা করছিল। এটা কারও মনোবলে তেমন প্রভাব ফেলতে পারে না। কেননা যতক্ষণ তারা আক্রমণাত্মক ও শত্রু প্রতিরোধমূলক ভূমিকায় থাকবে ততক্ষণ কিছুটা বিশৃংখলা থাকাটা স্বাভাবিক।

ম্যাপ-১ঃ ইয়ামামার যুদ্ধ
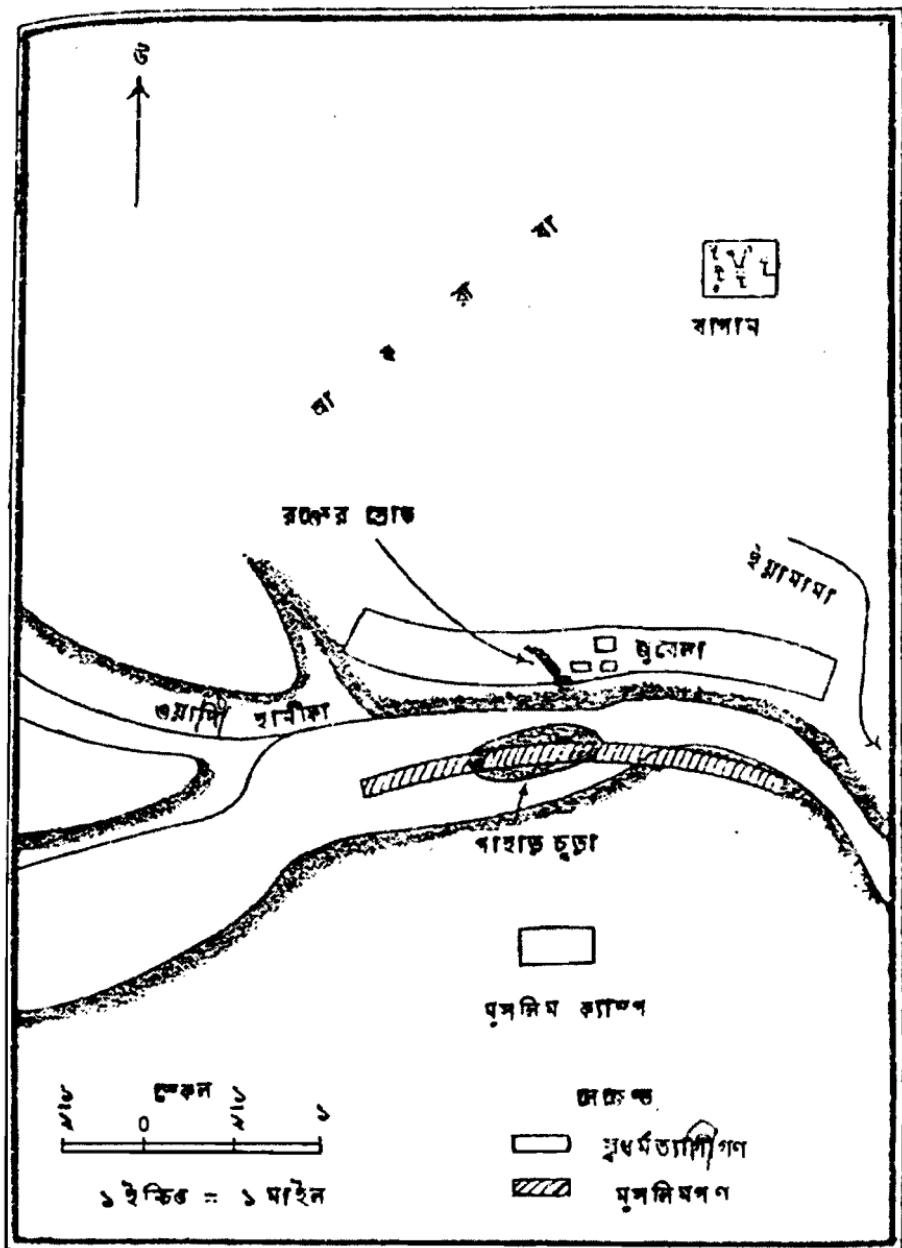
মুসায়লামা তার বাহিনীকে একযোগে প্রতিআক্রমণের নির্দেশ দান করে। কেননা সে সহসা উপলব্ধি করে যে, আর বেশিক্ষণ প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে থাকলে মুসলিম বাহিনী হঠাৎ করে তার প্রতিরক্ষব্যূহ ভেঙে ফেলতে সক্ষম হতেও পারে। স্বধর্মত্যাগীরা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতো সামনে অগ্রসর হলে মুসলিমগণ আতংকের সংগে লক্ষ্য করে যে, তারা পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। তবে তারা মরিয়া হয়ে স্বধর্মত্যাগীদের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে যুদ্ধ আরও ভয়ংকর রূপ লাভ করে। মুসায়লামার বাহিনীকে প্রতি গজ জায়গার জন্য প্রচুর রক্ত দিতে হচ্ছে, তবু তারা নেতার প্রতি অন্ধবিশ্বাস ও প্রতিশ্রুত জান্নাত প্রাপ্তির বাসনায় অবিরাম গতিতে সামনে অগ্রসর হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে থাকে। মুসলিম রেজিমেন্টগুলোতে বিভিন্ন গোত্রের লোকদের মিশ্রণের ফলে অটলতার কিছুটা অভাব দেখা দেয়। কেননা তারা গোত্রভিত্তিক দলবিভক্তির বাইরে যুদ্ধ করতে এখনও অভ্যস্ত নয়।

স্বধর্মত্যাগীরা ক্রমান্বয়ে প্রতিপক্ষের উপরে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফল পেতে থাকে। সংখ্যায় স্বল্প ও পাতলা হয়ে দাঁড়ানো মুসলিম বাহিনীর উপরে সংখ্যাঘন প্রতিপক্ষের চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলিম বাহিনী দৃঢ়তার সংগে যুদ্ধ করতে করতে পিছু হটতে থাকে। তাদের পশ্চাৎ পদক্ষেপ ক্রমান্বয়ে দ্রুত হতে থাকে। প্রতিপক্ষের চাপ আরও বৃদ্ধি পেলে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদপসরণ বিশৃংখল রূপ লাভ করে। কিছু রেজিমেন্ট পেছন ফিরে পালাতে থাকে এবং অন্যরাও শীঘ্রই তাদেরকে অনুসরণ করতে শুরু করলে যুদ্ধক্ষেত্র হতে একটি ব্যাপক পশ্চাদপসরণের দৃশ্যের অবতারণা হয়। অফিসারগণ তাদের যোদ্ধাদের পশ্চাদগতি থামানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, এমন কি তারা জনস্রোতে পড়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। মুসলিম বাহিনী থামতে থামতে তাদের ক্যাম্প এলাকা অতিক্রম করে চলে আসে।

মুসলিমগণ আকরাবা সমতলভূমি ত্যাগ করলে স্বধর্মত্যাগীরা তাদেরকে ধাওয়া করে। তাদের এই অগ্রাভিযান পরিকল্পিত ছিল না বরং ওহুদ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে পলায়নপর কোরেশগণকে মুসলমানগণ যে ভাবে ধাওয়া করেছিল এ ছিল অনেকটা তদ্রূপ। ওহুদের কিছু মুসলমানের মতো তার ও প্রতিপক্ষের ক্যাম্পের নিকট এসে লুটপাট শুরু করে দেয়। ওহুদ প্রান্তরের মতো সুযোগ আবার খালিদ (রা)-এর সামনে আসে। প্রতিপক্ষ লুটতরাজে ব্যস্ত থাকলে তিনি তাঁর বাহিনী পুনরায় সংগঠিত করে নেন প্রতিআক্রমণের জন্য।

মুসলিম ক্যাম্প এলাকায় খালিদ (রা)-এর তাঁবুতে অবস্থান করছে তাঁর নতুন স্ত্রী লায়লা ও শিকলপরা বন্দী মুজাআ। কয়েকজন অবিশ্বাসী বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল ও লুটপাটের সম্ভাব্য সুযোগে উদ্বুদ্ধ হয়ে খালিদের তাঁবুতে প্রবেশ করে। তারা মুজাআকে দেখে চিনতে পারে। তারা লায়লাকে হত্যা করতে চাইলে মুজাআ বাধা দান করে, "আমি তার রক্ষাকর্তা, তোমরা পুরুষদের সন্ধানে যাও।"[১৮৬] লুটতরাজের ধান্ধায় ব্যস্ত থাকার কারণে অবিশ্বাসীরা তাদের নেতা মুজাআকে মুক্ত করে দিতে ভুলে যায়।

---

১৮৬. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫১১।

কিছুক্ষণের জন্য মুসলিম ক্যাম্পে ব্যাপক লুটপাট চলে; যা বহন করা সম্ভব তা তারা নিয়ে যায় এবং বাকি সবকিছু ধ্বংস করে ফেলে। তারা তাঁবুগুলো কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। অল্প সময়ের মধ্যে লুটতরাজ বন্ধ হয়ে যায়। স্বধর্মত্যাগীরা দ্রুত আকরাবা সমতলভূমিতে ফিরে যায়, কেননা তারা দেখতে পায় যে, দক্ষিণ তীরে মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের জন্য পুনর্গঠিত হয়ে আবার অগ্রসর হচ্ছে।

বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, মুসলিম বাহিনী যখন পুনর্গঠনের জন্য ফিরে দাঁড়ায় এবং ভাবতে থাকে এইমাত্র কি ঘটে গেল, তখন তাদের অন্তরে ভয়-ভীতির কোনো চিহ্ন ছিল না; বরং তাদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি ও পশ্চাদপসরণের কারণে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এটা কিভাবে হলো? কিভাবে হতে পারে? অথচ তাদের চেয়ে শত্রুপক্ষের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নিঃসন্দেহে অনেক বেশি।

তাদের মনোবল অনড় কিন্তু তারা হতবুদ্ধি। তারা হতাশাগ্রস্ত ক্রোধ নিয়ে উপলব্ধি করলো যে, হয়তো বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে মিশ্রিত করে রেজিমেন্ট গঠন করার ফলেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এক গোত্রের লোকেরা অপর গোত্রকে দায়ী করতে থাকে। দায়ী করে শহরবাসীগণ মরুবাসীদেরকে। শেষ পর্যন্ত দাবি উঠলো, চলো, আমরা গোত্রভিত্তিক দল পুনর্গঠন করি। তারপর দেখা যাবে কারা কতটুকু কৃতিত্ব দেখাতে পারে।"[১৮৭]

খালিদ (রা) ভাবতে থাকেন ত্রুটিটা কোথায়। মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের সম্মুখভাবে ভাঙন ধরেনি, যা হওয়া উচিত ছিল; বরং মুসলিম বাহিনীর কিছুটা বিশৃংখলার সুযোগ নিয়ে ধর্মত্যাগীরা প্রতিআক্রমণ করে বসে। চাপ সহ্য করতে না পেরে তারা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, চেষ্টা করেও যা পুনরুদ্ধার করা যায়নি। সাহসিকতার কোন ঘাটতি ছিল না।

খালিদ (রা) বুঝতে পারলেন যে, বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে একত্র করে রেজিমেন্ট গঠন করাটা ভুল হয়েছে। কেননা গোত্রপ্রীতি এখনও আরবদের মধ্যে প্রবল। এই গোত্রপ্রীতির সংগে ইসলামী জোশ এবং ব্যক্তিগত সাহসিকতা ও দক্ষতা মুসলিম বাহিনীকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করে। এ ক্ষেত্রে সংখ্যার দিক থেকে তিনগুণ ও নেতার প্রতি অন্ধভাবে জীবনপাত করতে প্রস্তুত বাহিনীর মুকাবিলা করতে গিয়ে শুধু গোত্রীয় আনুগত্যের অভাবে মুসলিম বাহিনীর দৃঢ়তায় ফাটল ধরেছিল।

খালিদ (রা) তাঁর বাহিনীকে পুনর্গঠন করে ভুল শুধরে নেন। সৈন্য বিন্যাস ও কমান্ড পূর্বের মতোই থাকে, শুধু সৈনিকদের দল গঠিত হয় গোত্রের ভিত্তিতে। প্রত্যেক যোদ্ধা শুধু ইসলামের জন্যই নয়, স্বীয় গোত্রের সম্মান রক্ষার জন্যও যুদ্ধ করবে। গোত্রগুলোর মধ্যে বিরাজ করবে প্রতিযোগিতার মনোভাব।

---

১৮৭. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা - ৫১৩।

পুনর্গঠনের কাজ শেষ হলে খালিদ (রা) ও তাঁর কমান্ডারগণ বাহিনীর সামনে যান এবং চরম সাহসিকতার সংগে লড়াই করে মুসায়লামাকে শাস্তি দিয়ে হৃত সম্মান উদ্ধারের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। মুসলিমগণ প্রতিজ্ঞা করে যে, প্রয়োজন হলে তারা দাঁত দিয়ে যুদ্ধ করবে।

খালিদ (রা) কিছু যোদ্ধা বেছে নিয়ে তাদেরকে তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োজিত করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে নিজেকে প্রবিষ্ট করিয়ে স্বীয় যোদ্ধাদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। সেক্ষেত্রে এই দেহরক্ষী দল খুব কাজে লাগবে। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন "আমার সংগে সংগে থাকবে।"

পুনর্বিন্যস্ত মুসলিম বাহিনী পুনরায় আকরাবা সমতলে অগ্রাভিযান শুরু করে। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করে শুধু সিংহের মতো নয় বরং ক্ষুধার্ত সিংহের মতো।

ইতিমধ্যে মুসায়লামাও তার বাহিনীকে পূর্বের মতোই মোতায়েন করে। সে আল্লাহর তরবারির নিকট হতে দ্বিতীয় আঘাতের প্রতীক্ষা করতে থাকে এই বিশ্বাস নিয়ে যে, এবারেও তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করবে।

খালিদ (রা)-এর নির্দেশে মুসলিম বাহিনী আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে দ্রুত সামনে আগ্রসর হয়। সংখ্যায় ক্ষুদ্র এই বাহিনী স্বধর্মত্যাগীদের বৃহত্তর বাহিনীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলিম বাহিনীর ডান বাহুর কমান্ডার যায়দ মুকাবিলা করে প্রতিপক্ষের বামবাহুর কমান্ডার দলত্যাগী রাজ্জালের। তাকে দোযখের আগুন হতে রক্ষার জন্য যায়দ আহ্বান জানান, "ওহে রাজ্জাল! তুমি সত্যবিশ্বাস ত্যাগ করেছো। প্রত্যাবর্তন করো। আর তা হবে অধিক মহৎ ও সৎ কাজ।"[১৮৮] প্রতারক লোকটি এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে এবং কিছুক্ষণ পরেই দ্বৈতযুদ্ধে যায়দ তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন।

মুসলিম বাহিনী প্রতিপক্ষের গোটা সম্মুখ ভাগের উপর মরণপণ আঘাত হানে এবং প্রতিপক্ষও মরিয়া হয়ে মাটি আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। তাদের সম্মুখভাগে ভাঙনের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। স্বধর্মত্যাগীদের শত শত দেহ মাটিতে ঢলে পড়তে থাকে এবং মুসলিম পক্ষের নিহতের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবিশ্বাসীদের সংখ্যাধিক্য এবং মুসলিমদের দক্ষতা ও সাহসের কারণে উভয়পক্ষই সমানে সমান লড়ছিল। উভয় বাহিনীই মরণযুদ্ধে জড়িয়ে যায়। অসংখ্য পদচারণায় যুদ্ধক্ষেত্র হতে ধুলোর কুণ্ডলী আকাশে উড়ে যোদ্ধাদের মাথার উপরে মেঘের মতো ঝুলতে থাকে। তরবারি ও বর্শার ভাঙা অংশগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে খড়ের গাদার মতো জমে যায় এবং ছিন্নভিন্ন বিকৃত মানবদেহগুলো রক্তেভেজা বালুকা রাশির উপরে

১৮৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫১১

স্তূপাকারে পড়ে থাকে। সবচেয়ে ব্যাপক হত্যা সংঘটিত হয় সংকীর্ণ পরিখাটিতে যার ফলে মানুষের রক্ত পরিখা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ওয়াদী হানীফায় পতিত হয়। তখন হতে এই পরিখাটি আজ পর্যন্ত রক্তের পরিখা নামে খ্যাত। কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তের ইংগিত দান করে না।

যুদ্ধের এই পর্যায়ে খালিদ (রা) উপলব্ধি করেন যে, মুসায়লামা জীবিত থাকা অবস্থায় তার বাহিনী কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করবে না। এটা পরিষ্কার যে, মুসায়লামার মৃত্যু তার সৈনিকদের মনোবলে প্রচণ্ড আঘাত হানবে যা তাদেরকে পরাজয়ের পথে নিয়ে যাবে। কিন্তু মুসায়লামা খালিদ (রা)-এর মতো সম্মুখ অবস্থানে ছিল না। সে তার কতিপয় ভক্ত যোদ্ধা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিল। আঘাত হানতে হলে তাকে বেষ্টনী থেকে বের করে আনতে হবে।

যুদ্ধের প্রথম ধাক্কা শেষ হলে যোদ্ধাদের মধ্যে এক ধরনের আপাত স্থিরাবস্থা বিরাজ করতে থাকে। এই সময় খালিদ (রা) শত্রুবাহিনীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দ্বৈতযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করেন, "আমি আল-ওয়ালীদের পুত্র। এমন কেউ আছো যে আমার মুকাবিলা করতে চাও। শত্রুসারি হতে বেশ কয়েকজন যোদ্ধা খালিদ (রা)-এর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে একের পর এক এগিয়ে আসে। খালিদ (রা) তাঁর একেকজন প্রতিপক্ষকে খতম করতে বড়জোর একমিনিট করে সময় নিচ্ছিলেন। প্রত্যেক সংঘর্ষের পর তিনি আপনমনে উচ্চারণ করেন ঃ

আমার রক্তে আছে গোত্র প্রধানদের গৌরব
আমার তরবারি ভয়ংকররূপ ধারাল।
এর রূপ আরও ভয়ংকর হয়
যখন যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে।[১৮৯]

একের পর এক প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে করতে খালিদ (রা) মুসায়লামার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তাঁর সামনে দাঁড়ানোর মতো আর কেউ অবশিষ্ট থাকে না। ইতিমধ্যে তিনি মুসায়লামার সংগে কথা বলার মতো দূরত্বে পৌছে যান। মিথ্যাবাদীটি অবশ্য তার ভক্ত দেহরক্ষী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার ফলে খালিদ (রা) কোনো সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন না।

খালিদ (রা) কথা বলার প্রস্তাব দিলে মুসায়লামা রাজী হয়। সে খুব সাবধানে এগিয়ে এলেও দ্বৈত যুদ্ধের দূরত্বের বাইরে থাকে। খালিদ (রা) প্রশ্ন করেন, "আমরা যদি কোনো চুক্তি করতে চাই তাহলে তোমার শর্তসমূহ কি হবে ?[১৯০]

মুসায়লামা মাথাটি একদিকে এমনভাবে ঝুঁকিয়ে দেয় যেন সে কোনো অদৃশ্য ব্যক্তির সংগে কথা বলছে। ওহী প্রাপ্তি সময়ও সে এই ধরনের ভংগি করতো। তার

---

১৮৯ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা - ৫১৩।
১৯০ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা - ৫১৪।

এই ভংগি দেখে খালিদের স্মৃতিপটে রাসূল (সা)-এর বক্তব্য ভেসে ওঠে। তিনি বলেছিলেন যে, মুসায়লামা কখনও একা থাকে না। শয়তান সবসময় তার সংগে থাকে। সে কখনও শয়তানের অবাধ্য হতে পারে না এবং এই সব মুহূর্তে তার মুখে ফেনার উদ্রেক হয়। শয়তান তাকে চুক্তির প্রস্তাব মানতে নিষেধ করে দেয় এবং সে খালিদ (রা)-এর প্রতি মুখ ঘুরিয়ে মাথা নাড়ে।

খালিদ (সা) মুসায়লামাকে হত্যা করতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। কথোপকথনটি ছিল তাকে নাগালের মধ্যে নিয়ে আসার একটি উপায় মাত্র। মুসায়লামা তার দেহরক্ষীর বেষ্টনীতে ফিরে যাওয়ার পূর্বেই দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে। খালিদ (রা) মুসায়লামাকে আরও একটি প্রশ্ন করেন। মুসায়লামা এবারেও তার মাথাটি একদিকে ঝুঁকিয়ে দেয় যেন সে 'কিছু একটা শোনার' চেষ্টা করছে। ঠিক এই মুহূর্তে খালিদ (রা) স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে পড়েন।

খালিদ (রা) ছিলেন ক্ষীপ্র। কিন্তু মুসায়লামা ক্ষীপ্রতম। চোখের পলকে সে পিছু হটতে সক্ষম হয়।

মুসায়লামা নিরাপদে তার দেহরক্ষীদের বেষ্টনীতে ফিরে যায়। কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণকালে উভয় বাহিনীর মনোবলের মধ্যে অর্থবহ কিছু একটা ঘটে যায়। খালিদের সমান হতে স্বধর্মত্যাগীদের তথাকথিত নবী ও কমান্ডারের ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পিছু হটে যাওয়াকে তারা অসম্মানজনক হিসেবে মনে করে এবং এতে তাদের মনোবল ভেঙে যায়। অপরপক্ষে এই ঘটনায় মুসলমানদের মনোবল দারুণভাবে উদ্দীপিত হয়। পরিস্থিতির আনুকূল্যকে কাজে লাগানোর জন্য খালিদ (রা) তাঁর বাহিনীকে নতুন করে আক্রমণের নির্দেশ দান করেন।

'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে মুসলিম বাহিনী নতুন করে আক্রমণ রচনা করে। তারা নবতর উদ্দীপনা ও সাহস নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকে এবং অবশেষে বিজয়ের সম্ভাবনা দেখা যায়। মুসলমানদের ছুরি ও তরবারির তীব্র আঘাতে অবিশ্বাসীরা পিছু হটতে থাকে। ক্রমান্বয়ে তাদের পশ্চাদপসরণের গতি দ্রুততর হয়। এতে মুসলমানদের মনোবল আরো বৃদ্ধি পেলে তারা তাদের তৎপরতা দ্বিগুণ করে। অবিশ্বাসীদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙে খান খান হয়ে যায়।

মুসায়লামা তেমন কিছুই করতে পারে না। তার শীর্ষস্থানীয় কমান্ডার রাজ্জাল নিহত। একমাত্র দক্ষিণ বাহুর কমান্ডার মুহাক্কিম ভরসা। সে অবিশ্বাসীদেরকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এসে চিৎকার করে বলে, "ওহে বনী হানীফা! বাগান বাগান, বাগানে প্রবেশ করো। আমি তোমাদের পিছনদিক রক্ষা করবো।"

কিন্তু স্বধর্মত্যাগীদের বিশৃংখলা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। তাদের বাহিনীর বৃহত্তর অংশ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চারদিকে ছুটে পালাতে থাকে। মাত্র এক-চতুর্থাংশ যুদ্ধরত অবস্থায় থাকে। এই অংশটি দেয়ালঘেরা বাগানে প্রবেশ করে এবং

মুহাক্কিম একটি ক্ষুদ্র পশ্চাদরক্ষী দল নিয়ে তাদের পশ্চাদপসরণ পাহারা দেয়। এই পশ্চাদরক্ষীদেরকে মুসলমানগণ শীঘ্র টুকরো করে ফেলে এবং মুহাক্কিম খলীফার পুত্র আবদুর রহমানের তীরের আঘাতে ধরাশায়ী হয়।

মুসলমানগণ এখন আকরাবার সমতলভূমির উপর দিয়ে পলায়নপর অবিশ্বাসীদেরকে ধাওয়া করছিল এবং ডানে বামে যাকে যেখানে পাচ্ছিল, খতম করছিল। অল্প সময়ের মধ্যে তারা দেয়ালঘেরা বাগানটির নিকটে পৌঁছে যায়, সেখানে মুসায়লামা সাত হাজারের সামান্য কিছু বেশি স্বধর্মত্যাগীকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তারা উঁচু দেয়ালঘেরা বাগনে ঢুকে গেট বন্ধ করে দিয়ে নিজদেরকে নিরাপদ ভাবতে থাকে। তারা অতি সামান্যই জানতো।

মুসলিম বাহিনীর বৃহত্তর অংশ মৃত্যুর বাগানের পাশে এসে একত্রিত হয়। ইতিমধ্যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। তারা উদগ্রীব ছিল বাগানের ভেতরে প্রবেশ করে সেই সাত-সকালে যে কাজ শুরু করেছিল অন্ধকার আসার পূর্বেই তা শেষ করার জন্য। কিন্তু বাগানে প্রবেশের কোনো উপায় ছিল না। দেয়ালটির চারদিক থেকেই দুর্ভেদ্য বাধার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। গেটটিও ছিল ভেতর থেকে শক্তভাবে বন্ধ। এই বাধাকে অতিক্রম করার কোনো উপায় দেখা যাচ্ছিল না।

খালিদ (রা) একটা উপায় বের করার জন্য চিন্তা করছিলেন এমন সময় বারাআ বিন মালিক নামের একজন বয়স্ক যোদ্ধা গেটের সামনে দণ্ডায়মান সৈনিকদেরকে বললেন, "আমাকে দেয়ালের উপর দিয়ে বাগানে নিক্ষেপ করো।"[১৯১] তাঁর সহযোদ্ধারা এই কাজ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে, কেননা বারাআ ছিলেন একজন বিশিষ্ট ও সম্মানিত সাহাবী। তারা এমন কিছু করতে পারে না যাতে তাঁর নিশ্চিত জীবন নাশ হয়। বারাআ বার বার অনুরোধ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সহযোদ্ধারা তাঁকে কাঁধের উপর তুলে গেটের কাছে নিয়ে যায়। তিনি দু'হাতে দেয়াল ধরে টপকে বাগানের ভেতরে চলে যান। মিনিট খানিকের মধ্যে তিনি তাঁর ও গেটের মধ্যখানে অবস্থানকারী দু'জন অবিশ্বাসীকে খতম করেন। অন্যরা বাধা দেয়ার পূর্বেই তিনি গেটের ভারী বোল্টটি খুলে ফেলেন। গেটটি খুলে যাওযার সংগে সংগেই মুসলিম যোদ্ধারা বাঁধভাংগা বন্যার পানির মতো ভেতরে ঢুকে পড়ে। ইয়ামামা যুদ্ধের সর্বশেষ এবং সর্বচেয়ে বিধ্বংসী অধ্যায় শুরু হয়।

প্রথমে অবিশ্বাসীরা মুসলিম বাহিনীকে কিছুটা সময় ঠেকাতে সক্ষম হয়। কেননা এই সময়ে মুসলমানদের চাপ গেটের মুখের সংকীর্ণ এলাকার মধ্যে সীমিত ছিল। তদুপরি স্থানের স্বল্পতার কারণে তারা মুক্তভাবে হাত ঘুরিয়ে অস্ত্রও পরিচালনা করতে পারছিল না। কিন্তু মুসলিমগণ অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে সামনে এগুতে থাকলে অবিশ্বাসীরা তাদের তরবারির নীচে স্তূপাকারে পড়তে থাকে। চাপের মুখে প্রতিপক্ষ

---

১৯১. পূর্বোক্ত।

পিছু হটতে থাকলে মুসলিম যোদ্ধাগণ ব্যাপক সংখ্যায় বাগানের ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে।

যুদ্ধ আরও ভয়ংকর রূপ লাভ করে। সৈন্য পরিচালনার জায়গার অভাবের কারণে উভয়পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি মরণযজ্ঞ শুরু হয়। অবিশ্বাসীদের মধ্যে নিহতের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। কিন্তু মুসায়লামা তারপরও যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং তার মধ্যে যুদ্ধ পরিত্যাগের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। সে ছিল সাহসী ও দক্ষ যোদ্ধা। মুসলমানগণ তার সাহস ও পারদর্শিতা দেখে বিস্মিত হয়ে পড়ে। তার মুখ দিয়ে ফেনা নির্গত হতে থাকে এবং তাকে একটি ভয়ংকর পিশাচের মতো দেখাচ্ছিল।

ইয়ামামার যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ের চরম মুহূর্ত সমাগত। গোটা বাগান জুড়ে মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতের মুখে অবিশ্বাসীরা ব্যাপক হারে মৃত্যুবরণ করতে থাকে। শুধুমাত্র মুসায়লামার পরম সাহসিকতাই তার বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয়কে ঠেকিয়ে রাখে। মুসলিম বাহিনী মরিয়া হয়ে ওঠে। তাদের তরবারির আঘাতে অসংখ্য দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থাকে। ক্ষতবিক্ষত ও বিকৃত মানবদেহে বাগানটি ভরে যায়। আহত হয়ে যারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, যুদ্ধপাগল সৈনিকদের পায়ের আঘাতে তাদের প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করে। হত্যা এতো ব্যাপক রূপ লাভ করে যে, ধুলা ও রক্ত মিশে বাগানটি লাল কাদাময় হয়ে যায়।

স্বধর্মত্যাগীদের অনেকেই ছুটে মুসায়লামার নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কোথায় তোমার সেই প্রতিশ্রুত বিজয় ?" মুসায়লামার নির্ধারিত উত্তর, "যুদ্ধ করো, ওহে বনী হানীফা! শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাও।"[১৯২]

মুসায়লামা জানতো যে, খালিদ (রা)-এর হাত থেকে তার রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই, তার ধ্বংস অনিবার্য। এই শয়তান লোকটি তার গোত্রকেও ধ্বংসের পথে না নিয়ে ছাড়বে না। তার তরবারির আঘাতে বেশ কয়েকজন মুসলিম যোদ্ধাকে প্রাণত্যাগ করতে হয়। তার দেহরক্ষীরাও চিরঅন্ধের মতো তাকে ঘিরে যুদ্ধ করতে থাকে। এই সময় তার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় ওহুদ যুদ্ধে সেই কৃষ্ণকায় লোকটির বাজ পাখির মতো শ্যেণ দৃষ্টি যার নাম ওয়াহশী।

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে রাসূলে আকরাম (সা) ঘোষিত যুদ্ধ অপরাধীর তালিকায় এই লোকটির নাম ছিল। জীবনের ভয়ে সে মক্কা ত্যাগ করে তায়েফে গমন করে এবং সেখানে সাকীফ গোত্রের সংগে কিছু দিন বসবাস করে। নবম হিজরীতে সাকীফ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করলে সেও তাদের সংগে সত্যপথকে গ্রহণ করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য তাঁর সামনে উপস্থিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে দীর্ঘদিন দেখেননি। তাই নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি সেই বর্বর লোকটি ?"

---

১৯২. পূর্বোক্ত।

"হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল।"

"আমাকে বলো, তুমি কিভাবে হামযাকে শহীদ করেছিলে।"[১৯৩]

লোকটি হযরত হামযার শাহাদতের ঘটনা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করে। এই ঘটনাটির যে একটি আদর্শগত বা আবেগময় দিক আছে সে তা কখনও ভেবে দেখেনি। সে ইসলামের একজন মহান সেবক ও সিংহপ্রাণ মুজাহিদকে হত্যা করেছিল। সে ঘটনাটি ঠিক সেভাবে বর্ণনা করেছিল যেভাবে একজন বিজ্ঞ সেনাপতি তার মুগ্ধ শ্রোতাদের সামনে স্বীয় কৃতিত্বের উপাখ্যান বর্ণনা করে। অবশ্য হযরত হামযা (রা)-এর মতো একজন অতুলনীয় যোদ্ধাকে হত্যা করা নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সামরিক কৃতিত্ব ছিল। তার বর্ণনার ভংগি ছিল উত্তম।

কিন্তু লোকটির এই গৌরবগাঁথা শুনে রাসূল (সা)-এর মুখে প্রশংসাসূচক ভাবের পরিবর্তে দুঃখের চিহ্ন ফুটে উঠে। তিনি বলেন, "আমি তোমাকে আর দেখতে চাই না"[১৯৪], রাসূল (সা) পরোক্ষভাবে তাকে এই মর্মে সতর্ক করে দিলেন যে, মদীনায় মহান হামযার স্মৃতি এতো জীবন্ত যে, এখানে তোমার অবস্থান বিপজ্জনক হতে পারে। লোকটি তৎক্ষণাৎ মদীনা ত্যাগ করে।

পরবর্তী দু'বছর সে তায়েফের আশেপাশে আত্মগোপন করে থাকে। সে বিবেকের তাড়নায় ভুগতে থাকে এবং তাকে মৃত্যুভয় পেয়ে বসে। এই সময় স্বধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে গেলেও সে সত্যপথের প্রতি অনুগত থাকে এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেয়। আজ সে আল্লাহর তরবারির কমান্ডে স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত।

ওয়াহশী বর্শাটি শক্ত করে ধরে। তার এই বর্শার আঘাতে ইতিমধ্যে অনেকেই ধরাশায়ী হয়েছে। মিথ্যাবাদী মুসায়লামা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছিল, তার প্রতি অগ্রসরমান মুসলিম যোদ্ধাদেরকে প্রতিহত করার জন্য সে তার দেহরক্ষীদের সামনে এসে যুদ্ধ করছিল। কৃষ্ণকায় ঘাতক লোকটির দৃষ্টি তার প্রতি স্থির হয়। সে এমন একজন লোককে তার পরবর্তী শিকার হিসেবে টার্গেট করেছে যার মৃত্যু হয়তো তার মনের যন্ত্রণাকে কিছুটা উপশম করবে।

মুসলিম বাহিনীর সামান্য পিছনে স্বীয় অবস্থান হতে ওয়াহশী ধীর পদক্ষেপে সামনে এগুতে থাকে। সে তার টার্গেটকে বর্শার নিক্ষেপ দূরত্বের মধ্যে পেতে চায়। মুসায়লামার আশ-পাশ হতে ঘর্মাক্ত ও রক্তাক্ত যোদ্ধাদের ভিড় কমতে থাকে। ওয়াহশীর ভয়ংকর দু'টি চোখের সামনে শুধু মুসায়লামার চেহারা ভাসতে থাকে।

সে ওহুদ যুদ্ধের মহীয়সী রমণী উম্মে উমারাকে দেখতে পায় (যদিও উম্মে উমারার চেহারা দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে, তিনি একজন মহিলা) মুসায়লামার

---

১৯৩. ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৭২।

১৯৪. পূর্বোক্ত।

নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টায় রত। তাঁর পথে বাধাদানকারী একজন অবিশ্বাসীকে তিনি মুকাবিলা করছিলেন। সে অবিশ্বাসীটি আকস্মিকভাবে এক আঘাতে তাঁর একটি হাত কেটে ফেলে। পাশে দন্ডায়মান তাঁর পুত্র অবিশ্বাসীটিকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। উম্মে আমারা মুসায়লামার মুকাবিলা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ব্যথিত হন।

ওয়াহ্‌শী লোকটি আরও এগিয়ে যায়। তার স্মৃতিপটে ওহুদ যুদ্ধের মহান শহীদ হযরত হামযা (রা)-এর ছবি ভেসে ওঠে যার হত্যাকাণ্ড তার বর্তমান মানসিক যন্ত্রণার কারণ। সে দেখতে পায় সুদর্শন, সুঠাম হামযা (রা)-কে। মন হতে এই বেদনাদায়ক স্মৃতি মুছে ফেলার মানসে সে আর একবার মুসায়লামার দিকে তাকায়। সে দুই চেহারার বৈপরীত্য দেখে মর্মাহত হয়। মুসায়লামার হলুদ, কুৎসিৎ ও চ্যাপ্টা নাকওয়ালা হিংসামাখা চেহারা, যার মুখ দিয়ে ফেনা নির্গত হচ্ছিল, তার সামনে একটি ভীতিকর অবস্থা উপস্থাপন করে। এই পিশাচ লোকটির চেহারার মধ্যে যেন তার সমস্ত কু-কর্মের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অভ্যস্ত চোখে ওয়াহ্‌শী দূরত্ব পরিমাপ করে নেয়। দূরত্ব ছিল যথার্থ। সে তার হাতের বর্শা তাক করার সংগে সংগে দেখে আবু দুজানা (ওহুদ যুদ্ধে রাসূলের মানব ঢাল) হাতে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে মুসায়লামার দিকে ছুটে আসছেন। আবু দুজানা ছিলেন একজন দক্ষ তরবারি চালক এবং তিনি শীঘ্রই লক্ষ্য অর্জন করে ফেলবেন। ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ করে ওয়াহ্‌শী বর্শা নিক্ষেপ করে।

বর্শাটি মুসায়লামার পেটে বিদ্ধ হয়। ভণ্ড নবীটি মাটিতে পড়ে যায়। যন্ত্রণায় তার মুখ কুকড়ে যায় এবং দু'হাতে মাটি আঁকড়ে ধরে। মুহূর্তের মধ্যে আবু দুজানা তার উপরে চড়াও হন। তরবারির এক আঘাতেই তিনি মিথ্যাবাদীটির দেহ হতে শয়তানী মাথাটি বিচ্ছিন্ন করেন। তিনি এই শুভ সংবাদটি ঘোষণার জন্য সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সংগে সংগেই জনৈক অবিশ্বাসীর এক আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে যান। একজন স্বধর্মত্যাগী মুসায়লামার অসাড় দেহ দেখে চিৎকার করে বলে, "একজন কালো ক্রীতদাস তাকে হত্যা করেছে। সবাই চিৎকার করে উঠে, মুসায়লামা মৃত।"[১৯৫]

ওয়াহ্‌শী পরবর্তীতে সিরিয়া অভিযানেও খালিদ (রা)-এর নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করে। সিরিয়া ইসলামী রাষ্ট্রের আওতায় এলে সে ইয়েমসায় স্থায়িভাবে বসবাস করে এবং অতি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তও জীবিত ছিল। তবে সে জীবনের অধিকাংশ সময় নেশা করে কাটিয়েছিল। উমর (রা) তাকে এই নেশা করার জন্য শাস্তিস্বরূপ ৮০ বেত্রাঘাত দিয়েছিলেন (নেশার জন্য কোনো মুসলমানকে এটাই ছিল প্রথম শাস্তি)। কিন্তু তবুও সে নেশা ছাড়েনি। উমর (রা) এই ভেবে আশা ত্যাগ করেছিলেন যে, "সম্ভবত হযরত হামযা (রা)-এর হত্যাকারী হিসেবে তার উপরে আল্লাহর অভিশাপ আছে।"

---

১৯৫. ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৭৩।

পরবর্তীকালে ইমেসায় সে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ও পর্যটকদের আকর্ষণে পরিণত হয়েছিল। লোকজন তার বাড়িতে এই আশা নিয়ে যেতো যে, তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া গেলে তার নিকট হতে হযরত হামযা (রা) ও মুসায়লামা হত্যার গল্প শোনা যাবে। সে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে খুব রসিয়ে রসিয়ে এই দু'জনকে হত্যার গল্প বলতো। গল্পের শেষে এসে সে তার বর্শাটি তুলে খুব গর্বিত ভংগিতে বলতো, "এই বর্শার দ্বারা আমি অবিশ্বাসী হিসেবে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষকে ও বিশ্বাসী হিসেবে একজন নিকৃষ্ট মানুষকে হত্যা করেছি।"[১৯৬]

মুসায়ংলামার মৃত্যু সংবাদে ধর্মত্যাগীদের প্রতিরক্ষাব্যূহ দ্রুত ভেঙে পড়ে। তাদের কিছু লোক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়ে মরিয়া হয়ে তরবারি চালাতে থাকে। এতে কোনো ফল হয় না বরং তাদের কষ্টের সময় আরও দীর্ঘ হয়। তাদের অধিকাংশই যুদ্ধ করা থেকে বিরত হয়ে মুসলমানদের পক্ষ হতে শেষ আঘাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। মুসলমানরাও কিংবর্তব্যবিমূঢ় অবিশ্বাসীদের উপরে সর্বশেষ ও চরম আঘাত হানে এবং তাদের তরবারির সাহায্যে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর প্রতিশ্রুত ক্রোধ চরিতার্থ হয়। যুদ্ধের এই পর্যায়ে যা ঘটেছিল তাকে যুদ্ধ না বলে বরং ঢালাও হত্যা বলা চলে।

সূর্যাস্তের সময় হতে হতে মৃত্যুর বাগানে শান্তি ও নিরবতা ফিরে আসে। মুসলমানগণও তাদের তরবারি তুলে ধরার শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং হত্যা করারও কেউ বাকি থাকে না।

রাতের জন্য মুসলমানগণ যে যেখানে ছিল সেখানেই বিজয়ের তৃপ্তি নিয়ে বিশ্রামের কোলে ঢলে পড়েন।

পরদিন সকালে খালিদ (রা) যুদ্ধক্ষেত্র ঘুরে দেখেন। তিনি সর্বত্র যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ দেখতে পান। নিহত, ক্ষতবিক্ষত ও বিকৃত মানবদেহ স্তূপাকারে পড়ে আছে। মানুষের রক্তে ওয়াদী হানীফা, আকরাবার সমতল ভূমি এবং মৃত্যুর বাগান সিক্ত হয়ে আছে। কোথাও কোথাও তাকে রক্তেভেজা মাটির কাদা অতিক্রম করে এগুতে হয়।

ইয়ামামার স্বধর্মত্যাগীদের সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই এই যুদ্ধে নিহত হয় শুধু মুজাআ ছাড়া। মুজাআ এখনও শিকল পরিহিত অবস্থায় আছে এবং বিজয়ী বীর খালিদের সংগে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরছে। খালিদ (রা) তাকে সংগে নিয়েছেন দু'টি কারণে। প্রথমত প্রতিপক্ষের নিহত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে চিহ্নিত করা, দ্বিতীয়ত তাকে বনী হানীফার পরাজয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করার সুযোগ দেয়া।

মুসলমানদের অবস্থাও খুব ভাল ছিল না। এই বিজয়ের জন্য তাদেরকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। এই মুহূর্তে তারা আর আত্মরক্ষার শক্তিও রাখে না। ক্ষতবিক্ষত

---

১৯৬. পূর্বোক্ত।

অবস্থায় তারা যে যেখানে রাত যাপন করেছিল সেখানেই নিজেদের অংগ-প্রত্যংগের যত্ন করতে থাকে। ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও যুদ্ধের ফলাফলে খালিদ (রা) সন্তুষ্ট ছিলেন। মুসায়লামা নিহত এবং তার বাহিনী টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তাঁর চেহারায় একটা আনন্দের আভা ফুটে ওঠে। কিন্তু মুজাআ সেটাকে বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে দেয় না।

"হ্যাঁ, তোমরা বিজয় অর্জন করেছো কিন্তু তোমাদের জানা উচিত যে, তোমরা বনী হানীফার একটি ক্ষুদ্র অংশের সংগে মাত্র যুদ্ধ করেছো যা মুসায়লামা তাড়াহুড়া করে একত্র করতে পেরেছিল। বাহিনীর প্রধান অংশ এখনও ইয়ামামার দুর্গে অবস্থান করছে"—মুজাআ বলে।

খালিদ (রা) তার দিকে রোষভরা দৃষ্টিতে তাকান, "তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হোক। এ তুমি কি বলছো ?"

"হ্যাঁ, ব্যাপারটি তাই, তোমরা বরং শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করো। তোমরা তোমাদের শর্তের কথা বললে আমি দুর্গে গিয়ে তাদেরকে অস্ত্র ত্যাগের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারি।"

খালিদ (রা) সহজেই উপলব্ধি করেন যে, শান্ত ক্ষতবিক্ষত বাহিনী নিয়ে বৃহত্তর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি মুজাআর প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন, "হ্যাঁ, শান্তির চেষ্টা করো।"

দু'নেতা শান্তির শর্তসমূহ নির্ধারণ করেন। মুসলমানগণ ইয়ামামার সমস্ত স্বর্ণ, তরবারি, বর্ম ও ঘোড়া নিয়ে যাবে। কিন্তু জনসংখ্যার মাত্র অর্ধেককে দাস হিসেবে পাবে। মুজাআর শিকল খুলে দেয়া হয়। সে শীঘ্রই প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুরক্ষিত শহরে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ পড়ে সে ফিরে এসে জানায়, "তারা রাজী হয়নি। তারা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত বরং তারা আমার উপড়ে চড়াও হয়েছিল। ইচ্ছা করলে তোমরা তাদেরকে আক্রমণ করতে পারো।"

খালিদ (রা) শহরটি স্বচক্ষে দেখার সিদ্ধান্ত নেন। পরিশ্রান্ত বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিককে শহীদদের কবর দান ও পরিত্যক্ত মালামাল সংগ্রহের নির্দেশ দিয়ে তিনি একটি অশ্বারোহী দল নিয়ে ইয়ামামার দিকে রওয়ানা দেন। সংগে থাকে মুজাআ। তিনি দেয়ালঘেরা শহরের উত্তর পাশে উপস্থিত হয়ে বিস্ময়ের সংগে ভেতরে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত অসংখ্য যোদ্ধার চলাচল উপলব্ধি করেন, সূর্যের আলোয় যাদের তরবারি ও বর্মের ঝলাকানি চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। সুরক্ষিত দুর্গের ভেতরে অবস্থিত এই বাহিনীকে তিনি কিভাবে মুকাবিলা করবেন বুঝতে পারেন না। তাঁর যোদ্ধারা এখন যুদ্ধ করার মতো অবস্থায় নেই, তারা চায় শুধু বিশ্রাম।

মুজাআর কথায় নীরবতা ভাঙে, "তারা আত্মসমর্পণে রাজী হতে পারে যদি তুমি তাদের কাউকে দাসত্বে পরিণত না করার প্রতিশ্রুতি দাও। অবশ্য তুমি সমস্ত স্বর্ণ, তরবারি, বর্ম, ঘোড়া অন্যান্য অস্ত্র নিতে পার।" "তারা কি এই প্রস্তাবে রাজী আছে?" খালিদ (রা) জিজ্ঞেস করেন। "আমি এই প্রস্তাব নিয়ে তাদের সংগে কথা বলেছি; তারা কোনো সিদ্ধান্ত দেয়নি।"

খালিদ (রা) এতটুকু ছাড় দিতে রাজী, তার বেশি নয়। তিনি মুজাআর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকান। তারপর বলেন, "আমি তোমাকে তিনদিন সময় দিলাম। চুক্তির নতুন শর্তের প্রেক্ষিতে এই তিনদিনের মধ্যে যদি দুর্গের গেটগুলো না খোলে তাহলে আমি আক্রমণ করবো এবং তারপরে আর কোনো চুক্তি হবে না।

মুজাআ আবার দুর্গের ভেতরে গেল। এবারে হাসিমুখে ফিরে এসে ঘোষণা দিল, "তারা রাজী আছে।"[১৯৭]

নির্ধারিত শর্তসমূহ অনুযায়ী চুক্তিপত্র লেখা হয়। মুসলিম বাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন খালিদ (রা) এবং বনী হানীফার পক্ষে মুজাআ বিন মারারা।[১৯৮]

চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে মুজাআ দুর্গের ভেতরে যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গেটগুলো খুলে যায়। খালিদ (রা) তাঁর অশ্বারোহী দল ও মুজাআকে সংগে নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করেন। তিনি দুর্গের ভেতরে সশস্ত্র যোদ্ধার পরিবর্তে শুধু নারী, শিশু ও বৃদ্ধলোক দেখতে পান। বিস্ময়ভরাকণ্ঠে মুজাআকে জিজ্ঞেস করেন, "সে সব সশস্ত্র যোদ্ধা কোথায় যাদেরকে আমি দেখেছিলাম ?"

মুজাআ মহিলাদের দিকে অংগুলি নির্দেশ করেন, "এরাই সেই যোদ্ধা যাদেরকে তুমি দেখেছিলে।" সে ব্যাখ্যা করে বলে, "আমি প্রথমবার দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করে এদেরকে বর্ম পরিয়ে অস্ত্র হাতে দিয়ে, প্যারেড করে যুদ্ধ প্রস্তুতির ভাব সৃষ্টি করেছিলাম। আসলে তারা যোদ্ধা ছিল না।

মুজাআর চালাকিতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন খালিদ (রা), 'ওহে মুজাআ তুমি আমাকে প্রতারিত করেছো।"

মুজাআ কাঁধটি একটু বাঁকিয়ে বলে, তারা আমার গোত্রের লোক। এছাড়া আমার আর করার কি ছিল।"

সদ্যস্বাক্ষরিত চুক্তির জন্য মুজাআ রক্ষা পায়। নইলে খালিদ (রা) তাকে খালি হাতেই ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলতেন। তিনি চুক্তির শর্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। বনী হানীফার অবশিষ্ট লোকেরা দুর্গ থেকে বের হয়ে নিরাপদে চলাফেরা করতে থাকে।

এক বা দুদিন পরে খলীফার নিকট হতে নির্দেশ আসে বনী হানীফার স্বধর্মত্যাগী সব লোককে হত্যা করার। খলীফা ইয়ামামার যুদ্ধের সমাপ্তির খবর তখনও জানতেন না। যুদ্ধ পরবর্তী চুক্তিস্বাক্ষরের কারণে খলীফার নির্দেশ পালনে অক্ষমতার কথা ব্যাখ্যা করে খালিদ (রা) পত্র লেখেন। আবূ বকর (রা) চুক্তির শর্তে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

---

১৯৭. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫১৫-৭, বালাযুরী, পৃষ্ঠা - ৯৯-১০০।

১৯৮. চুক্তির প্রকৃত শর্তসমূহ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে; কিন্তু চুক্তির শর্তসমূহ এক্ষেত্রে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

অবশ্য এই চুক্তি প্রযোজ্য ছিল শুধু যারা দুর্গের মধ্যে ছিল তাদের জন্য। বনী হানীফার হাজার হাজার লোক, যারা ইয়ামামার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এই চুক্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক মুসায়লামার বাহিনীর সদস্যগণ। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০,০০০। যদিও মুসায়লামার মৃত্যুর পর তারা তেমন একটা হুমকির কারণ ছিল না, তবুও যেকোনে সময় ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে। তাদের ধ্বংস করা উচিত। যুদ্ধের কঠিন নিয়মানুযায়ী আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তারা ক্ষমার অযোগ্য।

খালিদ (রা) যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন যাতে গোটা এলাকায় পূর্ণ শান্তি বিরাজ করে। তিনি তাঁর শ্রান্ত বাহিনীকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে পাঠিয়ে দেন ইয়ামামার আশেপাশের এলাকাকে পদানত করতে এবং যারা বাধা দেবে তাদেরকে বন্দী অথবা হত্যা করতে।

পলাতক সৈন্যদেরকে খুঁজে বের করা হয়। এদের মধ্যে হাজার হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করতে অসম্মতি জানালে তাদেরকে খতম করা হয় এবং তাদের রমণী ও সন্তানদেরকে বন্দী করা হয়। অপরপক্ষে অসংখ্য পলাতক সৈনিক আত্মসমর্পণ করে। এদেরকে ক্ষমা করা হয় এবং তারা সবাই ইসলামের ছায়াতলে পুনঃপ্রবেশ করে।

খালিদ (রা) ইয়ামামার পাশে তার সদর দপ্তর স্থাপন করেন। খলীফার নিকট হতে পরবর্তী নির্দেশ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রায় দু'মাস সেখানে অবস্থান করেন।

ইয়ামামার যুদ্ধের সফল সমাপ্তির সংগে সংগে আরবের অধিকাংশ এলাকা স্বধর্মত্যাগের সমস্যা থেকে মুক্ত হয়। আর যেটুকু বাকি ছিল তা তেমন হুমকির কারণ ছিল না। আরও কিছু যুদ্ধ বাকি থাকলেও তা এ যাবত বর্ণিত যুদ্ধগুলোর মতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

ইয়ামামার যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নিখুঁত ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। মুসলিম বাহিনী এর পূর্বে কখনও এমন শক্তিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি। এই পরীক্ষায় তারা আল্লাহর তরবারির নেতৃত্বে গৌরবজনকভাবে সফলকাম হয়। দক্ষ মুসায়লামার নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিপক্ষের কয়েকগুণ শক্তিশালী বাহিনীকে ধ্বংস করে মুসলিমগণ নিজেদেরকে ইস্পাতকঠিন শক্তি হিসেবে প্রমাণ করে। অর্ধশতাব্দী পরে যখন কোনো বৃদ্ধ তার নাতি-নাতনির নিকট এই যুদ্ধের গল্প বলবে, তখন সে গল্পটি শেষ করবে গর্বের সংগে এই বলে যে, 'ইয়ামামায় আমিও ছিলাম'।

এই যুদ্ধে প্রতিপক্ষের মোট ২১০০০ সৈন্য প্রাণ হারায়। এদের মধ্যে ৭০০০ আকরাবার সমতলে, ৭০০০ মৃত্যুর বাগানে এবং বাকি ৭০০০ ইয়ামামার আশেপাশে প্রেরিত মুসলিম দলগুলোর হাতে।

প্রতিপক্ষের তুলনায় মুসলিম বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল কুবই কম। তবে তা অতীতের যুদ্ধগুলোর ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় ছিল অনেক বেশি। তাদের মোট শহীদ হয় ১,২০০ যোদ্ধা, যাঁদের অধিকাংশ প্রাণ দেন ওয়াদী হানীফায় অথবা তার আশেপাশে।[১৯৯] শাহাদৎ বরণকারীদের অর্ধেক ছিলেন পবিত্র রাসূলের ঘনিষ্ঠ সহচর আনসার ও মুহাজির। বলা হয় যে, এই শহীদদের মধ্যে ৩০০ ছিলেন এমন সাহাবা যাদের কুরআন মুখস্থ ছিল। এই যুদ্ধে কিছু উত্তম মুসলিম প্রাণ হারান। এঁরা হলেন আবু দুজানা, আবু হুযায়ফা (বামবাহুর কমান্ডার), যায়দ (উমরের ভ্রাতা এবং ডান বাহুর কমান্ডার)।

যায়দ শহীদ হলেও উমর (রা)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন। তিনি পিতার সংগে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন এই বলে, "তুমিও কেন যায়দের সংগে জীবন বিসর্জন দিলে না ! যায়দ মৃত অথচ তুমি জীবিত! আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।"

উমর (রা)-এর উপযুক্ত পুত্র জবাব দেন, "বাবা, চাচা শাহদৎ চেয়েছিলেন এবং আল্লাহ তাকে কবুল করেছেন। আমিও শাহাদৎ চেয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহ আমার প্রার্থনা কবুল করেননি।"[২০০]

ইয়ামামার যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে আবূ বকর (রা)-এর অভিযান চূড়ান্ত রূপলাভ করে। তাঁর কৌশল ছিল খালিদ (রা)-এর শক্তিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে এক এক করে প্রধান প্রধান স্বধর্মত্যাগী গোত্রগুলোকে দমন করা। খলীফার এ কৌশল পুরোপুরি সফল হয়। তিনি খালিদ (রা)-এর সাহায্যে প্রথমে কাছের, তারপর ক্রমান্বয়ে দূরের বিদ্রোহীদের খতম করেন। ইয়ামামায় যুদ্ধের পর আর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা থাকে না।

---

১৯৯. জুবায়লা পরিদর্শনকারীগণকে বর্তমানে ওয়াদী হানীফার দক্ষিণ তীরের একটি কবরস্থান দেখানো হয়, যেখানে মুসলিম বাহিনীর শহীদগণ শুয়ে আছেন এবং উত্তর তীরের গ্রাম ও সংকীর্ণ পরিখার মাঝের এলাকায় স্বধর্মত্যাগীদের কবরস্থান অবস্থিত।

২০০. তারাবী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫১২-৩।

স্বধর্মত্যাগীদের পতন

আরবের অন্যান্য এলাকার স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনী সুপরিকল্পিতভাবে একের পর এক অভিযান পরিচালনা করে তাদের নির্মূল করে ফেলে। এতে সময় লাগে প্রায় পাঁচ মাস।

আমর ইবনুল আসকে পাঠানো হয়েছিল সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকার ধর্মদ্রোহীদেরকে দমন করার জন্য। সেখানকার প্রধান দুটি গোত্র ছিল, কুজাআ ও ওয়াদীআ। ওয়াদীআ বৃহত্তর গোত্র কাব-এর অংশ। খালিদ (রা) মধ্যআরবের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকা অবস্থায় আমর উত্তরে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি সীমিত সাফল্য অর্জনে সক্ষম হন। ফলে বিদ্রোহী গোত্রগুলো ইসলামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকে।

ইয়ামামার যুদ্ধ সমাপ্ত হলে খলীফার নির্দেশে শুরাহবীল বিন হাসানা তার কোরসহ আমরের সংগে যোগদান করেন। তারা উভয়ে যৌথভাবে উত্তর আরবের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। অধিকাংশ বিদ্রোহী গোত্র তাবুক ও দাউমাত-উল-জান্দালে একত্রিত হয়। আমর ও শুরাহবীল সেখানেই তাদের উপরে চরম আঘাত হানেন। কয়েক সপ্তাহের সংঘর্ষের পর বিদ্রোহীরা পরাজিত হয় এবং গোত্রসমূহ পুনরায় ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে। উত্তর আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওমানে বসবাসকারী প্রধান গোত্র ছিল আযদ। গোত্র প্রধানের নাম ছিল লাকীত বিল মালিক। সে যুতাজ অর্থাৎ মুকুটধারী নামে সুপরিচিত ছিল। এই গোত্রের লোকেরা এবং এই অধ্যায়ে যাদের ধর্মদ্রোহিতার কথা আলোচিত হবে, তারা সকলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম কবুল করে মুসলিম রাষ্ট্রের সমস্ত শর্ত মেনে চলতে রাজী হয়েছিল।

রাসূলের মৃত্যুর খবর শোনার সংগে সংগে যুতাজের নেতৃত্বে আযদের অধিকাংশ লোক বিদ্রোহ করে। এটা নিশ্চিত নয় যে, যুতাজ স্বধর্মত্যাগী ছিল। তাবারীর একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি হলো যে, "নবীরা যা দাবি করে সে তাই দাবি করেছিল।"[২০১] এর থেকে মনে হয় যে, হয়তো সে নবুয়তের কিছুটা দাবি করেছিল। এটা এমনও হতে

---

২০১. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫২৯।

পারে যে, আবূ বকর (রা) মদীনার বিরুদ্ধে হুমকি সৃষ্টিকারী প্রধান গোত্রসমূহকে দমন করার জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকায় যুতাজ নিজেকে ওমানের রাজা ঘোষণা করে এবং দাবায় রাজধানী স্থাপন করে নিজেকে সেখানকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় (৭ নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য)।

খালিদ (রা) তুলায়হাকে দমন করার জন্য যুকীসসা ত্যাগ করলে খলীফা হুযায়ফা বিন মিহসানকে (কোর কমান্ডারদের একজন) ওমানে প্রেরণ করেন। হুযায়ফা ওমানে প্রবেশ করলেও যুতাজের মুকাবিলা করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি তাঁর ছিল না। তাই তিনি শক্তিবৃদ্ধির অনুরোধ জানিয়ে খলীফার নিকট পত্র লেখেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খলীফা ইকরামাকে ইয়ামামা থেকে হুযায়ফার সাহায্যে যাত্রা করার নির্দেশ দান করেন। ইকরামা (রা) ওমান পৌছলে দুই জেনারেল যৌথভাবে যুতাজকে দমন করার জন্য দাবা অভিমুখে যাত্রা করেন।

দাবায় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬৩২ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে (১১ হিজরীর রমযান মাসের প্রথম দিকে)। প্রথমে যুদ্ধের গতি মুসলিম বাহিনীর বিপক্ষে ছিল। সংকটময় অবস্থায় একটি স্থানীয় মুসলিম দল, যারা যুতাজের আবির্ভাব সত্ত্বেও সত্যপথকে আঁকড়ে ছিল, ইসলামী শক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। নতুন শক্তি যোগ হওয়ায় মুসলিম বাহিনী চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। যুতাজ যুদ্ধে নিহত হয়।

হুযায়ফা ওমানের গভর্ণর নির্বাচিত হয়ে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব না থাকায়, ইকরামা (রা) দাবার আশেপাশের আয্দের অবশিষ্ট বিদ্রোহীদের দমন করেন। ক্রমান্বয়ে আয্দের লোকেরা শান্তির পথে ফিরে আসে এবং তারা মদীনার জন্য আর কখনও ঝামেলা সৃষ্টি করেনি।

ওমান থেকে ইকরামা (রা) খলীফার নির্দেশে মাহরা যাত্রা করেন। খুব প্রকট আকারে না হলেও মাহরাতেও স্বধর্মত্যাগের প্রভাব বিস্তার লাভ করছিল। মাহরায় অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব ছিল আরফজা বিন হারসামার (কোর কমান্ডারদের একজন) উপরে এবং ইকরামার দায়িত্ব ছিল তাকে সাহায্য করা। কিন্তু আরফজার পৌছতে বিলম্ব হওয়ায় ইকরামা (রা) স্বীয় বাহিনী নিয়ে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বিদ্রোহী বাহিনী গঠিত হয়েছিল দুটি স্থানীয় অসম গোত্রের সমবেত বিদ্রোহীদের সমন্বয়ে। ইকরামা (রা) জেইরুতে পৌছে ৬৩৩ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে (১১ হিজরীর মধ্য শাওয়ালে) শত্রুর মুকাবিলা করেন। যুদ্ধের শুরুতেই তিনি বিদ্রোহীদেরকে ইসলামের ছায়াতলে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানান। প্রতিপক্ষের দুটি দলের মধ্যে ক্ষুদ্র দলটি এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলিম বাহিনীর সংগে যোগদান করে। অপেক্ষাকৃত বড় দলটি ইকরামার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং তারা পরাজিত হয়। যুদ্ধে তাদের নেতা নিহত হয় এবং শত্রুর বিপুল ধনসম্পদ ইকরামা (রা)-এর হস্তগত হয়।

মাহরায় ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ করে ইকরামা (রা) তাঁর বাহিনীসহ আবিয়ান গমন করেন। তিনি সেখানে তাঁর লোকদের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করে পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

ইয়ামামার যুদ্ধের পর খলীফা আ'লা বিন হাযরামিকে বাহ্‌রাইনে প্রেরণ করেন। সেখানকার বিদ্রোহ দমন করার জন্য আ'লা বাহ্‌রাইনে পৌঁছে দেখেন তারা হিজর-এ সমবেত হয়েছে এবং পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত অবস্থায় আছে (স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানসমূহের মধ্যে একমাত্র এই যুদ্ধেই প্রতিপক্ষ পরিখার সাহায্যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে)। আ'লা বেশ কয়েকবার আক্রমণ রচনা করেন এবং যুদ্ধও চলে কয়েকদিন ধরে। কিন্তু কোনো ভাল ফল পাওয়া যায় না। আ'লা চিন্তিত হয়ে পড়েন, কিভাবে শত্রুর দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জয় করা যায়। পরিখা অতিক্রম করাই একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়।

একরাতে তিনি শত্রুপক্ষের অবস্থান থেকে ভেসে আসা হৈ চৈ ও আনন্দ-উল্লাসের শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ দু'জন গুপ্তচর প্রেরণ করেন সংবাদ সংগ্রহের জন্য। তারা ফিরে এসে জানায় যে, শত্রুগণ আনন্দ উৎসবে মগ্ন এবং তারা সবাই নেশায় বিভোর। আ'লা দ্রুত একটি রাত্রিকালীন আক্রমণ রচনার নির্দেশ দান করেন। মুসলিম বাহিনী আক্রমণে গিয়ে দেখে কোন প্রহরী পর্যন্ত নেই। তারা আকস্মিকভাবে শত্রুর উপরে চড়াও হয়। শত্রুরা কিছু বুঝে ওঠার পূর্বেই শত শত নিহত হয়। অবশ্য কিছু যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পালাতে সক্ষম হয়। আলা পরদিন পলাতক শত্রুদেরকে খতম করার জন্য উপকূলবর্তী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় তিনি মাত্র এক জায়গায় বাধার সম্মুখীন হন এবং তাদেরকে চরমভাবে পরাজিত করেন। তাদের অধিকাংশই ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসে।

এই অপারেশনটি সম্পন্ন হয় ৬৩৩ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে (১১ হিজরীর যুকাদ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে)।

ইয়েমেন ছিল ইসলামের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী প্রদেশগুলোর মধ্যে প্রথম। এই বিদ্রোহ ছিল আন্‌স গোত্রের লোকদের, তাদের নেতা ও ভণ্ডনবী আসওয়াদের নেতৃত্বে, যার বর্ণনা পূর্বেই দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশাতেই ফিরোয নামের একজন পারসিক মুসলিম এই বিদ্রোহ দমন করে এবং তারপর থেকেই সে সানায় থেকে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করতে থাকে। রাসূলের ইন্তিকালের খবর শুনেই ইয়েমেনের লোকেরা আবার কায়েস আব্‌দ ইয়াগুসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা ফিরোযসহ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় মুসলিমগণকে হত্যার মাধ্যমে ইয়েমেনকে মুসলিম শাসনমুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কায়েস ফিরোয ও অন্যান্য মুসলিম নেতাকে আলোচনার জন্য ডাকে। কিছু মুসলিম কায়েসের এই ফাঁদে পড়ে জীবন দান করে কিন্তু ফিরোয শেষ মুহূর্তে ষড়যন্ত্রের বাতাস পেয়ে সাবধান হয়ে যান। বিদ্রোহ

মুকাবিলা করার মতো কোনো সংগঠিত বাহিনী না থাকায় সে পালিয়ে যাওয়াকেই নিরাপদ মনে করে। তার পলায়নের খবর পেয়ে কায়েস পিছু ধাওয়া করে। কিন্তু ফিরোয সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে পাহাড়ী এলাকায় নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেতে সক্ষম হয়। এই ঘটনা ঘটেছিল ৬৩২ খৃস্টাব্দের জুন অথবা জুলাই মাসে (১১ হিজরীর রবিউল আউয়াল অথবা রবিউল আখির মাসে)।

পরবর্তী ছয়মাস ফিরোয এই সুরক্ষিত পাহাড়ী অবস্থানে মুসলমানগণকে সংগঠিত করে। হাজার হাজার মুসলিম ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকারের ও কায়েসের হাত হতে ইয়েমেনকে উদ্ধারের শপথ নিয়ে ফিরোযের সংগে যোগদান করে। ফিরোয মুসলিমগণকে একটি বাহিনীতে সংগঠিত করে সানার উদ্দেশে যাত্রা করে। ৬৩৩ খৃস্টাব্দের মধ্য জানুয়ারীতে (১১ হিজরীর শাওয়াল মাসের শেষ দিকে) শহরের বাইরে কায়েসের সংগে মুসিলম বাহিনীর মুকাবিলা হয়। মুসলিমগণ জয়ী হয় এবং কায়েস পালিয়ে আবিয়ানে চলে যায়, যেখানে ইকরামা (রা) তাঁর কোর নিয়ে সাহরা পদানত করার পর বিশ্রামরত ছিলেন।

আবিয়ানে আরো কিছু ধর্মদ্রোহী নেতা কায়েসের সংগে যোগদান করে। কিন্তু মদীনার বিরুদ্ধে আর সুবিধাজনক কিছু করা যাবে না ভেবে তারা ইসলামের নিকট আত্মসমর্পণ করে। পরে খলীফা এদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন। এই ধর্মদ্রোহী নেতাদের অনেকেই ইসলামের পতাকাতলে পুনরায় শামিল হওয়ার পর পরবর্তী বছরগুলোতে ইরাক ও সিরিয়ায় খুব বীরত্বের সংগে যুদ্ধ করেছিল।

ধর্মদ্রোহের সর্বশেষ বড় ধাক্কা আসে নাজরান, হাদরামাউত ও পূর্ব ইয়েমেনে বসবাসকারী কিন্দা গোত্রের পক্ষ থেকে। তারা রাসূলের ইন্তিকালের সংবাদে তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা না করলেও কিছুটা অবাধ্যতা প্রকাশ করতে থাকে। হাদরামাউতের গভর্নর যিয়াদ বিন লুবীদ ছিলেন একজন আল্লাহ্ভীরু ও সৎ মুসলমান। যাকাত সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর অনমনীয় মনোভাব কিন্দার কিছু লোকের মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের যাকাত ফাঁকি দেয়ার যে কোনো চেষ্টাকে জিয়াদ শক্তহাতে দমন করেন।

৬৩৩ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে (শাওয়াল, ১১ হিজরী) একটি ঘটনা ঘটে। কিন্দা গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যাকাত হিসেবে একটি সুন্দর উট হস্তান্তরের পর তা আবার ফেরত নিতে চায়। জিয়াদ এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিটি এতে ক্ষুব্ধ হয় এবং কয়েকজন লোক পাঠিয়ে উটটি চুরি করে নেয়। জিয়াদ কয়েকজন সৈন্য পাঠিয়ে উটসহ চোরদেরকে ধরে নিয়ে আসেন। পরদিন সকালে কিন্দার কিছু লোক বিক্ষোভ প্রকাশ করে ও তাদের সংগীদের মুক্তি দাবি করে। জিয়াদ তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করে দেন যে, "মুসলিম আইন অনুযায়ী তাদের বিচার করা হবে।" এতে পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়।

কিন্দার অধিকাংশ লোক বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা যাকাত প্রদান না করার ও ইসলামের আইন না মানার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। তাদের সংগে আশেপাশের আরো কিছু স্বধর্মত্যাগী যোগ দেয়। তারা যৌথভাবে একটি সামরিক ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে মদীনার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

বিদ্রোহীদের একটি ক্যাম্প ছিল জাফরের অদূরে রিয়াজে। এই ক্যাম্পটি রেইড করার জন্য জিয়াদ একদল সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তারা একটি সফল রেইড পরিচালনা করে। এই আক্রমণে অনেক অবিশ্বাসী নিহত হয়। অনেকে বন্দী হয় এবং বাকিরা বিতাড়িত হয়। বন্দীদেরকে জাফরে নিয়ে আসা হয়। তারা কিন্দার গোত্রপ্রধান আশাআস বিন কায়েসের নিকট একটি সংবাদ প্রেরণ করে ও আহবান জানায় এই বলে, "ওহে আশআস! আমরা তোমার মায়ের গোত্রের লোক।"[২০২] কায়েস তখন পর্যন্ত ইসলামের প্রতি অনুগত ছিল। এই আহ্বানের পর মদীনার প্রতি আনুগত্যের তুলনায় তার গোত্রপ্রীতি অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সে তার কিছু যোদ্ধাকে সংগে নিয়ে মুসলমানদের হাত হতে কিন্দার বন্দীদের ছিনিয়ে নেয়।

এভাবেই আশআস-এর বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। কিন্দার লোকেরা দলে দলে তার পতাকাতলে সমবেত হয় এবং সে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মুসলিম ও বিদ্রোহী বাহিনীর শক্তি সমান সমান হওয়ায় তারা একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণের সূত্রপাত করা থেকে বিরত থাকে। যিয়াদ শক্তি বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

খলীফার প্রেরিত সর্বশেষ কোর কমান্ডার মুহাজির বিন আবি উমাইয়া সবেমাত্র নাজরানের বিদ্রোহ দমন করে ইয়েমেনের পথে ছিলেন। খলীফা তাঁকে গতি পরিবর্তন করে যিয়াদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দান করেন। আবিয়ানে অবস্থানকারী ইকরামা (রা)-কেও খলীফা একই নির্দেশ প্রেরণ করেন।

মুহাজির ও যিয়াদের সম্মিলিত বাহিনী জাফরে একত্রিত হয়ে মুহাজিরের সার্বিক কমান্ডে যুদ্ধযাত্রা করে।

আশআস বিন কায়স তার সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিল। তার জন্ম হয়েছিল একটি রাজপরিবারে এবং তার মধ্যে ছিল অনেকগুণের সমাহার। সে ছিল একাধারে একজন দক্ষ জেনারেল, চতুর গোত্রপ্রধান, সাহসী যোদ্ধা ও খ্যাতনামা কবি। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এই ব্যক্তিটি ছিল ধর্মদ্রোহী অনেক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম। তার অন্যতম প্রধান গুণ ছিল বিশ্বাসঘাতকতা। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, তার পরিবারের চার পুরুষের অর্থাৎ আশআস তার পিতা, তার পুত্র ও তার পৌত্রের চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার খ্যাতি আছে। আশআস-এর চরিত্রে সততা ও শয়তানীর সমান মিশ্রণ ছিল। সে এই দু'গুণের মধ্যে সবসময় ভারসাম্য রক্ষা করে চলতো।

---

২০২. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৪৫।

৬৩৩ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে (১১ হিজরীর যুকাদ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ) আশআস মুসলিম বাহিনীর সম্মুখীন হয়। যুদ্ধ ক্ষণস্থায়ী হয় এবং আশআস পরাজয় বরণ করে। তবে সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তার বাহিনীকে দ্রুত প্রত্যাহার করে নুজাইর-এ যেতে সক্ষম হয়। সেখানে বিভিন্ন গোত্রের আরো কিছু লোক তার সংগে যোগদান করে। সে অবরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ইকমারা তার কোর নিয়ে উপস্থিত হন। তিনটি মুসলিম কোর মুহাজিরের সার্বিক কমান্ডে অগ্রসর হয়ে দেয়াল বেষ্টিত সুরক্ষিত নুজাইর শহর অবরোধ করে। শহরের সংগে যোগাযোগের তিনটি পথে সৈন্য মোতায়েন করার ফলে শহরটিতে বাইরের সাহায্য আসার ও শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা শেষ হয়।

অবরোধ বেশ কয়েকদিন ধরে চলে। অবরোধ ভাঙার কয়েকটি চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। তবুও কিন্দার লোকেরা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে।

৬৩৩ খৃস্টাব্দের মধ্য-ফেব্রুয়ারির কোনো এক সময়ে (১১ হিজরীর যুলহাজ মাসের প্রথমদিকে) আশআস উপলব্ধি করে যে, পরিস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক এবং জয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। মুসলিম বাহিনীর হাতে শহরের পতন সময়ের ব্যাপার মাত্র এবং এতে রক্তক্ষয়ও হবে প্রচুর। এরপর আশআস যে কাজটি করার সিদ্ধান্ত নেয় তা তার চরিত্রের সংগে খুবই সংগতিপূর্ণ। সে নিজেকে রক্ষার জন্য তার গোত্রের লোকদেরকে বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ইকরামা (রা)-এর সংগে তার পূর্ব হতে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। সে ইকরামা (রা)-এর নিকট আলোচনার প্রস্তাব প্রেরণ করে। মুহাজির ও ইকরামার সংগে আশআস-এর আলোচনার ব্যবস্থা হয়। সে কয়েকজন সংগীসহ গোপনে দুর্গ থেকে বের হয়ে নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হয়। সে প্রস্তাব করে, "দশজন লোকের ও তাদের পরিবারবর্গের জীবনের নিরাপত্তা দিলে আমি গেট খুলে দেবো।" মুসলিমগণ প্রস্তাবে রাজী হয়। মুহাজির বলেন, "উক্ত দশজন লোকের নাম লিখ, আমরা দলিলটি সীল করবো।"

আশআস তার লোকদেরকে নিয়ে এক পাশে গিয়ে নাম লিখতে শুরু করে। তার পরিকল্পনা ছিল প্রথমে নয়জন প্রিয়পাত্রের নাম লিখে দশ নম্বরে লিখবে নিজের নামটি। কিন্তু সে খেয়াল করেনি যে, জাহদাম নামের একজন লোক তার কাঁধের উপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে তালিকাটি দেখছিল। নবম নামটি লেখার সংগে সংগে সে ছুরি বের করে ফিস্ ফিস্ করে বলে, "আমার নাম লেখ, নইলে তোমাকে হত্যা করবো।"[২০৩] নিজেকে কোনোভাবে চালাকি করে রক্ষা করার আশা নিয়ে আশআস দশ নম্বরে জাহদামের নাম লিখে দেয়। তালিকা প্রস্তুত হলে মুহাজির তা সীল করেন।

২০৩. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৪৭।

আশআস ও তার সংগীরা দুর্গে ফিরে যায়। নির্দিষ্ট সময়ে সে দুর্গের একটি গেট খুলে দিলে মুসলিমগণ স্রোতের মতো ভেতরে প্রবেশ করে। প্রত্যেকটি লোক অস্ত্র সমর্পণ না করা পর্যন্ত ব্যাপক হত্যা চলতে থাকে। আশআস ও পাশে অবস্থানকারী একদল লোক ও তাদের পরিবারবর্গ রক্ষা পায়।

নুজাইর দুর্গের পতন হয়েছে। মুহাজির তালিকাটি লক্ষ্য করে দেখেন যে, আশআস-এর নাম নেই। তিনি আনন্দচিত্তে বলে উঠেন, "ওহে আল্লাহর দুশমন! এখন সময় এসেছে তোমাকে শায়েস্তা করার।"[২০৪] মুহাজির হয়তো আশআসকে হত্যা করতেন। কিন্তু ইকরামা (রা) তাকে খলীফার সিদ্ধান্তের জন্য মদীনায় প্রেরণের প্রস্তাব করেন। তাকে শিকল পরানো হয়।

দুর্গ জয়ের পর বহু সংখ্যক বন্দীকে মদীনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং এদের মধ্যে বেশ কিছু সুন্দরী যুবতীও ছিল। তারা ইতিমধ্যে আশআস-এর ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরেছে। সারিবদ্ধভাবে দুর্গ ত্যাগের প্রাক্কালে তারা আশআস-এর দিকে তীব্র ঘৃণাভরে তাকিয়ে বলে, "তুমি বিশ্বাসঘাতক ! তুমি বিশ্বাসঘাতক!"[২০৫] শেষ পর্যন্ত আশআসকেও এই বন্দীদলের সংগে মদীনায় প্রেরণ করা হয় এবং এটা তার জন্য মোটেও সুখকর ভ্রমণ ছিল না।

আশআস মদীনায় নবাগত নয়। প্রতিনিধিদলের বছরে সেও কিন্দার লোকদের সংগে মদীনায় উপস্থিত হয়ে রাসূল (সা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করে। সেই সময় সে আবূ বকরের বোন উম্মে ফারিয়াকে বিয়ে করে। মদীনা ত্যাগের প্রাক্কালে সে স্ত্রীকে আবূ বকর (রা)-এর নিকট রেখে গিয়েছিল এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে, সে পরে এসে নিয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে তার মদীনায় সেই পরবর্তী আসা, যদিও ভিন্ন পরিস্থিতিতে।

খলীফা আশাআস-এর বিরুদ্ধে ইসলাম ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণের অভিযোগ আনয়ন করেন। তিনি তার স্বীয় গোত্রের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করাকেই খারাপভাবে মূল্যায়ন করেন। তার কঠোর শাস্তি অনিবার্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আশআস ছিল একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও বাকচতুর ব্যক্তি। এই সংকটময় মুহূর্তে সে তার সমস্ত যোগ্যতা কাজে লাগায়। সে শুধু নিজের জন্য ক্ষমার ব্যবস্থাই করে না বরং আবূ বকর (রা)-এর নিকট হতে নিজের স্ত্রীকে ফেরৎ নিতেও সক্ষম হয়। সে মদীনায় বসবাস করতে থাকে। নিজ গোত্রের নিকট ফিরে যাবার তার তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। পরবর্তীকালে সে সিরিয়া, ইরাক ও পারস্য অভিযানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। খলীফা উসমানের আমলে তাকে আযারবাইজানের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল।

---

২০৪. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৪৮।
২০৫. পূর্বোক্ত।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা তার স্বভাব থেকে কখনই দূর হয়নি। আবূ বকর (রা) সহ অনেকেই মনে করতেন ধর্মদ্রোহের অপরাধ থেকে তাকে ক্ষমা করা ঠিক হয়নি। আবূ বকর (রা) মৃত্যুর পূর্বে বন্ধুদের নিকট "কি করা হয়নি এবং কি করা উচিত ছিল"এ প্রসংগে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "আমার উচিত ছিল তাকে হত্যা করা।"[২০৬]

ইসলামের ইতিহাসের পাঠক মাত্রই মনে করতে পারবেন যে, ইমাম হাসানের যে স্ত্রী স্বামীকে বিষ প্রয়োগ করেছিল সে মহিলা ছিল এই আশআস-এর কন্যা।[২০৭]

নুজাইর দুর্গে কিন্দা গোত্রের পরাজয়ের ফলে স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। আরবভূমি ইসলামের জন্য নিরাপদ হয়ে যায়। ইসলামের বিরুদ্ধে যে অশুভ শক্তির উত্থান হয়েছিল তা চিরতরে খতম হয়ে যায়। আরবভূমির ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ ইতিহাসে পরবর্তীকালে বহু গৃহযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু স্বধর্মত্যাগেরর আন্দোলন কখনও দেখেনি।

স্বধর্মত্যাগের আন্দোলনের বিরুদ্ধে সফল অভিযানের সমাপ্তির সংগে সংগে শেষ হয় একাদশ হিজরী। ১৮ই মার্চ ৬৩৩ খৃস্টাব্দের হিজরী দ্বাদশ বর্ষের যাত্রা শুরুর শুভলগ্নে আরব ভূমি ছিল রাজধানী মদীনার একক কর্তৃত্বের অধীনে সংঘবদ্ধ।[২০৮]

স্বধর্মত্যাগের আন্দোলনের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা ছিল আবূ বকর (রা)-এর মহান রাজনৈতিক ও সামরিক দক্ষতার পরিচায়ক। তিনি ইরাক ও সিরিয়া অভিযানে দক্ষতার পরিচয় দিলেও প্রকৃত পক্ষে ইসলামের প্রতি তাঁর মহান খেদমত নিহিত স্বধর্মত্যাগের আন্দোলনকে সফলতার সংগে দমন করার মাঝে। এই আন্দোলনকে দমন করে তিনি শিশু ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং ইসলামের ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রার পথকে সুসংহত ও কণ্টকমুক্ত করেন। আর এর সফলতার পেছনে আল্লাহর তরবারি খালিদ বিন ওয়ালীদের সামরিক প্রজ্ঞা ও বাহুবলের যে অনেকখানি ভূমিকা ছিল তা বোধ করি নির্দ্বিধায় বলা চলে।

---

২০৬. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬১৯, মাসুদী ঃ মুরুজি, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা -৩০৮, বালাযুরি ঃ পৃষ্ঠা - ১১২।

২০৭. ইবনে কুতায়বা ঃ পৃষ্ঠা ২১২, মাসুদী ঃ মুরুজি, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা -৫। দিরহামের এই পরিমাণ উল্লেখ করেছেন মাসুদী। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই অংকের কথা বলেছেন ১,৫০,০০০ দিরহাম।

২০৮. স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলনের ধারাবাহিকতার সম্ভাব্য ভ্রান্তির ব্যাখ্যার জন্য পরিশিষ্ট 'খ'-এর ৪ নম্বর নোট দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় খণ্ড

ইরাক অভিযান

পারস্যের সংগে সংঘর্ষ

স্বধর্মত্যাগীদের সর্বশেষ শক্তিশালী দুর্গ নুজাইর-এর পতন ঘটে ৬৩৩ খৃস্টাব্দের মধ্য ফেব্রুয়ারিতে। এর পরপরই খলীফা আবূ বকর (রা) ইয়ামামায় অবস্থানকারী খালিদ (রা)-এর নিকট লিখিত নির্দেশ প্রেরণ করেন, "ইরাকের দিকে অগ্রসর হও। উবাল্লা এলাকায় অপারেশন শুরু করো। ঐ এলাকায় বসবাসকারী পারসিক ও অন্যান্য লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তোমার উদ্দেশ্য হলো হীরা জয় করা।"[২০৯]

খলীফার এই নির্দেশের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তিনি সে সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে যাচ্ছেন, যাদের দাপটে গোটা পৃথিবী হাজার বছরেরও বেশি সময় কম্পমান ছিল।

পারস্য সাম্রাজ্য বহুদিক থেকেই ছিল বিখ্যাত। এটা ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্য যার সীমানা বিস্তৃত ছিল পশ্চিমে গ্রীসের উত্তরাংশ হতে শুরু করে পূর্বে পাঞ্জাব পর্যন্ত। সময়ের দৈর্ঘের বিবেচনায়ও এই সাম্রাজ্য ছিল অনন্য। এর শাসনকাল বিস্তৃত ছিল খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হতে শুরু করে খৃস্টপরবর্তী সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত মাঝখানে গ্রীক বিজয়ের সময়টা বাদ দিয়ে।[২১০] পারস্য সাম্রাজ্যের মতো আর কোনো সাম্রাজ্য ইতিহাসে এতো দীর্ঘ সময় ধরে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সামরিক শক্তির ঐশ্বর্য সহকারে স্থায়ী হয়নি। এই দীর্ঘ সময়ে তাদের বিপর্যয় এসেছে। কিন্তু সহসাই তারা হৃতগৌরব উদ্ধারেও সক্ষম হয়েছে।

পারস্য সাম্রাজ্যের সর্বশেষ সোনালি যুগ ছিল ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এই সময়ে সম্রাট আনূশীরওয়ান সাম্রাজ্যকে খ্যাতি ও বিস্তৃতির শীর্ষে নিয়ে যান। তাঁর শাসনামলেই সিরিয়া, ইয়েমেন ও মধ্য এশিয়ার অধিকাংশ এলাকা পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সম্রাটের মৃত্যু হয় ৫৭৯ খৃস্টাব্দে, রাসূলে আকরাম (সা)-এর জন্মের নয় বছর পরে।

সম্রাট আনূশীরওয়ানের মৃত্যুর পর হতেই পারস্য সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত এই সাম্রাজ্যের পতন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় যখন তার পৌত্র শীরুয়া ক্ষমতালাভের জন্য স্বীয় পিতা খুসরাও পারভেজকে হত্যা করে। শুধু তাই

---

২০৯. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৫৩-৪।
২১০. গ্রীক বিজয় স্থায়ী হয়েছিল দু'শতাব্দীর কিছু কম সময়।

নয়, সে তার ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করার জন্য নিজ পুত্র ব্যতীত বংশের সমস্ত পুরুষ সদস্যকে হত্যা করে। যদিও সে মাত্র সাত মাস ক্ষমতাসীন থাকার পর মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসীন সম্রাটদের নামের ধারাবাহিকতা ও শাসনকাল নিয়ে প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ঐতিহাসিকগণ একমত যে, শীরুয়ার হত্যাযজ্ঞ হতে আত্মরক্ষাকারী ইয়াজ্‌দজির্‌দ বিন শাহরিয়ার বিন পারভেজ ছিলেন সর্বশেষ সাসানীয় পারস্য সম্রাট। শীরুয়া ও ইয়াজ্‌দজির্‌দ-এর মধ্যবর্তী সময়ে মাত্র চার-পাঁচ বছরের মধ্যে অন্তত পক্ষে আটজন সম্রাটের পরিবর্তন হয়। এদের মধ্যে দু'জন ছিল মহিলা ও বুরানদুখত ও আযারমীদুখত। বুরানদুখত ক্ষমতায় বসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায়। তার সাম্রাজ্যলাভের খবর শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) মন্তব্য করেছিলেন, "একজন মহিলার নেতৃত্বে একটি জাতি কখনই উন্নতি লাভ করবে না।"[২১১]

পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সবগুলো দেশের ভৌগোলিক বর্ণনাদানের সুযোগ এখানে নেই। আমরা শুধু ইরাকের মধ্যেই আমাদের বর্ণনা সীমিত রাখবো। এ সময়ে ইরাক একটি সার্বভৌম দেশের মর্যাদা ভোগ না করলেও পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলো প্রদেশের একটি হিসেবে অনেক স্বাধীনতাভোগ করতো। ইরাকের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে ছিল আরবভূমি।

ইরাকে আরবদের পরিচিতি ছিল বুখ্‌ত নাসরের[২১২] সময় থেকেই, কিন্তু সে সময়ে এই ভূখণ্ডের উপরে তাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। খৃস্টান যুগের প্রথমদিকে ইয়েমেন থেকে নতুন করে আরবদের আগমন ঘটলে কিছু কিছু কর্তৃত্ব তাদের হাতে আসতে থাকে। মালিক বিন ফাহম নামের জনৈক আরব গোত্রপ্রধান নিজেকে রাজা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ইরাকের পশ্চিম অংশ শাসন করতে থাকে। তার দু'পুরুষ পরে লখ্‌ম গোত্রের আমর বিন আদী সিংহাসন লাভ করে। এখান থেকেই শুরু হয় লখ্‌মী রাজবংশের শাসনকাল। এই রাজবংশ সে সময়ে 'হাউজ অব মুনজির' নামেও খ্যাত ছিল। এই বংশের রাজারা বহুকাল ধরে পারস্য সম্রাটের সামন্ত হিসেবে ইরাক শাসন করেছিল। এই বংশের শেষ শাসক নোমান বিন মুনযির সম্রাটের প্রতি অবাধ্য আচরণ করলে তাকে হাতি দিয়ে মাড়িয়ে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় ইরাকের আরবগণ পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তা নৃশংসভাবে দমন করা হয়। এভাবেই লখ্‌মী রাজবংশের ইতিহাসের সমাপ্তি হয়।

খুসরাও তাঈ গোত্রের আয়ায বিন কুবেসা'কে ইরাকের শাসক নিযুক্ত করে। আয়ায বেশ কিছু বছর অনেকটা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নিয়ে ইরাক শাসন করে। তারপর ক্রমান্বয়ে পারস্যের জেনারেল ও শাসকগণ অধিকাংশ ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেয়। আয়ায একজন নামমাত্র শাসক হিসেবে থাকে।

---

২১১. মাসউদী ঃ তানবীহ্ , পৃষ্ঠা - ৯০, ইবনে কুতায়বা ঃ পৃষ্ঠা - ৬৬৬।
২১২. নেবুচাদনেজার খৃস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতাব্দী।

সম্পদ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিবেচনায় ইরাকভূমি ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের একটি মূল্যবান সম্পদ। মরুবাসী আরবদের নিকট এই ভূমি ছিল দুধ, মধু ও মণিমুক্তার আধার। ইরাকের বুক চিরে প্রবাহিত ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস ছিল দুটি বিখ্যাত নদী। যদিও এই নদী দুটোর গতিপথ তখন ছিল ভিন্ন। আজকের বিখ্যাত শহর কুফা ও বসরার তখন তেমন কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আর বাগদাদ ছিল টাইগ্রিস নদীর তীরের একটি ক্ষুদ্র শহর মাত্র। তখনকার বিখ্যাত শহর টেসিফোন ও হীরার অস্তিত্ব আজ বিলীন। টেসিফোন ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী। এর বিস্তৃতি ছিল টাইগ্রিস নদীর উভয় তীর ঘেঁষে। হীরা ছিল ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত লখ্মী রাজবংশের রাজধানী। উবাল্লা ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের প্রধান বন্দর। এই বন্দরে ভারত ও চীনসহ অন্যান্য অনেক প্রাচ্য দেশের জাহাজ ভিড়তো। উবাল্লা দাস্ত মেইসান জেলার সামরিক দপ্তর হিসেবেও খ্যাত ছিল।[২১৩]

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী একাধিকবার তাদের গতিপথ পরিবর্তন করেছে। এ বইয়ে ব্যবহৃত ম্যাপসমূহে ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই নদীদ্বয়ের গতিপথ দেখানো হয়েছে। দিজলাত-উল-আউরা (একচোখা টাইগ্রিস) নামে খ্যাত টাইগ্রিস নদীর বর্তমান চ্যানেলটিই ছিল এর ইসলামপূর্ব যুগের গতিপথ। তারপর সে তার গতিপথ পরিবর্তন করে কুত হতে যাত্রা করে দুজায়লা (ক্ষুদ্র টাইগ্রিস) ও আখযার হয়ে উবাল্লার উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ১০০ বর্গমাইলের একটি খাল ও নিচু জলাভূমিময় এলাকায় প্রবেশ করে। ফলে এর পুরাতন গতিপথটি একটি শুকনো ও বালুময় নদীগর্ভে পরিণত হয়। টাইগ্রিস এই নিচু জলাভূমি দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মাজার (বর্তমানে আজেইর) নামক এলাকায় দিজলাত -উল আউরার সংগে মিলিত হয় এবং সেখান থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে পারস্য উপসাগরে পতিত হয়।[২১৪] কিন্তু টাইগ্রিস ষোড়শ শতকে পুনরায় তার গতিপথ পরিবর্তন করে পুরাতন পথ অনুসরণ করে যা সব ম্যাপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইউফ্রেটিস সরাসরি প্রবাহিত হয়ে হিন্দিয়ার নিকটে প্রধান দুটি শাখায় বিভক্ত হয় যার একটি হিল্লা ও অপরটি মূল নদীর নামেই পরিচিত। প্রধান শাখাটি (ইউফ্রেটিস নামে পরিচিত) শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বহুবার গতিপথ পরিবর্তন করে। সামাওয়ার নিকটে দুটি প্রধান শাখা পুনরায় একত্রে মিলিত হয় এবং পূর্বে উল্লেখিত নিচু জলাভূমি অতিক্রম করে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে কুরনায় টাইগ্রিসের সংগে মিলিত হয়। নিচু জলাভূমির বুক চিরে প্রবাহিত নাকিল নামের অপর একটি নদীও বসরার কিছু উত্তরে টাইগ্রিসের সংগে মিলিত হয়। এই তিনটি নদীর সম্মিলিত ধারা শাত-ইল-আরব নামে পারস্য উপসাগরে পতিত হয় (দশ নং ম্যাপ দ্রঃ)। নদীগুলোর গতিপথ পরিবর্তনের বিস্তারিত চিত্র ম্যাপে দেখানো সম্ভব হয়নি। ম্যাপে শুধু প্রধান শাখাগুলো দেখানো হয়েছে।

---

২১৩. আধুনিক বসরার যে অংশটি আশার নামে পরিচিত সেখানেই ছিল উবাল্লার অবস্থান।

২১৪. ইবনে রুসতা ঃ পৃষ্ঠা - ৯৪-৯৫।

ম্যাপ-১০ : ইরাক অভিযান
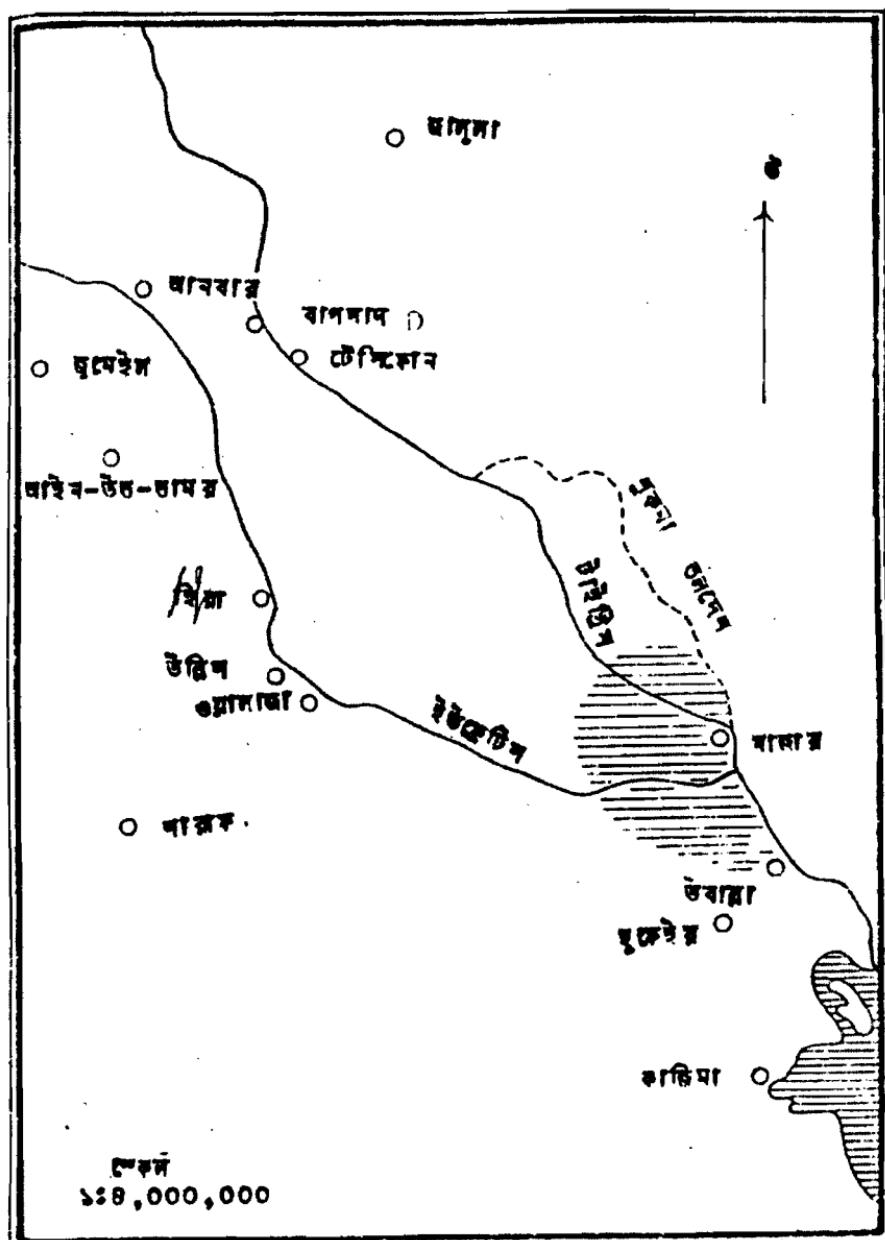
খলীফা আবূ বকর (রা) কর্তৃক বীরশ্রেষ্ঠ খালিদ বিন ওয়ালীদকে পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণের প্রাক্কালে এই ছিল ইরাকের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা। এই ভূমিতে আরবদের আংশিক কর্তৃত্ব থাকলেও শাসন করতো পারস্য সম্রাট। এই সময়ে পারস্য সাম্রাজ্যের রাজনৈতিকভাবে পতনের সূত্রপাত হলেও সামরিক শক্তি ছিল অটুট। সময়কালটি ছিল ৬৩৩ খৃস্টাব্দ।

পারস্য বাহিনী একটি আরব সহযোগীদলসহ ছিল সমসাময়িক কালের সবচেয়ে সুসংগঠিত ও দক্ষ সামরিক শক্তি। এই বাহিনীর জেনারেলগণ ছিল অভিজ্ঞ ও দর্পিত। সৈনিকগণও ছিল অস্ত্রেশস্ত্রে সবচেয়ে সুসজ্জিত। তাদের মাথায় থাকতো হেলমেট, বুকে বর্ম, হাতে ধাতুর তৈরি হাতা ও পায়ে আচ্ছাদন। অস্ত্র হিসেবে সংগে থাকতো একটি বর্শা, একটি বল্লম, একটি তরবারি ও একটি কুড়াল বা গদা (এটি ছিল পারস্যের সৈনিকদের প্রিয় অস্ত্র)। তারা হেলমেটের সংগে ঝুলিয়ে একটি বা দুটি ধনুক, ত্রিশটি তীর এবং ধনুকের দুটি অতিরিক্ত তীরও সংগে রাখতো।[২১৫] এই বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় পারস্য বাহিনী ছিল কত সুসজ্জিত। কিন্তু তাদের ছিল বাহনের সীমাবদ্ধতা। খালিদ (রা)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত পারস্য বাহিনীর সামনে দাঁড়ানোর মতো কোনো শক্তিই ছিল না।

পারস্য সাম্রাজ্যের সংগে মুসলমানদের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় মুসান্না বিন হারিসার মাধ্যমে। মুসান্না ছিলেন আরব উপদ্বীপে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ও ইরাকের দক্ষিণ অঞ্চলে বসবাসকারী বনী বকর গোত্রের নেতা। তাঁর স্বভাব ছিল বাঘের মতো এবং তিনি পারস্যের সংগে যুদ্ধে আহত হয়েই পরবর্তীতে ইন্তিকাল করেন। মুসান্না রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে হয়তো তাই হবে। কেননা প্রতিনিধিদলের বছরে বনী বকর গোত্রের একটি দল রাসূল (সা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করে।

ইয়ামামার যুদ্ধের পরপরই মুসান্না ইরাকের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। রোমাঞ্চকর অভিযান পরিচালনার বাসনা, ইরাকের অপরিসীম ধন-সম্পদ ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিশৃংখল রাজনৈতিক অবস্থা তাঁকে এই আক্রমণ পরিচলনায় উদ্বুদ্ধ করে। প্রথমে তিনি একদল অনুসারীকে নিয়ে মরুভূমির পার্শ্ববর্তী এলাকায় অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা করেন, যাতে জনবসতিশূন্য বালুকারাশির মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় নেয়া যায়। আক্রমণের তীব্রতা বাড়ানোর সংগে সংগে তিনি লক্ষ্যবস্তুও ঘন ঘন পরিবর্তন করতে থাকেন। অবশ্য সাধারণভাবে তাঁর আক্রমণ সীমিত ছিল উবাল্লা এলাকার মধ্যেই। প্রতিটি আক্রমণ শেষে তিনি প্রচুর সম্পদ নিয়ে ফিরতেন যা মরুবাসী আরবদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতো। অপরপক্ষে প্রতিপক্ষের সামরিক স্থাপনাগুলো তাঁর ভূতুড়ে আক্রমণে অসহায় বোধ করতে থাকে।

---

২১৫. এই তথ্যাদি নেয়া হয়েছে দীনাওয়ারি হতে (পৃষ্ঠা - ৭৩)। তিনিই একমাত্র প্রাথমিক যুগের লেখক যার লেখায় পারস্য সৈনিকদের যুদ্ধের সাজ-সজ্জার বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রাথমিক সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসান্না ৬৩৩ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে (১১ হিজরীর জুকাদ মাসের শেষার্ধে) খলীফা আবূ বকর (রা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করেন। তিনি খলীফার সামনে পারস্য সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক বিশৃংখলা, তাদের সেনাবাহিনীর বাহনের সীমাবদ্ধতা, ইরাকের অবস্থানগত সুবিধা ও বিশাল সম্পদরাজির একটি আকর্ষণীয় চিত্র তুলে ধরেন। পরিশেষে আবেদন করেন, "আমাকে আমার বাহিনীর কমান্ডার নিয়োগ করুন। আমি পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করবো। সেই সংগে আমি আমার এলাকাকেও তাদের আক্রমণ হতে রক্ষা করবো।"[২১৬]

খলীফা তাঁর আবেদন গ্রহণ করে তাকে বনী বকর গোত্রের সমস্ত মুসলমানের কমান্ডার নিয়োগ পূর্বক একটি প্রাধিকার পত্র প্রদান করেন। এই ক্ষমতাসহ ফিরে এসে মুসান্না আরও কিছু লোককে ইসলামের পতাকাতলে এনে ২০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী সৃষ্টি করেন। তিনি নতুন উদ্যম ও অধিক তীব্রতা সহকারে আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকেন। মুসান্নার প্রস্থানের পরও তাঁর কথাগুলো খলীফার কানে বাজতে থাকে। খলীফার মাথায় ক্রমান্বয়ে ইরাক অভিযানের চিন্তা দানা বাঁধতে থাকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে গোটা পারস্য সাম্রাজ্যের বিজয়ের চিন্তা করাটা ঠিক হবে না। তবে টাইগ্রিসের পশ্চিম তীরবর্তী আরবদের কর্তৃত্বাধীন ইরাকে অভিযান পরিচালনা করা যায়। এতে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধির সংগে সংগে নতুন বিশ্বাসের বিস্তৃতি ঘটবে।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এই শান্তির প্রদীপ মাথানত করে টিমটিম করে জ্বলতে থাকবে। এই বিশ্বাসের মধ্যে আছে শান্তি, ন্যায় ও শক্তির সমাবেশ। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করো এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করো, কিন্তু সীমালংঘন করিও না।" (২:১৯০) এবং মিথ্যা বিদূরিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করো যেন দীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।" (৮ ঃ৩৯)। অতএব, এ জিহাদ হবে অবিশ্বাসী অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধে।

আবূ বকর (রা) ইরাকে অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন। তবে তাঁকে এ কাজটি করতে হবে খুব সতর্কতার সংগে। কেননা আরবগণ শত শত বছর ধরে পারস্য সাম্রাজ্যের শৌর্যবীর্যকে ভয় করে আসছে। পরাস্যবাসীগণও আরবদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখতো। এই পরিস্থিতিতে একটি অভিযান পরিচালনা করে পরাাজিত হলে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে সুদূরপ্রসারী। বিজয়কে নিশ্চিত করার জন্য আবূ বকর (রা) দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ঃ (ক) এই বাহিনী গঠিত হবে স্বেচ্ছাসেবকদেরকে নিয়ে (খ) খালিদ (রা) হবে এই বাহিনীর কমান্ডার।

---

২১৬. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৫২।

খলীফা খালিদের প্রতি নির্দেশ প্রেরণ করেন ইরাকে অভিযান পরিচালনার জন্য। তিনি খালিদ (রা)-কে আরো জানান যে, এই অভিযানে শুধু তারাই অংশগ্রহণ করতে পারবে যারা আল্লাহর রসূলের ইন্তিকালের পরও বিশ্বাসের প্রতি অটল ছিল ও স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আর যারা স্বধর্মত্যাগীদের সংগে যোগ দিয়েছিল তাদেরকে এই অভিযানে যোগদানের সুযোগ থেকে বাদ দিতে হবে। শেষে মুজাহিদদেরকে উদ্দেশ্য করে লিখেন, "আর যারা ইচ্ছা করে তারা স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।"[২১৭]

এই ঘোষণা শুনে হাজার হাজার যোদ্ধা নিজ গৃহে ফিরে যায়। খালিদ (রা) এই ঘটনায় মর্মাহত হন। ইয়ামামার যুদ্ধে তার সংগে ছিল ১৩,০০০ যোদ্ধা আর এখন অবশিষ্ট আছে মাত্র ২,০০০। খালিদ (রা) খলীফাকে বিস্তারিত লিখে জানান এবং নতুন সৈন্য প্রেরণের অনুরোধ করেন। আবূ বকর (রা) তাঁর বন্ধু ও উপদেষ্টাদেরকে নিয়ে আলোচনারত ছিলেন এমন সময় পত্রটি হাতে পৌছে। তিনি সশব্দে পত্রটি পাঠ করেন যাতে উপস্থিত সকলে শুনতে পায়। তারপর তিনি কাকা বিন আমর নামের একজন তরুণ যোদ্ধার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন।

কাকা যুদ্ধযাত্রার সাজে সজ্জিত হয়ে খলীফার সামনে উপস্থিত হয়। খলীফা তাকে অনতিবিলম্বে ইয়ামামায় পৌছে খালিদের সংগে যোগদানের নির্দেশ দান করেন। খলীফার সংগীগণ কৌতুকভরে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি কি একজন যোদ্ধা প্রেরণ করে ঐ ব্যক্তির শক্তি বৃদ্ধি করতে চান যাকে তার সহযোদ্ধারা ত্যাগ করেছে?[২১৮]

আবূ বকর (রা) কাকার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে উত্তর দেন, "ঐ বাহিনী পরাজয় বরণ করবে না যাতে এই তরুণ যোদ্ধার মতো সৈনিক থাকবে।"[২১৯] কাকা বিন আমর খালিদের সংগে যোগদানের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেন।

খলীফার তৎপরতা এটুকুতেই সীমিত ছিল না। তিনি মুসান্না ও সাজুর বিন আদীকে (উত্তর-পূর্ব আরবের একজন বিখ্যাত গোত্রপ্রধান) নির্দেশ দান করেন বিশ্বাসী ও অনুগত যোদ্ধা সংগ্রহ করে ইরাক অভিযানের লক্ষ্যে খালিদ (রা)-এর অধীনে ন্যস্ত করার জন্য। এই নির্দেশ প্রেরণ করে খলীফা অনেকটা উদ্বেগহীনভাবে সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। তিনি খালিদ (রা)-কে মিশন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন–ইরাকে অভিযান পরিচালনার আক্রমণ শুরু করতে হবে উবাল্লা এলাকা হতে তাও বলে দিয়েছেন, তাঁর মিশন স্থির করে দিয়েছেন হীরা দখল করার এবং সম্ভাব্য সকল শক্তিই তিনি তাঁর অধীনে ন্যস্ত করেছেন। খলীফার আর করার কিইবা ছিল। এখন সবকিছু নির্ভর করছে খালিদ (রা)-এর উপর এবং আটচল্লিশ বছর বয়স্ক খালিদ (রা) ইরাক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন[২২০]।

---

২১৭. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৫৩।

২১৮. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৫৩-৫৫৪।

২১৯. পূর্বোক্ত।

২২০. ইরাক অভিযান সম্পর্কে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি ইবনে ইসহাক ও ওয়াকিদীর এবং অন্যটি সায়েফ বিন উমরের। তাবারী পরবর্তী বর্ণনাটিকে গ্রহণ করেছেন যা'র ভিত্তিতে এই

শিকলের যুদ্ধ

খলীফার নির্দেশ পেয়েই খালিদ (রা) একটি নতুন বাহিনী সংগঠনের জন্য তৎপর হয়ে উঠেন। তিনি ইয়ামামা এবং মধ্য ও উত্তর আরবের দূরবর্তী এলাকায় প্রতিনিধি প্রেরণ করে সাহসী যোদ্ধাদেরকে ইরাক অভিযানে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার সাহসী যোদ্ধা সমবেত হয়। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী খালিদের পুরাতন সহযোদ্ধা যারা ইতিমধ্যে পরিবার-পরিজনের সংগে দেখা-সাক্ষাৎ করে পুনরায় রোমাঞ্চকর বিজয় অভিযানে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খালিদ (রা)-এর নামের মধ্যেই একটা আকর্ষণ ছিল। তাঁর সংগে যুদ্ধযাত্রার অর্থই হলো উভয় জগতের সফলতা লাভ, অর্থাৎ আল্লাহর পথে বিজয় এবং প্রচুর ধন-সম্পদ ও দাস-দাসী লাভ। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ১০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।[২২১]

উত্তর-পূর্ব আরবে বহুসংখ্যক অনুসারীসহ চারজন মুসলিম গোত্র-প্রধান ছিলেন। এরা হলেন মুসান্না বিন হারিসা, মাজুর বিন আদি, হারমালা ও সুলমা। প্রথম দু'জনকে খলীফা পূর্বেই নির্দেশ দান করেছিলেন সসৈন্যে খালিদের কমান্ডে ইরাক অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। খালিদ (রা) এই চার ব্যক্তিকে পত্রের মাধ্যমে খলীফা কর্তৃক তাকে মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার নিয়োগ ও খলীফা প্রদত্ত মিশনের কথা অবহিত করেন। তিনি তাদেরকে সসৈন্যে উবাল্লা এলাকায় তার সংগে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দান করেন। তিনি খলীফার নির্দেশ পালন করে সসৈন্যে নিজেকে খালিদের কমান্ডে ন্যস্ত করেন। তিনি একজন সর্বোত্তম সহযোগী কমান্ডার হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে চান। চারজন গোত্রপ্রধানের প্রত্যেকেই ২,০০০ করে সৈন্যসহ খালিদ (রা)-এর সংগে যোগদান করেন। ফলে খালিদ (রা) ১৮,০০০[২২২] সৈন্যসহ ইরাকে প্রবেশ করেন। এটাই ছিল এযাবৎ সংগঠিত বৃহত্তম মুসলিম বাহিনী।

গ্রন্থে খালিদের ইরাক অভিযানের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই বর্ণনাতেও খলীফার অভিযান পরিকল্পনার দুটো বক্তব্য আছে। ব্যাখ্যার জন্য পরিশিষ্ট 'খ'-এর ৫ নম্বর নোট দ্রঃ।

২২১. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৫৪।

২২২. পূর্বোক্ত।

৬৩৩ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (১২ হিজরীর মুহাররম মাসের প্রথম দিকে) খালিদ (রা) ইয়ামামা হতে ইরাকের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। তার পূর্বেই তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলা দাস্ত মেইসানের গভর্নর হরমুযকে পত্রের মাধ্যমে আহ্বান জানান।

"ইসলামের পতাকাতলে শামিল হয়ে নিরাপত্তা লাভ করো। অথবা জিয্য়া কর প্রদানের স্বীকৃতি দাও, আমরা তোমার লোকদের নিরাপত্তা বিধান করবো। নতুবা পরিণতির জন্য তোমাকেই দায়ী থাকতে হবে। আমি এমন একদল লোককে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি যারা মৃত্যু প্রত্যাশী, যেখানে তোমরা জীবনকে ভালবাস।"[২২৩]

হরমুয রাগ ও ঘৃণাসহকারে পত্রটি পাঠ করে এবং পারস্য সম্রাট আর্দশীরকে খালিদের হুমকি সম্পর্কে অবহিত করে। সে আরবদেরকে একটি নির্মম শিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

খালিদ (রা) তাঁর বাহিনীকে চারটি দলে বিভক্ত করে ইয়ামামা হতে অগ্রাভিযান শুরু করেন। এই বিভক্তির উদ্দেশ্য হলো একটি বিশাল বাহিনীর একত্রে যাত্রার ক্লান্তি ও সময়ের অপচয় উপেক্ষা করা। প্রত্যেকদল একদিনের বিরতিতে যাত্রা শুরু করে। এই দূরত্বটি এরূপ ছিল যে, এতে যেমন চলাচলের সুবিধা ছিল, তদ্রূপ প্রয়োজনে দ্রুত একত্রিত হওয়াও সম্ভবপর ছিল। খালিদ (রা) তৃতীয় দলের সংগে অর্থাৎ অভিযান শুরুর তৃতীয় দিবসে যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে মুসলিম বাহিনী হরমুযের সংগে একটি চরম যুদ্ধের শপথ গ্রহণ করে। খালিদ (রা) তাদেরকে হুফেইর-এর[২২৪] নিকট একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দান করেন।

হরমুয ছিল দাস্ত মেইসান জেলার সামরিক গভর্নর। সে ছিল খুবই অভিজ্ঞ ও সম্রাটের আস্থাভাজন ব্যক্তি। তার দায়িত্ব ছিল এই জেলাটির নিরাপত্তা বিধান করা। জেলাটি ছিল পারস্য সম্রাটের নিকট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ সবচেয়ে সম্পদশালী ভূখণ্ড। এই জেলার প্রধান শহর উবাল্লা ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের প্রধান বন্দর। বাহরাইন, আরব, পশ্চিম ও মধ্য ইরাক ও পারস্যের কেন্দ্র হতে আগত স্থল পথসমূহও এই উবাল্লায় মিলিত হয়েছে। ফলে কৌশলগত দিকে এই শহরটি রক্ষার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

পারস্য সমাজে রাজকীয় ও আভিজাত্যপূর্ণ আচরণের কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। সমাজে একজন মানুষের মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ ঘটতো তার পরিহিত ক্যাপের মাধ্যমে। পদমর্যাদা বৃদ্ধির সংগে সংগে ক্যাপের মূল্য বৃদ্ধি পেতো। সম্রাটের পরপরই মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ হীরা, মুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান পাথর খচিত ১,০০,০০০ দিরহাম মূল্যের ক্যাপ পরিধান করতো। হরমুযও ছিল এই পদমর্যাদার ব্যক্তি।[২২৫]

---

২২৩. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৫৫।
২২৪. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৫৬।
২২৫. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৫৬।

সাম্রাজ্যবাদী ও উদ্ধত স্বভাবের এই লোকটি স্থানীয় আরবদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতো এবং এ ব্যাপারে তার কোনো রাখ-ঢাক ছিল না। সে আরবদের সংগে খুব কর্কশ আচরণ করতো ফলে আরবগণ তাকে ঘৃণা ও ভয় করতো। পারস্য সাম্রাজ্যের প্রজা হিসেবে হরমুযের এই নির্যাতন নীরবে সহ্য করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না।

খালিদ (রা)-এর পত্র প্রাপ্তির পরপরই হরমুয তার বাহিনীকে সংগঠিত করে উবাল্লা ত্যাগ করে। তার ধারণা ছিল যে, খালিদ (রা) ইয়ামামা থেকে সোজা রাস্তায় কাজিমা হয়ে উবাল্লা অভিমুখে যাত্রা করবে (১১ নম্বর ম্যাপ) কাজিমায় পৌঁছে সে তার বাহিনীকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে মুখ করে কেন্দ্র ও দুবাহুর বিন্যাসে মোতায়েন করে। সে তার যোদ্ধাদেরকে একে অপরের সংগে শিকলের সাহায্যে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দান করে। সৈন্য মোতায়েন করে সে খালিদের আগমনের অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু খালিদের কোনো চিহ্নই দেখা যায় না। পরবর্তী সকালে তার স্কাউট এসে খবর দেয় যে, খালিদ (রা) হুফেইর[২২৬] অভিমুখে যাত্রা করছে।

ইয়ামামা ত্যাগ করার পূর্বেই খালিদ (রা) হরমুযের বাহিনীকে মুকাবিলা করার একটি কৌশল নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁকে মিশন দেয়া হয়েছিল পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। খলীফার এক মিশন নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে প্রথম সংঘর্ষেই হরমুযকে পরাজিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। আর উবাল্লায় পারস্য বাহিনীর মজবুত অবস্থানে আঘাত হেনে তাদেরকে পরাজিত করা মোটেই সহজ ছিল না। তদুপরি প্রতিপক্ষের সৈন্যসংখ্যার আধিক্য, দক্ষতা, সাহসিকতা ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য সম্পর্কেও খালিদ (রা) সচেতন ছিলেন। তবে তাদের একটি বড় দুর্বলতা ছিল দ্রুত চলমানতার অভাব। অপরপক্ষে খালিদের বাহিনী ছিল যে কোনো ধরনের ভৌগোলিক অবস্থায় দ্রুত চলাচলে সক্ষম। তাদেরকে বহন করার মতো পর্যাপ্ত উট ছিল এবং দ্রুত আক্রমণ রচনার জন্য ছিল পর্যাপ্ত ঘোড়াও। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল খুবই দক্ষ ও সাহসী যোদ্ধা এবং স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

খালিদ (রা) তাঁর বাহিনীর দ্রুত চলমানতার সুবিধাকে ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের দুর্বলতাকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি তাদেরকে এক গন্তব্য হতে অন্য গন্তব্যে চলাচলে বাধ্য করতে চান। এভাবে চলাচলে একসময় ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়লে সুযোগ বুঝে তাদের উপর চরম আঘাত হানবেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে সাহায্য করে উবাল্লার ভৌগোলিক অবস্থান। ইয়ামামা হতে উবাল্লায় প্রবেশের দুটি পথ ছিল। একটি কাজিমা হয়ে এবং অন্যটি হুফেইর হয়ে (১১ নম্বর ম্যাপ)। খালিদ তাঁর কৌশল বাস্তবায়নে এই ভৌগোলিক সুবিধাকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

---

২২৬. কাজিমার অবস্থান ছিল কুয়েত উপসাগরের উত্তর তীরে, যা ১১ নম্বর ম্যাপে দেখানো হয়েছে, বর্তমান বসরা কুয়েত সড়ক হতে পাঁচ মাইল দূরে। এই শহরটি ছিল বেশ বড়। কিন্তু বর্তমানে এর কিছু ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কোনো চিহ্ন নেই। হুফেইর এর কোনো চিহ্ন বর্তমানে নেই। ইবনে রুসতার মতে এর অবস্থান ছিল বসরা থেকে ১৮ মাইল দূরে মদীনাগামী সড়কের উপরে। আমি এটাকে ম্যাপে দেখিয়েছি বসরা থেকে ২১ মাইল দূরে। কেননা প্রাচীন আরবের মাইল ছিল কিছুটা দীর্ঘ।

ম্যাপ – ১১ : শিকলের যুদ্ধ – ১
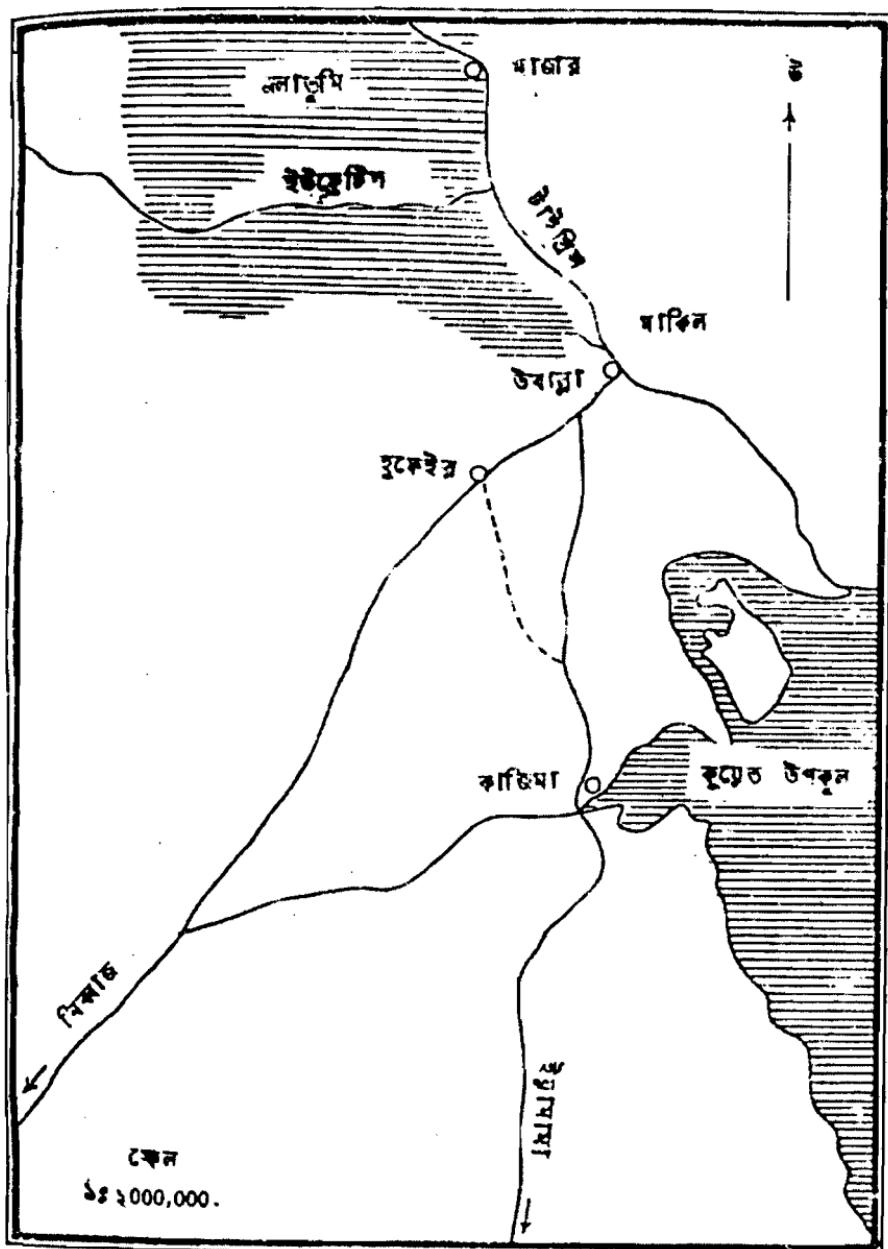
খালিদ (রা) জানতেন যে, তাঁর অভিযানের খবর শুনেই হরমুয স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে ইয়ামামা হতে উবাল্লা প্রবেশের সহজ পথ কাজিমা হয়ে আশা করবে এবং সে অনুযায়ী তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অতএব, তিনি সহজ পথটি উপেক্ষা করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হয়ে অগ্রসর হতে থাকেন, যাতে প্রয়োজন বোধে কাজিমা হয়ে বা হুফেইর হয়ে যে কোনো একটি প্রবেশ পথ অনুসরণের সুবিধা গ্রহণ করে অপেক্ষাকৃত কম গতিসম্পন্ন প্রতিপক্ষকে সমস্যার মধ্যে ফেলতে পারেন। এই পরিকল্পনা নিয়ে তিনি নিব্বাজের দিকে যাত্রা শুরু করেন। তিনি পূর্বের মতোই বাহিনীকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন এবং নিজের কমান্ডে রাখেন মুসান্নার ২,০০০ যোদ্ধাকে। মুসান্না তাঁর যোদ্ধাদেরকেসহ নিব্বাজে[২২৭] অপেক্ষা করছিলেন। নিব্বাজ থেকে তিনি হুফেইর অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে তিন গোত্রপ্রধান তাদের যোদ্ধাদেরসহ খালিদের সংগে শামিল হয়।

১৮,০০০ মুজাহিদের মুসলিম বাহিনী হুফেইর অভিমুখে যাত্রা করতে থাকে। খালিদ (রা) অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন। কাজিমায় অবস্থানকারী হরমুয আপতত তাঁর জন্য কোনো সমস্যা না। কেননা দ্রুত চলমানতার অভাবের কারণে হরমুযের পক্ষে তার চলার পথকে বিপজ্জনক করা ছিল প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া খালিদ (রা)-এর বাহিনীর মত একটি দ্রুত চলাচলে সক্ষম শক্তির পক্ষে মরুভূমির বুকে যে কোনো সময় গতিপথ পরিবর্তন করায় কোনো সমস্যা ছিল না। দ্রুত হুফেইর অতিক্রম করে উবাল্লায় পৌছার কোনো পরিকল্পনা খালিদের ছিল না। তাতে পার্শ্বদেশ বা পশ্চাৎ হতে হরমুযের পক্ষ থেকে হুমকি আসার আশংকা আছে। খালিদের মতো দক্ষ মরুচারী সেনানায়কের পক্ষে এই সুযোগ দানের প্রশ্নই আসে না। খালিদ (রা) হুফেইরে অদূরে অপেক্ষা করতে থাকেন।

একটি ক্ষুদ্র অশ্বারোহী দল হরমুযের গতিবিধির উপর নজর রাখে। খালিদ (রা) জানতেন যে, হুফেইরের অদূরে তাঁর অবস্থানের খবর হরমুযের মনে আতংকের সৃষ্টি করবে।

ঠিক তাই হয়। খালিদ (রা)-এর হুফেইর অভিমুখে যাত্রার খবর শুনেই হরমুয আতংকিত হয়ে পড়ে। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝতে পারে যে, তার ঘাঁটি হুমকির সম্মুখীন। মরুচারী আরবদেরকে সে ভাল করেই জানে। সে তার বাহিনীকে দ্রুত হুফেইর অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দান করে। প্রচুর ভারী অস্ত্রে সজ্জিত পারস্য সৈনিকদের জন্য ৫০ মাইলের এই যাত্রা ছিল খুবই ক্লান্তিকর। তবু শারীরিক দিক থেকে দক্ষ ও উন্নত শৃংখলাবোধসম্পন্ন পারস্য সৈনিকরা এই পদযাত্রাকে বিনা দ্বিধায় মনে নেয়। হুফেইর পৌছে হরমুয মুসলিম বাহিনীর কোনো চিহ্ন খুঁজে পায় না। তবু

---

২২৭. এই নিব্বাজ এখন নিবকিয়া নামে পরিচিত, যা বুরাইদার ২৫ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত (৭ ও ৮ নম্বর ম্যাপ দ্রঃ)

তারা যেকোনো সময় আসতে পারে এই আশংকায় হরমুয তার বাহিনীকে যুদ্ধের বিন্যাসে মোতায়েন করে। কাজিমার মতো সৈনিকদেরকে শিকল দ্বারাও আবদ্ধ করে। বাহিনী মোতায়েনের কাজ শেষ হতে না হতেই হরমুযের স্কাউটরা এসে খবর দেয় যে, খালিদ (রা) কাজিমার দিকে যাত্রা করছে।

হরমুযের বাহিনী দ্রুত হুফেইরের দিকে ছুটে আসছে এই খবর শুনেই খালিদ (রা) তাঁর বাহিনীকে প্রত্যাহার করেন এবং কাজিমার উদ্দেশে প্রতিযাত্রা শুরু করেন। তিনি মরুভূমির বেশি গভীরে না গিয়ে এমন পথ ধরে যাত্রা করছিলেন যাতে পারস্য স্কাউটরা তাদেরকে দেখতে পায়। খালিদের মধ্যে কোনো তাড়া ছিল না। তার প্রত্যেকটি যোদ্ধা ছিল বাহনের পিঠে। তিনি ধীরেসুস্থে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কেননা দ্রুত অগ্রসর হয়ে কাজিমা দখল করার কোনো পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। কাজিমা দখল করলে তাঁকে সেখানেই প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ যেদিক দিয়ে খুশি অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করার সুযোগ পাবে। খালিদ (রা) শত্রুকে এই সুযোগ দিতে চান না। শত্রু ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে গেলে তিনি বিশাল মরুভূমিকে পেছনে রেখে সুবিধা মতো অগ্রসর হয়ে প্রতিপক্ষের উপরে চড়াও হতে চান।

কাজিমাকে মুসলিম বাহিনীর হাতে ছেড়ে দেয়া যায় না। এই বিবেচনায় হরমুয আবার কাজিমার দিকে যাত্রা শুরু করে। সে হয়তো উবাল্লার কাছাকাছি কোথাও অবস্থান নিয়ে একটি প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে পারতো। কিন্তু মুসান্নার আক্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে তার উপলব্ধি আসে যে, মুসলিম বাহিনীকে উবাল্লার উর্বর ভূমির নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না। তাই সে নিজ শহর থেকে দূরে কোথাও একটি পরিকল্পিত খণ্ডযুদ্ধে মরুবাসী আরবদেরকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। কাজিমার অবস্থানগত গুরুত্ব ও মুসলিম বাহিনীর প্ররোচনা হরমুযকে কাজিমা অভিমুখে প্রতিযাত্রায় বাধ্য করে।

পারস্য সৈনিকদের জন্য এবারের প্রতিযাত্রার অভিজ্ঞতা খুব ভাল ছিল না। তাদের মধ্যে ফিসফাস শুরু হয়ে যায়। বিশেষ করে পারস্য বাহিনীর সহযোগী হিসেবে যোগদানকারী আরবীয় সৈনিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তারা এই দুর্ভোগের জন্য হরমুযকে দায়ী করতে থাকে। তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় কাজিমায় উপস্থিত হয়। কাজিমায় পৌঁছেই হরমুয যতো দ্রুত সম্ভব তার বাহিনীকে কেন্দ্র ও দুবাহুর সাধারণ বিন্যাসে মোতায়েন করে। তার দুবাহুর কমান্ডারগণ হলো কুবায ও আনুশজানাসে তার সৈনিকদেরকে আবার শিকলবদ্ধ করে। (১২ নম্বর ম্যাপে বাহিনীদ্বয়ের যাত্রা ও প্রতিযাত্রার চিত্র দেখানো হয়েছে)।

ম্যাপ-১২ : শিকলের যুদ্ধ-২
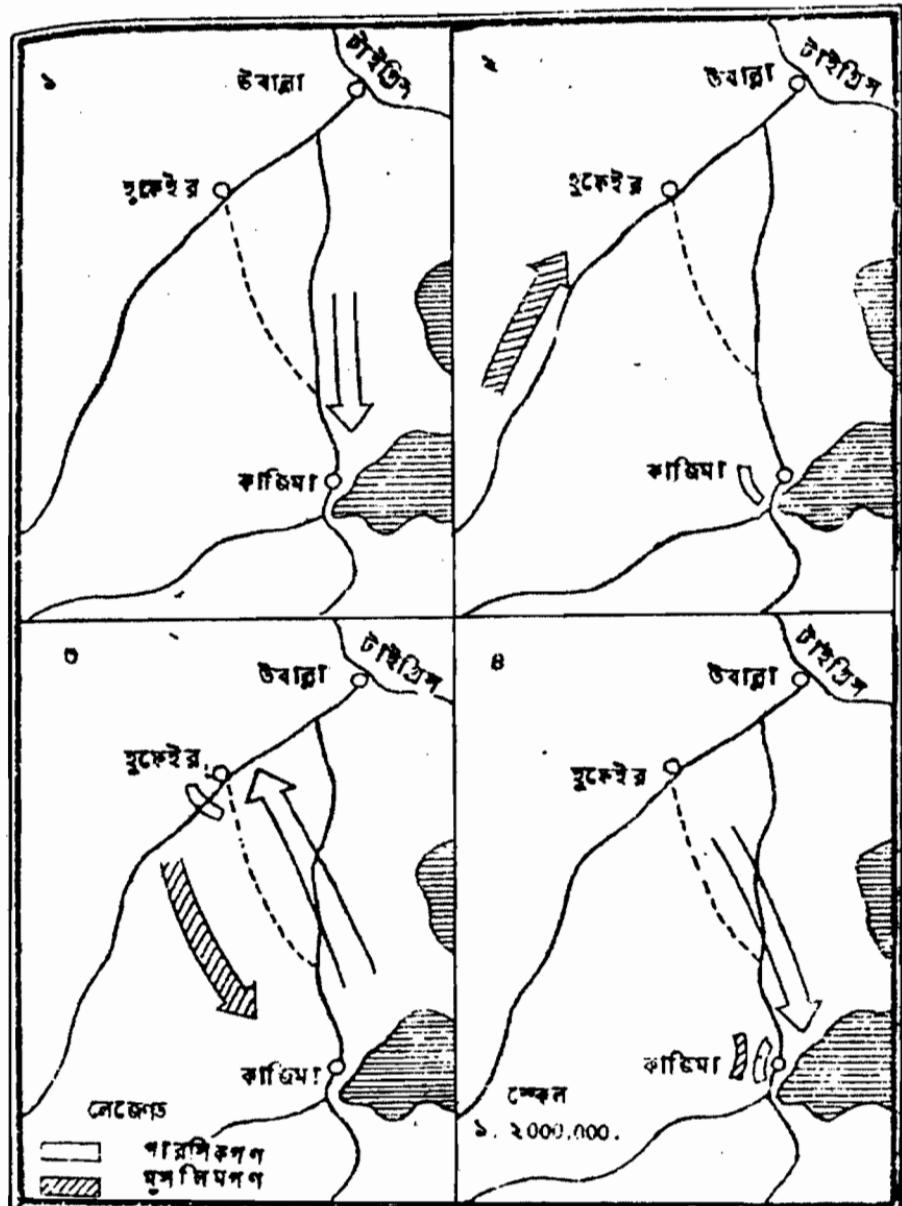
পারস্য বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায়ই শিকল ব্যবহার করতো। সাধারণত তিন, পাঁচ, সাত ও দশ ব্যক্তিকে একত্রে আবদ্ধ করার মতো চারটি ভিন্ন দৈর্ঘের শিকল ব্যবহার করা হতো। অনেক সমালোচক বলে থাকেন যে, সৈনিকদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নে বিরত রাখার লক্ষ্যে এই শিকল ব্যবহার করা হতো। এর চেয়ে উপযুক্ত ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকগণ মরণপণ লড়াইয়ের ইচ্ছা ব্যক্ত করার জন্যই শিকল পরিধান করতো। একদল লোক শিকলে আবদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়ালে প্রতিপক্ষের জন্য তা এমন দুর্ভেদ্য বাধার সৃষ্টি করতো যা ভেদ করে অনুপ্রবেশ করা অনেক সময় সম্ভব হতো না। পারস্য বাহিনী তাদের দীর্ঘ প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা দিয়ে এই কৌশলকে ভালভাবেই কাজে লাগাতো। এই কৌশলের একটি বড় অসুবিধাও ছিল। পরাজিত হয়ে শিকলের কারণে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ প্রত্যাহার সম্ভব হতো না। এক্ষেত্রে এই শিকল বেড়ির কাজ করতো। শিকলবদ্ধ সহযোদ্ধার পতনও অন্যদের চলাচলকে সীমিত করে ফেলতো। ফলে প্রতিপক্ষের হাতে অসহায়ের মতো জীবন দান করা ছাড়া আর করার কিছুই থাকত না।

আলোচ্য যুদ্ধে পারস্য বাহিনী কর্তৃক শিকলের ব্যবহারের কারণেই এর নাম হয়েছে শিকলের যুদ্ধ।

পারস্য বাহিনীর আরব সহযোগীরা কখনই শিকল পরার ধারণাকে গ্রহণ করতে পারেনি। এই যুদ্ধে পারস্য সৈনিকগণ শিকল পরতে শুরু করলে তারা মন্তব্য করে ঃ "তোমরা শত্রুর সামনে নিজেদেরকে বেঁধে দিচ্ছ। এর পরিণতি ভাল হবে না।" এর জবাবে পারস্য সৈনিকদের প্রতিক্রিয়া ছিল, "আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তোমরা পলায়নের জন্য নিজেদেরকে মুক্ত রাখছো।"[২২৮]

খালিদ (রা) মরুভূমি ত্যাগ করে পারস্য বাহিনীর দিকে অগ্রসর হন। পরিশ্রান্ত পারস্য বাহিনীর ক্লান্তি দূর হওয়ার পূর্বেই তিনি আঘাত হানতে চান। খালিদের নিকট খবর আসে যে, মুসলিম বাহিনীর মধ্যে পানির অভাব দেখা দিয়েছে। এই সংবাদবাহকদেরকে খুব আতংকিত মনে হয়। খালিদ (রা) বিচলিত না হয়ে নির্দেশ দিলেন, "উটের পিঠ হতে নেমে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। যে বাহিনী সক্ষম পানি তাদের নিকটই যাবে।"[২২৯] নেতার প্রতি অটল বিশ্বাসের বলে বলীয়ান মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে এমন বৃষ্টি হয় যাতে তারা তৃষ্ণা মিটিয়েও পানির পাত্রগুলো পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হয়।

হরমুয কাজিমাকে প্রতিরক্ষা এলাকার মধ্যে রেখে শহরের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের সামনে প্রায় তিন মাইল এলাকাজুড়ে ছোট ঝোপঝাড়েপূর্ণ বালুকাময় সমতল ভূমি। এরপরে রয়েছে ২০০ হতে ৩০০ ফুট পর্যন্ত

---

২২৮. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৫৫।
২২৯. পূর্বোক্ত।

বিরাণ পাহাড়ের সারি। এই পাহাড়ের সারিটি হুফেইর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং খালিদ (রা) এই পাহাড়ী পথ ধরেই কাজিমায় এসেছিলেন। এই পাহাড়ী এলাকাটি ছিল মরুভূমির অংশ। পাহাড়ী এলাকা ত্যাগ করে খালিদ (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে বালুকাময় সমতলভূমিতে পদার্পণ করেন। তিনি পেছনে পাহাড়ের সারি ও মরুভূমি রেখে সাধারণ ভংগিতে কেন্দ্র ও দুবাহুর বিন্যাসে সৈন্য মোতায়েন করেন। দুবাহুর কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ করেন আসিম বিন আমর (কাকা বিন আমরের ভাই) এবং আদীকে (তাঈ বিন হাতিমকে গোত্রের সেই অতিকায় লম্বা প্রধান যার কথা দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে)। ৬৩৩ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের কোনো এক সময়ে (১১ হিজরীর মুহাররম মাসের তৃতীয় সপ্তাহে) শিকলের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

দুবাহিনীর কমান্ডারদ্বয়ের মহাবীরত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে শিকলের যুদ্ধ শুরু হয়। হরমুয ছিল একজন কৌশলী যোদ্ধা। পারস্য সাম্রাজ্যে খুব কম বীরই ছিল যারা হরমুযের সামনে দাঁড়ানোর সাহস করতো (তখনকার দিনে এমন কাউকে বাহিনীর কামন্ডার নিয়োগ করা হতো না যে ব্যক্তিগতভাবে একজন দক্ষ যোদ্ধা নয়)। হরমুয তার ঘোড়াকে সামনে এগিয়ে নিয়ে দুবাহিনীর মধ্যবর্তী অবস্থানে দাঁড়িয়ে যদিও স্বীয় বাহিনীর সন্নিকটবর্তী, আহ্বান জানায় ব্যক্তির সংগে ব্যক্তির, কোথায় খালিদ ?"[২৩০] মুসলিম বাহিনীর মধ্য হতে খালিদ (রা) বেরিয়ে আসেন এবং হরমুযের অবস্থানের অদূরে দাঁড়িয়ে পড়েন। উভয় বাহিনী নিঃশব্দ-নীরবতায় দুই বিখ্যাত জেনারেলের নৈপুণ্য উপভোগ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে।

হরমুয ঘোড়া থেকে নেমে খালিদ (রা)-কেও আহ্বান জানায় নামার জন্য। আপাতত দৃষ্টিতে হরমুযের এই কাজটি ছিল খুবই সাহসিকতাপূর্ণ। কেননা ভূমিতে দাঁড়ানো অবস্থায় সংঘটিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পলায়নের সুযোগ তেমন একটা থাকে না। কিন্তু এক্ষেত্রে হরমুযের ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। সে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসার পূর্বে তার বাহিনীর কয়েকজন দক্ষ যোদ্ধাকে বেছে নিয়ে সম্মুখ সারিতে তার অবস্থানের সন্নিকটে মোতায়েন করে রাখে। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল ঃ সে খালিদ (রা)-কে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যস্ত রেখে সুযোগ বুঝে তাদের সাহায্য চাইবে। সংগে সংগে তারা গিয়ে দুই যোদ্ধাকে ঘিরে ফেলবে। এই সুযোগে হরমুয খালিদ (রা)-কে ধরে ফেলবে এবং তারা তাকে হত্যা করবে। খালিদ (রা) ঘোড়া থেকে নামার পর এই নির্বাচিত যোদ্ধাগণ নিশ্চিত হয় যে, এবারে তাঁর আর রক্ষা নেই।

দুই জেনারেল তরবারি ও ঢালের সাহায্যে যুদ্ধ শুরু করে। একে অপরকে প্রচণ্ড আঘাত হানতে থাকে। কিন্তু কেউ কাউকে কাবু করতে পারে না। একে অপরের

---

২৩০. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৫৫।

দক্ষতায় বিস্মিত হয়ে পড়ে। হরমুয নিজের তরবারি ফেলে দিয়ে খালিদ (রা)-কে কুস্তি লড়ার আহবান জানায়। হরমুযের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে খালিদ (রা)ও তরবারি ফেলে কুস্তি লড়ার জন্য অগ্রসর হন। কুস্তি শুরু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে একে অপরকে শক্ত করে ধরলে হরমুয তার নির্বাচিত যোদ্ধাদের প্রতি সাহায্যের জন্য চিৎকার দেয়। কোনো কিছু বুঝে উঠার পূর্বেই খালিদ (রা) দেখতে পান যে, কয়েকজন রুদ্রমূর্তি পারসিক যোদ্ধা তাদের দুজনকে ঘিরে ফেলেছে।

খালিদ (রা) পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁর হাতে তরবারি ও ঢাল কিছুই নেই এবং তিনি হরমুযের শক্ত বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ মনে হয়, শেষরক্ষার কোনো উপায় নেই। তিনি সহসাই সর্বশক্তি প্রয়োগ করে হরমুযকেসহ মাটিতে দ্রুত গড়াতে শুরু করেন। খুব দ্রুত গড়ানোর ফলে পারসিক সৈনিকদের পক্ষে তার উপর আঘাত হানা সম্ভব হয়ে উঠে না।

যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে প্রচণ্ড হৈ চৈ পড়ে যায়। একপক্ষ আনন্দের চিৎকার করতে থাকে আর অপর পক্ষ আতংকের। এই হৈ চৈ-এর কারণে এবং দৃষ্টি কুস্তিগীরদ্বয়ের উপর নিবদ্ধ থাকায় নির্বাচিত পারসিক সৈনিকগণ বুঝতেই পারেনি যে, কখন একজন অশ্বারোহী এসে তাদের উপর চড়াও হয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যেই দুই বা তিন জনের মস্তকবিহীন দেহ মাটিতে পড়ে লাফাতে থাকে। হাতাহাতি যুদ্ধের এই শ্বাসরুদ্ধকর পর্যায়ে যোগদানকারী অশ্বারোহী সৈনিকটি হলেন কাকা বিন আমর–খলীফা আবূ বকর (রা) যে একমাত্র ব্যক্তিটিকে পাঠিয়েছিলেন খালিদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য।

পারসিক সৈনিকগণকে অগ্রসর হতে দেখেই কাকা মুহূর্তের মধ্যেই হরমুযের ষড়যন্ত্র ও খালিদ (রা)-এর পরিণতির বিষয়টি উপলব্ধি করেন। পরিস্থিতি এতো সংকটাপন্ন ছিল যে, বিষয়টির গুরুত্ব কারও কাছে ব্যাখ্যা করার বা কাউকে বুঝিয়ে সংগে নেয়ার সময়ও ছিল না। কাকা তাঁর ঘোড়াসহ মুসলিম বাহিনীর মধ্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসেন এবং সর্বনাশ ঘটে যাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পারসিক সৈনিকদের উপরে তরবারি চালনা করেন। হরমুযের নির্বাচিত সব সৈনিককেই কাকা হত্যা করেন।[২৩১]

পারসিক সৈনিকদের ষড়যন্ত্রের জাল থেকে মুক্ত খালিদ (রা) এবারে হরমুযের প্রতি মনোযাগী হয়ে ওঠেন। মাত্র এক বা দুই মিনিটের মধ্যেই হরমুযের দেহ নিস্তেজ হয়ে মাটিতে পড়ে এবং খালিদ (রা) হাতে একটি রক্তমাখা ছুরি নিয়ে ধীরে তার বুক থেকে উঠে পড়েন। ছুরিটি থেকে ফোঁটা ফোঁটা তাজা রক্ত পড়তে থাকে।

খালিদ (রা) তাঁর বাহিনীকে একযোগে আক্রমণের নির্দেশ দান করেন। মুসলমানগণ প্রতিপক্ষের কমান্ডারের ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের স্পৃহা

---

২৩১. হরমুযের ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারী ও কাকার হাতে নিহত সৈনিকদের সংখ্যা সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে এদের সংখ্যা পাঁচ বা ছয় হতে পারে।

নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দুবাহু ও কেন্দ্র হতে একযোগে সমতলভূমির উপর দিয়ে পারস্য বাহিনীর উপরে আক্রমণ রচিত হয়। কমান্ডারের মৃত্যুতে পারস্য সৈনিকদের মনোবল কিছুটা ভেঙে গেলেও তারা ছিল সংখ্যায় অধিক। তদুপরি লৌহশৃংখল তাদেরকে একত্রে থাকতে সহায়তা করে। তারা মজবুত অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকে। কিছু সময়ের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে একটা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে। দ্রুতচলমান আক্রমণকারী মুসলিম বাহিনীর একের পর এক আঘাত শিকলবদ্ধ প্রতিপক্ষ প্রতিহত করতে থাকে। কিন্তু শীঘ্রই মুসলিম বাহিনীর দক্ষতা ও সাহসিকতা এবং পারস্য বাহিনীর শারীরিক ক্লান্তি ফল দিতে শুরু করে এবং কয়েকটি প্রচেষ্টার পর মুসলিমগণ শত্রুপক্ষের সম্মুখ সারির কয়েকস্থানে ভাঙন সৃষ্টিতে সক্ষম হন।

পরাজয় আসন্ন দেখে পারস্য বাহিনীর দুবাহুর কমান্ডারগণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সৈনিকদেরকে পিছু হটার নির্দেশ দান করে। প্রতিপক্ষ পিছু হটতে শুরু করলে মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে পারস্য বাহিনীর প্রত্যাহার একটি বিশৃংখল পলায়নের রূপ লাভ করে। যেসব পারসিক সৈন্য শিকলবদ্ধ ছিল না তাদের অধিকাংশ পালাতে সক্ষম হলেও শিকলবদ্ধ সৈনিকগণের জন্য এই শিকলই মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়। তারা খুব সহজেই পিছু ধাওয়াকারী মুসলিম বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে থাকে। অন্ধকার নেমে আসার পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে। কুবায ও আনুশজান নিজেরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালাতে সক্ষম হয় এবং স্বীয় বাহিনীর একটি বড় অংশকেই প্রত্যাহার করে নেয়।

পারস্য সাম্রাজ্যের বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর প্রথম যুদ্ধের এখানেই সমাপ্তি হয়। মুসলিম বাহিনী এই যুদ্ধে ব্যাপক বিজয় লাভ করে।

পরের দিনটি আহতদের সেবা ও শত্রুর পরিত্যক্ত মালামাল, অস্ত্র, বর্ম, অলংকার, ঘোড়া ইত্যাদি সংগ্রহ করতে ব্যয় হয়। খালিদ (রা) সংগৃহীত সম্পদের পাঁচ ভাগের চারভাগ সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করেন। বিতরণের নীতিমালা ছিল একজন অশ্বারোহী যা পাবে একজন পদাতিক সৈনিক পাবে তার এক-তৃতীয়াংশ। এটাই ছিল রাসূল (সা)-এর ঐতিহ্য। একজন অশ্বারোহীকে তিন অংশ দেয়া হতো। কেননা তাকে ঘোড়া পুষতে হতো এবং এই ঘোড়া ছিল তখনকার আরবদের নিকট যুদ্ধক্ষেত্রে গতিময়তা সৃষ্টির সবচেয়ে মূল্যবান বাহন।

রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে এক-পঞ্চমাংশ সম্পদ খলীফার নিকট প্রেরণ করা হয় যার মধ্যে ছিল হরমুযের ১,০০,০০০ দিরহাম মূল্যের ক্যাপটিও। দ্বৈতযুদ্ধে নিহত যোদ্ধার সম্পদের মালিক বিজয়ী যোদ্ধা হয় বিধায় খলীফা পুনরায় খালিদ (রা)-এর নিকট তা প্রেরণ করেন। খালিদ (রা) ক্যাপটি বিক্রয় করে নগদ অর্থ গ্রহণ করেন।

শিকলের যুদ্ধে একটি হাতিও মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং তা গনিমতের মালের সংগে মদীনায় প্রেরণ করা হয়। এই অতিকায় প্রাণীটি নবীর শহরে পৌঁছলে শহরবাসীদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কেননা তারা এর পূর্বে এতো বিশাল কোনো স্থল প্রাণীর সাক্ষাত লাভ করেনি। কিন্তু খলীফা এই প্রাণীটির কোনো উপযোগিতা খুঁজে না পেয়ে পুনরায় খালিদ (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। পরে হাতিটির কি হয়েছিল তা আর জানা যায়নি।

পারসিকদের পরিবার ও তাদের সহযোগী ইরাকী আরবদের পরিবারগুলোকে বন্দী করা হয়। গ্রামবাসী কৃষক ও মেষপালক পরিবারগুলোকে ক্ষমা করা হয়। কেননা তারা জিযিয়া কর প্রদানে সম্মত হয়ে মুসলমানদের হেফাজতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

খালিদ (রা) কয়েকটি দিন সাংগঠনিক কাজে ব্যয় করেন। তারপর তিনি গোটা বাহিনীসহ উত্তরের দিকে যাত্রা শুরু করেন। বাহিনীর অগ্রবর্তী দলে মুসান্নার নেতৃত্বে ২,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ পাঠিয়ে দেন এলাকা পরিদর্শন ও কোনো পলাতক পারসিক সৈন্য পেলে তাদেরকে হত্যা করার জন্য।

মুসান্না একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে উপস্থিত হন। নদীটির অবস্থান ছিল বর্তমানের জুবেরের উত্তরে। এই নদীর তীরে একটি দুর্গ ছিল যার নাম ছিল হিসনুল মারাত অর্থাৎ মহিলার দুর্গ। একজন মহিলা এই দুর্গটি কমান্ড করতো বিধায় এরূপ নামকরণ করা হয়।[২৩২] মুসান্না দুর্গটি অবরোধ করেন। কিন্তু অভিযানে বিলম্ব উপেক্ষা করার লক্ষ্যে ভাই মুয়ান্নার নেতৃত্বে কয়েকশ' যোদ্ধার উপরে অবরোধের দায়িত্ব দিয়ে বাকি সৈন্য নিয়ে তিনি সামনে অগ্রসর হতে থাকেন।

দু'তিন দিনের মধ্যেই দুর্গের মহিলা কমান্ডার উপলব্ধি করতে পারে যে, মুসলিম বাহিনীকে বাধা প্রদানের চেষ্টা বৃথা বৈ কিছু নয়। উবাল্লার পারস্য বাহিনী পরাজিত হওয়ায় কারও নিকট হতে সাহায্য পাওয়ারও আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না। মুয়ান্না দুর্গের মহিলার নিকট শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে কোনো রক্তপাত বা সম্পদের ক্ষতি করা হবে না ও কাউকেও বন্দী হিসেবে নেয়া হবে না। মহিলা এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। মুয়ান্না ও মহিলার মধ্যে সাক্ষাৎ হলে তারা উভয়ে একে অপরকে দেখে প্রীত বোধ করেন। মহিলা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে এবং বিলম্ব না করে মুয়ান্না তাকে বিয়ে করেন। এই সময়ে খালিদ (রা) মূল বাহিনীসহ কাজিমা হতে উত্তর দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখেন।

---

২৩২. নদীটি এখনও আছে যা মহিলার নদী নামে পরিচিত। কিন্তু দুর্গটির কোনো চিহ্ন নেই।

মাকিল নদীর যুদ্ধ

ইয়ামামা হতে মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রার সংবাদ হরমুয পারস্য সম্রাটকে অবহিত করে। এই সংবাদ শুনে সম্রাট টেসিফোনে একটি নতুন বাহিনী সংগঠনের নির্দেশ দান করে এবং এই বাহিনীকে ন্যস্ত করে কারিন বিন কিরিয়ানা নামের একজন প্রথম শ্রেণীর জেনারেলের অধীনে। কারিন ছিল একজন এক লক্ষ দিরহাম মূল্যের জেনারেল। সম্রাট কারিনকে হরমুযের শক্তি বৃদ্ধির জন্য উবাল্লা অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দান করে এবং কারিন এই উদ্দেশ্যে টেসিফোন ত্যাগ করে।

টাইগ্রিস নদীর বাম তীর ধরে অগ্রসর হয়ে কারিন মাজারে উপস্থিত হয়ে নদী পার হয় এবং মাকিল নদীর পাড়ে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত ডান তীর ধরে দক্ষিণ দিকে চলতে থাকে। সে দুই নদীর সংযোগ স্থলের পার্শ্ববর্তী এলাকা দিয়ে মাকিল অতিক্রম করতে না করতেই কাজিমায় হরমুযের দুর্যোগের সংবাদ লাভ করে। এর পরপরই শিকলের যুদ্ধে পারস্য বাহিনীর পলাতক সৈনিকগণ কুবায ও আনুশজানের নেতৃত্বে কারিনের সংগে যোগদান করে। এই পলাতক সৈনিকদের মধ্যে পারস্য বাহিনীর সহযোগী আরবগণও ছিল এবং স্বাভাবিক নিয়মেই তারা একে অপরকে পরাজয়ের জন্য দায়ী করতে থাকে। তাদের মনোবল পূর্বের মতো উঁচু না হলেও তারা ছিল সাহসী যোদ্ধা এবং তাদের মধ্যে পরাজয়ের ভীতির চেয়ে বরং ক্রোধের মাত্রা ছিল বেশি।

কুবায ও আনুশজান পুনরায় মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। কারিনসহ তাদের এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, কিভাবে অসভ্য বর্বর মরুচারী আরবগণ একটি সুসজ্জিত নিয়মিত বাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারে। তারা বুঝতে অক্ষম ছিল যে, কাজিমায় তাদের প্রতিপক্ষ অসভ্য ও বর্বর ছিল না বরং তারা ছিল নতুন বিশ্বাসে বলীয়ান একটি নতুন শক্তি। যাহোক, কারিন মাকিল নদীর দক্ষিণ তীরকে পিছনে ফেলে সামনে অগ্রসর হওয়াটাকে সমীচীন মনে করে না। পিছনে নদী রেখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে বাহিনীর পশ্চাত ভাগ নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না। এভাবে প্রতিপক্ষের সৈন্য পরিচালনার সুযোগকে সীমিত করে সে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চায় এবং এক্ষেত্রে তার বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা ছিল খুবই উঁচুমানের।

মুসান্না তাঁর হালকা অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে উবাল্লায় পরাজিত পারস্য বাহিনীর পলাতক অংশকে ধাওয়া করতে থাকেন। মাকিল নদীর তীরে তিনি তাদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। মুসলিম বাহিনীর উপস্থিতি ও তৎপরতা জানতে পেরেও পারস্য বাহিনী

ক্যাম্প ত্যাগ করে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হওয়া থেকে বিরত থাকে। মুসান্না এলাকাটি পর্যবেক্ষণ করে নেন এবং দূত মারফত খালিদ (রা)-এর নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তিনি মাকিল নদীর দক্ষিণ তীরে বিশাল পারস্য বাহিনরি সম্মুখীন হয়েছেন। নদীর তীরে এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয় এই জন্য এর পরিচিতি হয় নদীর যুদ্ধ হিসেবে।

কাজিমা ত্যাগ করে খালিদ (রা) উত্তর দিকে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং উবাল্লার ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্তমানের জুবেরে উপস্থিত হন। উবাল্লায় কোনো শত্রুসৈন্য নেই বিবেচনা করে তিনি সেখানে প্রবেশ না করার সিদ্ধান্ত নেন। জুবেরে অবস্থানকালে তিনি মুসান্নার দূতের নিকট থেকে কাজিমা হতে পলাতক শত্রুসৈন্য ও কারিনের বাহিনীর সমন্বিত সমাবেশের খবর জানতে পারেন। পারসিক সৈনিকদের মনে কাজিমায় পরাজয়ের প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকতেই খালিদ (রা) এই নগগঠিত পারস্য বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। তিনি মাকাল বিন মুকাররিনের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র দলকে উবাল্লা প্রেরণ করেন পারস্য বাহিনীর পরিত্যক্ত মালামাল সংগ্রহ করার জন্য এবং নিজে মূল বাহিনী নিয়ে মাকিল নদীর দিকে অগ্রসর হন। তিনি ৬৩৩ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (১২ হিজরীর সফর মাসের প্রারম্ভে) মুসান্নার সংগে মিলিত হন।

খালিদ (রা) নিজেও এলাকাটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে নেন। পারস্য বাহিনী পেছনে নদী রেখে অবস্থান নেয়ায় খালিদের হাতে কৌশলে সৈন্য পরিচালনা করে পার্শ্বদেশ বা পশ্চাৎ দিক হতে আক্রমণ রচনার তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। হরমুযের সংগে তিনি যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তেমন কোনো সুযোগও এখানে ছিল না। তিনি অনেকটা বাধ্য হয়েই পারস্য বাহিনীর বিন্যাসের অনুরূপ সাধারণ ভংগিতে একটি যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন; যেহেতু আর কোনো বিকল্প ছিল না।

দুই বাহিনী যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে। কারিন পারস্য বাহিনীর সার্বিক কমান্ড গ্রহণ করে কেন্দ্রে অবস্থান নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে যায় এবং দুবাহুর কমান্ড ন্যস্ত করে কুবায ও আনুশজানের উপরে। পারস্য বাহিনীর সহযোগী আরব যোদ্ধাদেরকেও বিভিন্ন অংশে মোতায়েন করা হয়। কারিন ছিল একজন সাহসী ও চতুর জেনারেল। সে তার বাহিনীসহ নদীর খুব কাছাকাছি অবস্থান নেয় এবং নৌকার একটি বহরও প্রস্তুত রাখে–প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য। খালিদ (রা) কেন্দ্র ও দুবাহুর বিন্যাসে সৈন্য মোতায়েন করেন এবং দুবাহুর কমান্ডার নিয়োগ করেন আসিম বিন আমর ও বাদী বিন হাতিমকে।

শুরুতেই তিনটি দ্বৈত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথম চ্যালেঞ্জ আসে কারিনের পক্ষ হতে। খালিদ (রা) তাঁর ঘোড়া নিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই মাকাল ইবনুল আশি নামের একজন মুসলিম যোদ্ধা অগ্রসর হয়ে কারিনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। মাকাল একজন দক্ষ তরবারি চালক ছিল বিধায় খালিদ তাকে পিছু ডাকা হতে বিরত থাকেন। মাকাল সহজেই কারিনকে হত্যা করতে সক্ষম হন।

এই ঘটনার পরপরই পারস্য বাহিনীর দুবাহুর কমান্ডারদ্বয় কুবায ও আনুশজান সামনে অগ্রসর হয়ে দ্বৈত যুদ্ধের আহ্বান জানায়। মুসলিম বাহিনীর দুবাহুর

কমান্ডারদ্বয় এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। অসিম আনুশজানকে এবং আদী কুবাযকে হত্যা করেন। পারস্য বাহিনীর কমান্ডারগণকে হত্যা করার পরপরই খালিদ (রা) তাঁর বাহিনীকে সাধারণ আক্রমণের নির্দেশ দান করেন এবং মুসলমানগণ দ্রুত অগ্রসর হয়ে পারস্য বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তখনকার দিনে যুদ্ধ ক্ষেত্রে কমান্ডারদের ব্যক্তিগত সফলতা বা বিফলতা সৈনিকদেরকে দারুণভাবে প্রভাবিত করতো। পারস্য বাহিনী কমান্ডারদেরকে হারানো সত্ত্বেও কিছুক্ষণ সাহসিকতার সংগে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে শীঘ্রই সৈনিকদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয়। মুসলিম বাহিনীর অব্যাহত চাপের মুখে তারা সব সমন্বয় হারিয়ে পিছন ফিরে নদীর দিকে ছুটতে থাকে। এই অসংগঠিত প্রত্যাহার বিশৃংখলা পলায়নে রূপ লাভ করে। হালকাভাবে সজ্জিত দ্রুতগতিসম্পন্ন মুসলিম বাহিনী ভারী অস্ত্রে সজ্জিত পারস্য সৈনিকদেরকে সহজেই ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। পারসিকরা জীবন রক্ষার জন্য দলে দলে হুমড়ি খেয়ে নৌকার উপরে উঠতে থাকে। কিন্তু নৌকায় ওঠার পূর্বেই পিছু ধাবমান মুসলিমগণ হাজার হাজার শত্রু সৈন্যকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। যারা নৌকায় উঠে পালাতে সক্ষম হয় তাদের সংখ্যাও অনেক। প্রাণে বেঁচে তারা কারিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এই জন্য যে, সে বুদ্ধি করে নৌকাগুলো না রাখলে একটি লোকও প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হতো না। মুসলিম বাহিনীর হাতে নদী পার হওয়ার কোনো উপায় না থাকায় তারা পলাতক শত্রুকে ধাওয়া করা থেকে বিরত থাকে।

তাবারীর মতে এই যুদ্ধে ৩০,০০০ পারসিক সৈন্য নিহত হয়েছিল।[২৩৩] এই যুদ্ধে কাজিমার চেয়েও বেশি পরিমাণ শত্রুসম্পদ হস্তগত হয়। খালিদ (রা) এ ক্ষেত্রেও তাড়াতাড়ি চার-পঞ্চমাংশ সম্পদ সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করেন এবং বাকি এক অংশ মদীনায় প্রেরণ করেন।

খালিদ (রা) বিজিত এলাকার প্রশাসনকে সংহত ও স্থায়ী করার কাজে মনোযোগ প্রদান করেন। স্থানীয় অধিবাসীগণ খালিদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে নিরাপত্তার বিনিময়ে জিযিয়া কর প্রদানে সম্মত হয়। হুফেইর-এ সদর দপ্তর স্থাপন করে খালিদ (রা) সবিদ বিন মুকাররীনের নেতৃত্বে একটি দল মোতায়েন করেন কর সংগ্রহ করার জন্য।

খালিদ (রা) প্রশাসনিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়ে তাঁর কিছু লোক কারিনের পলাতক সৈনিকদেরকে ধরার জন্য মাকিল ও ইউফ্রেটিস পার হয়ে যায়। আর কিছু লোক ইউফ্রেটিসের তীর ধরে হিরা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে পারস্য সম্রাট খুসরাও বাহিনীর আর কোনো চলাচল বা সমাবেশ দেখা যায় কি না সে সংবাদ সংগ্রহের জন্য।[২৩৪]

---

২৩৩. তাবারী. ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৫৮।

২৩৪. তাবারী এই যুদ্ধটিকে মাজারের যুদ্ধ নামেও বর্ণনা করেছেন যা আমার মতে সঠিক নয়। ব্যাখ্যার জন্য পরিশিষ্ট 'খ'-এর ৬ নম্বর নোট দ্রষ্টব্য।

ওয়ালাজার দোযখ

মাকিলে পারস্য বাহিনীর বিপর্যয়ের খবর টেসিফোনে অগ্নিশিখার মতো ছড়িয়ে পড়ে। অনুর্বর শূন্য মরুভূমির অধিবাসীদের দ্বারা পারস্য সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বাহিনীটিও পর্যুদস্ত হয়েছে। অথচ এই বাহিনী দুটি কমান্ড করেছিল পারস্য সাম্রাজ্যের দুজন বিখ্যাত জেনারেল যারা ১,০০,০০০ দিরহাম মূল্যের ক্যাপ পরিধান করতো। এই দুজন ছাড়াও আরও দুজন প্রথম সারির জেনাবেল এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। ব্যাপারটি ছিল অবিশ্বাস্য। কেননা এই নতুন শত্রুর কথা পারস্যবাসীদের নিকট ছিল অজ্ঞাত। পরপর দুটি যুদ্ধে সুসজ্জিত বিশাল পারস্য বাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজিত হওয়ার বিষয়টি সবার নিকট স্বপ্নের মতো মনে হয়।

সম্রাট আরদৃশীর আর কোনো সুযোগ দিতে রাজী নন। তিনি আরও দুটি বাহিনী সংগঠনের নির্দেশ দান করেন এবং এ আদেশ ঐ দিনই জারি করা হয় যেদিন মাকিল নদীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পাঠকের মনে এ প্রশ্নের সৃষ্টি হতে পারে যে, যুদ্ধক্ষেত্র হতে ৩০০ মাইল দূরে টেসিফোনে অবস্থানকারী সম্রাট একই দিনে কিভাবে যুদ্ধের ফলাফল জানতে পারলেন। পারস্য সম্রাটের যুদ্ধ আয়োজনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা। যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই উচ্চ কণ্ঠস্বরসম্পন্ন অসংখ্য লোককে নির্দিষ্ট দূরত্বে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করানো হতো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজধানী পর্যন্ত। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যেকটি ঘটনা প্রথম ব্যক্তি চিৎকার করে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জানিয়ে দিতো। তার পর দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তিকে এবং তৃতীয় ব্যক্তি চতুর্থ ব্যক্তিকে। এভাবে একের পর এক ব্যক্তির কণ্ঠ হয়ে সংবাদ অগ্রসর হয়ে যেতো।[২৩৫] এই পদ্ধতিতে সম্রাট স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্রের খবর জানতে পারতেন।

সম্রাটের নির্দেশ পেয়ে পারস্যের যোদ্ধারা রাজধানীতে একত্রিত হতে থাকে। পশ্চিম অঞ্চলে রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় মোতায়েন সৈনিকগণ ছাড়া প্রত্যেকটি শহর ও দুর্গ হতে যোদ্ধাগণ একত্রিত হতে থাকে। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রথম বাহিনী প্রস্তুত হয়ে যায়।

পারসিকগণ অনুমান করে যে, মুসলিম বাহিনী ইউফ্রেটিসের তীর ধরে উত্তর-পশ্চিম ইরাকের দিকে অগ্রসর হবে। এই ধারণা থেকে সম্রাট ওয়ালাজা নামক স্থানে

২৩৫. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৩

খালিদের গতিরোধ করে তাঁর বাহিনীকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (দশ নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য)।[২৩৬]

টেসিফোনে নবগঠিত পারস্য বাহিনীর প্রথমটি ন্যস্ত করা হয় আন্দারজাঘরের কমান্ডে। আন্দারজাঘর ছিল সীমান্তবর্তী প্রদেশ খুরাসানের সামরিক গভর্নর এবং পারসিক ও ইরাকী আরবদের দৃষ্টিতে খুবই খ্যাতিমান যোদ্ধা। পারসিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও সে বেড়ে উঠেছিল ইরাকী আরবদের মাঝে এবং আরবদের সংগে তাঁর খুবই সুসম্পর্ক ছিল।

আন্দারজাঘরকে তার বাহিনী নিয়ে ওয়ালাজা অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দান করা হয় এবং তাকে জানানো হয় যে, শীঘ্রই নবগঠিত দ্বিতীয় বাহিনী তার সংগে যোগদান করবে। সে টেসিফোন থেকে যাত্রা করে টাইগ্রিস নদীর পূর্ব পার ধরে অগ্রসর হয়ে কসকর[২৩৭] নামক স্থানে নদীটি অতিক্রম করে। সে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় এবং ওয়ালাজার নিকটবর্তী হয়ে ইউফ্রেটিস নদীর পার হয়ে ওয়ালাজায় ক্যাম্প স্থাপন করে। রাজধানী থেকে যাত্রার পূর্বে সে তার পরিচিত বিভিন্ন আরব গোত্রের নিকট দূত পাঠিয়ে তার সংগে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানায় এবং যাত্রাপথে হাজার হাজার আরব যোদ্ধা তার পতাকাতলে সমবেত হয়। কারিনের বাহিনীর অবশিষ্ট যোদ্ধাগণও তার সংগে পথে যোগদান করে। ওয়ালাজায় পৌঁছে নিজ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যার আধিক্য দেখে সে খুব উল্লসিত বোধ করে। সে বাহমনের নেতৃত্বে দ্বিতীয় পারসিক বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে যা শীঘ্রই তার সংগে যোগ দেয়ার কথা।

বাহমন ছিল নবগঠিত দ্বিতীয় পারস্য বাহিনীর কমান্ডার। সে ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের সামরিক ব্যক্তিত্বগণের প্রথম কাতারের একজন এবং ১,০০,০০০ দিরহাম জেনারেল। দ্বিতীয় বাহিনী প্রস্তুত হলে সম্রাট তাকে ওয়ালাজা অভিমুখে যাত্রা করে আন্দারজাঘরের সংগে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দেয়। সম্রাট উভয় বাহিনীকে বাহমনের সার্বিক কমান্ডে ন্যস্ত করে এই আশা নিয়ে যে, বিশাল বাহিনীদ্বয়ের যৌথ শক্তি দিয়ে একটি প্রচণ্ড যুদ্ধে মুসলিম শক্তিকে চিরতরে খতম করা সম্ভব হবে।

বাহমন আন্দারজাঘরের পথ পরিত্যাগ করে একটি ভিন্ন পথ ধরে যাত্রা শুরু করে। সে টেসিফোন হতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে দুই নদীর মধ্যবর্তী এলাকা দিয়ে সোজা ওয়ালাজা অভিমুখে যাত্রা করতে থাকে। প্রথম বাহিনী টেসিফোন

---

২৩৬. ওয়ালাজার কোনো চিহ্ন বর্তমান নেই। ইয়াকুতের মতে (চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা -৯৩৯), ওয়ালাজার অবস্থান ছিল কুফা-মক্কা সড়কের পূর্বে এবং এখান হতে হীরা পর্যন্ত ছিল বিস্তীর্ণ জলাভূমি। মুসিলের (পৃষ্ঠা - ২৯৩) বর্ণনা মতে, এর অবস্থান আইন জাহিকের নিকটে এবং ম্যাপে চিহ্নিত আছে আন-উল-মুহারি নামে যা সিনাফিয়ার ৫ মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ওয়ালাজা এলাকাটি তখন উর্বর থাকলেও এখন একদম শূন্য।

২৩৭. এই স্থানটিতে ৮৩ হিজরীতে ওয়াসিত শহরের পত্তন হয়। ওয়াসিতের পূর্ব অংশটিই ছিল কসকর।

ত্যাগের বেশ কয়েকদিন পরে তার বাহিনীর যাত্রা শুরু হয় এবং তার গতিও ছিল অপেক্ষাকৃত ধীর।

মাকিল নদীর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয় ছিল নজিরবিহীন। সামান্য ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে তারা বিশাল পারস্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে বিপুল সম্পদ হস্তগত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই যুদ্ধ খালিদ (রা)-কে কিছু বিষয় ভাববার সুযোগ এনে দেয়। তিনি দুটি যুদ্ধে বিশাল দুই পারস্য বাহিনীকে পরাজিত করা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্যের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন। কাজিমা ও মাকিল নদীর তীরে তিনি যে আকারের বাহিনীকে পরাজিত করেছেন, পারসিকগণ প্রয়োজনবোধে অনুরূপ অনেক বাহিনী মাঠে নামাতে সক্ষম। তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের সম্পদের প্রাচুর্যের কথা চিন্তা করে অভিভূত হয়ে পড়েন।

খালিদ (রা) ছিলেন প্রথম মুসলিম কমান্ডার যিনি আরবের বাইরে ভিন্ন দেশে জয়ের জন্য অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি শুধু একজন সামরিক কমান্ডারই ছিলেন না, বিজিত দেশকে খলীফার পক্ষ থেকে শাসন করার দায়িত্বও ছিল তাঁর উপরে। সাথে এমন কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিল না যার সংগে তিনি সামরিক ও প্রশাসনিক বিষয়াদি নিয়ে পরামর্শ করতে পারেন। তদুপরি তাঁর লোকজনও এখন ক্লান্ত ও শ্রান্ত। তারা অনেক পথ অতিক্রম করেছে। অনেক ক্ষুধা সহ্য করেছে এবং কয়েকগুণ শক্তিশালী শত্রুর সংগে প্রাণপণ লড়াই করেছে। এখন তারা বেশ ক্লান্ত। খালিদ (রা) তাঁর বাহিনীকে কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম দেন।

ইতিমধ্যে খালিদ (রা) একটি দক্ষ গোয়েন্দা বাহিনী সৃষ্টি করেন। এই গোয়েন্দারা ছিল স্থানীয় আরব অধিবাসী, যারা খালিদের ব্যক্তিগত আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি অনুগত হয়েছিল। অপরপক্ষে তারা ছিল পারসিকদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও রূঢ় আচরণে অতিষ্ঠ। তারা মুসলিম বাহিনীর সংগে নিজেদের ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলে এবং পারস্য বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে যাবতীয় খবরা-খবর খালিদ (রা)-কে সরবরাহ করতে থাকে। তারা আন্দারজাঘরের টেসিফোন হতে বিশাল বাহিনী নিয়ে যাত্রা, পথিমধ্যে তার সংগে আরব সেনাদলগুলোর ও কারিনের অবশিষ্ট বাহিনীর যোগদান ও তারা ওয়ালাজা অভিমুখে যাত্রার সব খবর খালিদ (রা)-কে অবহিত করে। তারা খালিদ (রা)-কে আরও জানায় যে, বাহমনের নেতৃত্বে পারস্য সম্রাটের দ্বিতীয় বাহিনী টেসিফোন হতে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে খালিদ (রা) আরো জানতে পারেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে দুই পারস্য বাহিনী একত্রিত হয়ে ইউফ্রেটিসের দক্ষিণে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়াবে অথবা সামনে অগ্রসর হয়ে উবাল্লা এলাকায় তাঁকে আক্রমণ করবে। সেই পারস্য বাহিনীর শক্তি ও সৈন্য-সংখ্যা এত বেশি হবে যে, খালিদ (রা)-এর পক্ষে তা সফলভাবে মুকাবিলা করার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। খালিদের হীরা পৌঁছা দরকার এবং সে ক্ষেত্রে পথে ওয়ালাজার বাধা অতিক্রম করতে হবে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রচুর সংখ্যক পারসিক সৈনিকের পলায়নের বিষয়টিও খালিদ (রা)-কে ভাবিয়ে তোলে। তারা এক যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে পরবর্তী বাহিনীর সংগে যোগ দিয়ে লড়াই করে। কাজিমার পলাতকরা যোগ দিয়েছিল কারিনের বাহিনীতে এবং কারিনের বাহিনীর পলাতক সৈনিকরা এখন যোগ দিয়েছে আন্দারজাঘরের সংগে। পারসিক শক্তিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে হলে এই পলায়নের সুযোগ বন্ধ করতে হবে।

এই দুটিই ছিল এখন খালিদ (রা)-এর সামনে প্রধান সমস্যা। প্রথমটি ছিল সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কৌশলগত, নবগঠিত দুই পারস্য বাহিনী শীঘ্রই একত্রিত হয়ে খালিদের বিরুদ্ধে যৌথভাবে আক্রমণ পরিচালনা করবে। এই সমস্যার তিনি একটি যুৎসই সমাধান বের করেন, আর তা হলো দ্রুত অগ্রসর হয়ে আন্দারজাঘরের বাহিনীকে ধ্বংস করতে হবে বাহমানের বাহিনী তার সংগে যোগদেবার পূর্বেই আর দ্বিতীয় সমস্যাটি ছিল রণকৌশলগত অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য মোতায়েনের কৌশল সংক্রান্ত–কিভাবে প্রতিপক্ষের পরাজিত সৈনিকের পলায়ন রোধ করা যায় যাতে তারা পরবর্তী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারে। এই সমস্যারও তিনি একটি বিজয়োচিত সমাধান বের করেন, যা শুধুমাত্র খালিদ (রা)-এর মতো একজন প্রতিভাবান সেনাপতির পক্ষেই সম্ভব। এই বিষয়টি আমরা পরে আলোচনা করবো।

খালিদ (রা) সুবিদ বিন মুকাররীনকে বিজিত জেলার শাসনকাজ দেখার ও প্রহরী মোতায়েন করে টাইগ্রিস নদীর নিম্নাঞ্চল পাহারা দেয়ার নির্দেশ দান করেন যাতে উত্তর ও পূর্ব দিক হতে নতুন শত্রুর আগমন হলে সংগে সংগে সংবাদ দিতে পারে। প্রায় ১৫,০০০ সৈন্যের বাকি দলটি নিয়ে তিনি বিশাল জলাভূমিটির কিনারা ধরে হীরার দিকে দ্রুত বেগে যাত্রা শুরু করেন।

আন্দারজাঘরকে সুযোগ দিলে সে নিঃসন্দেহে মুসলিম বাহিনীর সংগে চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বাহমনের বাহিনীর পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। কিন্তু তাকে সে সুযোগ দেয়া হয় না। বাহমনের বাহিনীর পৌঁছার সম্ভাব্য তারিখের কয়েকদিন পূর্বেই মুসলিম বাহিনী পূর্ব দিগন্তে উপস্থিত হয়ে ওয়ালাজার অদূরে ক্যাম্প স্থাপন করে। অবশ্য এতে আন্দারজাঘর তেমন একটা চিন্তিত হয় না। তার অধীনে গঠিত এক বিশাল বাহিনী এবং বিজয়ের ব্যাপারে সে ছিল নিশ্চিত। এমনকি সে তার পিছন দিককে সুরক্ষিত করার জন্য বাহিনীকে মাত্র মাইল খানেক পিছিয়ে নদীর তীরে মোতায়েন করার প্রয়োজনও বোধ করেনি। সে ওয়ালাজার যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল।

পরের দিন উভয় বাহিনী স্বীয় অবস্থানে থেকেই একে অপরের প্রতি লক্ষ্য রাখে। কমান্ডার ও অফিসারগণ এলাকাটি সরেজমিনে পরিদর্শন ও আগামী দিনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। পরদিন সকালে উভয় বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে মোতায়েন

হয় সাধারণ ভংগিতে কেন্দ্র ও দুবাহুর বিন্যাসে। এবারেও মুসলিম বাহিনীর বাহুদ্বয়ের কমান্ড ন্যস্ত হয় আসিম বিন আমর ও আদী বিন হাতিমের উপর।

যুদ্ধক্ষেত্রেটি বিস্তৃত ছিল দুটি সমতল চূড়ার মধ্যবর্তী এলাকায়। চূড়া দুটির দূরত্ব ছিল প্রায় দু'মাইল এবং উচ্চতা ছিল ২০ থেকে ৩০ ফুট। যুদ্ধক্ষেত্রটির উত্তর-পূর্ব দিকে অনুরূপ একটি চূড়ার অবস্থান ছিল যা প্রকৃতপক্ষে পূর্বদিকের চূড়াটির বর্ধিত অংশ। আর যুদ্ধক্ষেত্রটির দক্ষিণ অংশ গিয়ে মিলিত হয়েছে ধূসর মরুভূমিতে। উত্তর-পূর্ব দিকের চূড়াটির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ইউফ্রেটিসের একটি শাখা যা খাসীফ নদী নামে পরিচিত। পারস্য বাহিনী পশ্চিম দিকের চূড়াটিকে পিছনে ফেলে উত্তর-পূর্ব দিকের চূড়াটিকে বামে রেখে পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মুখ করে সমতল যুদ্ধক্ষেত্রটির কেন্দ্রে অবস্থান নেয়। খালিদ (রা) পূর্ব দিকের চূড়াটির সামনে পারস্য বাহিনীর মুখোমুখি মুসলিম বাহিনীকে দাড় করান। যুদ্ধক্ষেত্রটির কেন্দ্র ছিল বর্তমানের সিনাকিয়া থেকে ৬ মাইল দক্ষিণে।

আন্দারজাঘর মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যার স্বল্পতা দেখে বিস্মিত হয়ে পড়ে। তার অনুমানে এই সংখ্যা ১০,০০০। অথচ সে যে সব গল্প শুনেছিল তাতে ধারণা ছিল যে, খালিদ (রা)-এর বাহিনীর আকার হবে বিশাল। তার চোখে মুসলিম অশ্বারোহী সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য মনে হয় না। অধিকাংশ সৈন্যই ছিল পদাতিক। সম্ভবত কাজিমা ও মাকিল নদীর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক পারসিক সৈনিকগণ খালিদের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে বাড়িয়ে বলেছিল। আন্দারজাঘর জানত না যে, তার সম্মুখে দণ্ডায়মান মুসলিম সৈনিকগণও কিছুটা বিস্মিত হয়েছিল এই ভেবে যে, তাদের সংখ্যা গতকালের তুলনায় কেন কম মনে হচ্ছিল। অবশ্য এটা নিয়ে তারা তেমন চিন্তিত ছিল না। কেননা আল্লাহর তরবারিই (সেনাপতি খালিদ) সবকিছু ভাল জানেন।

পরিস্থিতি দেখে আন্দারজাঘরের মনোবল আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। সে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে নির্মূল করে অবাধ্য মরুবাসীদের কবল থেকে ইরাকভূমি মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর হয়। সে মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। মুসলিম বাহিনী প্রথমে আক্রমণ করলে সে তাদেরকে কিছুটা শান্ত ও দুর্বল করে তারপর একটি প্রচণ্ড প্রতিআক্রমণের মধ্যদিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করবে।

খালিদ (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে একযোগে আক্রমণ রচনা করলে আন্দারজাঘর আপ্লুত হয়ে ওঠে। কেননা সে এটাই চাচ্ছিল। দুই বাহিনী অত্যন্ত দৃঢ়তা ও বীরত্বের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে। অসীম সাহসী মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সংগে সুসজ্জিত প্রতিপক্ষের উপর আঘাত হানতে থাকে। কিন্তু পারস্য বাহিনীও দৃঢ়তার সংগে প্রতিটি আঘাত ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয। প্রায় ঘন্টাখানেক যুদ্ধের পর উভয় বাহিনী ক্লান্ত বোধ করতে শুরু করে। বিশেষ করে মুসলিমগণ। কেননা তাদের একজনকে কয়েকজন প্রতিপক্ষের সংগে লড়াই করতে হচ্ছিল। তদুপরি পারসিকগণ তাদের রিজার্ভ সৈন্য দিয়ে সম্মুখ সারির ক্লান্ত সৈনিকদেরকে বদল করতো। খালিদ (রা)-এর

দৃষ্টান্তমূলক নেতৃত্ব ও দক্ষতাই মুসলিম বাহিনীর মনোবলকে ধরে রাখতে সহয়তা করেছিল। তিনি সম্মুখ সারিতে অবস্থান নিয়ে বীরবিক্রমে লড়াই করে যাচ্ছিলেন।

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে একজন বিশাল আকৃতির পারসিক যোদ্ধার সংগে খালিদ (রা)-এর দ্বৈত যুদ্ধের বিষয়টি মুসলিম বাহিনীকে চাংগা করে তোলে। লোকটির বিশাল আকৃতি ও বিপুল শক্তির কারণে তাকে বলা হতো হাজার মর্দ অর্থাৎ এটা বিশ্বাস করা হতো যে, সে একাই এক হজার যোদ্ধার কাজ করতে সক্ষম।[২৩৮] এই বিশাল আকৃতির যোদ্ধাটি সামনে অগ্রসর হয়ে চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করলে খালিদ (রা) তা গ্রহণ করেন এবং কয়েক মিনিট যুদ্ধের পর সুযোগ বুঝে তরবারি চালিয়ে তাকে খতম করতে সক্ষম হন। অসাড় দেহটি মাটিতে পড়ে গেলে খালিদ (রা) তার বিশাল বুকের উপর বসে নির্বিঘ্নে তৃপ্তিসহকারে দুপুরের খাবার গ্রহণ করেন।[২৩৯]

যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়টি শুরু হয় পারস্য বাহিনীর প্রতিআক্রমণের মধ্য দিয়ে। আন্দারজাঘর তার অভিজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে মুসলিম যোদ্ধাদের চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ দেখতে পায়। সে এই সময়টিকে প্রতিঘাতের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করে। তার বিবেচনা ছিল যথার্থ। তার নির্দেশে পারস্য বাহিনী একযোগে সামনে অগ্রসর হয়ে মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। মুসলিম বাহিনী এই আঘাত কিছু সময়ের জন্য সহ্য করতে সক্ষম হলেও তাদের স্নায়ু ও অংগ-প্রত্যংগের উপরে অসহনীয় চাপের সৃষ্টি হয়। তারা ধীরে ধীরে পিছু হটতে থাকে, যদিও যুদ্ধের শৃংখলা বজায় রেখে। এতে পারস্য বাহিনীর আঘাতের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। মুসলিমগণ বার বার খালিদ (রা)-এর দিকে তাকাচ্ছিল এই আশায় যে, যুদ্ধ পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন আসে কিনা বা অন্য কোনো সংকেত পাওয়া যায় কিনা যার দ্বারা তারা কিছুটা স্বস্তি বোধ করবে। কিন্তু খালিদ (রা)-এর পক্ষ থেকে তেমন কোনো সংকেত ছিল না। বরং তিনি সিংহের মতো যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন এবং সহযোদ্ধাদের নিকট হতেও তাই আশা করছিলেন এবং তাঁর সৈনিকগণ তাই করে যাচ্ছিল।

সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য পারসিকদেরকে যদিও খুব চড়া মূল্য দিতে হচ্ছিল তবু তারা ছিল সম্ভাব্য বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত। আন্দারজাঘরও ছিল উল্লসিত। বিজয় প্রায় হাতের মুঠোয় এসে গেছে। সে পারস্য সাম্রাজ্যের সামরিক ও সামাজিক মর্যাদার সিঁড়ি বেয়ে সর্বোচ্চ মর্যাদায় এখন পর্যন্ত আসীন হতে পারেনি। এখন সে স্পষ্টতই ১,০০,০০০ দিরহাম মূল্যের ক্যাপ তার সামনে দেখতে পাচ্ছে। মুসলমানগণ বন্য প্রাণীর মতো কোণঠাসা অবস্থায় থেকে জীবন বাজি রেখে বেপরোয়া ভংগিতে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। তারা সকল মানবীয় ধৈর্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে।

---

২৩৮. পারসী ভাষায় হাজার মর্দ শব্দটির অর্থ হচ্ছে হাজার পুরুষ। অসীম শক্তিশালী যোদ্ধাদেরকে হাজার মর্দ বলে অভিহিত করা হতো।

২৩৯. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৬০। আবু ইউসুফ ঃ পৃষ্ঠা -১৪২।

অনেকেই ভাবতে শুরু করে, "আহা! খালিদ যদি শেষ পর্যন্ত তার প্রতিপক্ষ কমান্ডারের সংগে দ্বৈত যুদ্ধে লিপ্ত হতো।" অবস্থা এমন যে, প্রতিপক্ষের আর একটু চাপ বৃদ্ধি পেলেই মুসলিম বাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙে হাজার হাজার টুকরো হয়ে যাবে।

এমন সময় খালিদ (রা) একটি সংকেত প্রদান করেন। কেউ বুঝল না এই সংকেতের অর্থ কি। কিন্তু যাদের জন্য এই সংকেত তারা ঠিকই তৎপর হয়ে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যেই পারস্য বাহিনীর পিছনের পাহাড়ের চূড়ার রেখা বরাবর দুসারি অশ্বারোহীর আবির্ভাব হয়। এক সারি তাদের পশ্চাৎভাগের বাম দিক থেকে ও অন্য সারি ডান দিক থেকে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে মুসলিম অশ্বারোহীগণ পিছন দিক থেকে পারস্য বাহিনীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আরবীয় ঘোড়ার খুরের দাপটে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ওয়ালাজার সমতলভূমি প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

পারস্য বাহিনীর সম্ভাব্য বিজয়ের আনন্দ ভীতিতে রূপান্তরিত হয়। কিছুক্ষণ পূর্বে যারা উল্লাসে ফেটে পড়ছিল—পশ্চাৎদিক হতে মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আর্তচিৎকার করতে থাকে। খালিদ (রা)-এর নেতৃত্বে মূল বাহিনীও নতুন উদ্যম ও শক্তি নিয়ে পারস্য বাহিনীর সম্মুখ সারির উপর আক্রমণ রচনা করে এবং দুবাহু ক্রমান্বয়ে দুদিকে বিস্তৃত হয়ে পারস্য বাহিনীর পিছনে আক্রমণরত দুই অশ্বারোহী দলের সংগে মিলিত হয়। ফলে পারস্য বাহিনী মুসলমানদের দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে ঘেরাও হয়ে যায়। আন্দারজাঘরের বাহিনী একটি ফাঁদের মধ্যে পড়ে যায়, যেখান থেকে পলায়নের কোনো পথ থাকে না।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে সুশৃংখল পারস্য বাহিনী মুহূর্তের মধ্যে বিশৃংখল জনতার রূপ লাভ করে। সন্ত্রস্ত সৈনিক দল পিছনে ফিরলে বর্শা ও তরবারির আঘাতে ভূপাতিত হয় আর সামনে অগ্রসর হলেও তরবারি ও ড্যাগারের আঘাতে ধরাশায়ী হয়। চারদিক থেকে আগত আক্রমণের চাপে তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি এমন হয় যে, স্বীয় অস্ত্র পরিচালনা বা প্রতিপক্ষের আঘাতকে উপেক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় চলাচলের সুযোগও সীমিত হয়ে পড়ে। যারা যুদ্ধ করতে চাচ্ছিল, তারা বুঝতে পারছিল না কার উপরে আঘাত করবে। আর যারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়ন করতে চাচ্ছিল, তারাও বুঝতে পারছিল না কোন্‌দিকে যেতে হবে। এই মরণ ফাঁদ থেকে বের হওয়ার জন্য তারা একে অপরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ও একে অপরের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ওয়ালাজার যুদ্ধক্ষেত্রটি আন্দারজাঘরের বাহিনীর জন্য জাহান্নামে পরিণত হয়।

চারদিক থেকে মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে মানুষের তৈরি বৃত্তটি ইস্পাতের দৃঢ়তা লাভ করে। পারসিকদের অসহায়ত্ব মুসলমানদেরকে আরও মারমুখি করে তোলে এবং তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, এবারে একজন পারসিক বা ইরাকী আরবকেও পালাতে দেবে না। মুসলিমগণ এতে সফলকাম হয়। মাত্র কয়েক হাজার পারসিক সৈন্য প্রাণে রক্ষা পায়। কেননা যুদ্ধের ইতিহাসে এমন ঘটনা পাওয়া

যায় না যে, কোনো বিশাল বাহিনীর প্রতিটি সদস্যই নিহত হয়। তবে সামগ্রিকভাবে আন্দারজাঘরের বাহিনীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। ব্যাপারটি এরূপ ছিল, যেন পারস্য বাহিনীর পায়ের তলদেশে একটি বিরাট গহবরের মুখ খুলে যায় এবং তাদেরকে গিলে ফেলে। হরমুযের ও কারিনের বাহিনী চরমভাবে পরাজয় বরণ করে এবং আন্দারজাঘরের বাহিনী নির্মূল হয়ে যায়। (এই যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের চিত্র ১৩ নম্বর ম্যাপে দেখানো হয়েছে)।

আন্দারজাঘর নিজেও বিস্ময়করভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে সক্ষম হয়। কিন্তু সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মরুভূমির দিকে ছুটতে থাকে এবং প্রাণের ভয়ে ওয়ালাজার জাহান্নাম হতে যতদূর সম্ভব দূরত্ব সৃষ্টির জন্য মরুভূমির গভীরে ঢুকে পড়ে। এই ভাগ্যাহত লোকটি মরুভূমির বুকে পথ হারিয়ে তৃষ্ণায় ছটফট করে প্রাণ ত্যাগ করে।

যুদ্ধের পর খালিদ (রা) তাঁর ক্লান্ত-শ্রান্ত সহযোদ্ধাদের একত্র করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, এই যুদ্ধের কারণে সবার উপর দিয়ে প্রচণ্ড ধকল গেছে। ওয়ালাজার যুদ্ধটি ছিল ইরাকে সংঘটিত তিনটি ভয়ংকর যুদ্ধের মধ্যে ভয়ংকরতম। খালিদ (রা) নিশ্চিত করতে চান যে, একের পর এক যুদ্ধ লড়ার স্মৃতি যেন তাঁর লোকদের মনোবলকে ভোঁতা না করে। কেননা সামনে আরো নতুনতর পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে।

খালিদ (রা) তাঁর লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দান করেন। তিনি সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর তাঁর রহমত কামনা করে ভাষণ শুরু করেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা কি পারস্য ভূমির সম্পদের প্রাচুর্য দেখতে পাও না ? আরবভূমির দারিদ্র্যের কথা কি তোমাদের মনে পড়ে না? তোমরা কি দেখনা ফসল কিভাবে এই ভূমিকে আবৃত করে রেখেছে? আল্লাহর ইচ্ছা না হলে কি আমরা এই সম্পদ-সমৃদ্ধ ভূমিকে পদানত করে খাদ্যের প্রাচুর্যকে আয়ত্তে এনে আমাদের ধূসর মরুভূমির ক্ষুধাকে পরাভূত করতে পারি?[২৪০]

মুসলিম যোদ্ধাগণ খালিদ (রা)-এর সংগে একমত পোষণ করেন।

ওয়ালাজার যুদ্ধের পূর্বের দিন খালিদ (রা) বাসর বিন আবি রহম ও সায়েদ বিন সাররা[২৪১] নামের দুজন অফিসারের উভয়ের কমান্ডে ক্ষীপ্রতার সংগে আঘাত হানতে সক্ষম দ্রুত গতিসম্পন্ন ২০০০ বা তারও কিছু বেশি সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যের একটি দল ন্যস্ত করে নিম্নের নির্দেশগুলো দান করেন ঃ

ক) তারা তাদের বাহিনীকে নিয়ে রাতের আঁধারে পারস্য বাহিনীর ক্যাম্পের দক্ষিণ দিয়ে অনেক দূর ঘুরে অগ্রসর হবে।[২৪২]

---

২৪০. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৫৯।

২৪১. পূর্বোক্ত।

২৪২. প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় এই যাত্রাপথের কোনো সুনির্দিষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু সম্ভাব্য পথ একটিই হতে পারে আর তা'হলো মুসলিম অবস্থানের বামদিক দিয়ে (পারসিকদের অবস্থানের ডান বাহু দিয়ে), কেননা ডান দিকে ওয়ালাজার সমতল ভূমি ও খাসীফ নদীর মধ্যে অনুরূপ একটি বাহিনী চলাচলের যথেষ্ট জায়গা নেই।

ম্যাপ -১৩ : ওয়ালাজার যুদ্ধ
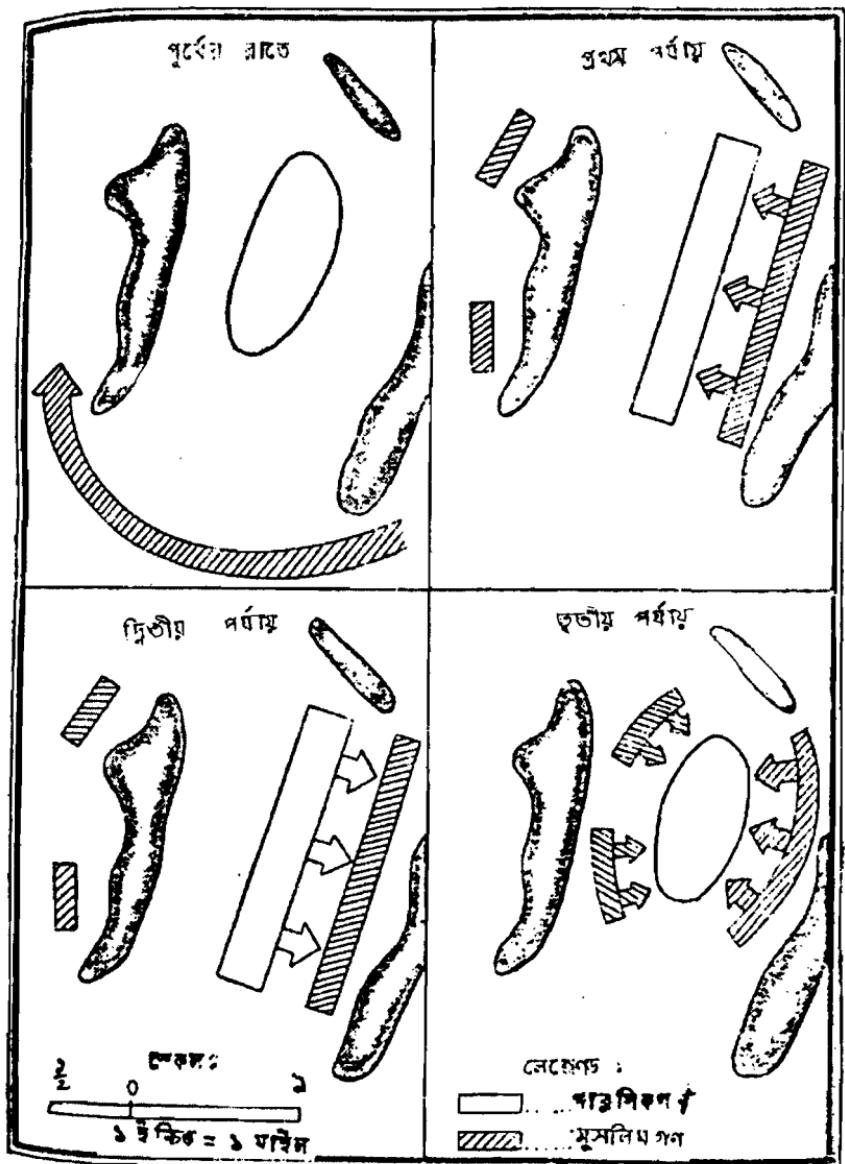
খ) পারসিকদের ক্যাম্পের পিছনের পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে পৌঁছে তারা গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে। তবে তারা স্বল্প সময়ের নোটিশে তৎপর হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

গ) সকাল বেলা যুদ্ধ শুরু হলে তারা যুদ্ধের সাজে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে চূড়ার আকাশ রেখার আড়ালে অপেক্ষা করবে এবং পর্যবেক্ষক নিয়োগ করবে খালিদ (রা)-এর সংকেত গ্রহণের জন্য।

ঘ) খালিদ (রা)-এর পক্ষ থেকে সংকেত পাওয়ার পর উভয় দল পারস্য বাহিনীর পিছন দিক হতে দুই বাহুর উপরে আকস্মিক আঘাত হানবে।

অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেও খালিদ (রা) প্রয়োজনীয় নির্দেশনামা পাঠিয়ে দেন। এই অপারেশনের পরিকল্পনাটি কোনো প্রকার ভুল বুঝাবুঝি ছাড়াই নির্বিঘ্নে বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু পরিকল্পনাটি সম্পর্কে চরম গোপনীয়তা বজায় রাখা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর কাউকে তা জানতে দেয়া হয় না। সকালবেলা মুসলিম বাহিনীর এই নির্ধারিত অশ্বারোহী দলকে আর কোথাও দেখা গেল না এবং খালিদ (রা) বাদবাকি আনুমানিক ১০,০০০ যোদ্ধা নিয়ে বিশাল পারস্য বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন।

এই ছিল ওয়ালাজার যুদ্ধের পরিকল্পনা যা সংঘটিত হয়েছিল ৬৩৩ খৃস্টাব্দের মে মাসের প্রথম দিকে (১২ হিজরীর সফর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে)। এই যুদ্ধে খালিদ (রা) শত্রুকে সম্মুখ আক্রমণের মাধ্যমে ব্যস্ত রেখে (Frontal holding attack) সুযোগ বুঝে পিছন দিক হতে দুই বাহুর উপরে শক্তিশালী সাঁড়াশি আক্রমণ (Envelopment) রচনার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তার এই অপারেশন পরিকল্পনা এতো নিখুঁত ছিল যে, তার প্রতিটি নির্দেশ পুংখানুপুংখরূপে বাস্তবায়িত হয়। খালিদ (রা)-এর মতো একজন অভিজ্ঞ জেনারেলের পক্ষেই শুধু এরূপ নিখুঁত পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব।

সৈন্য পরিচালনার এই চমৎকার কৌশলটি যুদ্ধের ইতিহাসে এর পূর্বেও প্রয়োগ করা হয়েছিল। হানিবল রোমানদের বিরুদ্ধে খৃস্টপূর্ব ২১৬ অব্দের ক্যান্যের (Cannae) যুদ্ধে এই কৌশলটি অবলম্বন করেছিলেন। তারপর হতেই যুদ্ধের ইতিহাসে এই কৌশলটি ক্যান্যে (Battle of Cannae) নামে পরিচিত হয়।

কিন্তু খালিদ (রা) হানিবলের কথা কখনও শুনেননি। এই যুদ্ধের পরিকল্পনাটি ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব[২৪৩]।

---

২৪৩. ওয়ালাজার ও ক্যান্যের যুদ্ধ পরিকল্পনার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। হানিবল তার অশ্বারোহী বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রোমান বাহিনীর দুবাহুর দিকে পাঠিয়ে দেন। তারা ঘুরে প্রতিপক্ষের অবস্থানের পেছনে গিয়ে সুযোগ বুঝে আঘাত হানে। কিন্তু ওয়ালাজার প্রান্তরে যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই মুসলিম বাহিনী বাম দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে প্রতিপক্ষের পেছনে গিয়ে অবস্থান নিয়ে থাকে। যুদ্ধের প্রকৃতি ছিল একইরূপ।

রক্তের নদী

পারসিকদের সংগে তিনটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিজয়ের মধ্য দিয়ে খালিদ (রা) তাঁর লক্ষ্যবস্তু হীরা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন। তা সত্ত্বেও খালিদ (রা) মনে করেন যে, লক্ষ্য অর্জনের পথে অনেক বাধা আছে। এটা অস্বাভাবিক যে, গর্বিত পারস্য বাহিনী সহজেই তাকে পথ ছেড়ে দিবে। এখনও অনেক রক্ত ঝরতে পারে।

খালিদ (রা)-এর দক্ষ রণকৌশল ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ওলালাজার যুদ্ধক্ষেত্র হতে কয়েক হাজার শত্রু সৈন্য পালাতে সক্ষম হয়। তারা ছিল প্রধানত বনী বকর গোত্রের আরব খৃস্টান। মুসান্নার গোত্রের এই লোকগুলো নতুন বিশ্বাসকে গ্রহণ না করে খৃস্টবাদকে আঁকড়ে ছিল। এই গোত্রের অধিকাংশ লোক পারস্য সম্রাটের প্রজা হিসেবে ইরাকে বসবাস করতো। তারা আন্দারজাঘরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওয়ালাজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

এই খৃস্টান আরবগণ ওয়ালাজার যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে খাসীফ নদী পার হয়ে ইউফ্রেটিস ও খাসীফের মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে (খাসীফ ইউফ্রেটিসের একটি শাখা নদী এবং এই দুই নদীর গতিপথের মাঝখানের দূরত্ব তিন মাইল)। এই দলটি ওয়ালাজার ১০ মাইল দূরে উল্লিসে আশ্রয় নেয়। এখানে পৌঁছে তাঁরা কিছুটা নিরাপদ বোধ করে। কেননা উল্লিসের একদিকে ছিল ইউফ্রেটিস এবং অপরদিকে খাসীফ নদী। ইউফ্রেটিস থেকে খাসীফের উৎপত্তি স্থল ছিল উল্লিসের সামান্য উপরে। ফলে শুধু সম্মুখ অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকেই উল্লিস আক্রমণের আশংকা ছিল।[২৪৪]

খালিদ তাঁর পরিশ্রান্ত বাহিনীকে কয়েক দিনের বিশ্রাম দেন এবং নিজে শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন ও সম্মুখ যাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তিনি ধারণা করেন যে, বাহমনের বাহিনীর অস্তিত্ব বর্তমান থাকায় হীরা দখলের পূর্বে আর একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লড়তে হবে। অভিযানের কেন্দ্র এখন টাইগ্রিস হতে ইউফ্রেটিসের পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থানান্তরিত হওয়ায় তিনি টাইগ্রিসের নিম্নাঞ্চল পাহারায় রত মুসলিম দলটিকে তাঁর সংগে যোগদানের নির্দেশ দান করেন।

খালিদ (রা) তাঁর গোয়েন্দা সূত্র থেকে উল্লিসে শত্রুর অবস্থানের কথা জানতে পারেন। কিন্তু ওয়ালাজার যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলাতক এই শত্রু দলটিকে তিনি কোনো সামরিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেন না। তদুপরি তিনি কোনো অবস্থাতেই

---

২৪৪. উল্লিসে যেতে হলে এখনও দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান ধরে অগ্রসর হতে হয় অথবা নৌকার ব্যবহার করতে হয়।

পলাতক শত্রুর পিছনে ধাওয়া করে তার ক্লান্ত-শ্রান্ত বাহিনীকে আরও অধিক পরিশ্রান্ত করতে চান না। কিন্তু যখন দিন-দশেক পরে তিনি উল্লিসে আরও শত্রুর সমাবেশের বিষয়ে জানতে পারেন তখন এটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, তাঁকে শত্রুর আর একটি নতুন বাহিনীর সংগে লড়তে হবে। শত্রুর সমাবেশ এতো বড় আকার ধারণ করে যে, তা একটি প্রচণ্ড যুদ্ধের সম্ভাবনাকে প্রকট করে তুলে। টাইগ্রিসের নিম্নাঞ্চল হতে মুসলিম দলটি যোগদান করার সংগে সংগেই খালিদ ১৮,০০০ সৈন্যের[২৪৫] মুসলিম বাহিনী নিয়ে ওয়ালাজা হতে যাত্রা শুরু করেন। উল্লিস আক্রমণের বিকল্প কোনো পথ না থাকায় তিনি খাসীফ নদী অতিক্রম করে সম্মুখ দিক দিয়েই লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার জন্য অগ্রসর হতে থাকেন।

পর পর তিনটি যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে বিশেষ করে আন্দারজাঘরের বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হওয়ায় পারস্য সাম্রাজ্যের ভীত নড়ে যায়। পারসিকগণ মরুভূমির বুক হতে উত্থিত অপ্রতিরোধ্য এই ইসলামী বাহিনীর মধ্যে কোনো অদৃশ্য শক্তির সংযোগ আছে বলে অনুমান করতে থাকে। যে কোনো শক্তি তাদেরকে বাধা দিতে গেলেই ধ্বংস হয়ে যায়। পারস্য শক্তি মরুবাসীদেরকে সবসময় ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতো। সেই মরুবাসীদের হাতেই পরাজয় স্বীকার করা ছিল তাদের জন্য খুবই বিব্রতকর। পারস্য সাম্রাজ্য তাঁর দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাসে কখনো এরূপ পরাজয়ের সম্মুখীন হয়নি, তাও আবার তাদের চেয়ে কয়েকগুণ ক্ষুদ্র বাহিনীর হাতে এবং স্বীয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর নিকটবর্তী স্থানেই।

এই প্রথমবারের মতো পারসিকগণ আরবদের সম্পর্কে তাদের ধারণা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। তাদের কাছে এটা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয় যে, ইসলামের মধ্যে এমন কিছু আছে যা এই মরুবাসী আরবদের মতো একটি পশ্চাদপদ, বিশৃংখল ও বর্বর জাতিকে শক্তিশালী, সুসংঘবদ্ধ ও সুশৃংখল বিজয়ী শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে। সেই সংগে তাদের নিকট এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, খালিদ (রা)-এর মধ্যেও এমন কিছু একটা আছে যা মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধক্ষমতা বাড়তি শক্তির সংযোগ ঘটিয়েছে। খালিদের নাম বিস্ময় ও ভীতির সংগে পারস্যবাসীদের কানে কানে ঘুরতে থাকে। কিন্তু সুদীর্ঘ ১২ শতাব্দির বিশাল শক্তিধর পারস্য সাম্রাজ্য মাত্র তিনটি যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলেই দুর্বল হয়ে যাওয়ার কথা নয়। পারসিকগণ বিজয়ী জাতি। তারা অতীতেও কখনো কখনো পরাজিত হয়েছে। আবার সহসাই উঠে দাঁড়িয়েছে। ওয়ালাজার দুর্যোগের পর টেসিফোনে যে বিষাদের ছায়া নেমেছিল অল্প সময়ে তা দূরীভূত হয় এবং সেই বিষাদের ছায়া দখল করে একটি মাত্র সংকল্প, আর

---

২৪৫. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৬২। মুসলিম বাহিনীতে নতুন সৈন্য যোগদানের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে নতুন সৈন্যের আগমন বা স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা বিগত যুদ্ধগুলোতে মুসলিম বাহিনীর যে ক্ষতি হয় তা পূরণ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

তাহলো এই আক্রমণকারী বাহিনীকে ধ্বংস করে সেই মরুভূমির বুকে বিতাড়িত করতে হবে যেখান থেকে তারা এসেছে। পারস্য গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে এবং আর এক দফা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।

ইতিমধ্যে বনী বকরের ওয়ালাজা থেকে পলাতক সৈনিকদের প্রতিনিধি টেসিফোনে পৌছে সম্রাটের নিকট গোটা পরিস্থিতি তুলে ধরে। তারা উল্লিস ও হীরার মাঝখানে বসবাসকারী তাদের গোত্রের লোকদের নিকটও সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। তাদের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার আরব খৃস্টান উল্লিসে সমবেত হয়ে খালিদ (রা)-এর বিরুদ্ধে একটি মরণপণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা আবেদন জানায় সম্রাট কি আর একটি বাহিনী প্রেরণ করে তার এই অনুগত প্রজাদেরকে সাহায্য করতে পারেন না ?

সম্রাট সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। সংগে সংগে বাহমনের নিকট সম্রাটের বার্তা পৌছে যায়। ওয়ালাজার দুর্যোগের খবর পেয়েই বাহমন তার অগ্রাভিযানে বিরতি দিয়ে ইউফ্রেটিসের উত্তর পাড়ে অবস্থান করতে থাকে। সম্রাটের নির্দেশ মোতাবেক তাকে বাহিনীসহ উল্লিসে গিয়ে আরব সৈনিকদের সংগে মিলিত হয়ে সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে হীরার পথে খালিদ (রা)-কে বাধা দান করতে হবে।

কিন্তু বাহমন নিজে উল্লিসে যায় না। সে তার পরবর্তী সিনিয়র জেনারেল জাবানকে সম্রাটের নির্দেশ শুনিয়ে তার নেতৃত্বেই পারস্য বাহিনীকে উল্লিসে পাঠিয়ে দেয়। বাহমন জাবানকে আরো বলে, "আমি যোগদান না করা পর্যন্ত সম্ভব হলে যুদ্ধ উপেক্ষা করিও।"[২৪৬]

জাবান বাহিনী নিয়ে যাত্রা করলে বাহমন টেসিফোনে প্রত্যাবর্তন করে। বাহমন কেন রাজধানীতে ফিরেছিল তা জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে, সে সম্রাটের সংগে কতিপয় বিষয়ে পরামর্শ করতে চেয়েছিল। রাজধানীতে পৌছে সে সম্রাটকে অসুস্থ দেখতে পায় এবং অপেক্ষা করতে থাকে।

উল্লিসে পৌছে জাবান আরব খৃস্টানদের এক বিশাল সমাবেশ দেখতে পায়। তারা সমবেত হয়েছে হীরা ও আমগীশিয়া এলাকা হতে। ইতিমধ্যে তারা সবাই উপলব্ধি করেছে যে, খালিদ (রা)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হীরা দখল করা এবং এতে তার সফলতার অর্থ হচ্ছে আরো রক্তপাত ও দাসত্ববরণ। তাই তারা একত্রিত হয়েছে খালিদ (রা)-কে প্রতিহত করার জন্য, এমনকি প্রয়োজন হলে জীবন দিয়েও। জাবান গোটা বাহিনীর সার্বিক কমান্ড গ্রহণ করে। খৃস্টান আরবদের অংশের কমান্ড ন্যস্ত হয় আবদুল আসওয়াদ নামের জনৈক গোত্রপ্রধানের উপর। আসওয়াদের দুই ছেলে ওয়ালাজার যুদ্ধে নিহত হয়েছিল এবং সে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে মরছিল। ইউফ্রেটিস বামে, খাসীফ ডানে ও দুই নদীর সংযোগস্থল পিছনে রেখে পারসিক ও আরবগণ পাশাপাশি অবস্থান গ্রহণ করে।

---

২৪৬. তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৬০।

প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণের মতে এই এলাকায় একটি নদী ছিল যা এই আসন্ন যুদ্ধের শেষ পর্যায়ের ঘটনাপ্রবাহের কারণে বিখ্যাত হয়ে আছে। এই নদীটি হয়তো এক সময়ে একটি নালা ছিল। ইউফ্রেটিস হতে নদীটির উৎপত্তি স্থলের কাছেই উল্লিসের উত্তরে একটি বাঁধ ছিল। বাঁধটি বন্ধ থাকায় যুদ্ধের সময় নদীটি শুকনো ছিল। আমি মনে করি ইতিহাসের এই নদীটিই খাসীফ নদী (যা এখনও একটি বড় আকারের নদী হিসেবে বিদ্যমান)। কেননা উল্লিস এলাকাটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় ঐ এলাকায় অন্য একটি নদী বা নালা সৃষ্টির মতো স্থান নেই। যেহেতু ঐ সময় নদীটি খাসীফ নামে পরিচিত ছিল না, তাই ইতিহাসে শুধু নদী নামেই উল্লেখিত আছে।

জাবান পারস্য বাহিনীসহ উল্লিসে পৌঁছার পূর্বেই মুসান্না তার হালকা অশ্বারোহী বাহিনীসহ সেখানে উপস্থিত হয়ে আরব খৃস্টানদের সম্মুখীন হন। তিনি খালিদ (রা)-কে শত্রুর অবস্থান, সংখ্যা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেন। খালিদ (রা) যাত্রার গতি বাড়িয়ে দেন পারসিক বাহিনী উল্লিসে পৌঁছার পূর্বেই আরব খৃস্টানদেরকে আক্রমণ করার বাসনা নিয়ে। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে জাবান উল্লিসে পৌঁছে যায়, ফলে খালিদের আবার একটি বিশাল শত্রু বাহিনীর মুকাবিলা করতে হয়। এই ক্ষেত্রেও তিনি যতো বেশি সংখ্যক শত্রু নিধনের পরিকল্পনা নেন যাতে পরবর্তী যুদ্ধে কমসংখ্যক শত্রুর মুকাবিলা করতে হয়। তিনি শত্রুকে সংগঠিত ও সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরির পর্যাপ্ত সময় না দিয়ে ঐ দিনেই আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সময়টি ছিল ৬৩৩ খৃস্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি (১২ হিজরীর সফর মাসের শেষার্ধ)।

খালিদ (রা) উল্লিসের নিকটবর্তী হয়ে মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধের বিন্যাসে সজ্জিত করার জন্য সামরিক যাত্রা বিরতি করেন। পূর্বের মতোই এবারেও তিনি আদী বিন হাতিম ও আসিম বিন আমরকে দু'বাহুর কমান্ডার নিযুক্ত করে অভিযান শুরু করেন। এবারে সম্মুখ দিক থেকে আক্রমণ করা ছাড়া শত্রুর দু'বাহুর বা পিছন দিক দিয়ে সৈন্য পরিচালনার আর কোনো বিকল্প উপায় ছিল না। তাই এই যুদ্ধে বিজয় নির্ভরশীল ছিল আক্রমণের গতি ও তীব্রতার উপরে। জাবান আসন্ন আক্রমণ সম্পর্কে জানার পূর্বেই মুসলিম বাহিনী উল্লিসের কাছাকাছি পৌঁছে যায়।

জাবানের নিকট মুসলিম বাহিনীর উপস্থিতির খবর পৌঁছে দুপুর বেলা। পারসিক সৈনিকগণ তখন খাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। অন্য যে কোনো কালের ও যে কোনো জাতির সৈনিকদের মতোই পারসিক সৈনিকগণও গরম খাবার পছন্দ করতো এবং খালি পেটে যুদ্ধ করতে নারাজ। তবে তাদের আরব সহযোগীগণ অবশ্য তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত ছিল।

জাবান তার সৈনিকদের দিকে ও রান্নাঘর হতে সদ্য আনা খাদ্যের প্রতি তাকায়। তারপর যুদ্ধের বিন্যাসে দ্রুত অগ্রসরমান মুসলিম বাহিনীর দিকে তাকায়। পারসিকগণ ছিল সাহসী যোদ্ধা, কিন্তু ঐ মুহূর্তে তারা ছিল বেশ ক্ষুধার্ত। তারা জাবানকে বলে, "আমরা এখন খাবো, তারপর যুদ্ধ করবো।"

"আমার ভয় হয় যে, শত্রু তোমাদেরকে শান্তিতে খেতে দিবে না," জাবান উত্তর দেয়।

পারসিকগণ তাদের কমান্ডারকে অমান্য করে বলে, "না, আমরা খেয়ে যুদ্ধ করবো।" মাটিতে কাপড় বিছিয়ে খাবার পরিবেশন করা হয়। সৈনিকগণ খেতে বসে। তাদের ধারণা ছিল যে, হাতে সময় আছে। অবশ্য ইতিমধ্যে খৃস্টান আরবগণ যুদ্ধের বিন্যাসে দাঁড়িয়ে পড়ে।

পারসিক সৈনিকগণ দু-এক গ্রাস খাবার মুখে দিতে না দিতেই বুঝতে পারে যে, মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ অতি আসন্ন। আর বিলম্ব করলে পূর্ণ উদর কোন কাজে আসবে না বরং তাদেরকে জীবন দিতে হবে। তারা খাবার ছেড়ে দ্রুত উঠে পড়ে। জাবানও যতো দ্রুত সম্ভব তার বাহিনীকে আরব খৃস্টানদের সংগে মোতায়েন করে। আরব খৃস্টান দ্বারা সে তার বাহিনীর দুবাহু গঠন করে এবং এই দুবাহুর কমান্ডার নিয়োগ করে দুই গোত্রপ্রধান আবদুল আসওয়াদ ও আবজারকে। পারসিক সৈনিকগণ অবস্থান নেয় বাহিনীর কেন্দ্রে।

যুদ্ধক্ষেত্রটি বিস্তৃত ছিল উল্লিসের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দুই নদীর মধ্যবর্তী এলাকায়। পারসিক বাহিনীর পিছনে ছিল উল্লিস এবং সামনে মুসলিম বাহিনী। উভয় বাহিনীর উত্তর দিকের বাহুতে ইউফ্রেটিস ও দক্ষিণ দিকের বাহুতে খাসীফ নদীর অবস্থান। যুদ্ধক্ষেত্রের বিস্তৃতি ছিল দুই নদীর মাঝখানে প্রায় ২ মাইল এলাকাব্যাপী।

এই যুদ্ধ ছিল খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। এ যাবত সংঘটিত যুদ্ধগুলোর মধ্যে ওয়ালাজার যুদ্ধ ছিল ভয়ংকরতম। কিন্তু এই যুদ্ধটি ছিল তারচেয়েও ভয়ংকর। এই যুদ্ধটির কথা খালিদ (রা) কখনও ভুলতে পারেননি।

এই যুদ্ধটির সৈন্য পরিচালনা কৌশল ও অন্যান্য পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। এটুকু জানা যায় যে, খালিদ (রা) দ্বৈত যুদ্ধে আরব খৃস্টান কমান্ডার আসওয়াদকে হত্যা করেছিলেন। আরও জানা যায় যে, সম্রাটের বাহিনী বিপুল ক্ষতি স্বীকার করেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়েছিল এবং আরব খৃস্টানগণও একটি মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কেননা এই যুদ্ধে পরাজিত হলে হীরা দখলের পথে খালিদ (রা)-এর সামনে আর কোনো বাধা থাকে না। পারস্য বাহিনী শেষ পর্যন্ত লড়েছিল তাদের শক্তির যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য।

প্রায় ঘন্টা দুয়েক মরণপণ যুদ্ধ চলে। নদীর তীরেই যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ছিল বেশি। এখানেই মুসলিম বাহিনীর হাতে অসংখ্য পারসিক সৈন্য নিহত হয়। এর পরেও ক্লান্ত

ও ক্ষুব্ধ মুসলিম বাহিনী পারসিক ও আরব সৈনিকদের মধ্যে পিছু হটার কোনো লক্ষণ দেখতে পায় না। এই সময় খালিদ (রা) আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে মিনতি জানায় "ওহে আল্লাহ! আমাদেরকে বিজয় দাও। আমি দেখতে চাই কোনো শত্রু জীবিত নেই এবং তাদের রক্তে নদী প্রবাহিত।"[২৪৭]

মুসলিমগণ নতুন উদ্যমে আক্রমণ শুরু করলে মহান আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী করেন। বিকাল শুরুর প্রাক্কালে পারসিক বাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে শুরু করে। তাদের হাজার হাজার সৈন্য নিহত হয়, বিশেষ করে নদীর মধ্যে ও তীরে। শুকনো নদীটির বালুরাশি রক্তে লাল হয়ে যায়।

শত্রুসৈন্য পলায়ন শুরু করলে খালিদ (রা) তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকে তাদের পিছনে ধাওয়া করার নির্দেশ দান করেন। তাঁর হুকুম ছিল, "তাদেরকে হত্যা করো না, জীবিত ধরে আনো।"[২৪৮] নদীর বালুকারাশি রক্তে ভিজে গেলেও খালিদ (রা)-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এখনও রক্ত প্রবাহিত হয়নি।

মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পলাতক শত্রু সৈনিকদের পিছনে ধাওয়া করে। শত্রুগণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় খাসীফ নদী পার হয়ে হীরার দিকে ছুটতে থাকে। মুসলিম অশ্বারোহী দলগুলো তাদেরকে ঘিরে ফেলে অস্ত্রহীন করে ভেড়ার পালের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। প্রত্যেকটি দলকে এনে নদীর মধ্যে অথবা তীরে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয় যাতে তাদের রক্ত নদীর বুকে গড়িয়ে যায়। পলাতক শত্রুকে ধাওয়া করে ধরে এনে হত্যা করার কাজ ঐদিনের বাকি সময়, গোটা রাত, পরের দিন ও তারপরের দিনেরও কিছু সময় ধরে এক নাগাড়ে চলে।[২৪৯] যেসব পলাতক ধরা সম্ভব হয়, তাদের সকলকেই হত্যা করা হয়। তৃতীয় দিবসের কোনো এক সময়ে সর্বশেষ শত্রু সৈন্যকে হত্যা করা হয়।

এই পর্ব শেষ হলে কিছু অফিসার খালিদ (রা)-এর আশেপাশে একত্রিত হন। কাকা খালিদের দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি পৃথিবীর সমস্ত লোককে হত্যা করলেও এই নদীর বুকে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হবে না যতক্ষণ না এর উজানের বাঁধ খুলে দেয়া হয়। নদীর বুকে পানি আসতে দিন, তাহলেই আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা হবে।"[২৫০]

খালিদ (রা) বাঁধ খুলে দেয়ার নির্দেশ দান করেন। বাঁধ খুলে দেয়ার সংগে সংগে নদীর বুকে পানির ধারা প্রবাহিত হয় এবং সেই সংগে প্রবাহিত হয় নদীর বুকে জমে থাকা প্রতিপক্ষের রক্তও। এভাবে নদীটি 'রক্তের' নদী নামে পরিচিত হয়।

---

২৪৭ তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা -৫৬০।

২৪৮ পূর্বোক্ত।

২৪৯ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা - ৫৬১-২।

২৫০ পূর্বোক্ত।

যুদ্ধের দিন সূর্য অস্ত গেলে খালিদ (রা) তাঁর লোকদেরকে নিয়ে পারসিক বাহিনীর পরিত্যক্ত খাবারগুলোর নিকটে যান। মরুবাসী আরবগণ তাদের খাবার আয়োজন দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে।

উল্লিসে যুদ্ধ শেষ। পারস্য বাহিনীর সৈনিকদের পরিবারবর্গসহ অসংখ্য ধনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়। তাবারীর মতে, এই যুদ্ধে ৭০,০০০ পারসিক ও আরব খৃস্টান নিহত হয়।[২৫১] কিন্তু প্রধান সেনাপতি জাবান পালাতে সক্ষম হয়।

পরদিন স্থানীয় অধিবাসীদের সংগে খালিদ (রা) একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী জিয্য়া কর প্রদানের বিনিময়ে মুসলমানগণ তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করবে। এই চুক্তির একটি নতুন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, স্থানীয় অধিবাসিগণ মুসলমানদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করবে এবং তাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে।

রক্তের নদীর এই উপাখ্যানটির বর্ণনাকালে অনেক অতি উৎসাহী ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে অতিরঞ্জিত করে চিত্রিত করেছেন। এ সম্পর্কিত ভুল ধারণার নিরসন হওয়া উচিত। ঐ ঐতিহাসিকগণের মতে নদীর বুকে শুধু রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল এবং নদীর ভাটিতে অবস্থিত একটি ময়দার মিল তিনদিন ধরে এই রক্তের স্রোতেই চলেছিল। উল্লেখ্য যে, এই মিলটি নদীর স্রোতের সাহায্যে চলতো।

এই বর্ণনাটি একটি চমৎকার অসত্য। বালাযুরী তাঁর বর্ণনায় এই মিলটির কোনো উল্লেখ করেননি। তাবারী উল্লিসের যুদ্ধের বর্ণনার শেষ পর্যায়ে একটি সূত্রের উল্লেখ করেছেন, " ---------- শোয়েবের বর্ণনা মতে, সে শুনেছে সায়েফের নিকট হতে, সায়েফ শুনেছে তালহার নিকট হতে এবং তালহা শুনেছে মুগীরার কিট হতে", মুগীরার মতে, নদীর ভাটিতে একটি ময়দার মিল ছিল মিলটি চলতো নদীর পানির স্রোতের সাহায্যে। এই মিলটিতে তিনদিন ধরে মুসলিম বাহিনীর জন্য ময়দা ভাংগা হয়েছিল এবং সেই সময় নদীর পানি ছিল লাল।[২৫২]

তাবারীর বর্ণনায় উল্লেখিত মিলের তথ্যটি সঠিক হলেও তাতে রক্তের সাহায্যে তিনদিন মিল চালানোর কোনো উল্লেখ নেই। এছাড়া আর অন্য কোন বর্ণনায় মিলের উল্লেখ নেই। প্রকৃত ঘটনা হলো, কাকার পরামর্শে উজানের বাঁধ খুলে দিলে পানি প্রবাহিত হয় এবং সে পানি রক্তের সংগে মিশে লাল রং ধারণ করে যা বেশ কিছু সময় ধরে থাকে। কিন্তু শুধু রক্তের সাহায্যে স্রোত সৃষ্টি করে মিল চালানোর জন্য কি পরিমাণ লোক হত্যা করতে হবে তা কি অনুমান করা সম্ভব ? শুধু মানুষের রক্তে তিন

---

২৫১. পূর্বোক্ত।

২৫২. তাবারী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৬২।

দিন ধরে নদীতে স্রোত প্রবাহিত হওয়ার গল্প শুধু আরব্য রজনীতেই পাওয়া যেতে পারে, ইতিহাসে নয়।

আর একটি প্রশ্ন হলো যুদ্ধ বন্দীদেরকে হত্যা করা নিয়ে। সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক শত্রু সেনাকে পিছু ধাওয়া করে হত্যা করা হয়। এটা সব সময়ই ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। এই বিষয়টি নিয়ে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। এই যুদ্ধে খালিদ (রা) প্রতিজ্ঞা করেছিলেন নদীতে রক্তের স্রোত বইয়ে দিবেন। তাঁর এরূপ প্রতিজ্ঞার কারন হলো যুদ্ধক্ষেত্রেই অধিকাংশ শত্রুসৈন্যকে হত্যা করা যাতে তারা পালিয়ে গিয়ে আর একটি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে না পারে। যেমনটি অতীতে হয়েছে। এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য পলাতক শত্রুকে ধাওয়া করার সময় হত্যা না করে বন্দি করে এনে নদীর পারে হত্যা করা হয়। এভাবেই রক্তের নদীর উপাখ্যানটি সৃষ্টি হয়।

রাসূলে আকরাম (সা)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত যুদ্ধগুলোর মধ্যে মুতার যুদ্ধ খালিদের স্মৃতিতে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। এই যুদ্ধে তিনি এক চরম নাজুক মুহূর্তে মুসলিম বাহিনীর কমান্ড হাতে নিয়ে তাদেরকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ হতে রক্ষা করেছিলেন। পারস্য বাহিনীর বিরুদ্ধে ইরাকে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর মধ্যে উল্লিসের যুদ্ধটিও অনুরূপভাবে তাঁর স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে থাকে।

যুদ্ধের সফল সমাপ্তির একদিন পর বন্ধুদের সংগে গল্প প্রসংগে খালিদ (রা) বলেছিলেন, "মৃত্যুর যুদ্ধে আমি নয়টি তরবারি ভেঙেছিলাম। কিন্তু আমি পারস্য বাহিনীর মত শক্তিশালী বাহিনী আর কখনও দেখিনি এবং পারস্য বাহিনীর মধ্যে উল্লিসের বাহিনীর মতো শত্রুর মুকাবিলা আর কখনও করিনি।"[২৫৩]

খালিদ (রা)-এর মতো একজন মহান সমরনায়কের এই উক্তি থেকেই পারস্য বাহিনীর শৌর্যবীর্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। কিন্তু এই সময় পারস্য সম্রাটের দরবারের অবস্থা ছিল ভিন্ন। সম্রাট আর্দশীর মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যাশায়ী এবং তার পক্ষে আল্লাহর তরবারির মুকাবিলায় আর কোনো বাহিনী প্রেরণ সম্ভব নয়। উল্লিসের যুদ্ধক্ষেত্র হতেই ভেসে এসেছিল মহান পারস্য সম্রাট আনুশিরওয়ানের দৌহিত্র সম্রাট আরদশীর-এর জীবনের বিদায় সংগীত।

---

[২৫৩] তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৬৯।

হীরা বিজয়

৬৩৩ খৃস্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ (১২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম দিকে) খালিদ (রা) উল্লিস হতে আমগীশিয়ার পথে যাত্রা শুরু করেন। আমগীশিয়ার অবস্থান উল্লিসের খুব কাছেই। আসলে উল্লিস হচ্ছে আমগীশিয়ার প্রবেশ পথের একটি ছোট শহর।[২৫৪] ফলে ঐদিন সকালেই মুসলিম বাহিনী আমগীশিয়ার শহরে প্রবেশ করে এবং শহরটিকে নীরব দেখতে পায়।

আমগীশিয়া ছিল ইরাকের বড় শহরগুলোর একটি। এই শহরটি আকার, নাগরিকদের অগ্রসরতা, প্রাচুর্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে হীরার প্রতিদ্বন্দ্বী। মুসলিমগণ শহরটিকে অক্ষত অবস্থায় দেখতে পায় এবং দোকানপাট ও বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলোতে সব ধরনের মালামালের প্রচুর সমাহার লক্ষ্য করে। কিন্তু কোথাও জনমানবের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। আমগীশিয়ার মানব সম্পদ উল্লিসের প্রান্তরে ধ্বংস হয়ে গেছে। অবশিষ্ট যারা আছে প্রধানত নারী, শিশু ও বৃদ্ধ খালিদের আগমনের সংবাদ শুনেই জীবনের ভয়ে পার্শ্ববর্তী নিরাপদ এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। খালিদ (রা)-এর নাম উচ্চারণের সংগে সংগেই প্রতিপক্ষের ভেতরে যে ভীতির সঞ্চার হয় তা তার বাহিনীর অপারেশনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

মুসলমানগণ আমগীশিয়ার ধনসম্পদকে গনিমতের মাল হিসেবেই গ্রহণ করে। এই সম্পদের প্রাচুর্য দেখে মরুবাসী সরলপ্রাণ যোদ্ধাগণ বিস্মিত হয়ে পড়ে। মনে করা হয় যে, এই সম্পদের পরিমাণ ইরাকে সংঘটিত বিগত চারটি যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের সমপরিমাণ। প্রথামাফিক এই সম্পদের পাঁচভাগের চারভাগ সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং বাকি একভাগ রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে মদীনায় প্রেরণ করা হয়।

ইতিমধ্যে ইরাক সীমান্ত হতে রাজধানীতে সম্পদ আসার বিষয়টি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকটি বিজয় সংবাদের সংগে সংগে প্রচুর সম্পদও আসতো যা রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডার সমৃদ্ধ ও বিশ্বাসীদের অন্তরকে আপ্লুত করতো। তরপরও খলীফা আমগীশিয়ার হতে আগত সম্পদ দেখে বিমোহিত হয়ে পড়েন। তিনি মুসলমানগণকে মসজিদে ডেকে বলেন, "ওহে কোরেশগণ! তোমাদের সিংহ

---

২৫৪. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৬৩, আমগীশিয়া মানীশিয়া নামেও খ্যাত।

আর এক সিংহকে আক্রমণ করে পরাজিত করেছে। ভবিষ্যতে আর কোনো মায়ের পক্ষেই খালিদের মতো সন্তান জন্মদান সম্ভব হবে না।"[২৫৫]

খলীফার এই বক্তব্যে খালিদ বিন ওয়ালিদের যথার্থ মূল্যায়ন হয়েছে।

হীরার গভর্নর আজাজবেহ খুবই দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে দিনগুলো অতিবাহিত করছিল। সে কাজিমা মাকিল, ওয়ালাজা ও উল্লিসে পারস্য বাহিনীর বিপর্যয়ের কথা শুনেছে এবং তার নিকট এটা পরিষ্কার ছিল যে, মুসলিম বাহিনী হীরাকে লক্ষ্য করেই তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। পারস্যের বিশিষ্ট জেনারেলদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশাল বিশাল বাহিনী খালিদের অগ্রযাত্রার পথে পদদলিত হয়েছে। তার এই ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে মুসলমানদেরকে বাধা দেয়া কি আদৌ সম্ভব হবে ? অসুস্থ সম্রাটের নিকট হতেও কোনো নির্দেশ ছিল না।

আজাজবেহ ছিল হীরার প্রশাসক ও সামরিক কমান্ডার। খ্যাতি ও দক্ষতার বিচারে সেও ছিল ৫০,০০০ দিরহাম মূল্যের ক্যাপ পরিহিত জেনারেল। হীরার আরব খৃস্টান রাজা ইয়ায বিন কুবেসা ছিল নামমাত্রই রাজা। অন্যান্য রাজা, যুবরাজ বা গোত্রপ্রধানদেরও গোত্রীয় ব্যাপারের বাইরে দেশ রক্ষার বা প্রশাসনিক ব্যাপারে করণীয় তেমন কিছু ছিল না। হীরা রক্ষার দায়িত্ব আযাদবেহ্‌র উপরেই বর্তায় এবং পারস্যের সন্তান হিসেবে সে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে।

সে তার বাহিনীকে শহরের বাইরে নিয়ে ক্যাম্প স্থাপন করে। সেখান হতে সে তার পুত্রকে অশ্বারোহী দলসহ সামনে পাঠায় খালিদের অগ্রযাত্রায় বাঁধা দেয়ার জন্য এবং তাকে বলা হয় ইউফ্রেটিসের উপরে বাঁধ দেয়ার জন্য যাতে খালিদ (রা) নদী পথে অগ্রসর হতে না পারে। এই তরুণ অফিসার সামনে অগ্রসর হয়ে হীরার ১২ মাইল ভাটিতে, যেখানে আতীক নদী ইউফ্রেটিসের সংগে মিলিত হয়েছে তাঁর ঘাঁটি স্থাপন করে। সেখান থেকে সে একটি অশ্বারোহী দলকে আমগীশিয়ার প্রায় কাছাকাছি, যেখানে ইউফ্রেটিস হতে বাদকালা নামে আর একটি ক্ষুদ্র নদী বের হয়েছে, পাঠিয়ে দেয়।[২৫৬]

খালিদ (রা) তাঁর অগ্রযাত্রার শেষ লক্ষ্যবস্তু হীরার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। তিনি নদী পথে যাত্রার উদ্দেশ্যে সমস্ত ভারী মালামাল নৌকায় তুলে ফেলেন। মানুষগুলো ঘোড়া ও উটের পিঠে চড়ে নৌকার সারির সংগে সংগে নদীর পার দিয়ে চলতে থাকে। কিছুদূর যেতে না যেতেই নদীর পানি কমতে শুরু করে এবং এক সময় নৌকাগুলো মাটিতে আটকে যায়। আজাজবেহর পুত্র নদীতে বাঁধ দিয়েছে।

---

২৫৫. পূর্বোক্ত।

২৫৬. আতীক নদীটি এখনও আছে। এটি এখনও একটি ক্ষুদ্র নদী। ঐ সময় হয়তো এটি একটি নালা ছিল। বাদকালাও ঐ সময় একটি নালা ছিল (তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৬৩)।

মূল বাহিনী পিছনে রেখে খালিদ (রা) একটি অশ্বারোহী দলকে সাথে নিয়ে দ্রুত হীরার পথ ধরে সামনে অগ্রসর হন। কিছুক্ষণের মধ্যে বাদকালায় পৌঁছেই তিনি আজাজবেহর পুত্রের প্রেরিত অশ্বারোহী দলটিকে দেখতে পান। এই সৈনিকগণ খালিদের সামনে কোনো বাধাই ছিল না। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে তাদের প্রত্যেককে হত্যা করেন। এরপর খালিদ (রা) বাঁধ খুলে দিলে নদীতে পুনরায় পানির স্রোত প্রবাহিত হয় এবং মুসলিম বাহিনী আবার যাত্রা শুরু করে।

আজাজবেহর পুত্র সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত ছিল না। তার ধারণা ছিল যে, সামনে প্রেরিত তার অগ্রবর্তী সৈনিকদল প্রয়োজনের মুহূর্তে সময় মতো সংকেত প্রদান করবে। সে অনেকটা আয়েশ করতে থাকে। এই অবস্থায় খালিদ (রা) তাদের উপড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পারস্য বাহিনীর এই দলটির তরুণ কমান্ডারসহ অধিকাংশ সৈনিক নিহত হয়। শুধু কয়েকজন দ্রুতগামী সৈনিক পালিয়ে আজাজবেহকে এই দুঃসংবাদটি দিতে সক্ষম হয়।

পুত্রের মৃত্যু ও অশ্বারোহী দলটির নিশ্চিহ্ন হওয়ার খবর শুনে আজাজবেহ্ মানসিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময় টেসিফোনের দূত মারফত সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ হীরায় পৌঁছে। পুত্রের মৃত্যুতে ভগ্নহৃদয় আজাজবেহ সম্রাটের মৃত্যু সংবাদে দিশেহারা হয়ে পড়ে। সে তার উপরে ন্যস্ত দায়িত্বকে খুবই কঠিন বলে মনে করে। তাই খালিদের মুকাবিলা করে হীরা রক্ষা করার ধারণা বাদ দিয়ে সে তার বাহিনীসহ ইউফ্রেটিস পার হয়ে টেসিফোনে বাহমনের নিকট উপস্থিত হয়। হীরা মুসলিম বাহিনীর জন্য উন্মুক্ত থাকে।

খালিদ (রা)-এর যাত্রা লক্ষ্যবস্তুর দিকে অব্যাহত থাকে। এটা জানা যায় না যে, মুসলিম বাহিনী কখন নদীপথ ত্যাগ করেছিল। হীরায় প্রচণ্ড বিরোধিতা হবে ভেবে খালিদ (রা) তাঁর বাহিনীকে সম্মুখ দিয়ে অগ্রসর না করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বামদিকে ঘুরে পশ্চিম দিক থেকে খাওয়ারনাক শহরে প্রবেশ করেন। এই শহরটি ছিল হীরা হতে তিন মাইল উত্তর-উত্তর পশ্চিমে। তিনি খাওয়ারনাক হতে পিছন দিক দিয়ে হীরায় প্রবেশ করেন। তিনি বিনাবাধায় শহরে প্রবেশ করেন। হীরার অধিবাসীগণ শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়নি বা খালিদ (রা)-কে বাধা দানের চিন্তাও করেনি। খালিদ (রা)ও তাদেরকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকেন।

অল্প সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি পরিষ্কার হয়ে যায়। হীরা ছিল মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত এবং তারা তা সহজে দখল করে নিতে পারতো। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় চারটি নগরদুর্গ। এই নগরদুর্গগুলোতে মোতায়েন ছিল আরব খৃস্টানদের শক্তিশালী বাহিনী এবং তাদের কমান্ডে ছিল গোত্রপ্রধানগণ। তারা বিনাযুদ্ধে দুর্গগুলো ছেড়ে দিতে রাজী নয়। খালিদ (রা)-কে এই নগরদুর্গগুলো দখল করতে হলে যুদ্ধের মাধ্যমে তা করতে হবে।

প্রত্যেকটি দুর্গের মধ্যে একটি করে প্রাসাদ ছিল যাতে বাস করতো দুর্গের কমাণ্ডার গোত্রপ্রধানগণ। আর দুর্গগুলো পরিচিত ছিল ঐ প্রাসাদগুলোর নামেই। নগরদুর্গগুলো ছিল ঃ শ্বেত প্রাসাদ, কমান্ডার ইয়াস বিন কুবেসা (ইরাকের রাজা); আদাসীন প্রাসাদ, কমাণ্ডার-আদী বিন আদী; বনী মাজিন প্রাসাদ, কমান্ডার-ইবনে আকল; এবং ইবনে বুকায়লা প্রাসাদ, কমান্ডার-আবদুল মসী বিন আমর বিন বুকায়লা।

খালিদ (রা) প্রত্যেকটি নগরদুর্গে তার বাহিনীর একেকটি অংশকে একেকজন জেনারেলের অধীনে প্রেরণ করেন। দুর্গ অবরোধকারী এই জেনারেলগণ হলেন, দুর্গগুলোর উল্লেখিত ক্রমানুযায়ী, জাররার বিন আজওয়ার, জাররার ইবনুল খাত্তাব (উমরের সংগে কোনো আত্মীয়তা নেই), জাররার ইবনুল মুকাররিন এবং মুসান্না। প্রত্যেক জেনারেলকে নির্দেশ দেয়া হয় দুর্গগুলো অবরোধ করে দুর্গবাসীদের প্রতি ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া কর প্রদান অথবা যুদ্ধের পথ বেছে নেয়ার আহ্বান জানানোর। দুর্গবাসীদেরকে এই প্রস্তাব বিবেচনার জন্য একদিন সময় দানেরও নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দেশ অনুযায়ী জেনারেলগণ দুর্গগুলো অবরোধ করে অধিবাসীদের প্রতি চরম বার্তা জারি করে দেন। পরদিন আরব খৃস্টানগণ মুসলমানদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে সহিংসতা শুরু হয়ে যায়।

জারার বিন আজওয়ার প্রথম শ্বেত প্রাসাদ আক্রমণ করেন। আরব খৃস্টানগণ যুদ্ধের বিন্যাসে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের প্রতি তীর ও গুলতি ব্যবহার করতে থাকে। জাররার একদল নির্বাচিত তীরন্দাজকে সামনে অগ্রসর হয়ে একযোগে গুলতি ব্যবহারকারীদের উপর আক্রমণ করার নির্দেশ দান করেন। এই আক্রমণে গুলতি ব্যবহারকারী প্রত্যেকটি আরব খৃস্টান নিহত হয়। সেই সংগে নিহত হয় অনেক শত্রু তীরন্দাজও। শত্রুর বাকি যোদ্ধাগণ দ্রুত যুদ্ধের বিন্যাস থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে।

একই ধরনের সংঘর্ষ অন্য দুর্গগুলোতেও চলতে থাকে। শীঘ্রই দুর্গবাসীদের পক্ষ থেকে চুক্তির প্রস্তাব আসে। তারা সরাসরি খালিদ (রা)-এর সংগে কথা বলার জন্য তাদের প্রতিনিধি মনোনীত করতে রাজী হয়। তাদের মনোনীত ব্যক্তিটি ছিল ইবনে বুকায়লা প্রাসাদের কমান্ডার আবদুল মসী বিন আমর বিন বুকায়লা।

আবদুল মসী তার দুর্গ হতে বের হয়ে মুসলমানদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সে ছিল অত্যন্ত বৃদ্ধ, তাই ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। বয়সের কারণে "তার ভুরু চোখের উপরে ঝুলে পড়েছিল।"[২৫৭]

আবদুল মসী ছিল সে সময়ের ইরাকের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সে ছিল একজন যুবরাজ। সমকালের সবচেয়ে বিজ্ঞ ও বয়স্ক লোক হিসেবে সে পারস্য সম্রাটের

২৫৭. আবু ইউসুফ ঃ পৃষ্ঠা - ১৪৩।

দরবারে ও ইরাকে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। ইরাকীদের যাবতীয় ব্যাপারে তার ছিল বিশেষ ভূমিকা। চমৎকার উপস্থিত বুদ্ধি ও রসবোধের জন্য তার খ্যাতি ছিল অপরিসীম। সম্রাট আনুশীরওয়ানের জীবন সায়াহ্নে তার সংগে সাক্ষাৎ করে সে মন্তব্য করেছিল যে, তার মৃত্যুর পর পারস্য সাম্রাজ্যে ধ্বংস শুরু হবে।

বিজ্ঞ বৃদ্ধ ব্যক্তিটি ধীরে ধীরে খালিদ (রা)-এর সামনে উপস্থিত হন। তারপর শুরু হয় একটি ব্যতিক্রমধর্মী কথোপকথন।

"তোমার জীবনের উপর দিয়ে কতটি বছর গড়িয়ে গেছে ? " খালিদ প্রশ্ন করেন।

"দুশ বছর" - আবদুল মসীর উত্তর।

"এই দীর্ঘ জীবনে তোমার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা কি ?"

"আমি দেখেছি একজন নারী এক খণ্ড রুটি হাতে নিরাপদে দামেস্কের দিকে যাত্রা করতো।"

আবদুল মসী সম্রাট আনুশীরওয়নের শাসন কালের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ও জন-জীবনের নিরাপত্তার প্রতি খালিদের সৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। খালিদ (রা) কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেন। তিনি বলেন, "তুমি কি তোমার এ দীর্ঘ জীবনে শুধু বার্ধক্য ছাড়া আর কিছুই অর্জন করনি ? আমি শুনেছিলাম যে, হীরার লোকজন ধূর্ত ও চালাক। কিন্তু তারা এমন একজন লোককে আমার নিকট পাঠিয়েছে যে, তার নিজের উৎপত্তি সম্পর্কেই ধারণা রাখে না।"

"ওহে কমান্ডার! বিজ্ঞ লোকটি প্রতিবাদ করে বলেন, "আমি যথার্থই জানি আমার উৎপত্তি কোথা থেকে।"

"কোথা থেকে তোমার উৎপত্তি ?"

"আমার পিতার শিরদাড়া থেকে।"

"কোথা থেকে তোমার উৎপত্তি ?" খালিদ আবার জিজ্ঞেস করেন।

"আমার মায়ের গর্ভ হতে।"

"তুমি এখন যাচ্ছ কোথায় ?"

"সামনের দিকে।"

"তোমার সামনে কি ?"

"সমাপ্তি।"

"তোমার দুর্ভাগ্য! খালিদ (রা) বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলেন। তুমি কোথায় দাড়িয়ে আছো ?"

"মাটির উপরে।"

"তোমার দুর্ভাগ্য! তুমি কি অবস্থায় আছো ?"

"আমি কাপড় পরে আছি।"

"খালিদের ধৈর্যচ্যুতির উপক্রম হয়। তবুও তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আমা কথা বুঝতে পারো।"

"হ্যাঁ।"

"আমি তোমাকে মাত্র কয়েকটি প্রশ্ন করবো।"

"এবং আমি শুধু তার জবাব দিতে চাই।"

এই কথোপকথনে বিরক্ত হয়ে খালিদ (রা) বিড়বিড় করে বলেন, এই পৃথিবীতে নির্বোধদের জায়গা নেই, আবার বুদ্ধিমান লোকেরা পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে। আমি মনে করি যে, তোমার লোকেরা তোমাকে আমার চেয়ে বেশি জানে।"
ওহে কমান্ডার! আবদুল মসী বিনয় সহকারে জবাব দেন উট নয় বরং পিঁপড়াই জানে তার গর্তে কি আছে।

এই উত্তরটি খালিদের মধ্যে হঠাৎ একটি উপলব্ধির সৃষ্টি করে। তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি একজন অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের সংগে কথা বলছেন। তার প্রতিটি উত্তর যথার্থ এবং পরিবেশনা অর্থপূর্ণ ও কৌতুকময়। খালিদের কণ্ঠ কিছুটা নরম হয়ে আসে। তিনি বলেন, "তোমার স্মরণীয় কিছু আমাকে বলো।"

আবদুল মসীর দৃষ্টি কিছুটা উদাস হয়ে যায়। তিনি কিছুক্ষণের জন্য নগরদুর্গের টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, আমার মনে আছে, এমন এক সময় ছিল, যখন চীন থেকে জাহাজ এসে এই নগরদুর্গের পিছনে ভিড়তো। তিনি আবার সম্রাট আনুশীরওয়ানের সোনালি যুগে ফিরে যান।

এতক্ষণ ধরে ভূমিকা চললো। খালিদ (রা) এবারে কাজের কথায় আসেন। তিনি বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করলে তুমি মুসলমান হবে। তাহলে আমরা যেভাবে লাভবান হচ্ছি তুমিও সেভাবেই লাভবান হবে। আর যদি তা না করো তাহলে জিযিয়া কর প্রদান করতে হবে। আর যদি তাও না করো তাহলে আমি এমন একদল লোককে ডাকবো যারা মৃত্যুকে আঁকড়ে ধরতে চায় ঐভাবে যেভাবে তোমরা জীবনকে ধরে আছো।"

"তোমাদের সংগে যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই। তবে আমরা এই মুহূর্তে আমাদের বিশ্বাস ত্যাগ করছি না। আমি জিযিয়া প্রদানে রাজী আছি।"

কথোপকথন শেষ। চুক্তিপত্রও তৈরি হয়ে যায়। খালিদ (রা) বিজ্ঞ লোকটিকে বিদায় করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে লক্ষ্য করেন, তার পিছনে দণ্ডায়মান ভৃত্যটির বেল্টের সংগে একটি ক্ষুদ্র থলে ঝুলে আছে। খালিদ (রা) কাছে গিয়ে থলেটি হাতে নিয়ে তালুর উপরে ঢেলে জিজ্ঞেস করেন, "এগুলো কি?"

"এগুলো এক ধরনের বিষ যা তাৎক্ষণিকভাবে কাজ করে।"
কিন্তু সংগে বিষ কেন ?

আমার ভয় ছিল যে, এই আলোচনা যেভাবে সমাপ্ত হলো তা না হয়ে, অন্য রকম হতে পারতো। সে ক্ষেত্রে আমি স্বচক্ষে আমার লোকজন ও জন্মভূমির দুর্দশা দেখার চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করতাম।"[২৫৮]

এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ৬৩৩ খৃস্টাব্দের মে মাসের শেষের দিকে (১২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে)। চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে নগরদুর্গের গেট খুলে যায়। হীরায় শান্তি ফিরে আসে। খলীফার দেয়া লক্ষ্য অর্জন করতে খালিদ (রা)-কে চারটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও বেশ কিছু সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি সকলকে সাথে নিয়ে আট রাকাত শোকরিয়া নামায আদায় করেন।

স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী হীরার অধিবাসীগণ ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রতি বছর ১,৯০,০০০ দিরহাম জিযিয়া প্রদান করবে। এই চুক্তির আরো কিছু শর্ত ছিল। যেমন, হীরাবাসী মুসলিম বাহিনীকে ঘোড়ার পিঠের একটি জিন দেবে (মুসলমানদের একটি জিনের ঘাটতি ছিল), হীরার লোকেরা মুসলমানদের পক্ষে গুপ্তচরের ও পথপ্রদর্শকের কাজ করবে এবং সেই সংগে ছিল জনৈক রাজকুমারীকে নিয়ে একটি শর্ত।

একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু অনুসারী নিয়ে গল্প করছিলেন। কথা প্রসংগে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর কথা উঠলে তিনি মন্তব্য করেন যে, মুসলমানগণ শীঘ্রই হীরা জয় করবে। একথা শুনে শুবিল[২৫৯] নামের একজন সরলপ্রাণ ব্যক্তি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞেস করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা হীরা জয় করলে আমি কি কিরামা বিনতে আবদুল মসীকে পাবো ?"

আবদুল মসীর কন্যা কিরামা ছিল একজন রাজকুমারী। আরবের লোকেরা তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা বলে জানতো। রাসূল (সা) হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, সে তোমারই হবে।"[২৬০]

হীরা এখন মুসলমানদের দখলে। আবদুল মসীর সংগে খালিদ (রা)-এর কথোপকথন ও সম্ভাব্য চুক্তি স্বাক্ষরের কথা শুনে শুবিল আল্লাহর তরবারির সংগে সাক্ষাৎ করে বলে, "ওহে কমান্ডার! হীরা আত্মসমর্পণ করলে আমি কি কিরামা বিনতে আবদুল মসীকে পাবো ? আল্লাহর রসূল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সে আমার হবে।"

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ থেকে এরূপ একটি কথা বিশ্বাস করতে খালিদের কষ্ট হচ্ছিল। তিনি বললেন, "এ ব্যাপারে কি তোমার কোনো সাক্ষী আছে ?"

"হ্যাঁ, আল্লাহর কসম।" এই বলে শুবিল সাক্ষী এনে হাজির করে। সাক্ষীদের বক্তব্য শুনে শুবিলের দাবির ব্যাপারে খালিদ (রা)-এর মনে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। খালিদ (রা) আত্মসমর্পণের দলিলে এই শর্তটি যোগ করেন। কিরামা বিনতে আবদুল মসীহকে শুবিলের নিকট দেয়া হবে।

---

২৫৮. এই কথোপকথন নেয়া হয়েছে বালাযুরী (পৃষ্ঠা - ২৪৪ ও তাবারী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৬৪-৬) থেকে।
২৫৯. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৬৯। বালাযুরীর মতে এই ব্যক্তিটির নাম খুরাইস বিন আউস (পৃষ্ঠা - ২৪৫)।
২৬০. পূর্বোক্ত।

এই খবর শুনে আবদুল মসীর প্রাসাদের মহিলাগণ বিলাপ শুরু করে। একজন রাজকুমারী যে রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য ও সুন্দর মনোরম পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করেছে তাকে কিভাবে একজন অমার্জিত মরুবাসীর হাতে তুলে দেয়া যায়। ব্যাপারটি আরো হাস্যকর হয় এজন্য যে, কিরামা ছিল একজন ৮০ বছরের বৃদ্ধা। একসময় সে অবশ্যই ছিল সমকালের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা কিন্তু সেতো অনেক দিন পূর্বের কথা। রাজকুমারী নিজেই এই সমস্যার সমাধান করে সে বলে, "আমাকে তার কাছে নেয়া হোক। সেই বোকা লোকটি হয়তো আমার অতীতের সৌন্দর্যের কথা শুনেছে এবং ভেবেছে সৌন্দর্যের ক্ষয় নেই।"[২৬১] কিরামা একজন দাসীকে নিয়ে ইবনে বুকায়লা প্রাসাদ ত্যাগ করে। শুবিল অধীর আগ্রহে তার পুরস্কারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কিরামা তার সামনে হাজির হয়। বেচারা শুবিল তাঁর কাঙ্ক্ষিত রমণীর দিকে এক নজর তাকিয়ে শোকে-দুঃখে নির্বাক হয়ে যায়।

রাজকুমারী বিব্রতকর নীরবতা ভেঙে বলে, "একজন বৃদ্ধা মহিলাকে দিয়ে তুমি কি করবে। আমাকে যেতে দাও।"

শুবিল মুক্তিপণ আদায়ের একটি সুযোগ দেখতে পায়। সে বলে, "না, আগে আমার শর্ত পূরণ করতে হবে।"

"কি তোমার শর্ত? তুমি কত মুক্তিপণ চাও।"

"এক হাজার দিরহামের কমে যদি আমি তোমাকে ছেড়ে দেই তাহলে আমি শুবিলের মায়ের পুত্র নই।"

ধূর্ত মহিলা ভান করে বিস্ময় প্রকাশ করে, "এক হাজার দিরহাম ? এক দিরহামও কম নয় ?"

"হ্যাঁ, এক দিরহামও কম নয়।"

রাজকুমারী দ্রুত এক হাজার দিরহাম শুবিলের হাতে দিয়ে প্রাসাদে ফিরে যায়।

শুবিল তার সহযোদ্ধাদের নিকট ফিরে খুব গর্বভরে এই গল্পটি বলে। সবকিছু শুনে তার বন্ধুরা হাসিতে ফেটে পড়ে। তারা বলে, "তুমি চাইলে আরো অনেক বেশি দিরহাম পেতে পারতে।"

এই মন্তব্যে হতভম্ব হয়ে সরলপ্রাণ সৈনিকটি বলে, "আমি জানতাম না যে হাজারের চেয়ে বড় কোনো সংখ্যা আছে।"

এই গল্প শুনে খালিদ (রা)ও প্রাণ খুলে হাসেন। তিনি ভাবেন, "মানুষ চায় একটা আর আল্লাহ চান আর একটা।"[২৬২]

---

২৬১. পূর্বোক্ত।
২৬২ তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৬৯। বালাযুরী, পৃষ্ঠা -২৪৫।

হীরা হস্তগত হওয়ার পর খালিদ (রা) ইরাকের অন্যান্য এলাকার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তিনি আশেপাশের জেলাগুলো থেকে শুরু করেন এবং শহরের মেয়র ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট পত্র লিখে স্পষ্টভাবে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব রাখেন। ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া প্রদান অথবা তরবারির মুকাবিলা। হীরার আশেপাশের শহরগুলো সহজেই আত্মসমর্পণ করে। তাদের মেয়র অথবা গোত্রপ্রধানদের সংগে জিযিয়া করের হার নির্ধারণ করে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং বিনিময়ে অধিবাসীগণ মুসলমানদের নিকট হতে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ করে।

ইতিমধ্যে পারস্যের দরবারের অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপের দিকে যেতে থাকে। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নির্বাচন নিয়ে পারসিকদের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। অবশ্য খালিদের বিরোধিতা করার ব্যাপারে তারা ছিল ঐক্যবদ্ধ। সম্রাটের দরবারের এই বিশৃংখল অবস্থার মধ্যে বাহমন কমান্ডার ইন চীফের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বাহমন টেসিফোনের উপর মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে একটি আঘাতের আশংকা করতে থাকে। তাই সে টেসিফোনকে রক্ষা করাই তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তটি ছিল অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। কেননা টাইগ্রিসের পশ্চিমাঞ্চলের এলাকার উপরে পারসিকদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই এলাকায় ঘোড়ার ছিল অবাধ বিচরণ। খালিদ (রা) জানতেন যে, পারসিকদের চারটি প্রধান বাহিনী ধ্বংস হওয়ার পর টেসিফোনের পক্ষ থেকে আর কোনো হুমকি আসার আশংকা নেই। তাই তিনি সেন্ট্রাল ইরাকে গোটা শক্তি নিয়োগ করেন। হীরাকে অপারেশনের ঘাঁটি করে তিনি তার অশ্বারোহী বাহিনীকে ইউফ্রেটিসের ওপারে পাঠিয়ে দেন। তার অশ্বারোহী বাহিনী সেন্ট্রাল ইরাকের টাইগ্রিস পর্যন্ত পৌঁছে যায়, পথে যারা বাধা প্রদান করে তাদেরকে খতম করে এবং যারা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয় তাদের সংগে শান্তি স্থাপন করে। এই দ্রুতগামী বাহিনীগুলোর নেতৃত্ব দেন জারার বিন আজওয়ার। কাকা ও মুসান্নার মতো দুর্ধর্ষ জেনারেলগণ ৬৩৩ খৃস্টাব্দের জুন মাসের শেষ নাগাদ (১২ হিজরীর রবিউল আখির মাসের মাঝামাঝি সময়ে) দুই নদীর মধ্যবর্তী গোটা এলাকা খালিদ (রা)-এর অধীনে চলে আসে। তার রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্বকে মুকাবিলা করার কোনো শক্তি অবশিষ্ট থাকে না।

সামরিক বিজয় সম্পন্ন হওয়ার পর খালিদ (রা) বিজিত এলাকার প্রশাসনিক বিষয়াদি সংগঠিত করেন। জিযিয়া আদায়ের ব্যাপারটি তদারকির জন্য তিনি বিভিন্ন জেলায় অফিসার নিয়োগ করেন। স্থানীয় অধিবাসীগণ পারসিকদের সম্পর্কে তথ্য

সরবরাহ করে এবং মুসলিম ইউনিটসমূহের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। খালিদ (রা) টেসিফোনে দুটি পত্র প্রেরণ করেন যার একটি সম্রাটের দরবার সম্বোধন করে এবং অন্যটি জনগণের উদ্দেশ্যে। দরবারের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রে লিখলেন ঃ

"পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। খালিদ বিন ওয়ালীদের পক্ষ হতে পারস্যের রাজন্যবর্গের প্রতি। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাদের পদ্ধতিকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তা না হলে হয়তো তোমাদেরকে আরও খারাপ পরিণতির মুকাবিলা করতে হতো।

"আমাদের অনুসৃত পথকে অনুসরণ করো, আমরা তোমাদেরকে শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ দেবো। নতুবা তোমরা এমন এক দল লোকের অধীনে শাসিত হবে যারা মৃত্যুকে অনুরূপ ভালবাসে, যেমন জীবনকে তোমরা ভালবাস।"[২৬৩]

জনগণের উদ্দেশে লিখিত পত্রের ভাষাও ছিল অনুরূপ। এই পত্রে জিযিয়া প্রদানের বিনিময়ে জনগণকে মুসলমানদের পক্ষ হতে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। পত্র দুটি হীরার স্থানীয় আরবদের দ্বারা টেসিফোনে প্রেরণ করা হয়। এই পত্রের কোনো জবাব আসেনি।

---

২৬৩. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৭২।

আনবার এবং আইন-উত-তামর

ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের মধ্যবর্তী ও টেসিফোনের নিম্নাঞ্চলের গোটা এলাকা মুসলিম নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। পারস্য বাহিনীর কোনো তৎপরতা দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় খালিদ (রা) নিশ্চিত হন যে, টেসিফোন তার অগ্রযাত্রার পথে আর বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। এবারে খালিদ (রা) উত্তরের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন। আনবার ও আইন-উত-তামর নামক দুটি এলাকা হতে কিছুটা প্রতিবন্ধকতা আসার আশংকা ছিল। এই এলাকা দুটিতে পারস্য সম্রাটের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যোদ্ধা তাদের আরব সহযোগীসহ দুর্গে অবস্থান নিয়ে আছে। উভয় দুর্গের কমান্ডে ছিল পারস্য বাহিনীর অফিসারগণ। তারা মুসলিম বাহিনীকে বাধা দানে বদ্ধপরিকর। (দশ নম্বর ম্যাপ দ্রঃ)।

খালিদ (রা) প্রথম আনবারে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আনবার দুর্গ পরিবেষ্টিত একটি পুরাতন শহর এবং সিরিয়া ও পারস্য হতে আগত ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যকেন্দ্র। এই শহরটি তার অফুরন্ত শস্যভাণ্ডারের জন্যও ছিল বিখ্যাত। ৬৩৩ খৃস্টাব্দের মধ্য জুনে (১২ হিজরীর মধ্য রবিউল আখির) খালিদ (রা) তার অর্ধেক সৈন্যসহ (প্রায় ৯,০০০) আনবারের উদ্দেশে যাত্রা করেন। বাকি সৈন্যদেরকে হীরা ও মধ্য ইরাকের বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন রাখেন। ইউফ্রেটিসের পশ্চিম তীর ধরে অগ্রসর হয়ে আনবারের কাছাকছি এলাকায় পৌছে তিনি নদী অতিক্রম করেন। টেসিফোনের দিক হতে কোনো বাধা আসে কিনা তা লক্ষ্য করার জন্য খালিদ (রা) পূর্বদিকে স্কাউট প্রেরণ করেন এবং নিজে স্থলবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে আনবার শহর অবরোধ করেন। মুসলিম বাহিনী লক্ষ্য করে যে, শহরটি শুধু দুর্গের দেয়াল দ্বারাই সুরক্ষিত নয় বরং একটি পানিভর্তি প্রশস্ত পরিখাও শহর আক্রমণকারীদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুর্গের দেয়াল হতে পরিখাটি তীর নিক্ষেপের দূরত্বের মধ্যে বিস্তৃত যাতে পরিখা অতিক্রমের কোনো প্রচেষ্টাকে সহজেই নস্যাৎ করা যায়। অপরপক্ষে মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর পেয়েই দুর্গবাসী পরিখার উপরের সেতুগুলো ধ্বংস করে ফেলে।[২৬৪]

---

২৬৪. বর্তমান ফালুজার ৩ মাইল উত্তর পশ্চিম দিকে ইউফ্রেটিসের ১ মাইল দূরে কিছু প্রতিরক্ষা টিলা ব্যতীত আনবারে কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। ইয়াকুতের মতে (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৩৬৭) পারসিকগণ এই শহরটিকে ফিরোযসাবুর বলে ডাকে।

সাবাত জেলার প্রধান শহর আনবার। শহরটি অবস্থিত টেসিফোনের পশ্চিমে দু'নদীর মধ্যবর্তী স্থানে। সাবাতের গভর্নর শীরযাদ আনবারে বসবাস করতো। শীরযাদ সামরিক দক্ষতার চেয়ে বিদ্যা-বুদ্ধির দিক থেকে ছিল অধিক পরিচিত। শীরযাদকে এখন মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা করতে হবে তার অধীনে ন্যস্ত পারসিক সৈন্য ও তাদের সহযোগী আরব যোদ্ধাদেরকে নিয়ে। সহযোগী আরব খৃস্টানদের উপরে তার আস্থা ছিল খুবই সামান্য।

আনবারে পৌছার পরদিন খালিদ (রা) দুর্গটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা করার লক্ষ্যে অগ্রসর হন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, দুর্গের প্রশস্ত দেয়ালের উপরে হাজার হাজার পারসিক ও সহযোগী আরব সৈনিক এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন তারা তামাশা দেখছে। এই দৃশ্যে বিস্মিত হয়ে খালিদ (রা) মন্তব্য করেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি যে, এরা যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুই জানে না।"[২৬৫]

তিনি এই সুযোগটির সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে দ্রুত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং তাঁর বাহিনী থেকে ১০০০ উত্তম তীরন্দাজকে নির্বাচিত করে তা ব্যাখ্যা করেন। তীরন্দাজগণ উদ্দেশ্যহীন ভংগিতে হাঁটতে হাঁটতে পরিখার তীরে যাবে। তাদের হাতে ধনুক থাকবে তবে তীর থাকবে আলাদা। খালিদের নির্দেশে তারা ধনুকে দ্রুত তীর সংযোগ করে একটার পর একটা নিক্ষেপ করবে। সবশেষে তিনি নির্দেশ দিলেন, তীরের নিশানা হবে "প্রতিপক্ষের চোখ এবং চোখ ছাড়া আর কিছুই নয়।"[২৬৬]

মুসলিম তীরন্দাজ দলটি পরিখার দিকে অগ্রসর হতে থাকলে দুর্গের দেয়ালে দণ্ডায়মান প্রতিপক্ষের সৈনিকগণ হা-করে তাকিয়ে থাকে কি ঘটে তা দেখার জন্য। তীরন্দাজগণ পরিখার পারে পৌছার সংগে সংগে খালিদ (রা)-এর নির্দেশে মুহূর্তের মধ্যেই পরপর কয়েক হাজার তীর ছুটে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিপক্ষের হাজার খানেক চোখ নষ্ট হয়ে যায়। দুর্গের ভেতরে কলরব পড়ে যায় যে, "আনবারের লোকদের চোখ শেষ।" এই ঘটনার কারণে আনবারের যুদ্ধ চোখের যুদ্ধ নামেও খ্যাত।[২৬৭]

এই দুঃসংবাদে ভগ্নহৃদয় শীরযাদ খালিদের নিকট শর্তসাপেক্ষে সন্ধির প্রস্তাবসহ দূত প্রেরণ করে। খালিদ (রা) প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জানিয়ে দেন যে, সন্ধি হতে হবে শর্তহীন। শীরযাদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

খালিদ (রা)-এর জন্য এই দুর্গ দখল করা কোনো কঠিন কাজ নয়। তবে সমস্যা হলো পরিখাটি পার হওয়া। পরিখাটি ছিল গভীর ও প্রশস্ত এবং আশেপাশে কোনো নৌকা বা নৌকা তৈরির উপাদান ছিল অনুপস্থিত। বাধ্য হয়ে খালিদ (রা) প্রাণী দিয়ে সেতু তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

---

২৬৫. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৭৫।
২৬৬. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৭৫।
২৬৭. পূর্বোক্ত।

দুর্গের প্রধান ফটকের পাশে পরিখার সবচেয়ে অপ্রশস্ত এলাকাটিকে তিনি নির্বাচন করেন সেতু তৈরির জন্য। তিনি পরিখার পারে কিছু তীরন্দাজ মোতায়েন করেন সেতু তৈরি ও পরিখা অতিক্রমে বাধাদানকারীকে প্রতিহত করার জন্য। এরপর তার নির্দেশে বৃদ্ধ ও দুর্বল উটগুলোকে সংগ্রহ করে পারে জবাই করে পরিখায় নিক্ষেপ করা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই উটের শব পানির উপরে ভেসে ওঠে এবং অসমান হলেও একটি শক্ত সেতুর সৃষ্টি করে। খালিদ (রা)-এর নির্দেশে একদল যোদ্ধা প্রাণীর সেতুর উপর দিয়ে পরিখার ওপারে চলে যায়।

মুসলিম যোদ্ধাগণ দেয়াল অতিক্রম করার চেষ্টা করতে থাকে। এমন সময় দুর্গের প্রধান ফটক খুলে যায় এবং পারস্য বাহিনীর একটি দল তীব্র বেগে ছুটে আসে মুসলিমগণকে পরিখায় ঠেলে দেয়ার জন্য। কিছুক্ষণের জন্য একটি শাসরুদ্ধকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিম যোদ্ধাগণ পারসিকদের আক্রমণকে সফলতার সংগে প্রতিহত করে। তারা প্রধান ফটক দিয়ে দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে এই আশংকায় পারসিকগণ দ্রুত প্রত্যাহার করে ফটক বন্ধ করে দেয়। এই সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে পরিখার এপারের মুসলিম তীরন্দাজগণ দুর্গের দেয়ালে অবস্থানকারী পারসিক ও তাদের আরব সহযোগীদের উপরে তীর নিক্ষেপ অব্যাহত রাখে যাতে সেতু তৈরি ও পরিখা অতিক্রমের কাজ বাধাগ্রস্ত না হয়।

খালিদ (রা) তার সৈনিকদেরকে দেয়াল অতিক্রম করার নির্দেশ দিবেন এমন সময় শীরযাদের দূত সন্ধির নতুন প্রস্তাব নিয়ে দুর্গের প্রধান ফটকে উপস্থিত হয়। পারসিকগণকে বিনাবাধায় দুর্গ ত্যাগ করতে দিলে তারা আত্মসমর্পণ করতে রাজী আছে। খালিদ (রা) আর একবার দুর্গের প্রাচীরের দিকে তাকালেন। এই প্রাচীর অতিক্রম করে ভেতরে অবস্থানরত যোদ্ধাদের সংগে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। তিনি শীরযাদের দূতকে বললেন, পারসিকগণ তাদের সমস্ত সম্পদ ফেলে গেলে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে।

শীরযাদ অত্যন্ত আনন্দচিত্তে এই শর্ত মেনে নেয়। পরদিন পারসিকগণ তাদের পরিবারবর্গসহ টেসিফোনের উদ্দেশে যাত্রা করে এবং মুসিলমগণ দুর্গে প্রবেশ করে। আরব খৃস্টানগণ অস্ত্র সমর্পণ করে জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়। এই ঘটনাটি ঘটে ৬৩৩ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে (১২ হিজরীর রবিউল আখির মাসের শেষের দিকে)। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে আশেপাশের এলাকায় বসবাসকারী গোত্রসমূহ খালিদ (রা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করে আত্মসমর্পণ করে।

শীরযাদ টেসিফোনে পৌছলে বাহমন তাকে কঠোর ভর্ৎসনা করে। সব অক্ষম কমান্ডারদের মতো সেও সব দোষ চাপিয়ে দেয় সৈনিকদের উপরে। এক্ষেত্রে আরব খৃস্টানদের উপরে। সে বিলাপ করে, "আমি এমন একদল লোক নিয়েছিলাম যাদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। এবং এদের শিকড় ছিল আরবদের মধ্যেই।"[২৬৮]

---

২৬৮. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৭৫।

খালিদ (রা) আনবারে একজন শাসক নিযুক্ত করে নিজে আবার বাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। তিনি ইউফ্রেটিস নদী পুনরায় অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করতে থাকেন। আইন-উত-তামর-এর নিকটে পৌঁছে দেখতে পান যে, শুধু আরব সৈনিকদের দ্বারা গঠিত একটি বাহিনী তার পথের উপরে যুদ্ধের জন্য অবস্থান নিয়ে আছে।

আইন-উত-তামর খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি বিরাট শহর। এই শহরের দুর্গে অবস্থানকারী পারসিক ও তাদের সহযোগী আরবদের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী ছিল আনবার দুর্গের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং খালিদ (রা)-কে বাধা দানের জন্যও ছিল যথেষ্ট শক্তিধর। আইন-উত-তামর-এর পারসিক কমান্ডার মেহরান বিন বাহরাম জাবীন শুধু একজন দক্ষ জেনালেরই ছিল না, সে ছিল ধূর্ত রাজনীতিকও। এখানকার আরব যোদ্ধাগণ ছিল দুর্ধর্ষ নামর গোত্রের যারা নিজেদেরকে অদ্বিতীয় ভাবতো। আশেপাশের আর কিছু আরব খৃস্টান গোত্র তাদের সংগে যোগ দিয়েছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত বাহিনী গঠন করার লক্ষ্যে। এই সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ডার ছিল একজন বিখ্যাত গোত্রপ্রধান আক্কা বিন আবী আক্কা।

আরব স্কাউটগণ খালিদের আইন-উত-তামর অভিমুখে অগ্রযাত্রার সংবাদ নিয়ে এলে আক্কা পারসিক কমান্ডারের নিকট গিয়ে বলে, "আরবগণই ভাল জানে কিভাবে আরবদের মুকাবিলা করতে হয়। আমি খালিদের মুকাবিলা করতে চাই।"

মেহরান সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বলে, "হ্যা তুমি ভাল জানো কিভাবে আরদের মুকাবিলা করতে হয় এবং অনারবদের মুকাবিলা করার ব্যাপারে তোমার দক্ষতা আমাদের মতোই।"[২৬৯]

প্রশংসা বাক্যে আক্কা খুশী হয়ে যায়। তা লক্ষ্য করে মেহরান বলে, "যাও, খালিদের মুকাবিলা করো। প্রয়োজন হলে আমরা তোমার সাহায্যে এগিয়ে যাবো।"[২৭০]

আক্কা চলে গেলে পাশে দাঁড়ানো পারসিক অফিসারগণ তাদের কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করে, "কি কারণে তুমি এই কুকুরটির সংগে এভাবে কথা বললে ? "

মেহরান জবাব দেয়, "এ ব্যাপারটি আমার উপরে ছেড়ে দাও। আমি যা করেছি তাতে তোমাদের মংগল আছে এবং ক্ষতি হলে শুধু তাদেরই হবে। তারা যদি জয়ী হয় সে জয় হবে আমাদেরও। আর তারা পরাজিত হলেও খালিদ (রা)-এর বাহিনীকে অন্তত কিছুটা দুর্বল করতে সক্ষম হবে এবং আমরা সেই ক্লান্ত ও দুর্বল বাহিনীকে সহজেই মুকাবিলা করতে পারবো।"[২৭১]

---

২৬৯. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৭৬।
২৭০. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৭৬।
২৭১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৫৭৭।

পারসিক বাহিনী আইন-উত-তামর-এ থেকে যায় এবং আরবগণ আনবারের দিকে দশ মাইল অগ্রসর হয়ে যুদ্ধের জন্য অবস্থান গ্রহণ করে।

শুধু আরব সৈনিকদের দ্বারা গঠিত বাহিনী দেখে খালিদ (রা) কিছুটা বিস্মিত হয়ে পড়েন। এ যাবত ইরাকে সংঘটিত সব যুদ্ধেই তিনি মুকাবিলা করেছেন পারসিক ও আরবদের সম্মিলিত বাহিনীর। যা হোক তিনি একটি সাধরণ ভংগিতে কেন্দ্র ও দুবাহুর বিন্যাসে সৈন্য মোতায়েন করেন। নিজে দাঁড়িয়ে পড়েন মধ্যবর্তী অবস্থানের সম্মুখভাগে শক্তিশালী দেহরক্ষীদল সংগে নিয়ে। যুদ্ধক্ষেত্রের অপরপ্রান্তে দণ্ডায়মান শত্রু বাহিনীর সম্মুখে অবস্থান নিয়েছে আক্কা। খালিদ (রা) আক্কাকে জীবন্ত ধরে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

খালিদ (রা) তাঁর দুবাহুর কমান্ডারদ্বয়কে এই মর্মে নির্দেশ দান করেন তারা যেন তার সংকেতে প্রতিপক্ষকে হালকা আক্রমণের মাধ্যমে শুধু ব্যস্ত রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি স্বয়ং মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে প্রচণ্ড আক্রমণের সূত্রপাত করেন। খালিদের সংকেতে কমান্ডারদ্বয় সামনে অগ্রসর হয়ে প্রতিপক্ষকে ব্যস্ত রাখার মতো আক্রমণ রচনা করেন। এই অবস্থা কিছু সময় ধরে চলতে থাকে। মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে কোনো আক্রমণ না আসায় আক্কা কিছুটা হতভম্ভ হয়ে পড়ে। এমন সময় খালিদ (রা) তাঁর দেহরক্ষীদলসহ অগ্রসর হয়ে আক্কার উপড়ে চড়াও হন।

দেহরক্ষীগণ আক্কার আশেপাশে দণ্ডায়মান সৈনিকদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হলে খালিদ (রা) ও আক্কার মাঝে দ্বৈত যুদ্ধ শুরু হয়। আক্কা খুব সাহসী ও দক্ষ যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও অল্প সময়ের মধ্যে খালিদের হাতে বন্দী হয়ে যায়। প্রতিপক্ষের মধ্যবর্তী অবস্থানের সৈনিকগণ তাদের কমান্ডারকে খালিদের হাতে বন্দী অবস্থায় দেখে অনেকে আত্মসমর্পণ করে এবং বাকিরা পিছন ফিরে পালাতে শুরু করে। শত্রুর দুবাহুর যোদ্ধারাও একই পথ অনুসরণ করে। তারা তাদের অনেক অফিসারকে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী রেখে আইন-উত-তামর অভিমুখে দ্রুত পালাতে থাকে।

আরবগণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আইন-উত-তামর-এ পৌঁছে দেখে পারসিকগণ দুর্গ ত্যাগ করে পালিয়ে গেছে। মেহরান যুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্য একটি স্কাউট দল সামনে প্রেরণ করেছিল। তাদের নিকট হতে আরবদের পলায়নের খবর পেয়ে সে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে আইন-উত-তামর দুর্গ পরিত্যাগ করে টেসিফোনের দিকে যাত্রা করে। পারস্য বাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে আরবগণ কোনো উপায় না পেয়ে অগত্যা দুর্গে প্রবেশ করে ফটক বন্ধ করে দেয় এবং এক ধরনের অনিশ্চয়তাকে বরণ করে নেয়।

মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হয়ে দুর্গটি অবরোধ করে। আক্কা ও অন্যান্য বন্দীকে দুর্গের বাইরে প্যারেড করানো হয় যাতে কমান্ডারদের বন্দীদশা দেখে দুর্গবাসীরা

প্রভাবিত হয়। শীঘ্রই কাঙ্ক্ষিত ফল দেখা যায়। দুর্গবাসীরা শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব প্রেরণ করে, কিন্তু খালিদ (রা) তা প্রত্যাখ্যান করে শর্তহীন আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। বয়স্ক আরবগণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে যুদ্ধ করার চেয়ে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের পক্ষেই মতামত প্রদান করে। কেননা তাতে কিছুটা হলেও প্রাণে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে। ৬৩৩ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ দিকে (১২ হিজরীর মধ্য জমাদিউল আউয়াল) আইন-উত-তামর দুর্গ খালিদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

খালিদের নির্দেশে দুর্গে ও আনবারের পথে মুসলিম বাহিনীকে বাধাদানকারী শত্রুগণকে হত্যা করা হয়।[২৭২] বাকিদেরকে বন্দী হিসেবে নেয়া হয় এবং আইন-উত-তামর দুর্গের ধনসম্পদ গনিমতের মাল হিসেবে বণ্টন করা হয়।

আইন-উত-তামর-এর একটি মন্দির হতে ৪০ জন বালককে বন্দী করা হয়, যারা পৌরহিত্য শিক্ষায় রত ছিল। এই বালকদের মধ্যে একজনের নাম ছিল নুসায়র। এই নুসায়রের পুত্র মুসা ছিলেন উত্তর আফ্রিকার সেই বিখ্যাত গভর্নর যার নির্দেশে তারিক বিন যিয়াদ স্পেনে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক বিষয়াদি নিয়ে কয়েকদিন অতিবাহিত করার পর খালিদ হীরায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁর নিকটে উত্তর আরব থেকে সাহায্যের আবেদন আসে। চিন্তা-ভাবনা করে খালিদ (রা) দাউমাত-উল-জান্দাল অভিমুখে যাত্রা করেন।

---

২৭২. পূর্বোক্ত।

দূউমাত-উল-জান্দালে পুনঃ অভিযান

দাউমাত-উল-জান্দাল ছিল আরবের একটি বিরাট বাণিজ্যশহর এবং মধ্যআরব, ইরাক ও সিরিয়ার যোগাযোগকেন্দ্র। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে খালিদ (রা) কিভাবে দাউমাত-উল-জান্দাল অভিযান চালিয়ে দুর্গের অধিপতি উকেইদার বিন আবদুল মালিককে গ্রেফতার করেছিলেন তা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর থেকে উকেইদার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে আসছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বধর্মত্যাগীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে প্রতিশ্রুতি ভুলে মদীনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

খালিদ (রা)-এর ইয়ামামা অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে খলীফা আবূ বকর (রা) আয়ায বিন গানামকে দাউমাত-উল-জান্দাল দখল করে উত্তর আরবের গোত্রগুলোকে বশে আনার জন্য প্রেরণ করেন। খলীফার মনে হয়তো এই ধরনের পরিকল্পনা ছিল যে, আয়ায দাউমাত-উল-জান্দাল দখল করে খালিদ (রা)-কে সহায়তা করার জন্য ইরাকে তার সংগে যোগদান করবে। আয়ায সেখানে পৌঁছে দুর্গটিকে শক্তিশালী খৃস্টান গোত্র কাব-এর দ্বারা সুরক্ষিত দেখতে পান। তিনি দুর্গের দক্ষিণ দিকে মুসলিম বাহিনীকে মোতায়েন করেন। উভয়পক্ষ ক্লান্ত-শ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কয়েক সপ্তাহ ধরে সংঘর্ষ চলতে থাকে। বিরাজমান অচলাবস্থা নিরসনেরও কোনো উপায় দেখা যায় না। এই পরিস্থিতিতে জনৈক মুসলিম অফিসারের পরামর্শে আয়ায খালিদ (রা)-এর নিকট সাহায্যের আবেদন জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন।

আয়াযের পত্র পেয়ে খালিদ (রা) অল্প সময়ের মধ্যে মনস্থির করে ফেলেন। তিনি পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখেন যে, ইরাকের অবস্থা এখন স্থিতিশীল এবং টেসিফোন হতে প্রতিআক্রমণের আশংকা দেখা দিলেও তাঁর যোগ্য সহযোদ্ধাগণ তা প্রতিহত করতে সক্ষম। তিনি কাকাকে হীরায় তাঁর ডেপুটি নিয়োগ করে ৬০০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে আয়াযের সাহায্যে অগ্রসর হন।

খালিদ (রা)-এর অগ্রযাত্রার খবর দ্রুত দাউমাত-উল-জান্দালে পৌঁছে যায়। প্রতিপক্ষ বেশ আতংকিত হয়ে পড়ে। তারা দ্রুত সাহায্য প্রেরণের জন্য পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোকে অনুরোধ জানালে অনুকূল সাড়া মেলে। গাস্সান ও কাব গোত্রের লোকেরা দ্রুত দুর্গের প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের সংগে যোগদান করে।

আরব খৃস্টান বাহিনীর কমান্ডার ছিল দুই বিখ্যাত গোত্রপ্রধান জুদী বিন রাবীআ এবং উকেইদার। এদের মধ্যে খালিদের মুকাবিলা করার অভিজ্ঞতা ছিল শুধু উকেইদারের এবং খালিদ (রা)-এর অগ্রযাত্রার খবর শুনেই সে অসুস্থ বোধ করতে থাকে। উকেইদার দুর্গে সমবেত গোত্রগুলোর একটি সম্মেলন ডেকে বলে, "খালিদের সম্পর্কে আমিই সবার চেয়ে বেশি জানি। তাঁর মতো ভাগ্যবান ব্যক্তি কেউ নেই, তাঁর সমকক্ষ কোনো যোদ্ধাও নেই। খালিদের সংগে যেই মুকাবিলা করুক তাকে পরাজয় বরণ করতেই হবে। আমার পরামর্শ গ্রহণ করো এবং তাঁর সংগে শান্তি স্থাপন করো।"[২৭৩]

কিন্তু উকেইদার পরামর্শ উপেক্ষা করে সম্মেলন খালিদ (রা)-এর মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উকেইদার ক্রমান্বয়ে ভগ্নহৃদয় হয়ে পড়ে এবং এক রাতে দুর্গ হতে পালিয়ে জর্ডানের উদ্দেশে যাত্রা করে। কিন্তু দূভার্গ্য যে, সে অসিম বিন আমরের নেতৃত্বে খালিদ (রা)-এর একটি অশ্বারোহী দলের সম্মুখে পড়ে যায় এবং বন্দীত্ব বরণ করে।

উকেইদার পুনরায় খালিদের সামনে দাঁড়ায়। তার অন্তরে একটু মৃদু আশা ছিল যে, হয়তো খালিদ (রা) তাদের অতীতের সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাপ্তির কথা বিবেচনা করে তার প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল আচরণ করবেন। কিন্তু তার ধারণা ছিল ভুল। খালিদের দৃষ্টিতে উকেইদার ছিল আনুগত্যের শর্ত ভংগকারী বিদ্রোহী। খালিদ (রা) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দান করলে সংগ সংগে তা পালন করা হয়। এখানেই সমাপ্ত হয় দাউমাত-উল-জান্দালের প্রভু, কিন্দার যুবরাজ উকেইদার বিন আবদুল মালিকের ইতিহাস।

পরদিন খালিদ (রা) আয়াযকে তাঁর কমান্ডে নিয়ে নেন এবং উভয় বাহিনীকে একীভূত করে ফেলেন। তিনি আয়াযের লোকদেরকে দুর্গের দক্ষিণ দিকে মোতায়েন করেন আরবের দিকে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করার লক্ষ্যে। এরপর দুর্গের উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মোতায়েন করেন ইরাক থেকে তাঁর সংগে আগত লোকদেরকে যাতে দুর্গ হতে ইরাক ও জর্ডানগামী রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। বাকি যোদ্ধাদেরকে তিনি রিজার্ভ হিসেবে রাখেন। সৈন্য মোতায়েন শেষে তিনি বিবেচনা করেন যে, বর্তমান অবস্থায় শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দুর্গটি দখল করার প্রচেষ্টা খুবই ক্ষতিকর হতে পারে। তিনি অবরোধ অব্যাহত রেখে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই আশায় যে, দীর্ঘ অবরোধের ফলে ক্লান্ত হয়ে প্রতিপক্ষ দুর্গের বাইরে আসবে যুদ্ধ করার জন্য। এই সুযোগে তিনি তাদের উপর চড়াও হবেন এবং এভাবে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে দুর্গের উপরে চরম আঘাত হানবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি লোকদেরকে দুর্গের নিকট হতে কিছুটা সরিয়ে নিয়ে আসেন।

উকেইদারের মৃত্যুর ফলে আরব খৃস্টানদের গোটা বাহিনীর কমান্ড ন্যস্ত হয় জুদী বিন রাবীআর উপরে। জুদী মুসলমানদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশা করতে

---

২৭৩. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৭৮।

থাকে। কিন্তু মুসলিম পক্ষ থাকে নিষ্ক্রিয়। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও জুদী লক্ষ্য করে যে, অবরোধকারীদের পক্ষ থেকে আক্রমণের সূচনা করার লক্ষণ দেখা যায় না। সে খালিদ (রা)-এর সংগে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। জুদী তার বাহিনীর প্রতি আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ দান করে। একদল আক্রমণ করবে আয়াযের উপরে এবং তার বাহিনীর বৃহত্তর দলটি যা গঠিত হয়েছে তার কমান্ডে এবং তারই গোত্র ওয়াদীআর লোকদের দ্বারা আঘাত হানবে দুর্গের উত্তর দিকে খালিদ (রা)-এর উপরে।

আয়ায তাঁর উপরে আক্রমণকারীদেরকে খুব সহজেই প্রতিহত করতে সক্ষম হন। আক্রমণকারীদের কিছু নিহত হয় এবং বাকিরা দ্রুত দুর্গে প্রবেশ করে ফটক বন্ধ করে দেয়।

জুদীর নেতৃত্বে তার বাহিনীর বৃহত্তর অংশটিও একই সময় খালিদ (রা)-এর উপরে আঘাত হানার জন্য দুর্গ হতে বের হয়ে আসে। খালিদ (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে দুর্গ হতে কিছু দূরে যুদ্ধের বিন্যাসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। খালিদের পক্ষ থেকে আক্রমণের কোনো উদ্যোগ না দেখে জুদী আরও সাহসী হয়ে ওঠে। সে তার বাহিনী নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়। উভয় বাহিনী কাছাকাছি হলে জুদী ভাবতে থাকে যে, সে শীঘ্রই মুসলমানগণকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করবে। এমন সময় খালিদ (রা) ভয়ংকর তীব্রতা ও গতি নিয়ে জুদীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যে প্রতিপক্ষের বাধা তাসের ঘরের ন্যায় ভেঙে যায়। জুদী বন্দী হয় এবং তার বাহিনীর লোকেরা সমস্ত উদ্দীপনা হারিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দুর্গের দিকে ছুটতে থাকে। মুসলিমগণও তাদের দলের মধ্যে ঢুকে দুর্গের ফটক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুসলিমগণ প্রতিপক্ষকে এমনভাবে ধাওয়া করছিল যে, ফটকের নিকটবর্তী প্রথম ব্যক্তিটি যদি হয় আরব খৃস্টান তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হবে মুসলিম। দুর্গবাসীরা ভেতরে থেকে দেখলো যে, একটি জনস্রোত ফটকের দিকে ছুটে আসছে যার অর্ধেক মুসলমান। তারা তাদের কমরেডদের মুখের উপর ফটক বন্ধ করে দেয়। ফলে জুদীর গোত্রের লোকেরা দুর্গের বাইরে আটকে যায়। তাদের শত শত বন্দীত্ব বরণ করে এবং বাকিরা প্রাণত্যাগ করে। এই সময় তাদের উকেইদারের পরামর্শের কথা মনে পড়ে কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

খালিদ (রা)-এর পরিকল্পনার প্রথম অংশ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। এবারে তিনি বাহিনী নিয়ে দুর্গের নিকটবর্তী হয়ে অবস্থান নেন যাতে দুর্গবাসীরা বুঝতে পারে যে, পলায়নের কোনো সম্ভাবনা নেই। তিনি দুর্গের লোকদের প্রতি আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। জুদীও তার গোত্রের বন্দীদেরকে দুর্গের সামনে এমনভাবে প্যারেড করানো হয় যাতে দুর্গবাসীরা দেখতে পায়। কিছুক্ষণ পরে সবার চোখের সামনেই তাদেরকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া খালিদ

(রা) যা ভেবেছিলেন তেমন না হয়ে বরং উল্টো হতো। দাউমাত-উল-জান্দালের অধিবাসীরা যে কোনো মূল্যেই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অবরোধ বেশ কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে। তারপর একদিন খালিদ (রা) প্রচণ্ড তীব্রতা নিয়ে দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গবাসীরা যথাসাধ্য বাধা দানের চেষ্টা করে। কিন্তু খালিদ (রা)-এর শক্তিমত্তা ও তাঁর বাহিনীর দক্ষতার সামনে মোটেই সুবিধা করতে পারে না। প্রতিপক্ষের অধিকাংশ যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়। নারী, শিশু ও বেশ কিছু সংখ্যক যুবক-যুবতীকে বন্দী করা হয়। এই ঘটনাটি ঘটে ৬৩৩ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে (১২ হিজরীর মধ্য জমাদিউল আখির)।

খালিদ (রা) দাউমাত-উল-জান্দালের প্রশাসনিক ব্যাপারে কয়েকদিন অতিবাহিত করার পর হীরা অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি সংগে আয়াযকেও নিয়ে নেন সহযোগী জেনারেল হিসেবে। অবশ্য ইরাকের পরিস্থিতির ইতিমধ্যে কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। কেননা পারস্য বাহিনী আবার যুদ্ধের জন্য পথে নেমেছে।

পারস্য শক্তির সর্বশেষ প্রতিরোধ

খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা)-এর আইন-উত-তামর ত্যাগের খবর কয়েকদিনের মধ্যেই টেসিফোন পৌঁছে যায় এবং বিশ্বাস করা হয় যে, খালিদ (রা) তাঁর বাহিনীর বৃহত্তর অংশ নিয়ে আরবে ফিরে গেছেন। এই বিশ্বাস থেকে টেসিফোনে স্বস্তির বাতাস প্রবাহিত হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই টেসিফোনের বাতাস গরম হয়ে যায়। তারা মুসলমানদেরকে পুনরায় মরুভূমির বুকে ঠেলে দিয়ে তাদের হৃত সম্মান ও গৌরব পুনরুদ্ধার করতে চায়। পারসিকগণ খালিদ (রা)-এর সংগে আর কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ার ব্যাপারে একমত হলেও খালিদবিহীন মুসলিম বাহিনীর সংগে যুদ্ধ করতে তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

এ ব্যাপারে বাহমন উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে। সে ইতিমধ্যে একটি নতুন বাহিনী গঠন করে ফেলে যার কিছু অংশ সংগঠিত হয় উল্লিস হতে পলাতক সৈনিকদের দ্বারা, কিছু সংগৃহীত হয় সাম্রাজ্যের অন্যান্য দুর্গ হতে এবং কিছু নতুন সৈনিকও যোগ করা হয়। ফলে এই বাহিনী অতীতের পারস্য বাহিনীর তুলনায় দুর্বল হয়ে যায়। এই দিকটি বিবেচনা করে বাহমন আরব খৃস্টান বাহিনীর সমর্থন লাভের পূর্ব পর্যন্ত কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে আরবদের সংগে আলোচনা শুরু করে দেয়।

আরব খৃস্টানগণ বাহমনের আহবানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। আইন-উত-তামরের পরাজয় ও প্রিয় গোত্রপ্রধান আক্কা'র হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা বদ্ধপরিকর। তারা তাদের হৃত ভূমি উদ্ধার ও মুসলমানদের হাতে বন্দী সহযোগীদের উদ্ধারের ব্যাপারেও উদগ্রীব। আরব গোত্রসমূহ যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

বাহমন পারস্য বাহিনীকে দুভাগে বিভক্ত করে টেসিফোন ত্যাগের নির্দেশ দান করে। এক অংশ রুজবেহর নেতৃত্বে অবস্থান নেয় হুসেইদ এলাকায় এবং অন্য অংশ জারমাহর-এর নেতৃত্বে খানাফিস এলাকায়। প্রশাসনিক ও চলাচলের সুবিধার্থে বাহিনীদ্বয়কে কিছু সময়ের জন্য স্বতন্ত্র অবস্থানে রাখা হয়। তবে আরব খৃস্টান বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে স্বীয় অবস্থানে থাকতে বলা হয়। বাহমন বিশাল রাজকীয় বাহিনী সংগঠিত করে মুসলমানদের পক্ষ হতে আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করার পরিকল্পনা করে। আর তা না হলে সামনে অগ্রসর হয়ে হীরায় মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করবে।

আরব খৃস্টান বাহিনীর সংগঠিত হতে আরও সময়ের প্রয়োজন। তারা দুদলে সংগঠিত হতে থাকে। প্রথম দল জনৈক গোত্রপ্রধান হুযইফ বিন ইমরানের নেতৃত্বে মুজাআহ এলাকায় এবং দ্বিতীয় দল আর একজন গোত্রপ্রধান রাবীআ বিন বুজাইর-এর নেতৃত্বে পাশাপাশি অবস্থিত সানী ও জুমাইল এলাকায়। এই দল দুটি প্রস্তুত হলে পারস্য বাহিনীর সংগে মিলিত হয়ে বিশাল শক্তিশালী রাজকীয় বাহিনী গঠিত হবে (১৪ নম্বর ম্যাপ দ্রঃ)।

পারস্য শক্তির এই প্রস্তুতি চলাকালে ইরাকে খালিদ (রা)-এর ডেপুটি কাকা মুসলিম বাহিনীকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ইউফ্রেটিসের অপরপারে অবস্থিত কয়েকটি মুসলিম দলকে যা খালিদ (রা) পাঠিয়েছিলেন, ফিরিয়ে এনে হীরায় একত্র করেন। এরপর তিনি একটি রেজিমেন্টকে হুসেইদ এবং একটিকে খানাফিসে প্রেরণ করেন। তাদের উপরে দায়িত্ব দেয়া হয় উক্ত এলাকাদ্বয়ে অবস্থিত পারস্য বাহিনীকে ব্যস্ত রাখার এবং তারা সামনে অগ্রসর হতে চাইলে অগ্রযাত্রায় বিলম্ব ঘটানোর। তারা পারস্য বাহিনীর শক্তি ও গতিবিধি সম্পর্কেও হীরায় কাকাকে অবহিত রাখবে। উভয় বাহিনী স্বীয় গন্তব্যে পৌঁছে প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করতে থাকে। এদিকে কাকা বাকি সৈনিকদেরকে নিয়ে যেকোন অবস্থা মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

৬৩৩ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের চতুর্থ সপ্তাহে (১২ হিজরীর মধ্য রজব) হীরায় পৌঁছে খালিদ (রা) উল্লিখিত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি সহজেই উপলব্ধি করেন যে, পারসিক ও আরববাহিনী চতুষ্টয় একত্রিত হয়ে ইতিমধ্যে হীরার উপরে আক্রমণ রচনা করলে পরিস্থিতি হয়তো বিপজ্জনক মোড় নিতে পারতো। এই পরিস্থিতিতে খালিদ (রা)-এর পক্ষ থেকে পরবর্তী যুদ্ধের যে কোনো পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক, কৌশলগত দিক থেকে নীচের বিষয় দুটো বিবেচনায় রাখা অপরিহার্য হয়ে পড়ে ঃ

ক) পারস্য ও আরব শক্তিসমূহের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠনে বাধা দান করা।

খ) হীরার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত রেখে সামনে অগ্রসর হয়ে প্রতিপক্ষের শক্তিসমূহের মুকাবিলা করা।

খালিদ (রা) তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে যুদ্ধপরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। তিনি প্রথম আক্রমণ করে স্বতন্ত্রভাবে শত্রুর শক্তিসমূহকে ধ্বংস করতে চান। যুদ্ধকৌশল চূড়ান্ত করার পর তিনি হীরার মুসলিম বাহিনীকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে এক অংশের নেতৃত্বে স্থাপন করেন কাকাকে এবং অন্য অংশে আবু লোইলাকে। খালিদ (রা) তাদের উভয়কে আইন-উত-তামর-এ প্রেরণ করেন। দাউমাত-উল-জান্দালের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের বিশ্রাম গ্রহণ সম্পন্ন হলে তিনিও তাদের সংগে যোগদান করবেন।

ম্যাপ-১৪ : পারস্য শক্তির সর্বশেষ প্রতিরোধ
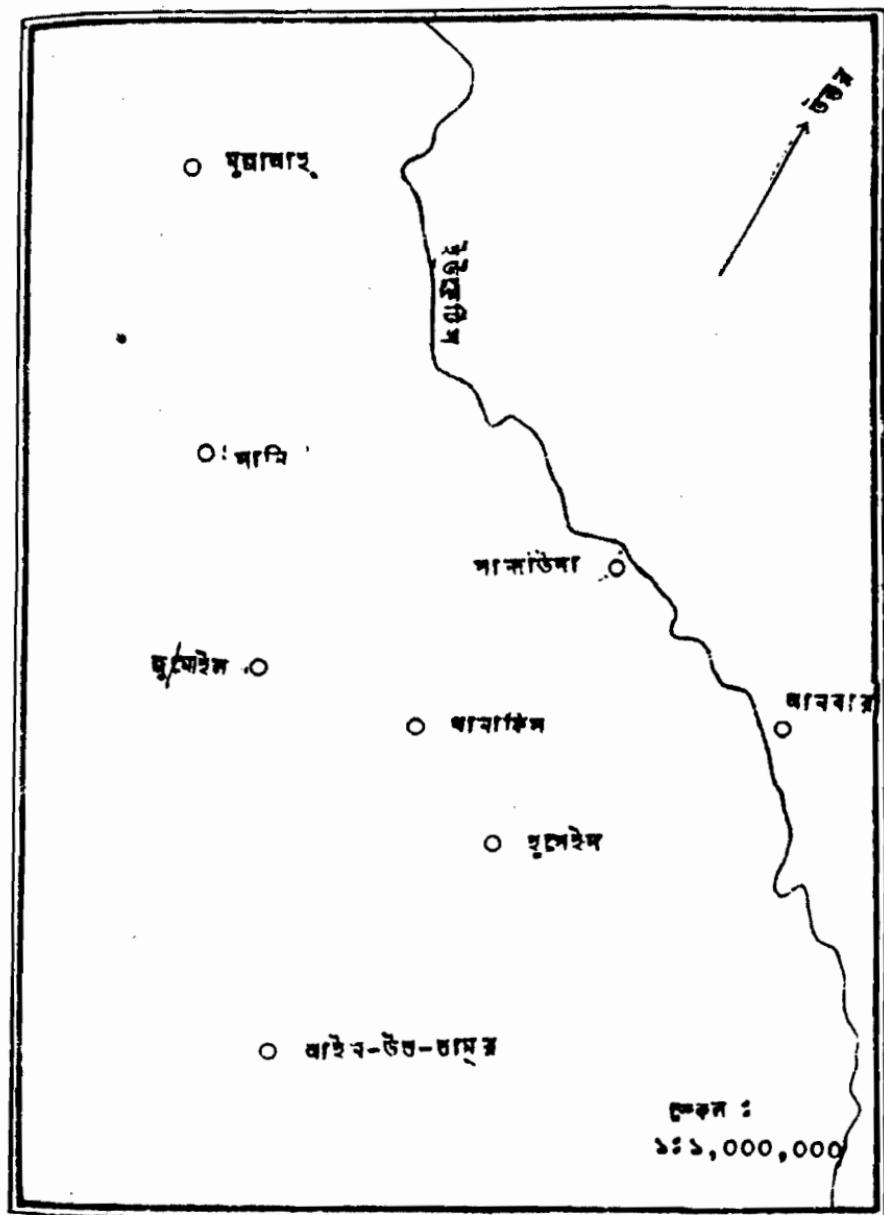
কয়েকদিন পর সমগ্র মুসলিম বাহিনী আইন-উত-তামরে একত্রিত হয়। অবশ্য হীরার প্রতিরক্ষার জন্য আয়ায বিন গানামের নেতৃত্বে একদল যোদ্ধাকে পিছনে রাখা হয়। মুসলিম বাহিনীকে তিনটি কোরে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতি কোরের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় পাঁচ হাজার করে। একটিকে মজুদ রেখে বাকি দুটি কোরকে কাকা ও আবু লোইলার নেতৃত্বে যথাক্রমে হুসেইদ ও খানাফিস অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। খালিদ (রা)-এর উদ্দেশ্য ছিল দুই মুসলিম বাহিনী দ্রুত অগ্রসর হয়ে একযোগে শত্রু অবস্থানের উপরে আঘাত হেনে তাদেরকে ধ্বংস করবে যাতে একে অপরের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হতে না পারে। কিন্তু খানাফিসের দূরত্ব বেশি হওয়ায় আবু লোইলার পক্ষে একই সময়ে গন্তব্যে পৌঁছা সম্ভব হয়ে ওঠে না। খালিদ (রা) আইন-উত-তামরে অবস্থান নিয়ে সানি জুমোইল হতে হীরা অভিমুখে শত্রুর যে কোনো অভিযানকে প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

কাকা তার গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি পৌঁছলে হুসেইদ-এর পারসিক কমান্ডার রুজবেহ সাহায্যের জন্য খানাফিসের পারসিক কমান্ডার জারমাহর-এর নিকট আবেদন জানায়। বাহমনের অনুমতি ব্যতীত জারমাহর-এর পক্ষে তার বাহিনীকে হুসেইদে প্রেরণ করা সম্ভব নয়। তাই সে নিজেই সেখানকার পরিস্থিতি দেখার জন্য যাত্রা করে এবং ঠিক যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে হুসেইদে উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয় ৬৩৩ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি নাগাদ (১২ হিজরীর শাবান মাসের ১ম সপ্তাহে)।

হুসেইদে পৌঁছেই কাকা শত্রুর উপর আক্রমণ রচনা করেন। প্রতিপক্ষের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। যুদ্ধ শুরু হলে কাকা খুব সহজেই রুজবেহকে হত্যা করেন। জারমাহরও যুদ্ধে অংশ নেয় এবং জনৈক মুসলিম অফিসারের হাতে নিহত হয়। পারস্য বাহিনী অত্যন্ত সাহসিকতার সংগে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও কাকার হাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং অসংখ্য সহযোদ্ধার মৃতদেহ ফেলে রেখে দ্রুত পালিয়ে খানাফিসে অপর পারস্য বাহিনীর সংগে যোগদান করে। মাহবুজান নামের আর একজন পারসিক জেনারেল পারস্য বাহিনীর এই অংশের কমান্ড গ্রহণ করে।

হুসেইদের যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রাণে বেঁচে যাওয়া পারসিকগণ খানাফিসে পৌঁছার পরপরই আবু লাইলা তাঁর বাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর শুনেই বিজ্ঞ জেনারেল মাহবুজাম হুসেইদ রণক্ষেত্রের শিক্ষার আলোকে এই মুহূর্তে যুদ্ধ উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে দ্রুত খানাফিস ত্যাগ করে মুজাআহ্ এলাকায় হুযাইল বিন ইমরানের নেতৃত্বে সংগঠিত আরব বাহিনীর সংগে যোগদান করে। আবু লাইলা খানাফিস দখল করেন এবং পারস্য বাহিনীর মুজাআহ এলাকায় গমনের সংবাদ খালিদ (রা)-কে অবহিত করেন।

আইন-উত-তামরে থেকে খালিদ (রা) পারস্য বাহিনীর এক অংশের পরাজয় ও অপর অংশের খানাফিস হতে মুজাআহ্ এলাকায় গমনের সংবাদ জানতে পারেন। হুসেইদে পরাজিত বাহিনীর অবশিষ্ট সৈনিকগণও অপর অংশের সংগে যোগদান করে। পারস্য বাহিনীর এই অবস্থান পরিবর্তনের ফলে টেসিফোন অরক্ষিত এবং আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়, যদিও রাজধানীর নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকা স্বাভাবিক। মুজাআহ এলাকাতেই এখন পারস্য বাহিনীর সর্ববৃহৎ সমাবেশ ঘটে। সানী এবং জুমাইল এলাকায় সমবেত আরব বাহিনীও আর হীরার জন্য তেমন একটা হুমকি নয়। কারণ পারস্য বাহিনীর পরিণতি দেখে তাদের পক্ষে ঘাঁটি ত্যাগ করে কোনো আক্রমণে না যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

খালিদ (রা)-এর সামনে এখন তিনটি পথ খোলা ঃ (ক) পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী আক্রমণ করা, (খ) মুজাআহ এলাকায় সমবেত পারস্য বাহিনীকে আক্রমণ করা ও (গ) সানী ও জুমাইল এলাকায় সংগঠিত আরব খৃস্টান বাহিনীকে আক্রমণ করা।

তিনি টেসিফোন আক্রমণের চিন্তা দুটি কারণে পরিত্যাগ করেন ঃ প্রথমত (তাবারীর মতে) তিনি খলীফার অসন্তুষ্টির[২৭৪] ভয় করেছিলেন। আবূ বকর (রা) চাননি যে, খালিদ (রা) টেসিফোন আক্রমণ করুক। দ্বিতীয় কারণটি ছিল সম্পূর্ণ সামরিক বিবেচনাপ্রসূত। এই অবস্থায় খালিদ (রা) টেসিফোনের দিকে অগ্রসর হলে তার পার্শ্বে ও পশ্চাদদেশ মুজাআহ এলাকায় সমবেত শক্তিশালী পারস্য বাহিনীর নিকট উন্মুক্ত হয়ে যায়। টেসিফোনের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত থাকা অবস্থায় এই বাহিনী তাকে পিছন দিক হতে আক্রমণ করতে পারে অথবা সামনে অগ্রসর হয়ে তার ঘাঁটি হীরা দখল করে মরুভূমির সংগে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে।

বাকি দুটো লক্ষ্যের মধ্য থেকে তিনি মুজাআহ এলাকায় অভিযান পরিচালনার বিষয়টিকে বেছে নেন। এবং সানী ও জুমাইল এলাকায় সমবেত আরব বাহিনীকে পরে মুকাবিলা করবেন বলে চিন্তা করেন। ইতিমধ্যে তাঁর লোকেরা মুজাআহ এলাকায় পারস্য বাহিনীর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। মুজাআহ অভিযানের ব্যাপারে খালিদ (রা) এমন একটি রণকৌশলের পরিকল্পনা করেন যার ব্যবহার সামরিক ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা যায়। তিনি লক্ষ্যবস্তুর উপরে একই সময়ে তিন দিক হতে সমন্বিত রাত্রিকালীন আক্রমণ (Conversing night attack) রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এরূপ অভিযানে রাতের বেলা তিনদিক হতে আগত বাহিনীর চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার।

খালিদ (রা) প্রথমে যাত্রার নির্দেশ জারি করেন। তিনটি কোর স্বীয় অবস্থান হুসেইদ, খানাফিস ও আইন-উত-তামর হতে ভিন্ন ভিন্ন পথে, ইউফ্রেটিস ও সানী-

---

২৭৪. ইরাকে খালিদের মিশন সম্পর্কে পরিশিষ্ট 'খ'-এর ৫ নং নোট দ্রঃ।

জুমাইল রেখার মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়ে একটি নির্দিষ্ট রাতের নির্দিষ্ট সময়ে মুজাআহ হতে কয়েক মাইল দূরে নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই যাত্রা সংঘটিত হয় এবং তিনটি কোর নির্দিষ্ট স্থানে সময় মতো একত্রিত হয়। এখানেই খালিদ (রা) আক্রমণের বিস্তারিত নির্দেশ জারি করেন। তিনি আক্রমণের নির্দিষ্ট সময় বলে দেন এবং তিনটি কোরকে স্বতন্ত্র পথ কে কোন দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে অচেতন শত্রুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা বিস্তারিত বলে দেন। তিনি মুসলিম বাহিনীকে একটি কঠিন পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করেন। শুধু একটি অত্যন্ত দক্ষ সামরিক শক্তি, যা যন্ত্রের মতো কাজ করে, এরূপ একটি রাত্রিকালীন সমন্বিত আক্রমণ পরিচালনা করতে পারে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিযান পরিচালিত হয়। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মুসলিম বাহিনীর অবস্থান নিরাপদ দূরত্বে থাকায় কোনো আকস্মিক আক্রমণের আশংকা না দেখে পারস্য ও আরব বাহিনী শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। এটাই ছিল তাদের মুজাআহ এলাকায় শেষ রাত। মুসলিম বাহিনী তিনদিক হতে তাদের উপর অতর্কিতে চড়াও হবার পর তারা এই আক্রমণ সম্পর্কে জানতে পারে।

রাত্রিকালীন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হওয়ার ফলে সৃষ্ট ভীতির কারণে রাজকীয় বাহিনী উঠে দাঁড়ানোর শক্তি ও সাহস হারিয়ে ফেলে। শত্রু ক্যাম্পের ভেতরে এমন ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, সৈনিকগণ মুসলিম বাহিনীর এক অংশের হাত থেকে কোনো রকমে ছুটতে পারলেও অন্য অংশের হাতে গিয়ে পড়ে। এভাবে হাজার হাজার শত্রু প্রাণত্যাগ করে। মুসলিমগণ ওয়ালাজার যুদ্ধের মতো এখানেও প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু অন্ধকারের সহায়তা নিয়ে বেশ কিছু শত্রুসৈন্য প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়।

পুব আকশে সূর্য উদিত হলে মুজাআহ এলাকায় রাজকীয় বাহিনীর কোনো জীবিত সৈনিকের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। পারসিক জেনারেল মাহবুজানের ভাগ্য সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে আরব জেনারেল হুযাইল বিন ইমরান কোনো রকমে পালিয়ে জুমাইলে সমবেত আরব বাহিনীর সংগে যোগদান করে।

এই অভিযানটি পরিচালিত হয় ৬৩৩ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে (১২ হিজরীর শাবান মাসের চতুর্থ সপ্তাহে)।

মুজাআহর যুদ্ধে নিহত আরবদের মধ্যে দু'জন মুসলমানও ছিল। এই দু'ব্যক্তি ইরাকে অভিযানের কিছু পূর্বে মদীনা ভ্রমণকালে খলীফার সংগে সাক্ষাত করে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের গোত্রের সংগে বসবাসের মানসে ফিরে আসে। খালিদ (রা)-এর বাহিনীর হাতেই এই দু'ব্যক্তির মৃত্যুর খবর মদীনায় পৌঁছলে উমর (রা) খলীফার নিকটে গিয়ে এই ঘটনার নিন্দা করেন। জবাবে আবূ বকর (রা) মন্তব্য করেন, "তারা অবিশ্বাসীদের সংগে মিশে ছিল বিধায় এরূপ ঘটেছে।"[২৭৫] তা সত্ত্বেও খলীফা নিহত

২৭৫. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৮১।

ব্যক্তিদ্বয়ের পরিবারকে ক্ষতিপূরণদানের নির্দেশ প্রেরণ করেন। এ প্রসংগে খলীফা খালিদ (রা) সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি পুনরায় উচ্চারণ করেন, "অবিশ্বাসী কাফিরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ যে তরবারিকে কোষমুক্ত করেছেন, আমি তা কোষবদ্ধ করতে পারি না।"

মুজাআহর পর খালিদ (রা) সানী ও জুমাইলের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন। সানীর অবস্থান নিকটবর্তী হওয়ায় তিনি এটাকেই প্রথম লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্ধারণ করেন। মুজাআহর রণকৌশল অবলম্বন করে তিনি সানী অভিযানে সৈন্য পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পূর্বের মতোই মুসলিম বাহিনী তিনটি কোরে বিভক্ত হয়ে মুজাআহ হতে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি নির্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হয়ে নির্দিষ্ট রাতে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সানীতে অবস্থিত প্রতিপক্ষের ক্যাম্পের উপরে সমন্বিত আক্রমণ পরিচালনা করে। ঘটনাটি ঘটে ৬৩৩ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে (১২ হিজরীর রমযান মাসের ১ম সপ্তাহ)। এই আক্রমণে প্রতিপক্ষের খুব সামান্য যোদ্ধাই আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। নারী, শিশু ও যুবক-যুবতীদের বন্দী করা হয়। আরব বাহিনীর কমান্ডার রাবীআ বিন বুজাইর এযুদ্ধে নিহত হয় এবং তার সুন্দরী কন্যাকে বন্দী করে মদীনায় প্রেরণ করা হয় যেখানে সে হযরত আলী (রা)-এর স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করে।[২৭৬]

খালিদ (রা) যেন দাবার বোর্ডে একটার পর একটা চাল দিচ্ছেন। সানী অভিযানের তিনরাত পর একই কৌশলে সৈন্য পরিচালনা করে তিনি জুমাইল আক্রমণ করেন। এখানেও মুসলিম বাহিনীর রাত্রিকালীন ত্রিমুখী অতর্কিত হামালায় আরবগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[২৭৭]

জুমাইল যুদ্ধের বন্দী ও মালামাল মদীনায় প্রেরণের পর খালিদ (রা) রুজাব অভিমুখে যাত্রা করেন। রুজাবে আক্কার পুত্র হিলাল পিতা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে তার গোত্রের লোকদেরকে একত্র করতে থাকে। কিন্তু মুসলিম বাহিনী রুজাবে পৌছে তা পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত আরবগণ মরুভূমির বুকে আশ্রয় নেয়।

খালিদ (রা) এখন চাপমুক্ত এবং ইচ্ছা করলে তিনি এই বিজয়কে উদযাপন করতে পারেন। এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি চারটি পৃথক যুদ্ধে বিশাল রাজকীয় বাহিনী ধ্বংস করেছেন। এই যুদ্ধসমূহের অপারেশনের এলাকা ছিল প্রায় ১০০ মাইল জুড়ে বিস্তৃত। তিনি এই অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছেন তার বাহিনীর দ্রুত চলাচলের ক্ষমতা, সাহসিকতার সংগে আকস্মিক অভিযান পরিচালনা ও মরণপণ আক্রমণ রচনার কৌশলকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে। তিনি খলীফার দেয়া

---

২৭৬. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৮২।

২৭৭. এই চারটি যুদ্ধক্ষেত্রের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চয়তার অভাব আছে। ব্যাখ্যার জন্য পরিশিষ্ট 'খ'-এর ৭ নম্বর নোট দ্রঃ।

মিশনকে সম্পন্ন করেছেন এবং তার সামনে দাঁড়াবার মতো আর কোনো শক্তি নেই। আইন-উত-তামর হতে খালিদ (রা)-এর বিদায়ের খবর শুনে যে পারস্য বাহিনী মাঠে নেমেছিল তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে। টেসিফোনে তার সাম্রাজ্যবাদী হাতকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।

ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় খালিদ (রা) কয়েকটি অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা করেন। এই সব এলাকা মুসলিম অশ্বারোহী দলের পদভারে ও আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ইরাকের সাধারণ মানুষ অবশ্য অক্ষত অবস্থায় থাকে। মুসলমানদের আগমনকে তারা আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করে। কারণ মুসলিম শাসকগণ দেশে প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়। মহান পারস্য সম্রাট আনুশিরওয়ানের শাসনকালের পর তারা এই প্রথম শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।

খালিদ (রা) আরাম-আয়েশ বা আনন্দ উপভোগ করে সময় কাটানোর ব্যক্তি নন। তিনি সব সময় অতীতের সাফল্যকে ছোট করে দেখতেন এবং ভবিষ্যতের বৃহত্তর বিজয়ের লক্ষ্যে দূর-দূরান্তে অভিযান পরিচালনার জন্য উদগ্রীব থাকতেন। তিনি জানতে পারেন যে, ইউফ্রেটিসের ওপারে ফিরাযে এখনও একটি পারসিক দুর্গ বর্তমান আছে। এই দুর্গটির অবস্থান ছিল পারস্য ও পূর্ব রোমের সীমান্তবর্তী এলাকায়। খলীফার নির্দেশ ছিল পারসিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। তাই তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের এই সর্বশেষ দুর্গটি নিশ্চিহ্ন করতে চান। তিনি ফিরায অভিমুখে যাত্রা করেন। ৬৩৩ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে (১২ হিজরীর রমযানের শেষে)। ফিরাযে পৌঁছে খালিদ দুটি দূর্গের অস্তিত্ব দেখতে পান। একটি পারসিকগণের, অপরটি রোমকদের। ফিরায এলাকার এই দুর্গ দুটি দুই সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতো যারা বিগত দু'দশক ধরে একে অপরের বিরুদ্ধে খুব ব্যয়বহুল যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এখন তারা মুসলিম শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য একে অপরের সংগে হাত মিলিয়েছে এবং তাদের সংগে যোগ দিয়েছে স্থানীয় আরব খৃস্টান গোত্রসমূহ।

কোনো ঘটনা ছাড়াই ছয় সপ্তাহ অতিবাহিত হয়। ইউফ্রেটিসের দুই তীরে দাঁড়িয়ে দুই বাহিনী একে অপরের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকে। দক্ষিণ তীরে মুসলিম বাহিনী এবং উত্তর তীরে পারসিক ও রোমক বাহিনীর অবস্থান। কারো মধ্যে নদী পার হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। শেষ পর্যন্ত ৬৩৪ খৃস্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী (১৫ই যুকাদা, ১২ হিজরী) খালিদ (রা) প্রতিপক্ষকে নদী পার হওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করতে সক্ষম হন। প্রতিপক্ষ নদী পার হতে না হতেই খালিদ (রা) তাঁর স্বাভাবিক গতি ও দুর্ধর্ষতা নিয়ে তাদের উপরে মরণ আঘাত হানেন। শত্রুর হাজার হাজার সৈন্য নিহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করে।

কৌশলগত দিক থেকে এই যুদ্ধটির তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। তবে খালিদ (রা)-এর অপরিসীম সাফল্যমণ্ডিত পারস্য অভিযানের শেষ যুদ্ধ হিসেবে এটি উল্লেখ অপরিহার্য।

খালিদ (রা) ফিরাযে পরবর্তী দশদিন অতিবাহিত করেন। তারপর ৬৩৪ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ২৬ তারিখে তিনি বাহিনীসহ হীরার উদ্দেশে ফিরায ত্যাগ করেন। এই যাত্রার জন্য তিনি মুসলিম বাহিনীকে অগ্রবর্তী দল, প্রধান দল ও পশ্চাদবর্তী দলে বিভক্ত করেন এবং নিজে পশ্চাদবর্তী দলের সংগে যাত্রা করবেন বলে সকলকে জানিয়ে দেন। পশ্চাদবর্তী দলটি ফিরায ত্যাগ করার সংগে সংগেই খালিদ (রা) কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুসহ দক্ষিণ দিকে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গোপনে মক্কায় গিয়ে পক্ষকালের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য হজ পালন করা। এটি ছিল এক ধরনের শান্তিপূর্ণ রোমাঞ্চকর অভিযান।

জানা যায় যে, খালিদ (রা) ও তাঁর সংগীগণ এমন দুর্গম মরুপথে মক্কা গমন করেছিলেন, যে পথে চলতে ডাকাতরাও ভয় করতো।[২৭৮] মক্কায় পৌছে তারা গোপনে হজ সম্পন্ন করে ইরাকে প্রত্যাবর্তন করেন। খালিদ (রা) তাঁর সংগীগণসহ এতো দ্রুত প্রত্যাবর্তন করেন যে, মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদবর্তী দল হীরায় পৌছার পূর্বেই তিনি তাদের সংগে যোগদান করেন। তিনি এই দলের সংগেই হীরায় প্রবেশ করেন এবং ব্যাপারটি এরূপ দাঁড়ায় যে, তিনি সব সময় এই দলের সংগেই ছিলেন। শুধু দলনেতা এই গোপন তথ্যটি জানতেন। অবশ্য সৈনিকগণ খালিদ (রা)-এর ন্যাড়া মাথা[২৭৯] দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়েছিল।

ইরাকে বিরাজমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ক্লান্ত হয়ে খালিদ (রা) স্বয়ং একটি আক্রমণ পরিচালনা করেন। তিনি মুসান্নাকে সংগে নিয়ে টেসিফোনের নিকটবর্তী বাগদাদ শহরে একটি সফল আক্রমণ পরিচালনা করেন।

বাগদাদ থেকে ফিরেই তিনি খলীফার নিকট হতে একটি পত্র লাভ করেন। পত্র পাঠ করে তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর হজ পালনের ঘটনাটি মক্কায় গোপন থাকেনি। খলীফা তাঁকে এজন্য সতর্ক করে দিয়ে লিখেছেন, "এরূপ ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি করিও না।" সেই সংগে খলীফা তাঁকে সিরিয়া অভিযানের পরবর্তী মহান মিশন প্রদান করেন। এখানেই সমাপ্তি হয় ইরাক অভিযানের।[২৮০]

---

২৭৮. তাবারী ঃ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা - ৫৮৩।

২৭৯. হজ পালনের সময় মাথা ন্যাড়া করা সুন্নত।

২৮০. ইরাক অভিযানের যুদ্ধসমূহের তারিখ সম্পর্কে ব্যাখ্যার জন্য পরিশিষ্ট 'খ'-এর ৮ নম্বর নোট দেখুন।

পারস্য অভিযানে খালিদের রণকৌশলের মূল্যায়ন

ইরাক অভিযানের সমাপ্তি হয়েছিল বিস্ময়কর বিজয়ের মধ্য দিয়ে। মুসলিম বাহিনী তাদের তুলনায় অনেক বৃহৎ আকারের প্রতিপক্ষ পারস্য বাহিনীর সংগে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং এসব যুদ্ধে তারা শুধু বিজয়ই লাভ করেনি বরং পারস্য শক্তি ও তাদের সহযোগী আরব খৃস্টান বাহিনীকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হয়। সমকালীন সময়ে পারস্য বাহিনীর খ্যাতি ছিল অত্যন্ত দক্ষ, সুসজ্জিত ও সুসংগঠিত সামরিক শক্তি হিসেবে।

এই অভিযান চলাকালে খালিদ (রা) সবসময় চেষ্টা করেছেন মরুভূমির কাছাকাছি থেকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে, যাতে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মরুর বুকে আশ্রয় নেয়া যায়। মরুভূমি ছিল খালিদ (রা)-এর বাহিনীর জন্য এমন একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল যেখানে পারস্য বাহিনী প্রবেশের চিন্তা সহসা করত না। তদুপরি মরুভূমির উন্মুক্ত প্রান্তরে খালিদ (রা) দ্রুত চলাচলের মাধ্যমে যে কোনো লক্ষ্য বস্তুতে পৌঁছতে পারতেন। পারস্য বাহিনী এই মরুভূমির বুকে প্রবেশের পথে হুমকি সৃষ্টির শক্তি না হারানো পর্যন্ত খালিদ (রা) ইরাকের গভীরে প্রবেশ করেননি।

পারস্য বাহিনীর রণকৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক সীমানাকে অক্ষুণ্ন রাখা। ফলে তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে মরুভূমি ও আবাদী এলাকার মধ্যবর্তী সীমানা ঘেঁষে মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা করে, যা খালিদ (রা) সবসময় কামনা করতেন। রণকৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পারসিকগণ সবসময় সর্বোত্তম উপায় অবলম্বন করে যুদ্ধের জন্য শক্তির সর্বাধিক সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। পরিকল্পনামাফিক কারিন হরমুযের সংগে, বাহমন আন্দারজাঘরের সংগে এবং রুজবেহ ও জারমাহর মুজাআহ ও সানী-জুমাইলে আরব বাহিনীর সংগে মিলিত হওয়ার কথা ছিল। এই সমন্বয় হলে ইরাক অভিযানের গতি হয়তো অন্যদিকে মোড় নিতো। এটা সম্ভব হয়নি কারণ খালিদ (রা)-এর দ্রুত গতিময়তা এবং তাঁর সুচিন্তিত পরিকল্পনা, যার দ্বারা তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সংগে শত্রু বাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন অংশকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও সময়ে যুদ্ধে লিপ্ত করাতে সক্ষম হয়েছিলেন, যাতে তারা একে অপরকে সাহায্য করতে না পারে।

সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে খালিদ (রা)-এর উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার পিছনে সহায়ক উপাদান ছিল প্রধানত দুটি ঃ মুসলিম বাহিনীর

সামরিক দক্ষতা ও দ্রুত চলাচলের ক্ষমতা। এ দুটো সুবিধার তিনি শেষ সীমা পর্যন্ত ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ অশ্বারোহী ও বাকি বৃহত্তর অংশ উটের আরোহী হলেও তা' কমান্ডারের ইচ্ছা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে সক্ষম ছিল। শত্রু বুঝে ওঠার পূর্বেই মুসলিম বাহিনী এক যুদ্ধক্ষেত্র হতে অন্য যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত গিয়ে আক্রমণ রচনা করতে সক্ষম ছিল।

বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে খালিদ (রা) যে পারস্য শক্তির মুকাবিলা করেছিলেন তার সংখ্যা বা উভয় পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাব আছে। পারস্য বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে কোথাও কোথাও যেসব সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে অতিরঞ্জনও থাকতে পারে। তবে এটা নিশ্চিত যে, প্রতিটি যুদ্ধে পারস্য বাহিনীর সমাবেশ ছিল বিশাল এবং তাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও ছিল অপরিসীম। বিশেষ করে ওয়ালাজা, উল্লিস, মুজাআহ ও সানী জুমাইলের যুদ্ধে পারস্য বাহিনীর পক্ষে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এতো বেশি ছিল যে, যুদ্ধের পর কার্যকর শক্তি হিসেবে ঐসব বাহিনীর অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়েছিল। আমার হিসেবে কাজিমা, মাকিল, ওয়ালাজা ও উল্লিসের যুদ্ধে খালিদ (রা) যে পারস্য বাহিনীসমূহের মুকাবিলা করেছিলেন, সেগুলোর সৈন্যসংখ্যা হবে ৪০,০০০ থেকে ৭০,০০০-এর মধ্যে। খালিদ (রা) ও তাঁর যোদ্ধাদের নিকট প্রতিপক্ষের চারগুণ বড় বাহিনী কোনো দুঃশ্চিন্তার কারণ ছিল না এবং তাঁরা সহজেই তা ঘায়েল করতে পারতেন। অপরপক্ষে পারস্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও প্রাচুর্যের তুলনায় উল্লেখিত আকারের বাহিনী খুব একটা বিরাট কিছু নয়। (তিন বছর পরে সংঘটিত কাদেসিয়ার যুদ্ধে পারস্য শক্তি ১৩০,০০০ সৈন্যের বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছিল)। মুসলিম বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে এরূপ বিবেচনা করা যায় যে, প্রত্যেকটি যুদ্ধের পর তাদের কার্যকর ক্ষমতা থাকতো পূর্বের মতোই উঁচু। ফলে তাদের পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ খুব কম হওয়াটাই স্বাভাবিক।

সর্বোপরি, খালিদ (রা)-এর বিশাল ব্যক্তিত্ব ও অপরিসীম দক্ষতার কারণেই শত প্রতিকূলতার মাঝেও মুসলিম বাহিনীর ইরাক অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। তিনিই প্রথম খ্যাতিমান মুসলিম কমান্ডার যাকে মদীনা থেকে প্রেরণ করা হয় অন্যদেশ জয় করে ইসলামের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ম্যাপ নতুন করে অংকনের লক্ষ্যে। তিনি নিজে যা করতে পারতেন না তা কখনও তার সহযোদ্ধাদের কাঁধে চাপাতেন না। আল্লাহর তরবারির উপরে তার সৈনিকদের সীমাহীন বিশ্বাস ও আস্থার কারণেই তারা যে কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে সহজে মুকাবিলা করতে পারতো।

খালিদ (রা) অদম্য ঝড়ের গতিতে ইরাক ভূমির উপর দিয়ে বিচরণ করেছেন। এবারে তিনি একইভাবে অদম্য গতিতে সিরিয়ায় প্রবেশ করবেন এবং প্রচণ্ড আঘাত হানবেন আর একটি গর্বিত সাম্রাজ্যের বাহিনীর উপরে। আর সাম্রাজ্যটি হলো পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য।

চতুর্থ খণ্ড

সিরিয়া বিজয়

বিপজ্জনক অগ্রযাত্রা

হীরায় অবস্থানকালে খালিদ (রা) ৬৩৪ খৃস্টাব্দের মে মাসের শেষ দিকে খলীফার পত্রটি হাতে পান এবং পাঠ করেন ঃ

'মহান দয়াময় আল্লাহর নামে। আল্লাহর দাস আবু কাহাফের পুত্র আতীকের[২৮১] নিকট হতে আল ওয়ালীদের পুত্র খালিদের প্রতি। তার উপরে আল্লাহ্র শান্তি বর্ষিত হোক।

'সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ পাকের যিনি ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই এবং শান্তি বর্ষিত হোক সেই মহাপুরুষের প্রতি যাঁকে আল্লাহ তাঁর বাণীবাহক করে পাঠিয়েছেন।

'সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনী খুবই উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটাচ্ছে। তাদের সংগে যোগদান না করা পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রাখবে।

'আমি তোমাকে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করছি এবং তোমার প্রতি নির্দেশ হলো রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। আবু উবায়দা (রা) ও তার বাহিনীকে তোমার কমান্ডে ন্যস্ত করা হলো।

'ওহে সুলেইমানের পিতা ! সিরিয়া বিজয়ের মহান লক্ষ্য নিয়ে দ্রুত সামনে অগ্রসর হও এবং যারা আল্লাহর পথে সংগ্রামরত তাদের সংগে মিলিত হয়ে মহান আল্লাহর সাহায্য নিয়ে তোমার মিশন সম্পন্ন করো।

'তোমার বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে অর্ধেক মুসান্নার নেতৃত্বে ইরাকে রেখে যাও। খেয়াল রাখবে তোমার সংগে যেন অর্ধেকের বেশি যোদ্ধা না যায়। সিরিয়া বিজয়ের পর ইরাকে ফিরে আবার কমান্ড গ্রহণ করবে।

'অহংকারকে অন্তরে প্রবেশ করতে দিও না। কেননা অহংকার মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে। বিলম্ব কর না। প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি মানুষকে পুরস্কৃত করেন'।[২৮২]

এভাবে খালিদ (রা) সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মনোনীত হন।[২৮৩]

---

২৮১. প্রথম খলীফা আবূ বকর হিসেবে পরিচিত হলেও তার প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ এবং রাসূলে আকরাম (সা) তাঁকে আতীক নাম দিয়েছিলেন।

২৮২. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা - ৬০০-৬০৫। ওয়াকিদী ঃ ফুতূহ, পৃষ্ঠা - ১৪ (এই গ্রন্থের বাকি অংশে ওয়াকিদী বর্ণিত তথ্যসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে ফুতূহ-উশ-শাম হতে।

খালিদ (রা) সিরিয়া অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করেন। তিনি মুসান্নাকে খলীফার নির্দেশ অবহিত করেন এবং বাহিনীকে দুভাগ করে অর্ধেকের দায়িত্ব তার উপরে ন্যস্ত করেন। বাহিনীকে বিভক্ত করার সময় খালিদ (রা) পবিত্র রাসূল (সা)-এর বিখ্যাত সহচর মুহাজির ও আনসারগণকে তাঁর অংশে রাখার চেষ্টা করেন। এতে মুসান্না আপত্তি করলে তিনি তার আপত্তির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন এবং সে অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মুসান্নার যুক্তি ছিল যে, তার বাহিনীতেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কিছু বিখ্যাত সংগী থাকলে তাদের উপস্থিতি বিজয় অর্জনে সহায়ক হবে। কেননা এদের অনেকেই ছিলেন খুবই দক্ষ অফিসার এবং সৈনিকদের মধ্যে এদের অবস্থান ছিল অতি উঁচুতে। বাহিনীর বিভক্তি সম্পন্ন হলে খালিদ (রা) সিরিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

খলীফা আবূ বকর (রা) সাধারণত তার জেনারেলগণকে যে এলাকায় অভিযান পরিচালনা করতে হবে তার বর্ণনা দিতেন এবং প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করতেন বা উৎসের কথা বলে দিতেন। মিশন অর্জনের কৌশলগত ব্যাপারটি তিনি জেনারেলদের উপর ছেড়ে দিতেন। এটাই ছিল খলীফার কোনো জেনারেলকে মিশন দানের পদ্ধতি। এভাবেই তিনি খালিদ (রা)-কে ইরাক অভিযানের মিশন দিয়েছিলেন এবং এখন দিচ্ছেন সিরিয়া অভিযানের মিশন। এক্ষেত্রে খলীফার প্রদত্ত মিশন ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। খালিদ (রা)-কে যতো দ্রুত সম্ভব সিরিয়া পৌঁছে মুসলিম বাহিনীর সার্বিক কমান্ড গ্রহণ করতে হবে এবং বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত রোমান শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হবে। খালিদ কোন্ পথ ধরে সিরিয়া যাত্রা করবেন তা নির্ধারণের দায়িত্ব তার উপরেই ছেড়ে দেয়া হয় এবং এ মুহূর্তে সেটাই ছিল তাঁর সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর সঠিক অবস্থানও তার জানা ছিল না। তিনি শুধু এটুকু জানতেন যে, মুসলিমগণ বুসরা ও জাবিয়া এলাকায় অবস্থান নিয়ে আছে। তাঁকে সেখানে দ্রুত পৌঁছতে হবে।

জানামতে খালিদের সামনে সিরিয়া যাত্রার দুটো পথ খোলা ছিল। প্রথমটি দাউমাত-উল-জান্দাল হয়ে দক্ষিণ দিকের পথ। এই পথটি ছিল সুপরিচিত, সহজগম্য ও শত্রুর বাধামুক্ত। তদুপরি এই পথে ছিল পর্যাপ্ত পানির উৎস। তবে পথটি ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ যা অতিক্রম করতে পর্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজন। অথচ খলীফা তাঁর পত্রে সিরিয়ায় দ্রুত পৌঁছার ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা সেখানে অবস্থিত মুসলিম বাহিনীর অবস্থান ছিল নাজুক। সবদিক বিবেচনা করে খালিদ (রা) এই পথটি বাতিল করে দেন।

---

২৮৩. অন্যান্য বর্ণনায় বলা হয় খালিদ (রা) নিজেই এই কমান্ড গ্রহণ করেছিলেন অথবা অন্যান্য জেনারেল খালিদ (রা)-কে তাঁর দক্ষতার কারণে মুসলিম বাহিনী কমান্ডের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই বর্ণনাগুলো সঠিক নয়। খলীফাই খালিদ (রা)-কে সিরিয়া অভিযানে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করেছিলেন।

অপর পথটি ছিল উত্তর দিক দিয়ে ইউফ্রেটিসের তীর ধরে অগ্রসর হয়ে সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পৌঁছার। এটিও একটি বহুল ব্যবহৃত পথ তবে এই পথে অগ্রসর হলে খালিদ (রা) সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর অবস্থান হতে অনেক দূরে সরে যাবেন এবং ইউফ্রেটিসের তীরে অবস্থিত রোমান দুর্গের দ্বারা বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। এই বাধা অতিক্রম করা হয়তো তার জন্য কোনো সমস্যা নয়, কিন্তু তাতে অহেতুক বিলম্ব ঘটবে। তাকে সিরিয়া প্রবেশের বিকল্প ও সংক্ষিপ্ত পথ খুঁজতে হয়।

খালিদ (রা) তার অফিসারদেরকে ডেকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলেন, "আমাদেরকে এমন একটি পথ খুঁজে বের করতে হবে যে পথে অগ্রসর হলে রোমানগণ আমাদের পথ রোধ করতে সক্ষম হবে না।

তারা অবশ্যই এ চেষ্টা করবে যাতে আমরা মুসলিম বাহিনীর সাহায্যার্থে সিরিয়া পৌঁছতে না পারি।" তিনি ইউফ্রেটিসের উত্তর তীরে অবস্থিত রোমান দুর্গের প্রতি ইংগিত করছিলেন।

অফিসারগণ জানান, "আমাদের জানামতে এমন কোনো পথ নেই যা অনুসরণ করে একটি গোটা বাহিনী শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে যেতে পারবে, যদিওবা এক ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব হয়। গোটা বাহিনীকে বিপথে পরিচালনার ব্যাপারে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।" [২৮৪]

কিন্তু খালিদ (রা) একটি নতুন পথ খুঁজে বের করার ব্যাপারে ছিলেন সংকল্পবদ্ধ। তিনি প্রসংগটি আবার উত্থাপন করেন। উপস্থিত সকলে নিশ্চুপ থাকে। তবে রাফে বিন উমাইরা নামের একজন খ্যাতিমান যোদ্ধা সাড়া দেন। তিনি সামাওয়া এলাকা হয়ে একটি পথের সন্ধান দান করেন। মুসলিম বাহিনী সহজেই হীরা হতে যাত্রা করে আইন-উত-তামর ও মুজাআহ হয়ে কুরাকির পৌঁছতে পারবে। কুরাকির ছিল ইরাকের পশ্চিমে পর্যাপ্ত পানিসমৃদ্ধ একটি মরূদ্যান। এই কুরাকির হতে সুআ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে পানিশূন্য শুষ্ক মরুভূমির বুক চিরে এবং এই পথটি স্বল্প পরিচিত ও স্বল্প ব্যবহৃত। তবে সুআ পৌঁছতে পারলে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যাবে। তিনি এও জানতেন যে, সুআ পৌঁছার একদিন পূর্বের দূরত্বে একটি ঝর্ণা থাকার কথা যা মুসলিম বাহিনীর জন্য পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করতে সক্ষম। এই পথের সবচেয়ে বিপজ্জনক অংশ হচ্ছে কুরাকির হতে ঝর্ণা পর্যন্ত প্রায় ১২০ মাইল পথ পানিশূন্য মরুভূমির উপর দিয়ে অতিবাহিত করা।

পথের বর্ণনা শেষে রাফে খালিদ (রা)-কে এই বলে সতর্ক করেন, "একটি সৈন্য বাহিনীর জন্য এই পথ নির্বাচন করা ঠিক হবে না। এমনকি দীর্ঘপথ ভ্রমণের প্রত্যাশী একজন পথিককেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই পথে পা বাড়াতে হবে। এই পথ নির্বাচন করলে একফোঁটা পানি ছাড়াই শুকনা বালুকারাশির উপর পাঁচদিনের কষ্টকর যাত্রা ও মরুভূমির বুকে পথ হারানোর সার্বক্ষণিক ঝুঁকি নিয়েই তা করতে হবে।"[২৮৫] উপস্থিত

---

২৮৪. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬০৩

২৮৫. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা - ৬০৯।

অফিসারগণও তার কথায় মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। বস্তুত এরকম একটি বিপজ্জনক পথে যা অনুসরণ করলে পথ হারিয়ে তৃষ্ণায় প্রাণত্যাগের আশংকা বেশি। একটি বাহিনীকে মার্চ করানোর সিদ্ধান্ত একজন স্বাভাবিক বিবেকসম্পন্ন লোকের পক্ষে নেয়া সম্ভব নয়।

খালিদ (রা) শান্ত স্বরে বলেন, "আমরা এই পথ ধরেই অগ্রসর হবো।" উপস্থিত অফিসারদের চোখেমুখে ভীতির চিহ্ন দেখে তিনি বলেন, "তোমাদের উদ্যম হারাবে না। এটা মনে রাখবে যে, তোমরা তোমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী আল্লাহর সাহায্য পাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাকের সাহায্যের আশ্বাস আছে ততক্ষণ মুসলমানদের কোনো কিছুকেই ভয় করা উচিত নয়।" [২৮৬]

খালিদ (রা)-এর এই কথার ফলাফল সংগে সংগে পাওয়া যায়। উপস্থিত অফিসারগণ সমস্বরে জবাব দেন, "আপনি এমন একজন ব্যক্তি যাঁর উপরে আল্লাহর রহমত আছে। আপনি আপনার ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।"[২৮৭] এরপর অপরিসীম উদ্দীপনা সহকারে খালিদের বাহিনী এমন একটি পথে মার্চ করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে, যে পথে পূর্বে কখনও কোনো সৈন্যবাহিনী যাত্রা করেনি এবং যে পথটি শুধু রাফে বিন উমাইরা নামে একজন ব্যক্তিরই জানা ছিল। (১৫ নম্বর ম্যাপ দ্রঃ)

৬৩৪ খৃস্টাব্দের জুন মাসের প্রথম দিকে (১৩ হিজরীর রবিউল আখির মাসের প্রথম দিকে) খালিদ ৯,০০০[২৮৮] সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে হীরা ত্যাগ করেন। সংগে কোনো মহিলা ও শিশুকে নেয়া হয় না। বরং খালিদ (রা) তাদেরকে মদীনা প্রেরণের নির্দেশ দান করেন। তারা সেখানেই নিরাপদে অবস্থান করবে এবং সুবিধা মতো সময়ে সিরিয়ায় গমন করবে। খালিদের বাহিনী আইন-উত-তামর, সান্দাউদা ও মুজাআহ হয়ে কুরাকির পৌঁছে যায়। মুসান্না এই পর্যন্ত খালিদ (রা)-কে সংগ দেন এবং এখান থেকে পারস্যের ভূখণ্ডে ইসলামী রাষ্ট্রের নতুন সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের লক্ষ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। মুসলিম বাহিনী কুরাকিরে তাঁবু ফেলে রাত যাপন করে এবং পানির চামড়ার পাত্রসমূহ এমনভাবে ভর্তি করে নেয় যাতে পরবর্তী পাঁচদিন তা দিয়ে অতিবাহিত করা যায়। পরদিন প্রত্যুষে খালিদ (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে এই বিপজ্জনক পথে পা বাড়াবেন এমন সময় রাফে তার সামনে উপস্থিত হয়ে পূর্বের আবেদনটি পুনরায় পেশ করেন। পথপ্রদর্শক হিসেবে তিনি যেন নিজের উপরে আস্থা হারিয়েছেন এমন ভংগিতে বলেন, 'ওহে কমান্ডার! আপনি একটি গোটা সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই মরুভূমি অতিক্রম করতে পারবেন না। আল্লাহর দোহাই, এমনকি দীর্ঘ পথ ভ্রমণের প্রত্যাশী পথিকও শুধুমাত্র জীবনের ঝুঁকি নিয়েই এই পথে যাত্রা করতে পারে।"

---

২৮৬. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা - ৬০৩।
২৮৭. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা - ৬০৯।
২৮৮. এই সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন সংখ্যার যেমন ৫০০, ৭০০, ৮০০, ৬০০০, ৯০০০ উল্লেখ আছে। তবে সর্বশেষ সংখ্যাটিই সঠিক। কেননা খলীফার নির্দেশে খালিদ (রা) মুসলিম বাহিনীর অর্ধেক সৈন্য নিয়ে ইরাক ত্যাগ করেছিলেন। প্রাথমিক যুগের সব ঐতিহাসিক এই সংখ্যা ৯০০০ বলে উল্লেখ করেছেন।

ম্যাপ ১৫৪ বিস্ময়কর অগ্রযাত্রা
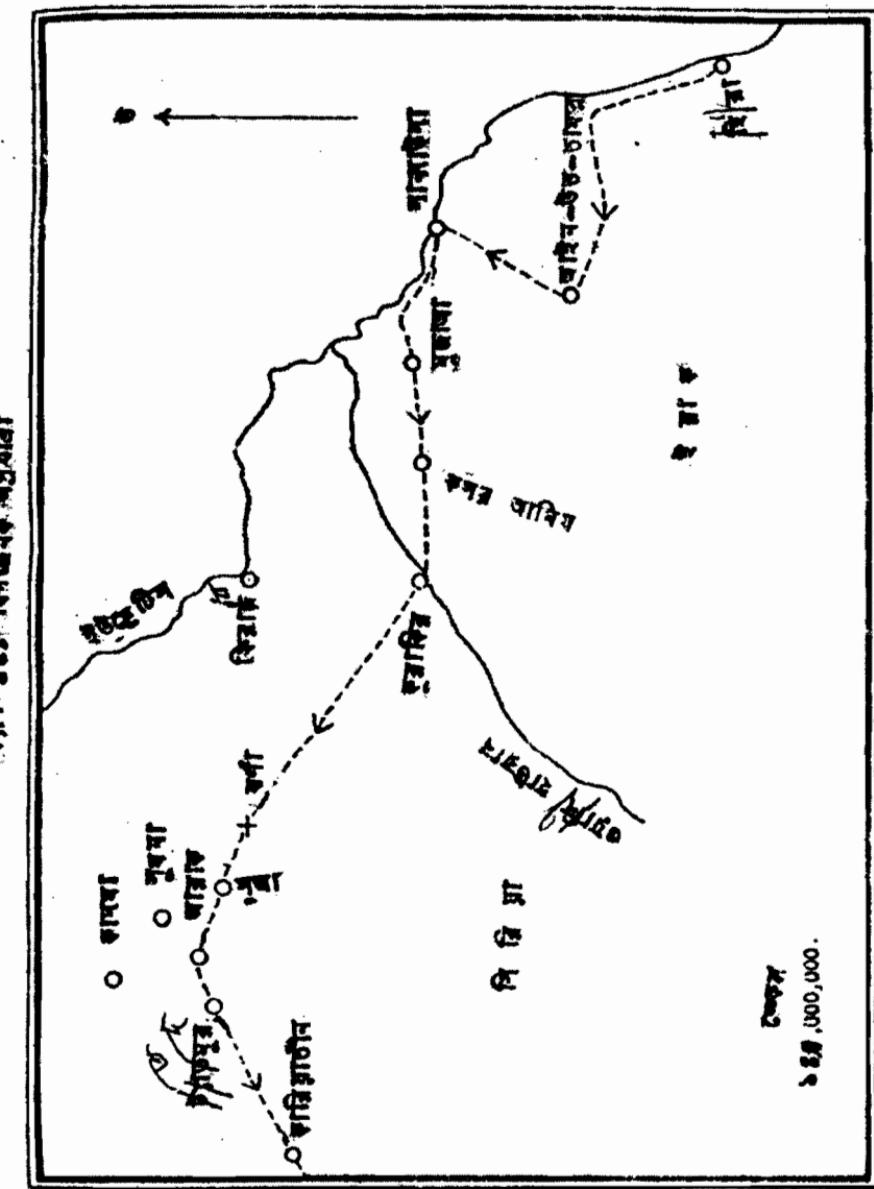
খালিদ (রা) তাঁর দিকে রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, "ওহে হতভাগ্য রাফে! আমি আল্লাহর নামে বলছি, আমার সামনে যদি সিরিয়ায় দ্রুত পৌছার আরও কোনো সংক্ষিপ্ত রাস্তার পরিচয় থাকত তবে আমি তাই অনুসরণ করতাম। নির্দেশ অনুযায়ী যাত্রা করো।"[২৮৯]

খালিদের নির্দেশে রাফে ৯,০০০ সৈন্যের মুসলিম বাহিনীর সামনে অবস্থান নিয়ে মরুভূমির বুকে যাত্রা শুরু করেন। স্বাভাবিকভাবেই অশ্বারোহী দল সামনে এবং বাকিরা উটের পিঠে চড়ে তাদেরকে অনুসরণ করতে থাকে। সময়টি ছিল জুন মাস। সূর্য বালুকারাশির উপরে নির্দয়ভাবে তাপ বর্ষণ করে পানিশূন্য মরুভূমির বুক হতে প্রাণের স্পন্দন ও অতি সাহসী লোকদের চলাচলের পদচিহ্নটুকুও মুছে ফেলেছে। কোনো স্বাভাবিক বিবেকসম্পন্ন মানুষের পক্ষে বিশেষ করে বছরের এই সময়ে এরূপ একটি বাহিনী নিয়ে এবং যখন তাদের নিরাপদে সিরিয়ায় পৌছার ওপর নির্ভর করছে সেখানকার মুসলিম বাহিনীর ভাগ্য, এই বিপজ্জনক যাত্রা শুরু করার কথা নয়। কিন্তু ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিজয়গুলো স্বাভাবিক বিবেক দিয়ে সবদিকের নিরাপত্তা বিধান করে অর্জিত হয়নি। এই বিপজ্জনক অভিযাত্রায় অংশগ্রহণকারী লোকগুলো ছিল বহু বিস্ময়কর অভিযানের সফল নায়ক 'আল্লাহর তরবারির' অনুসারী এবং তারা ইতিহাসের একটি অন্যতম মহান সামরিক অভিযানে পা বাড়িয়েছে।

প্রথম তিনদিন কোনো ঘটনা ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে যায়। তবে রৌদ্রের খরতাপ ও বালুর উপর আলো বিকিরণের ফলে প্রত্যেকটি সৈনিক ভয়ানক রকমের ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই কষ্টকে তারা আদৌ কষ্ট মনে করে না যতক্ষণ পর্যন্ত খাবার পানি ছিল। .... সমস্যা হলো, যে পানি পাঁচদিন চলার কথা তা তিন দিনের মাথায় শেষ হয়ে যায়। তাদের সামনে আরও দুই দিনের পথ বাকি অথচ এক ফোঁটা পানিও নেই।[২৯০]

চতুর্থ দিনের যাত্রা শুরু হয়। কারো মুখে কোনো কথা নেই। তাপের মাত্রা পূর্বের তুলনায় যেন বেশি করে অনুভূত হতে থাকে। সবার মনে একই আশংকা যদি রাফে পথ ভুল করে বা হারিয়ে ফেলে তাহলে পিপাসায় প্রাণ বিসর্জন দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। দিনের শেষে রাত আসে। সবাই তাঁবু ফেলে ঘুমানোর চেষ্টা করে কিন্তু কারও চোখেই ঘুম আসে না। জিভ নাড়তে নাড়তে তা ফুলে যায়। এই অবস্থায় বুকফাটা তৃষ্ণার আগুন নিয়ে সকলে শুধু এই প্রার্থনা করতে থাকে, "আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি সবচেয়ে বড় রক্ষক।"[২৯১]

---

২৮৯. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা -৬০৯।

২৯০. এই যাত্রায় উটের পেটের ভিতরে পানি বহন করার যে রোমাঞ্চকর গল্প প্রচলিত আছে তার ব্যাখ্যার জন্য পরিশিষ্ট 'খ'-এর ৯ নম্বর নোট দ্রঃ।

২৯১. কুরআন ঃ ৩ ঃ ১৭৩।

পঞ্চম দিনের সকাল বেলা এই বিপজ্জনক যাত্রার শেষ পর্যায় শুরু হয়। রাফের জানামতে এই পর্যায়ের শেষেই একটি ঝর্ণার সন্ধান লাভ করার কথা। ক্লান্ত-শ্রান্ত সৈনিকগণ মাইলের পর মাইল দীর্ঘ পথ নীরবে অতিক্রম করতে থাকে। নির্দয় মরুভূমির খর-রৌদ্র তাপে সিদ্ধ হয়ে তারা একেকটি দীর্ঘ ঘণ্টা অতিবাহিত করতে থাকে। দিনের শেষে সবাই প্রাণে বেঁচে থাকলেও তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে এবং তাদের ধৈর্য মানবীয় সহ্য সীমার শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায়। তাদের অনেকেই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং যে কোনো সময় পথের ধারে পড়ে যাওয়ার আশংকা নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকে যদি বা কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছে পানির সন্ধান পাওয়া যায়।

যাত্রীদলের অগ্রভাগ সেই কাঙ্ক্ষিত এলাকায় যেখানে ঝর্ণাটি থাকার কথা, পৌঁছার পর রাফে চোখে কিছুই দেখতে পান না। তিনি পূর্ব থেকেই দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতায় ভুগছিলেন এবং মরুভূমির প্রখর তাপের বিকিরণের ফলে তার দৃষ্টিশক্তি শূন্যের কোটায় পৌঁছে যায়। তিনি তার মাথার পাগড়ির এক অংশ দিয়ে চোখ ঢেকে ফেলেন এবং উটকে থামিয়ে দেন। তার পিছনের লোকজন এই অবস্থা দেখে আতংকিত হয়ে পড়েন এবং ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, "ওহে রাফে! আমরা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি! তুমি কি পানির সন্ধান পেয়েছ?" কিন্তু রাফে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। তিনি ভাঙা গলায় ফিস্ ফিস্ করে বলেন, "নারীর স্তনের মতো পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি পাহাড় চূড়ার সন্ধান করো।" সংগে সংগে কয়েকজন ছুটে যায় এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে উক্ত চূড়াদ্বয়ের সন্ধান লাভের সংবাদ দান করে।

"উপবিষ্ট মানুষের আকৃতির মতো একটি কাঁটা গাছের সন্ধান করো", রাফে পুনরায় নির্দেশ দান করেন। কয়েকজন আবার ছুটে যায় এবং কিচুক্ষণ পর ফিরে এসে জানায় যে অনুরূপ কোনো গাছের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

"আল্লাহ আমাদের মালিক এবং শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবো" রাফে কুরআনের এই বাণীটি উচ্চারণ করেন এবং বলেন, "তাহলে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাবো। তবে তার পূর্বে আর একবার সবাই কাঁটা গাছটির সন্ধান করো।" লোকজন আবার গাছটির সন্ধানে লেগে যায় এবং এবারে কাঁটা গাছের একটি কাণ্ডের সন্ধান পায় যার বাকি অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। এই খবর শুনে রাফে নির্দেশ দেন, "কাণ্ডটির গোড়া খনন করো।"[২৯২] লোকজন তাই করে এবং ওয়াকিদীর ভাষায়, "ভূগর্ভ থেকে নদীর স্রোতের মতো পানি প্রবাহিত হতে থাকে।"[২৯৩]

প্রত্যেকটি লোক তৃপ্তি সহকারে পানি পান করে এবং মহান আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও তার দরবারে রাফের জন্য রহমত কামনা করতে থাকে। পশুগুলোকে পানি পান করানো হয় এবং তারপরও পানি উদ্বৃত্ত থাকে। শত শত সৈনিক চামড়ার পাত্রে পানি ভরে পিছিয়ে পড়া সহযোদ্ধাদের সন্ধানে ছুটে যায় এবং তাদেরকে জীবন্ত একত্র করতে সক্ষম হয়।

---

২৯২. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬০৯।
২৯৩. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা - ১৪।

এই বিপজ্জনক যাত্রার এখানেই সমাপ্তি হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা সফলভাবেই সমাপ্ত হয়। এরূপ ঝুঁকিপূর্ণ অগ্রযাত্রা পূর্বে কখনও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। খালিদ (রা) সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় পৌঁছে গেছেন। তিনি পিছনে ফেলে এসেছেন রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্ত এবং তাদের ইরাকমুখী দুর্গ। আর মাত্র একদিনের যাত্রাপথ পার হলেই বসতি এলাকায় পৌঁছা যাবে। (১৫ নম্বর ম্যাপ দ্রঃ)।

খালিদ (রা) গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, তাঁর বাহিনী জাহান্নামের শাস্তি অতিক্রম করে এসেছে এবং তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। মুসলিম বাহিনী কি পরিমাণ ঝুঁকির মধ্য দিয়ে এই মরুভূমি অতিক্রম করেছে তা খালিদ (রা) পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন যখন রাফে (রা) তার নিকট গিয়ে মৃদু হেসে বলেন, "ওহে কমান্ডার! আমি আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে বালক বয়সে আমার বাবার সংগে এই পথে মাত্র একবার ভ্রমণ করেছিলাম এবং এই ঝর্ণাটি দেখেছিলাম।"[২৯৪]

পরবর্তীকালে জনৈক খলীফার দ্বারা আদিষ্ট হয়ে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি মুসলিম শাসনাধীন ভূখণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে সিরিয়া প্রসংগে লিখেছিলেন, "ওহে মুমিনদের নেতা! সিরিয়া একটি প্রাচুর্যের দেশ। এখানকার পাহাড়, মেঘমালা, বাতাস, বিশেষ করে ইমেসার (হেম্স) আবহাওয়া, মানুষের শরীর ও মনকে পরিচ্ছন্ন করে। এখানকার পানি বিশুদ্ধ যা মানুষের অনুভূতিকে ধারালো করে। সিরিয়ার প্রকৃতি সবুজ তৃণরাজি ও বনভূমি দ্বারা সমৃদ্ধ। এখানকার নদীগুলো প্রকৃতিকে আরো সুন্দর করেছে। এখানে উটের জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত খাবার পানি।"[২৯৫]

আসলেই সিরিয়া ছিল একটি সুন্দর ভূমি–বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের সুন্দরতম প্রদেশ। পাশেই ভূমধ্য সাগরের উপস্থিতির কারণে মরুভূমির খরতাপ ও উত্তরের ঠাণ্ডা থেকে সিরিয়ার আবহাওয়া ছিল মুক্ত। বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের এশীয় অংশের রাজধানী ছিল এন্টিওক যা এখন তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত। রাজনৈতিক গুরুত্ব ও সমৃদ্ধির দিক থেকে এই এন্টিওকের অবস্থান ছিল কনস্টান্টিনোপলের পরপরই সিরিয়ার আলেপ্পো, হেমস ও দামেস্কের ন্যায় শহরগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে সমৃদ্ধি লাভের পাশাপাশি সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবেও গড়ে উঠেছিল। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী লাতাকিয়া, ত্রিপলী, বৈরুত, টায়ার, আক্রা ও জাফা সমুদ্রবন্দর সমূহ পৃথিবীর বিখ্যাত ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

রাজনৈতিকভাবে সিরিয়া ছিল দুটি প্রদেশে বিভক্ত। একটি ছিল সিরিয়া নামেই পরিচিত যার বিস্তৃতি উত্তরে এন্টিওক ও আলেপ্পো হতে মরু সাগরের উপর পর্যন্ত।

---

২৯৪. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬০৪, ৬০৯। খালিদ অনুসৃত পথের ব্যাপারে যে ভিন্ন বর্ণনা আছে, তার ব্যাখ্যার জন্য পরিশিষ্ট 'খ'-এর ১০ নম্বর নোট দ্রঃ।

২৯৫. মাসউদী ঃ মুরুজ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬১-২।

মরু সাগরের উত্তর ও পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল অপর প্রদেশ ফিলিস্তিন। এই প্রদেশটিও ছিল একাধিক ধর্মের পবিত্র স্থান ও বিখ্যাত শহরে সমৃদ্ধ। ঐ সময়ে আরবের লোকদের নিকট জর্দান একটি প্রদেশ হিসেবে পরিচিত হলেও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে এর তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। জর্দানের অবস্থান ছিল পূর্বোক্ত দুই প্রদেশের মধ্যবর্তী এলাকায়। উল্লেখিত এলাকাসমূহ নিয়ে গঠিত হয়েছিল পূর্ব রোম বা বায়যান্টাইন সাম্রাজ্য। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সিরিয়া আক্রমণ করা মানেই রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করা, আর এই কাজটি যেনতেনভাবে করার কোনো উপায় ছিল না।

অবশ্য রোমান সাম্রাজ্যের অবস্থাও ছিল পতনোন্মুখ। আর এই পতন শুরু হয়েছিল পারস্য সাম্রাজ্যের পতন শুরুর পূর্বেই। তা সত্ত্বেও পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী ছিল খুবই শক্তিশালী এবং গোটা পৃথিবীতে শক্তির দিক থেকে এর অবস্থান ছিল পারস্য বাহিনীর পরপরই। পূর্ব রোমান বাহিনী ছিল সুসজ্জিত এবং দক্ষ কমান্ডার দ্বারা পরিচালিত। যে কোনো অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা প্রতিপক্ষের মনে ভীতিকর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম ছিল। অন্য যে কোনো সাম্রাজ্যের বাহিনীর মতোই রোমান বাহিনীও ছিল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী হতে সংগৃহীত যোদ্ধাদের দ্বারা গঠিত। এই বাহিনীতে ছিল রোমান, স্লাভ, ফ্রাংক, গ্রীক, জর্জীয়, আর্মেনীয়, আরব ও বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন গোত্রের যোদ্ধাগণ। এই যোদ্ধাগণ সিরিয়ার বিভিন্ন সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান নিয়ে থাকতো।

ইরাকের মতো সিরিয়ার কিছু এলাকাও বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ অংশ ছিল আরবভূমির অন্তর্গত। আরবগণ এই এলাকায় রোমান শাসনের পূর্ব হতেই বসবাস করতো এবং খৃস্টপরবর্তী চতুর্থ শতকে সম্রাট কনস্টানটাইন তার সাম্রাজ্যে খৃস্ট ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করলে আরবগণও এই ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু ইয়েমেন হতে শক্তিশালী গাস্সান গোত্র সিরিয়ায় অভিবাসন করার পূর্ব পর্যন্ত আরবরা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ জনশক্তি ছিল না। গাসসানগণ ইসলামের আবির্ভাবের শতাধিক বছর পূর্ব হতে সিরিয়ায় বসবাস শুরু করে। সিরিয়ায় আগমনের পর গাসসানগণ বেশকিছু সময় ধরে পূর্বাঞ্চলের রোমান দুর্গগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। রোমানগণ তাদের সামরিক মনোবল ও যোদ্ধাসুলভ গুণাবলী প্রত্যক্ষ করে তাদের সংগে শান্তি স্থাপন করে এবং তাদেরকে নিজেদের রাজার অধীনে আধা-স্বায়ত্তশাসিত শক্তি হিসেবে সিরিয়ায় বসবাসের অনুমতি প্রদান করে। এভাবেই গাসসান বংশ রোমান সাম্রাজ্যের একটি অন্যতম রাজবংশে পরিণত হয় এবং বুসরাকে রাজধানী করে তারা জর্দান ও সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের আরবদেরকে শাসন করতে থাকে। খালিদের সিরিয়া অভিযানকালে সর্বশেষ গাসসান রাজার নাম ছিল জাবালা বিন আল-আইহাম। এই লোকটিও ছিল পূর্বে উল্লেখিত আদী বিন হাতিমের মতো আরবের ইতিহাসের দীর্ঘতম ব্যক্তি। ঘোড়ায় চড়লে তারও পা মাটি স্পর্শ করতো[২৯৬]।

---

২৯৬. ইবনে কুতায়বা ঃ পৃষ্ঠা - ৬৪৪।

ত্রয়োদশ হিজরীর শুরুর দিকে মুসলিম অভিযানের প্রাক্কালে এই ছিল সিরিয়ার রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থা।

সিরিয়ায় যার নেতৃত্বে প্রথম সামরিক অভিযান পরিচালিত হয় তার নামও ছিল খালিদ, পূর্ণ নাম খালিদ বিন সাঈদ। যদিও তার সামরিক দক্ষতা ছিল খালিদ (রা)-এর বিপরীত। ১২ হিজরীর শেষের দিকে (৬৩৪ খৃস্টাব্দের শুরুতে) খলীফা তার নেতৃত্বে একটি সৈন্য দলকে মদীনার উত্তরে কিছু দূরে তিহামায় অবস্থান গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। খলীফার পরিকল্পনা অনুযায়ী এই দলটি ছিল একটি রিজার্ভ শক্তি।

তিহামায় অবস্থানকালে খালিদ বিন সাঈদের মনে সিরিয়া আক্রমণের খেয়াল চাপে এবং তিনি এ ব্যাপারে খলীফার অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলীফার মনে এরূপ একটি ক্ষুদ্র বাহিনী দিয়ে সিরিয়া বিজয়ের লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনার কোনো পরিকল্পনা ছিল না, বিশেষ করে খালিদ বিন সাঈদের মতো একজন উদাস প্রকৃতির ও অপরীক্ষিত জেনারেলের নেতৃত্বে। সিরিয়ার সামরিক শক্তি সম্পর্কে মুসলমানদের কোনো ধারণা ছিল না। তাই খলীফা এটাকে একটি সসৈন্যে পরিদর্শনমূলক অভিযান (Reconnaissance in force) হিসেবে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। খলীফা খালিদ বিন সাঈদকে পত্র মারফত সিরিয়া প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন। তবে তিনি সতর্ক করে দেন এমন কোনো সংঘর্ষে জড়িয়ে না পড়ার জন্য যাতে তাঁকে অসম্মানজনকভাবে প্রত্যাহার করতে হয়।

খালিদ বিন সাঈদ তার ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করেই রোমান বাহিনীর এক অংশের মুখোমুখি হয়ে পড়েন। বাহান নামের তার প্রতিপক্ষের কমান্ডার ছিল দক্ষ কৌশলী এবং সে মুসলিম বাহিনীকে প্রলুব্ধ করে ফাঁদে ফেলে ঘিরে ফেলতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় খালিদ বিন সাঈদ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে অধিকাংশ সহযোদ্ধাকে শত্রুর হাতে ফেলে নিজে পালাতে সক্ষম হন। ফাঁদেপড়া মুসলমানদের সৌভাগ্য যে, তাদের দলে ইকরামা বিন আবু জহলও ছিলেন। তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে মুসলিম বাহিনীকে সম্ভাব্য বিষাদময় ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করেন। ইকরামা মুসলিম বাহিনীকে নিরাপদে প্রত্যাহার করতে পারলেও এই অভিযানটির ললাটে পরাজয়ের গ্লানি খচিত হয়ে যায়। খালিদ বিন সাঈদ একটা অসম্মানজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন এবং খলীফাও তাকে তিরস্কার করতে দ্বিধা করেন না (অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি মুসলিম বাহিনীর সংগে সিরিয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করে শাহাদৎ বরণ করেন)।

এই সংঘর্ষটির সঠিক অবস্থান সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে সংঘর্ষটি হয়েছিল দামেস্কের দক্ষিণে মারজ-উস-সাফার এলাকায়। কিন্তু এটা সম্ভব নয় এই কারণে যে, রোমান বাহিনীর সঙ্গে কোনো সংঘর্ষ ব্যতিরেকে ক্ষুদ্র

মুসলিম বাহিনীর পক্ষে সিরিয়ার অতো ভিতরে প্রবেশ সম্ভব নয়। এই অভিযানের ব্যর্থতা থেকে খলীফা এই শিক্ষা লাভ করেন যে, সিরিয়া অভিযানের বিষয়টি হালকাভাবে নেয়ার মতো বিষয় নয়।

৬৩৪ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মক্কা থেকে বার্ষিক হজ পালন শেষে মদীনায় ফিরে খলীফা সিরিয়া অভিযানের জন্য মুসলিম যোদ্ধাদেরকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান। ইরাকে খালিদ (রা)-এর তুলনাবিহীন সাফল্য শুধু ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানাই বৃদ্ধি করেনি, সেই সঙ্গে পূর্ণ হয়েছে রাষ্ট্রের কোষাগারও। মুসলিমগণ অনুভব করেন যে, তারা দুর্ভেদ্য পারস্য শক্তিকে পরাজিত করতে পারলে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী রোমানদের বিরুদ্ধে কেন জয়ী হতে পারবে না? তদুপরি নতুন ইসলামী আন্দোলনের ঢেউকে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে মানবতার মুক্তির জন্য এবং তার বাণীকে অবশ্যই প্রতিটি মানুষের নিকট পৌঁছাতে হবে। খলীফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আরব উপদ্বীপের প্রত্যন্ত এলাকা হতে বিভিন্ন গোত্রের হাজার হাজার সৈনিক একত্রিত হতে থাকে। এমনকি ওমান ও ইয়েমেন হতেও সৈন্যদল আসে। তারা সশস্ত্র অবস্থায় বাহনসহ আসলেও সংগে নারী ও শিশুদের নিয়ে আসে। যারা একবার স্বধর্ম ত্যাগ করেছিল তাদেরকে এই আহ্বানের বাইরে রাখা হয়। ৬৩৪ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসের (মুহাররম, ১৩ হিজরী) মধ্যেই এই সমাবেশ সম্পন্ন হয়।

খলীফা আবূ বকর (রা) সমবেত মুসলিম বাহিনীকে চারটি কোরে বিভক্ত করেন। নিম্নে কোর কমান্ডারদের নাম ও তাদেরকে প্রদত্ত লক্ষ্যবস্তুর উল্লেখ করা হলো ঃ

ক) আমর ইবনুল আস ঃ লক্ষ্যবস্তু ফিলিস্তীন। ঈলার পথ ধরে অগ্রসর হয়ে আরাবা উপত্যকা অতিক্রম করবে।

খ) ইয়াযীদ বিন আবী সুফিয়ান ঃ লক্ষ্যবস্তু দামেস্ক। তাবুকের পথ ধরে অগ্রসর হবে।

গ) শুরাহবীল বিন হাসানা ঃ লক্ষ্যবস্তু জর্দান। ইয়াযীদের পরে তাবুকের পথ ধরে অগ্রসর হবে। (শুরাহবীল খালিদের অধীনে ইরাক অভিযানে অংশগ্রহণের পর সংবাদবাহক হিসেবে সম্প্রতি মদীনায় আগমন করেন। খলীফা তাকে মদীনায় রেখে দেন এবং সিরিয়া অভিযানে কোর কমান্ডার হিসেবে মনোনীত করেন)।

ঘ) আবু উবায়দা বিন আল জাররাহ ঃ লক্ষ্যবস্তু হেম্স। শুরাহবীলের পর তাবুকের পথ ধরে অগ্রসর হবে।

খলীফার ইচ্ছা ছিল সিরিয়া আক্রমণ করে যতবেশি সম্ভব এলাকা আয়ত্তে আনার (১৬ নম্বর ম্যাপ দ্রঃ)। রোমানবাহিনীর আকার ও সঠিক অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকার কারণে একটি কোরকে আর একটির সংগে একত্র করা থেকে বিরত থাকেন। তবে তিনি এটা অনুমান করতে পারেন যে, রোমান সাম্রাজ্য যে কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে বিশাল বাহিনীর সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম। তাই তিনি তার কোর কমান্ডারদেরকে এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, তারা একে অপরের সংগে সংযোগ রক্ষা করবে এবং প্রয়োজন

হলে একে অপরের সাহায্যে দ্রুত অগ্রসর হবে। যদি এমন হয় যে, চারটি কোরকে একত্রিত হয়ে একটি যুদ্ধে শরীক হতে হয় তাহলে গোটা মুসলিম বাহিনীর কমাণ্ড গ্রহণ করবেন আবূ উবায়দা।

৬৩৪ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে (১৩ হিজরীর সফর মাসের শুরুতে) মুসলিম বাহিনী সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। প্রথম মদীনা ত্যাগ করেন ইয়াযীদ। খলীফা তাঁর সংগে হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূর অগ্রসর হন এবং বিদায়ী উপদেশ প্রদান করেন, যা নিম্নরূপ ঃ

যাত্রা চলাকালে নিজেকে এবং নিজের লোকদেরকে কষ্ট দিও না। অধীন সৈনিক ও অফিসারদের সংগে কর্কশ ব্যবহার করবে না বরং সব ব্যাপারে তাদের সংগে পরামর্শ করবে। ন্যায় পথে থাকবে এবং অন্যায় ও অত্যাচারের পথ পরিহার করবে। অন্যায়-অত্যাচার করে কোনো জাতি তার প্রতিপক্ষের উপর জয়ী হতে পারে না।

শত্রুর সংগে সাক্ষাৎ হলে তাকে কখনও পিঠ দেখাবে না। অবশ্য কৌশলগত কারণে প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা। যারা আল্লাহর পথ হতে শত্রুকে পিঠ দেখায় তারা আল্লাহর ক্রোধের সম্মুখীন হয়।

শত্রুকে পদানত করার পর তাদের নারী, শিশু, বৃদ্ধলোক ও পশুকে হত্যা করবে না। অবশ্য খাবার প্রয়োজনে পশু হত্যা করা যাবে। একবার চুক্তি স্বাক্ষর করলে তা আর ভঙ্গ করবে না।

উপাসনালয়ে অবস্থানকারী ধর্মযাজকদের হত্যা করবে না এবং উপাসনালয় ধ্বংস করবে না। তোমরা এমন কিছু লোকের দেখা পাবে যারা শয়তানের অনুসারী এবং ক্রুশের পূজারী। তাদের বিরুদ্ধে তরবারি চালাবে যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে অথবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়।

আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হেফাজতে দিয়ে দিলাম।[২৯৭]

খলীফা এই একই বিদায়ী উপদেশবাণী প্রতিটি কোর কমান্ডারের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করেন। আবূ বকর (রা) এই কাজের মধ্য দিয়ে রাসূল (সা)-এর পদাংক অনুসরণ করেন। রাসূল (সা)ও কোনো বাহিনীকে বিদায়ের বেলা এই বলে উপদেশ দান করতেন, "আল্লাহর নামে যুদ্ধ করো। সীমালংঘন ও বিশ্বাসঘাতকতা করিও না। কারও অংগছেদ করবে না এবং নারী ও শিশুদের উপরে অস্ত্র চালনা করবে না। উপাসনালয়ে বসবাসকারী ব্যক্তিদেরকে হত্যা করবে না।"[২৯৮]

জানা যায় যে, খলীফা আবূ বকর (রা) ইয়াযীদের সংগে দু'মাইল হেঁটেছিলেন। ইয়াযীদ তাঁকে ফিরে যেতে বললে তিনি বলেছিলেন,"আমি আল্লাহ্‌র রসূলকে বলতে শুনেছি, যে পা আল্লাহর পথে ধুলিযুক্ত হয় দোযখের আগুন তা কখনও স্পর্শ করবে না।"[২৯৯]

---

২৯৭. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা - ৪।
২৯৮. আবু ইউসুফ ঃ পৃষ্ঠা- ১৯৩-৫ ।
২৯৯. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা - ৬।

ম্যাপ ১৬ঃ সিরিয়া অভিযান
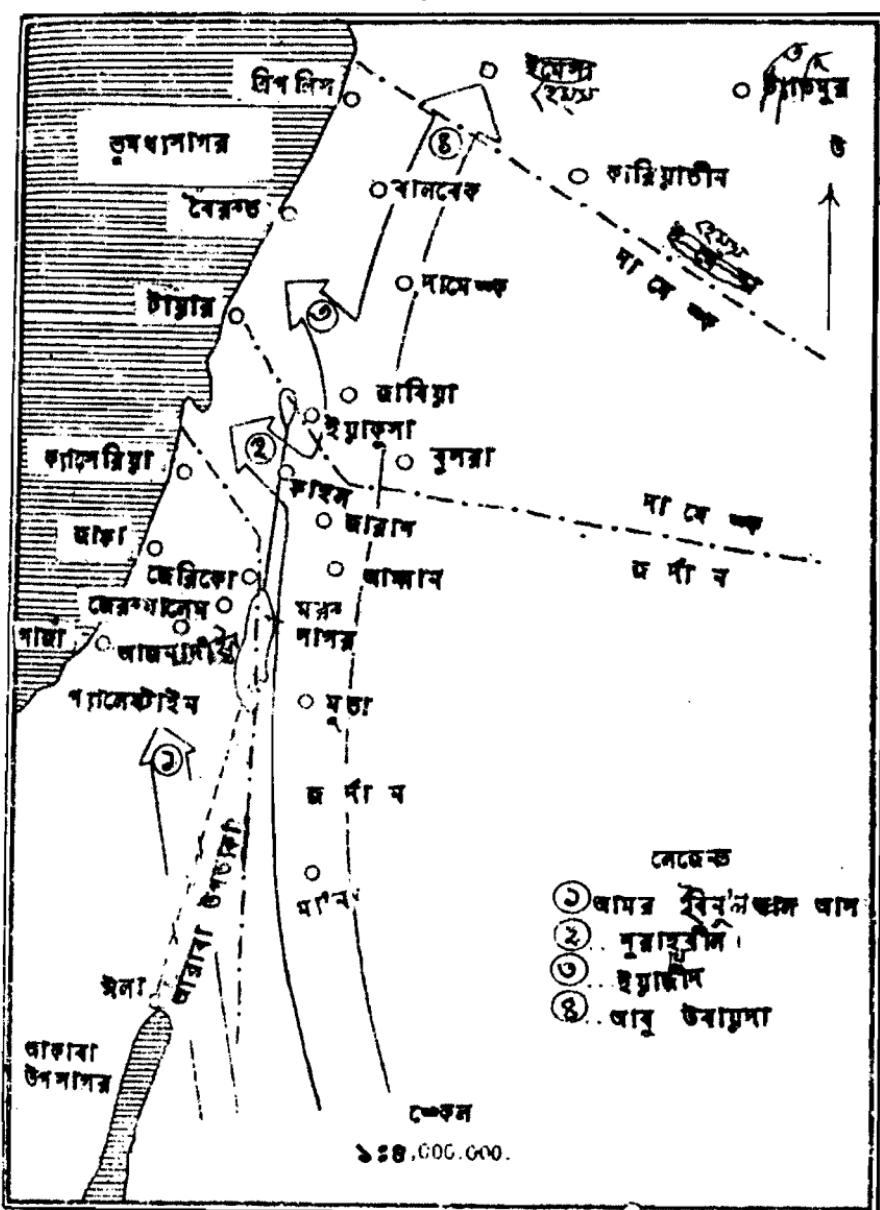
খলীফার মুখের এই বাণীর অনুরণন কানে নিয়ে ইয়াযীদ মদীনা ত্যাগ করেন। সিরিয়া অভিযানের এখানেই সূত্রপাত হয়।

ইয়াযীদ, শুরাহ্‌বীল ও আবু উবায়দা প্রত্যেকেই তাবুকের পথ ধরে একদিনের ব্যবধানে যাত্রা শুরু করেন। আমর ইবনুল আসও ঈলার পশ্চিম দিকের পথ ধরে যাত্রা শুরু করেন। ইয়াযীদ তাবুক হতে যাত্রার দুই অথবা তিনটি পর্যায় অতিক্রম করতেই রোমান বাহিনী কর্তৃক প্রেরিত আরব খৃস্টানদের একটি পরিদর্শনকারী দলের সম্মুখীন হন। একটি সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পর এই আরবগণ দ্রুত প্রত্যাহার করে চলে যায়। এরপর ইয়াযীদ আরাবা উপত্যকায় মরু সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে উপনীত হন। (১৬ নম্বর ম্যাপ দ্রঃ)।

ইয়াযীদ ও আমর ইবনুল্ আস প্রায় একই সময়ে যথাক্রমে আরাবা উপত্যকা ও ইলায় উপনীত হন। উভয় কোর প্রায় সমসংখ্যক সৈন্যের রোমান বাহিনীর মুকাবিলা করে যাদেরকে প্রধান রোমান বাহিনী থেকে পাঠানো হয়েছে প্যালেস্টাইনে মুসলিম অনুপ্রবেশ রোধ করার লক্ষ্যে। ইয়াযীদ ও আমর ইবনুল আস উভয়ে তাদের প্রতিপক্ষের রোমান দল দুটিকে সংঘর্ষে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির স্বীকার করে পিছু হটতে বাধ্য করেন। ইয়াযীদ একটি ক্ষুদ্র দলকে প্রেরণ করেন প্রতিপক্ষের পলাতক সৈনিকদেরকে ধাওয়া করার জন্য। তারা গাজার নিকটবর্তী দাসিনে একদল শত্রুসৈন্যের মুকাবিলা করে তাদেরকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয় এবং নিরাপদে ফিরে এসে ইয়াযীদের সংগে যোগদান করে। ইতিমধ্যে আমর ইবনুল আস আরাবা উপত্যকা ধরে উত্তরের দিকে যাত্রা করতে থাকেন। মুসলিম বাহিনী মদীনা ত্যাগের পক্ষকালের মধ্যেই এইসব সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিল।

ইয়াযীদ এইসব সংঘর্ষে জড়িত হওয়ায় খলীফা প্রদত্ত লক্ষ্যবস্তু হতে কিছুটা দূরে সরে পড়েন এবং এই সময়ে শুরাহ্‌বীল ও আবু উবায়দা মান-মূতা-আম্মানের প্রধান পথ ধরে উত্তরে লক্ষ্যবস্তুর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। কিছু পরে ইয়াযীদও তাদেরকে অনুসরণ করেন। সফর মাসের শেষের দিকে (মে মাসের প্রথম দিকে) শুরাহ্‌বীল ও আবু উবায়দা বুসরা ও জাবিয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় উপনীত হন। ইয়াযীদ জর্দানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোনো এক জায়গায় ক্যাম্প করেন এবং আমর আরাবা উপত্যকায় অপেক্ষা করতে থাকেন। এই অবস্থায় মুসলিমগণ বুঝতে পারেন যে, রোমান বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে। বস্তুত তারা মাঠে নেমে পড়েছে।

সম্রাট হেরাক্লিয়াস হেম্‌সে উপস্থিত থেকে মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে বাধা দানের পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত ছিল। সম্রাট খালিদ (রা)-এর হাতে পারস্য বাহিনীর নির্মূল হওয়ার খবর প্রথম শুনে খুবই বিস্মিত হয়ে পড়েছিলেন, কেননা মরুচারী আরব মুসলিমদের সম্পর্কে পারস্য দরবারের মতোই রোমান দরবারের ধারণাও মোটেই ভাল ছিল না। তবে মুসলিম শক্তির উত্থানে রোমান সম্রাট খুব একটা উদ্বিগ্ন ছিলেন না। এই সময়ে খালিদ বিন সাঈদের পরাজয়ের খবর সম্রাটকে আরো নিশ্চিত করে।

তবু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সম্রাট বেশ কিছু সংখ্যক লিজিওন (ছয় হাজার রোমান সৈন্যের এক একটি বাহিনী লিজিওন নামে পরিচিত ছিল) আজনাদাইনে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দান করে যেখান থেকে প্যালেস্টাইন ও জর্দান এলাকায় মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা করা যাবে।

মুসলিম কোর চারটি মদীনা ত্যাগ করলে রোমান বাহিনী আরব খৃস্টানদের নিকট হতে এই তথ্য জানতে পারে। হেরাক্লিয়াস বুঝতে পারেন যে, রোমান শক্তিকে পদানত করার লক্ষ্যে এটি মুসলিম বাহিনীর একটি পরিকল্পিত অভিযান। অল্প সময়ের মধ্যে মুসলিম বাহিনীর হাতে আজনাদাইন হতে প্রেরিত রোমান অগ্রবর্তী দলের পরাজয়ের খবরও আসে। এতে সম্রাট ক্ষুব্ধ হয়ে এই মরুচারী আরবদেরকে কঠোর শাস্তিদানের লক্ষ্যে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশের নির্দেশ দান করেন। সম্রাটের নির্দেশে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের দুর্গগুলো হতে বিশাল আকারের রোমান বাহিনীগুলো আজনাদাইনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

স্থানীয় লোকদের সহায়তায় মুসলিম বাহিনী ইতিমধ্যে আজনাদাইনে রোমান বাহিনীর ব্যাপক সমাবেশ তৎপরতার খবর জানতে পারে এবং সব কোর কমান্ডার আবু উবায়দার সংগে যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকেন। তিনটি মুসলিম কোর জর্দানের পূর্বাঞ্চল ও সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের পাশাপাশি এলাকায় অবস্থান নিয়ে আছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে আবু উবায়দা মুসলিম বাহিনীর সার্বিক কমান্ড গ্রহণ করেন। আমর ইবনুল আস তার কোর নিয়ে অন্যদের থেকে দূরে ছিলেন। তিনি মনে করেন, রোমান বাহিনী হয়তো তার কোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই তিনি সাহায্যের জন্য আবু উবায়দার সংগে যোগাযোগ করেন।

রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে (মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে) খলীফা আবু উবায়দার নিকট হতে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ লাভ করেন। মুসলমানদের ধারণা অনুযায়ী আজনাদাইনে ১,০০,০০০ রোমান সৈন্যের সমাবেশ ঘটেছে এবং আজনাদাইনকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে তারা আমর ইবনুল আসের কোরকে সম্মুখ দিক থেকে অথবা আবু উবায়দার নেতৃত্বাধীন তিনটি কোরকে পশ্চাৎ বা পার্শ্বদেশ দিয়ে আক্রমণ করতে পারে।

পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে ধাবিত হয়। রোমান বাহিনীর সমাবেশ তৎপরতা চলতে থাকলে দেখা যায় যে, তাদের সংখ্যা সম্পর্কে যে ধারণা করা হয়েছিল প্রকৃতসংখ্যা তার চেয়েও অনেক বেশি। তদুপরি এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তারা সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান নিয়ে থাকার জন্য সৈন্য সমাবেশ ঘটাচ্ছে না। তারা একটি বিশাল বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়ে মাঠে একটি আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জন্য তৎপরতা চালাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম বাহিনীর সামনে দুটো পথ উন্মুক্ত ছিল। রাজকীয়

রোমান বাহিনীর সংগে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া অথবা দ্রুত প্রত্যাহার করে ফিরে যাওয়া। এই দুটি পথের কোনোটাই অনুসরণ করা আরামদায়ক ছিল না। প্রত্যাহার করার ব্যাপরটি খলীফা তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দেন। রোমান শক্তির ভয়ে মুসলিম বাহিনীকে সিরিয়া হতে ফিরিয়ে নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সিরিয়ায় যে অভিযানের সূত্রপাত করা হয়েছে তা অবশ্যই বহাল থাকবে। কিন্তু যে বিষয়টি খলীফার উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলো কে হবেন এই মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার? খলীফার পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুযায়ী আবু উবায়দার এই কমান্ড গ্রহণ করার কথা। আবু উবায়দা ছিলেন একজন অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুসলিম। তার ব্যক্তিগত সাহসিকতা ছিল প্রশ্নের অতীত। কিন্তু তার নম্র ও শান্ত স্বভাব এবং কোনো বড় যুদ্ধে বিশাল বাহিনী কমান্ড করার অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে খলীফা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি কি পারবেন এই ভয়ংকর যুদ্ধে পৃথিবীর একটি শক্তিশালী রাজকীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে কমান্ড করতে?

এই পরিস্থিতিতে আবূ বকর (রা) সবচেয়ে উত্তম সিদ্ধান্তটিই গ্রহণ করেন। তিনি খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা)-কে মুসলিম বাহিনীর কমান্ড গ্রহণের লক্ষ্যে সিরিয়ায় প্রেরণের জন্য মনস্থির করেন। খালিদ (রা) সম্প্রতি পরপর কয়েকটি যুদ্ধে বিশাল পারস্য বাহিনীকে ধ্বংস করেছেন। তিনিই ভাল জানবেন কি করে রোমান বাহিনীর মুকাবিলা করতে হবে। এই সিদ্ধান্তে খলীফার উদ্বেগ দূর হয়ে যায় যেন তার কাঁধ হতে একটি বড় বোঝা সরে যায়। তিনি বলেন, "আল্লাহর নামে বলছি, আমি খালিদের সাহায্যে রোমান শক্তি ও শয়তানের বন্ধুদেরকে খতম করবো।"[৩০০] তিনি একজন দ্রুতগামী বার্তাবাহককে হীরায় এই বার্তা নিয়ে প্রেরণ করেন, খালিদ যেন তার অর্ধেক সৈন্যসহ সিরিয়া গমন করে মুসলিম বাহিনীর কমান্ড গ্রহণ করেন এবং রোমান শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে খালিদ (রা)-এর সিরিয়া বিজয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে আমি উপলব্ধি করি যে, এই বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বিদ্যমান মতবিরোধ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণে আমার বর্ণনায়ও কিছুটা ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যেতে পারে। প্রধান যুদ্ধগুলোর তারিখ, যুদ্ধে মোতায়েন সৈন্য সংখ্যা, যুদ্ধগুলো সংঘটিত হওয়ার ক্রমধারা, এমনকি কিছু নাজুক যুদ্ধে কে সৈন্যবাহিনী কমান্ড করেছেন ইত্যাদি বিষয়ে মতবিরোধ বিদ্যমান। ওয়াকিদীই হচ্ছেন একমাত্র লেখক যিনি সিরিয়া অভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তার বর্ণনাতেও ত্রুটি চোখে পড়ে, কেননা তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন সিরিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের বর্ণনা পরম্পরা হতে, যার মধ্যে কিছু কিছু বৈপরীত্য দেখা যায়।

---

৩০০. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬০৩।

আমি সমস্ত বর্ণনাকে সামনে নিয়ে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিবেচনা করে ঘটনার একটি ধারাবাহিক চিত্র দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি যাতে বর্ণনায় কোনো বৈপরীত্য না থাকে। একটি ঘটনার একাধিক বর্ণনার আলোচনা প্রসংগে অধিক পাদটীকা দান থেকে বিরত থেকেছি পাঠককে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত রাখার জন্য। তবে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাদটীকা দিয়েছি, যাতে পাঠক তার নিজস্ব মতামত তৈরি করতে পারেন। আল্লাহ্ পাকই সব বিষয়ে ভাল জানেন।

সিরিয়ার অভ্যন্তরে

পাঁচদিনের ক্লান্তিকর যাত্রা শেষে, যে যাত্রায় জীবননাশের সমূহ আশংকা ছিল, সৈনিকগণ স্বাভাবিকভাবেই বিশ্রামের প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু খালিদ (রা) পরদিন সকালেই তাঁর বাহিনীকে সুআ অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করেন। খালিদ (রা) নিজেও বিশ্রাম নেননি বা প্রয়োজনও বোধ করেননি বিধায় সৈনিকগণ কোনো অভিযোগ করার সুযোগ পায় না। যাত্রা শুরু হলে খালিদ (রা) ঘোড়ায় চড়ে যাত্রীদলের সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে সবার খোঁজখবর নেন। কমান্ডারকে তৎপর দেখে সবার মধ্যে নতুন শক্তির সঞ্চার হয় এবং বিগত দিনের বিপজ্জনক যাত্রার ভয়ংকর স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে।

খালিদ (রা) একটি শিকলের বর্ম পরিধান করে সিরিয়া অভিযান শুরু করেন। এই বর্মটি ছিল মিথ্যাবাদী মুসায়লামার। তার চামড়ার চওড়া বেল্টে একটি জাঁকাল তরবারি ঝুলে আছে। এই তরবারিটিও ছিল ভণ্ড মুসায়লামার। এই দুটি ছিল ইয়ামামার যুদ্ধ বিজয়ের ট্রফি। শিকলের হেলমেটের উপরে খালিদ (রা) একটি লাল পাগড়ি ও হেলমেটের নীচে লাল ক্যাপ পরেছিলেন। আর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যেতো এই ক্যাপটির মধ্যে আছে কয়েকটি কাল রেখা। খালিদের দৃষ্টিতে এই ক্যাপটি ছিল সব অস্ত্রের চেয়ে মূল্যবান। এর ইতিহাস অন্যত্র বর্ণনা করা হবে। তিনি হাতে বহন করতেন রাসূল (সা)-এর দেয়া একটি কাল পতাকা। এই পতাকাটি একসময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ছিল এবং এটি পরিচিত ছিল ঈগল নামে।

খালিদ (রা)-এর সংগে আছে ৯,০০০ নির্ভীক যোদ্ধা। এদের আছে অনেক যুদ্ধজয়ের অভিজ্ঞতা এবং এদের মধ্যে কমান্ডারের আদেশে জীবনদানে দ্বিধা করবে এমন কেউই নেই। এই বাহিনীতে আছেন সে সময়ের সবচেয়ে সাহসী অফিসারগণ, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাহসিকতা ও শৌর্যবীর্য প্রদর্শন এবং মৃত্যুকে হাসিমুখে উপেক্ষা করার বহু ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এদের মধ্যে ছিলেন খালিদের পুত্র আবদুর রহমান, যিনি মাত্র ১৮তে পদার্পণ করেছিলেন, খলীফার পুত্র আবদুর রহমান, বিখ্যাত যোদ্ধা রাফে বিন উমাইরা, যিনি বিপজ্জনক অগ্রযাত্রায় পথপ্রদর্শকের কাজ করেছিলেন, কাকা বিন আমর, যিনি একমাত্র ব্যক্তি যাকে খলীফা প্রেরণ করেছিলেন খালিদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ও খালিদের জামাতা। আরও ছিলেন জাররার বিন

আজওয়ার নামের একজন দীর্ঘদেহী হালকা গড়নের যুবক, যার প্রসংগে এই অভিযানের বর্ণনায় অনেকবার আসবে এবং যার সীমাহীন উৎসাহ ও উদ্দীপনা একজন ক্লান্ত-শ্রান্ত সৈনিককেও তরবারি নিয়ে যুদ্ধে লাফিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করতো। জাররার ছিলেন খালিদের ডান হাত। তাকে সবসময় সাহসিকতাপূর্ণ মিশনে প্রেরণ করা হতো এবং তিনি বিপদকে সব সময় অবজ্ঞা করতেন ও জীবনের জন্য কোনো চিন্তা করতেন না।

বিকাল শুরুর প্রাক্কালে মুসলিম বাহিনী সুআ পৌঁছে যায়। (১৫ নম্বর ম্যাপ দ্রঃ)। এটাই ছিল সিরিয়ার সীমান্তবর্তী প্রথম বসতি এলাকা। এটি একটি মরূদ্যান এবং এর চারদিকে ছিল তৃণভূমি যেখানে ভেড়া ও অন্যান্য গবাদি পশুর পাল চড়ে বেড়াতো। খালিদ (রা) চারদিকে ঘুরে সমস্ত বাধা জয় করে এলাকাটিকে আয়ত্তে নিয়ে নেন এবং গবাদি পশু দিয়ে এই অভিযানে খাদ্যের সঞ্চয় গড়ে তোলার নির্দেশ দান করেন।

পরদিন মুসলিম বাহিনী আরাকে উপনীত হয়। আরাক ছিল একটি সুরক্ষিত শহর যা পাহারা দিতো রোমান অফিসারের নেতৃত্বে আরব খৃস্টানদের একটি বাহিনী। মুসলমানগণকে দেখেই খৃস্টানবাহিনী দুর্গে আশ্রয় নিলে খালিদ (রা) আরাক শহরটি অবরোধ করেন। তিনি এই প্রথমবারের মতো জানতে পারেন যে, তার বীরত্বের খ্যাতি বিজিত এলাকার বাইরেও বিস্তার লাভ করেছে। তার এই খ্যাতিই একটি শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হয়।

আরাকে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিল যে সমকালীন সময়ে সব খবর রাখতেন। মরুভূমির বুক হতে একটি আক্রমণকারী বাহিনীর আগমনের খবর জানতে পেরে সে জিজ্ঞেস করে, "এই বাহিনী কি একটি কাল পতাকা বহন করছে ? এই বাহিনীর কমান্ডার কি লম্বা ও শক্ত সমর্থ ব্যক্তি যার রয়েছে চওড়া কাঁধ, লম্বা দাড়ি ও মুখে কয়েকটি বসন্তের দাগ ?[৩০১] যারা মুসলিম বাহিনীকে অগ্রসর হতে দেখেছে তাদের দেখার অভিজ্ঞতার সংগে এই বর্ণনা মিলে গেলে বিজ্ঞ লোকটি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলে, "এই বাহিনীর সংগে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।"

জিযিয়া প্রদানের শর্তে দুর্গটি আত্মসমর্পণ করে। রোমান কমান্ডারদের নিকট এই শর্তটি খুবই সহজ মনে হয় এবং তারা বিজয়ী শক্তির মহানুভবতায় বিস্মিত হয়ে পড়ে। দুর্গটি আত্মসমর্পণ করলে মুসলিম বাহিনী রাত্রিযাপনের জন্য বাইরে তাঁবু স্থাপন করে।

পরদিন সকালে খালিদ (রা) দুটো দলকে প্রেরণ করেন সুখনা ও কাদমা (এখন কুদাইমা নামে খ্যাত) পদানত করার জন্য। একই সংগে তিনি জাবিয়া এলাকায় অবস্থানরত আবু উবায়দার নিকটও একজন বার্তাবাহক প্রেরণ করেন, তাকে

---

৩০১. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা - ১৫।

খালিদের আগমনের প্রতীক্ষা বা পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করার আদেশ দিয়ে। এরপর খালিদ (রা) তার বাহিনী নিয়ে তাদমুর (পালমিরা) যাত্রা করেন।

সুখনা ও কাদমার জনগণ মুসলিম দলদুটিকে আনন্দচিত্তে স্বাগতম জানায়। তারা পূর্বের দিন আরাকে স্বাক্ষরিত সন্ধি চুক্তির সহজ শর্তের কথা ইতিমধ্যেই শুনেছে। তারাও অনুরূপ সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হতে চায়। কোনো বাধা-বিপত্তি ও রক্তপাত ছাড়াই মুসলিম দল দুটি কর্তব্য সম্পাদনের পর প্রত্যাবর্তন করে।

তাদমুর দুর্গটিও বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করে। তাদমুরের অধিবাসীরা জিযিয়া প্রদানে ও শহর অতিক্রমকারী যে কোনো মুসলিম যোদ্ধাকে খাদ্য ও আশ্রয় দানে সম্মত হয়। তাদমুরের আরব গোত্রপ্রধান খালিদ (রা)-কে একটি ঘোড়া উপহার হিসেবে দান করে যা তিনি পরবর্তী অনেক অভিযানে ব্যবহার করেছিলেন।

তাদমুর হতে মুসলিম বাহিনী কারিয়াতীনে অগ্রসর হয়। কারিয়াতীনের অধিবাসীগণ মুসলমানদেরকে বাধা দান করে। তাদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করা হয় এবং তাদের ধনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

কারিয়াতীন হতে অগ্রসর হয়ে মুসলিম বাহিনী ১০ মাইল দূরবর্তী হুয়ারীনে পৌছলে সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়। হুয়ারীন ছিল পশুপালের জন্য বিখ্যাত। মুসলমানগণ পশু সংগ্রহ করতে শুরু করলে হাজার হাজার স্থানীয় আরব তাদেরকে আক্রমণ করে। বুসরা হতে একদল গাসসান দ্রুত তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। এরাও মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়।

পরদিন সকালে দামেস্ক অভিমুখে মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা পুনরায় শুরু হয়। তিনদিন যাত্রার পর বাহিনীটি দামেস্ক হতে ২০ মাইল দূরে একটি গিরিপথে উপনীত হয়। এই গিরিপথটি বর্তমানে আজরা ও কুতেইফার মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে ২০০০ ফুটেরও বেশি উচু স্বাভাবিক ঢাল বিশিষ্ট একটি পাহাড় চূড়াকে অতিক্রম করেছে। এই চূড়াটি "জবাল-উস-শারক" নামে পরিচিত পাহাড়সারির অংশ যা উত্তর-পূর্ব রেখা বরাবর তাদমুরের দিকে বিস্তৃত হয়েছে। গিরিপথটি দুর্গম না হলেও দীর্ঘ ছিল। খালিদ (রা)-এর সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌছে কিছু সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি করেন এবং তার পতাকাটি মাটিতে পুঁতে দেন। এই ঘটনার পর হতেই এই গিরিপথটির নাম হয় 'সানিয়্যাত-উল-উকবা' অর্থাৎ ঈগলের গিরিপথ। খালিদের পতাকার নামানুসারেই এই নামকরণ হয়। যদিও কখনো কখনো সংক্ষেপে শুধু আল-সানিয়া বলে উল্লেখ করা হয়।[৩০২] খালিদ (রা) এই চূড়া হতে চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। দামেস্কের উত্তরে পূর্ব-পশ্চিমে বরাবর বিস্তৃত উঁচু

৩০২. ইয়াকুত (২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা - ৯৩৬) এই গিরিপথটির অবস্থান চিহ্নিত করেছেন দামেস্কের পার্শ্ববর্তী ঘুতার উত্তরে ইমেমা সড়কের উপরে।

ভূমির জন্য তিনি শহরটি দেখতে না পেলেও শহরের পার্শ্ববর্তী ঘুতা[৩০৩] এলাকার প্রাচুর্য ও সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যান।

ঈগলের গিরিপথ হতে খালিদ (রা) গাসসানদের বিরাট শহর মারজ রুহিতের[৩০৪] দিকে যাত্রা করেন। এই শহরটির অবস্থান ছিল দামেস্কগামী সড়কের উপরে বর্তমানের আজরার নিকটে। মুসলিম বাহিনী এমন এক সময়ে এই শহরে পৌঁছে যখন গাসসানগণ একটি উৎসবে মেতেছিল এবং তাদের সংগে যোগ দিয়েছিল খালিদের পূর্ববর্তী অপারেশন এলাকাগুলো হতে বিতাড়িত অসংখ্য উদ্বাস্তু। অবশ্য উৎসবে মেতে থাকলেও গাসসানগণ সিরিয়ায় খালিদের প্রবেশের ফলে সম্ভাব্য আক্রমণের বিষয় সম্পর্কে সচেতন ছিল। তাই তারা তাদমুর হতে আগত সড়কের মুখে শক্তিশালী প্রহরার ব্যবস্থা করে। মুসলিম বাহিনী খুব সহজেই এই বাধা অতিক্রম করে এবং গাসসানদের উৎসবে যোগদান করে। যদিও তারা যোগদান করেছিল আকস্মিকভাবে আক্রমণকারী হিসেবে। গাসসানগণ মুসলমানদের অগ্রযাত্রার পথে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। খালিদ (রা) শহর হতে প্রচুর পরিমাণ ধন-সম্পদ সংগ্রহ করে কিছু লোককে বন্দী হিসেবে নেন এবং রাত্রিযাপনের জন্য শহরের বাইরে গিয়ে তাঁবু ফেলেন।

পরদিন সকালে তিনি একটি অশ্বারোহী দলকে প্রেরণ করেন দামেস্কের পার্শ্ববর্তী ঘুতা এলাকা আক্রমণ করার জন্য। একই সময়ে তিনি বাহিনীর প্রধান অংশ নিয়ে বুসরার দিকে যাত্রা করে এবং বার্তাবাহক মারফত আবু উবায়দার নিকট নির্দেশ প্রেরণ করেন তিনি যেন তার সংগে সেখানে সাক্ষাৎ করেন। খালিদ (রা) দামেস্কের বাইরে দিয়ে ঘুরে বুসরা পৌঁছেছিলেন। খালিদ (রা) বুসরার পথে থাকতেই অশ্বারোহী দলটি দামেস্ক শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় আক্রমণ করে বেশকিছু বন্দী ও প্রচুর সম্পদসহ তার সংগে যোগদান করে।

সিরিয়ায় প্রবেশের পর খালিদের ক্ষুদ্র অপারেশনসমূহের এখানেই সমাপ্তি হয়।

•

ইয়াযীদ ও শুরাহবীলের কোরসহ আবু উবায়দার কমান্ডে এখন তিনটি কোর। তবে তিনি এখন পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েননি বা কোনো শহরও দখল করেননি। তিনি ইয়ারমুক নদীর উত্তর-পূর্ব দিকে বিস্তৃত হাউরান জেলা নিজের আয়ত্তে নিয়েছেন মাত্র। তিনি বুসরা শহরটি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। গাসসান রাজার রাজধানী হিসেবে বুসরা ছিল রোমান অফিসারদের কমান্ডে রোমান ও আরব খৃস্টান সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল বাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত।

---

৩০৩. ২. দামেস্কের পার্শ্ববর্তী (প্রায় তিনদিক ঘিরে) ঘুতা এলাকা এখনও উর্বর ও পর্যাপ্ত পানি সমৃদ্ধ এবং ফসল ও সবুজ বাগানে ভরপুর।

৩০৪. মারজ রহিতও একটি তৃণভূমি। মাসদী এটিকে দামেস্কের ১২ মাইল দূর বলে বর্ণনা করেছেন এবং এর নাম উল্লেখ করেছেন মারজ আজরা হিসেবে (মুরুজ ঃ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২)।

সিরিয়ায় প্রবেশের পর খালিদ (রা) ক্ষুদ্র অপারেশনের মাধ্যমে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় আবু উবায়দা (রা) খলীফার পুত্র মারফত জানতে পারেন তাঁকে খালিদের সার্বিক কমান্ডে ন্যস্ত করা হয়েছে। খালিদ (রা) পৌছার পূর্বেই তিনি বুসরা দখল করতে চান, যাঁতে তাকে আর এটা নিয়ে চিন্তা করতে না হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ ৪,০০০ সৈন্যসহ শুরাহ্বীলকে প্রেরণ করেন বুসরা দখল করার জন্য। মুসলিম বাহিনীকে দেখেই রোমান বাহিনী দুর্গ পরিবেষ্টিত সুরক্ষিত শহরে আশ্রয় নেয়। রোমান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ১২,০০০। তারা শুরাহ্বীলের বাহিনীকে বিশাল মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তীদল হিসেবে বিবেচনা করে এবং দুর্গের দেয়াল বরাবর প্রহরারত থেকে বাকি সৈন্যের আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকে। শুরাহ্বীল শহরের পশ্চিমদিকে ক্যাম্প এবং চারদিকে সৈন্য মোতায়েন করেন।

দুই দিন কোনো ঘটনা ছাড়াই অতিবাহিত হয়। তৃতীয় দিনে অর্থাৎ যেদিন খালিদ (রা) মারজ রহিতের উপকণ্ঠ হতে বুসরা অভিমুখে যাত্রা করেন, রোমান বাহিনী শহরের বাইরে আসে মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য। দুই বাহিনী যুদ্ধের বিন্যাসে দাঁড়িয়ে পড়লে শুরাহ্বীল রোমান বাহিনীর কমান্ডারকে ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া প্রদান অথবা তরবারিকে বরণ করার আহ্বান জানান। রোমানগণ তরবারিকে বরণ করলে মধ্য-সকালে যুদ্ধের সূচনা হয়।

প্রথম দুই ঘণ্টা যুদ্ধের গতি সমানে সমানে চলতে থাকে; কোনো পক্ষই প্রতিপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু দুপুরের পরপরই রোমান বাহিনীর সংখ্যাধিক্য কথা বলতে শুরু করে। যুদ্ধের গতি তাদের পক্ষে মোড় নেয়। রোমানগণ মুসলিম বাহিনীর দুইবাহুকে ঘিরে ফেলতে সক্ষম হয়। ফলে যুদ্ধের তীব্রতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। মুসলমানগণ আত্মঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। রোমানগণ মুসলিম বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার জন্য অগ্রসর হতে থাকে এবং এটাই তাদের যুদ্ধকৌশল। মুসলিম বাহিনী সম্ভাব্য ঘেরাওকে (Encirelement) উপেক্ষা করার লক্ষ্যে মরণপণ যুদ্ধ করা সত্ত্বেও পড়ন্ত দুপুরে রোমান বাহিনীর দুইবাহু আরও সামনে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। ফলে মুসলিম বাহিনীর চারদিক হতে ঘেরাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়। এমন সময় যোদ্ধাগণ হঠাৎ দেখতে পায় যে, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দ্রুত বেগে ছুটে আসছে একটি শক্তিশালী অশ্বারোহী দল। এই দলের সম্মুখ রয়েছে উন্মুক্ত ও আন্দোলিত তরবারি হাতে দুই ব্যক্তি যাদের একজনের আকৃতি বিশাল ও মাথায় লাল পাগড়ি।

খালিদ (রা) বুসরা হতে একমাইল দূরে থাকতেই বাতাসে যুদ্ধের শব্দ শুনতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ লোকদেরকে ঘোড়ায় সওয়ার হতে বলেন। অশ্বারোহী দল প্রস্তুত হলে তিনি দ্রুত বেগে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হন। তার পাশে ছিলেন

আবদুর রহমান বিন আবূ বকর। কিন্তু খালিদ ও রোমানদের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটেনি। মুসলিম অশ্বারোহী দলের আগমন দেখেই রোমানগণ দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে দুর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলিম যোদ্ধাগণ এই ঘটনাকে একটি অলৌকিক ব্যাপার হিসেবে বিবেচনা করে যেন তাদেরকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষার জন্যই আল্লাহর তরবারির আবির্ভাব হয়েছে।

শুরাহবীল ছিলেন একজন সাহসী ও ধার্মিক মুসলিম। তার বয়স ছিল ষাটের উর্ধ্বে। রাসূল (সা)-এর ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে তিনিও আল্লাহর বাণী লেখকদের একজন ছিলেন এবং ক্রমান্বয়ে আল্লাহর বাণীবাহকের অনুলেখক হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। জেনারেল হিসেবে তিনি ছিলেন দক্ষ ও জ্ঞানী। খালিদের সংগে ইয়ামামা ও ইরাক অভিযানে অংশগ্রহণ করে তিনি যুদ্ধবিদ্যার অনেক কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

যুদ্ধরত দুই বাহিনীর দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই খালিদ (রা) তাদের সংখ্যার পার্থক্যটা উপলব্ধি করেন এবং বিস্ময়ের সংগে ভাবেন শুরাহবীল কেন বুসরা আক্রমণ করার পূর্বে তার জন্য অপেক্ষা করেনি। সাক্ষাতের সংগে সংগেই তিনি জিজ্ঞেস করেন, "ওহে শুরাহবীল! তুমি কি জানতে বুসরা রোমান সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত শহর এবং এটির নিরাপত্তার দায়িত্ব একজন উত্তম জেনারেলের অধীনে একটি বিশাল বাহিনী মোতায়েন আছে ? তুমি কেন এই ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলে?"

'আবু উবায়দার নির্দেশে' শুরাহবীল উত্তর দেন। এই উত্তর শুনে খালিদ মন্তব্য করেন, "আবু উবায়দা একজন উত্তম চরিত্রের অধিকারী মানুষ, কিন্তু কি কৌশলে শত্রুকে পরাজিত করতে হয় তা তিনি জানেন না।"[৩০৫]

পরদিন সকালে রোমান বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। খালিদ (রা)-এর আগমনের ফলে সৃষ্ট ভীতি তারা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। শক্তি বৃদ্ধির ফলে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা এখন প্রায় তাদের সমান হওয়া সত্ত্বেও তারা একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে চায়। খালিদ (রা)-এর বাহিনীকে বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ না দিয়েই তারা আক্রমণ করতে চায়। অবশ্য তারা জানতো না যে, খালিদ (রা)-এর যোদ্ধাগণ বিশ্রাম নিতে অভ্যস্ত নয়।

শহরের বাইরে সমতল ভূমিতে দুই বাহিনী যুদ্ধের বিন্যাসে দাঁড়িয়ে পড়ে। খালিদ (রা) ডান ও বাম বাহুকে ন্যস্ত করেন যথাক্রমে রাফে বিন উমাইরা ও জাররার ইবনুল আজওয়ারের অধীনে এবং মধ্যবর্তীদলের কমান্ড রাখেন নিজের হাতেই। মধ্যবর্তী অবস্থানের সম্মুখে তিনি আবদুর রহমান বিন আবূ বকরের নেতৃত্বে হালকা এক সারি সৈন্য (Screen) মোতায়েন করেন। শুরুতেই আবদুর রহমান রোমান বাহিনীর কমান্ডারের সংগে দ্বৈত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাকে পরাজিত করেন। রোমান

---

৩০৫. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা - ১৭।

জেনারেল আবদুর রহমানের হাত থেকে পালিয়ে তার বাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করার সংগে সংগে খালিদ (রা) যুদ্ধক্ষেত্রের গোটা সম্মুখজুড়ে একটি সাধারণ আক্রমণ রচনা করেন। রোমান বাহিনী অত্যন্ত সাহসিকতার সংগে কিছু সময় টিকে থাকার চেষ্টা করে। দুই বাহুর মুসলিম জেনারেলদ্বয় প্রতিপক্ষের উপরে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চাপিয়ে দেয়; বিশেষ করে জাররার। এই যুদ্ধে জাররার এমন একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন যা তাকে সিরিয়ায় বিখ্যাত করে তোলে। দিনের খরতাপের কারণে তিনি শরীর হতে বর্মটি খুলে ফেলেন। এতে তিনি আরাম ও হালকা বোধ করেন। এরপর তিনি শরীর হতে জামাটিও খুলে ফেলেন এবং আরও হালকা ও আরাম বোধ করেন। কোমরের উপর হতে অর্ধ-উলংগ অবস্থায় জাররার তার সামনে আগত প্রতিটি প্রতিপক্ষকে খতম করতে থাকেন। এক সপ্তাহের মধ্যে গোটা সিরিয়ায় এই উলংগ বীরের কথা প্রচার হয়ে যায় এবং শুধু সবচেয়ে সাহসী রোমানগণই যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে মুকাবিলা করার কথা ভাবতে পারতো।

কিছু সময় যুদ্ধের পর রোমান বাহিনী পিছু হটে গিয়ে দুর্গে আশ্রয় নেয়। এই সময় খালিদ (রা) তার দলের সামনে মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি দুর্গ অবরোধের নির্দেশ দেবেন এমন সময় লক্ষ্য করেন যে, একজন অশ্বারোহী মুসলিম বাহিনীর মধ্যদিয়ে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এই অশ্বারোহী ব্যক্তিটি পরবর্তীতে সিরিয়া অভিযানে এমন খ্যাতি ও গৌরব অর্জন করেছিলেন যা শুধু খালিদ (রা)-এর সংগেই তুলনা করা যায়।

তিনি সবেমাত্র পঞ্চাশ পার হয়েছেন। তার লম্বা দেহ, হালকা কিন্তু শক্ত গড়ন। কিছুটা সামনে ঝোঁকা। তাঁর হালকা-পাতলা মুখের গড়নটিও আকর্ষণীয় এবং চোখদুটো শান্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত। তাঁর পাতলা দাড়ি রং করা। তাঁর হাতে এমন একটি পতাকা যা সাধারণত জেনারেলগণ বহন করেন। পতাকাটির রং ছিল হলুদ এবং বিশ্বাস করা হয় যে, এটি রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বরের যুদ্ধে বহন করেছিলেন।[৩০৬] শরীরের বর্মটি পোশাকের দীনতাকে ঢাকতে পারেনি। খালিদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলে তাঁর দাঁতের সামনের মাড়িতে বিদ্যমান ফাঁকটি সবার নিকট পরিষ্কার হয়ে যায়; অবশ্য তাঁর দাঁতের এই ফাঁকটি মুসলমানদের নিকট ছিল ঈর্ষার বিষয়। এই লোকটিই ছিলেন ছেদকদন্তহীন আবু উবায়দা, যিনি পরিচিত ছিলেন শৈল্য চিকিৎসকের পুত্র হিসেবে। তিনি ওহুদের যুদ্ধে রাসূল (সা)-এর গণ্ডদেশে বসে যাওয়া হেলমেটের দু'টি লিংক টেনে তুলতে গিয়ে সামনের মাড়ির দাঁতগুলি হারিয়েছিলেন। বলা যায় যে, সামনের দাঁত না থাকলেও আবু উবায়দা (রা) ছিলেন সুদর্শন ব্যক্তিদের একজন।[৩০৭]

---

৩০৬. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা - ১৩৮।

৩০৭. ইবনে কুতায়বা ঃ পৃষ্ঠা- ২৪৮।

আবু উবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহ নামে পরিচিত হলেও তার প্রকৃত নাম ছিল আমির বিন আবদুল্লাহ জাররাহ। আবু উবায়দার পিতামহ আল-জাররাহ ছিলেন শৈল্য চিকিৎসক এবং তিনি কিছু আরবের মতো পিতার পরিবর্তে পিতামহের নামেই পরিচিত ছিলেন। মুসলিম হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই উঁচু পর্যায়ের একজন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) একবার বলেছিলেন, "প্রত্যেক জাতির একেকজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে এবং আবু উবায়দা হচ্ছে এই জাতির বিশ্বস্ত ব্যক্তি।"[৩০৮] তার পর থেকেই আবু উবায়দা (রা) 'আমীন উল-উম্মত' অর্থাৎ জাতির বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হন। তিনি বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনেরও একজন ছিলেন।

এই লোকটিকেই খালিদের কমাণ্ডে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং নতুন আর্মি কমান্ডার পুরাতন আর্মি কমান্ডারের আগমনে এক ধরনের আশংকা নিয়ে তাঁর দিকে তাকান। মদীনায় অবস্থানকালে খালিদ (রা) আবু উবায়দা (রা)-কে ভালভাবেই চিনতেন এবং তাকে তাঁর মহৎ গুণাবলী ও ইসলামের প্রতি অপরিসীম ভক্তির কারণে শ্রদ্ধা করতেন। আবু উবায়দা (রা)ও খালিদ (রা)-কে পছন্দ করতেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রিয়পাত্র হিসেবে এবং তিনি মনে করতেন আল্লাহ পাক তাঁর সামরিক যোগ্যতাকে নির্বাচিত করেছেন অসত্যকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহারের জন্য। আবু উবায়দার মৃদু হাসি খালিদ (রা)-কে আশংকামুক্ত করে। খালিদ (রা) মাটিতে দাঁড়িয়েছিলেন বিধায় আবু উবায়দা (রা) ঘোড়া হতে নামার উদ্যোগ নেন। খালিদ (রা) তাঁকে ঘোড়া হতে নামতে নিষেধ করেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে যান। এরপর সিরিয়া অভিযানের দুই শীর্ষ জেনারেল করমর্দন করেন।

"ওহে সুলাইমানের পিতা, আবু উবায়দা (রা) খালিদ (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন, "আপনাকে আমার উপর কমান্ডার নিয়োগ করে প্রেরিত খলীফার পত্র আমি আনন্দের সংগে গ্রহণ করেছি। এতে আমার অন্তরে কোনো কষ্ট নেই, কেননা আমি আপনার সামরিক দক্ষতা সম্পর্কে জানি।"

"আল্লাহর নামে বলছি, খালিদ উত্তরে বলেন, "খলীফার আদেশ মান্য করা কর্তব্য না হলে আমিও কখনোই আপনার উপরে কমান্ড গ্রহণ করতাম না। ইসলামের দৃষ্টিতে আপনার মর্যাদা আমার চেয়ে অনেক বেশি। আমিও আল্লাহর রাসূল (সা)-এর সহচর, কিন্তু আপনি এমন একজন ব্যক্তি যাকে আল্লাহর রাসূল (সা) 'জাতির বিশ্বস্ত ব্যক্তি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৩০৯] এই আনন্দময় বাক্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আবু উবায়দা (রা) নিজেকে খালিদ (রা)-এর কমান্ডে ন্যস্ত করেন।

---

৩০৮. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা - ২৪৭।
৩০৯. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা - ২৩।

মুসলিম বাহিনী বুসরা অবরোধ করে। রোমান কমান্ডার বুঝতে পারেন যে, সমস্ত মজুদ সৈন্য আজনাদাইনের পথে থাকায় সহসা সাহায্য প্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। কয়েকদিন নিষ্ক্রিয় থাকার পর রোমান দুর্গ শান্তিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। খালিদ (রা) তাদের উপরে শুধু জিযিয়া প্রদানের শর্তটি আরোপ করেন। ৬৩৪ খৃস্টাব্দের মধ্য জুলাইতে (১৩ হিজরীর মধ্য জামাদি-উল-আউয়াল) এই আত্মসমর্পণের ঘটনাটি ঘটে।

সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর দখলীকৃত প্রথম বড় শহর হচ্ছে বুসরা। মুসলমানগণ দুইদিনের যুদ্ধে ১৩০টি প্রাণের বিনিময়ে এই বিজয় অর্জন করে। অপরপক্ষের প্রাণহানি সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। সিরিয়া প্রবেশের পর হতে অপারেশনের অগ্রগতি জানিয়ে খালিদ (রা) খলীফার নিকট পত্র লেখেন এবং সেই সংগে গনিমতের মালের এক-পঞ্চমাংশও প্রেরণ করেন। বুসরা আত্মসমর্পণের পরপরই শুরাহবীলের প্রেরিত একজন চর এসে জানায় যে, রোমান বাহিনীর লিজিওনগুলোর আগমন অব্যাহত রয়েছে এবং শীঘ্রই আজনাদাইনে ১০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল রাজকীয় বাহিনীর সমাবেশ ঘটবে। খালিদ (রা) উপলব্ধি করেন যে, নষ্ট করার মতো আর কোনো সময় হাতে নেই।

এই সময় পর্যন্ত ইয়াযীদ ছিলেন ইয়ারমুক নদীর দক্ষিণে। আমর ইবনুল আস আরাবা উপত্যকায় এবং আবু উবায়দার কোরের কয়েকটি দল ও শুরাহবীলের কোর ছিল হাউরান জেলার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। খালিদ (রা) সকল কমান্ডারকে দ্রুত আজনাদাইনে একত্রিত হওয়ার জন্য লিখিত নির্দেশ দান করেন। মুসলিমগণ এই নির্দেশ পেয়ে তাদের নারী, শিশু ও বিশাল পশুপালসহ যাত্রা শুরু করে। এই পশুপাল তাদের খাদ্যের চলমান ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। আজনাদাইনেই সংঘটিত হবে ইসলাম ও খৃস্টানদের মধ্যকার প্রথম প্রকাণ্ড যুদ্ধ।

আজনাদাইনের যুদ্ধ

৬৩৪ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মুসলিম বাহিনী বুসরা থেকে মার্চ করে। মুসলিম বাহিনীর এই মার্চের দৃশ্যটি ছিল অদ্ভুত, কেননা তা কোনো নিয়মিত সেনাবাহিনীর মতো সুশৃংখল মার্চ ছিল না। এই অগ্রযাত্রাকে একটি সেনাবাহিনীর মার্চ না বলে বরং একটি কাফেলার যাত্রা বলা চলে।

এই বাহিনীর সৈনিকদের কোনো ইউনিফরম ছিল না এবং তাদের পরিহিত পোশাকের মধ্যেও কোনো সাদৃশ্য ছিল না। পারসিক ও রোমানদের নিকট হতে হস্তগত ঢিলেঢালা জামাসহ সৈনিকগণ যা খুশি তাই পরিধান করতো। পদবীর পরিচয়সূচক কোনো ব্যাজ ছিল না বা সাধারণ সৈনিক ও কমান্ডারদের মধ্যে পার্থক্যসূচক কোনো চিহ্নও ব্যবহার করা হতো না। প্রকৃত পক্ষে অফিসার বলতে কোনো র‍্যাংক ছিল না, তবে নেতৃত্বের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে মনোনয়ন দেয়া হতো। যে কোন মুসলিম এই বাহিনীতে যোগ দিতে পারতো এবং স্বীয় গোত্রে তার মর্যাদা নির্বিশেষে একজন যোদ্ধা হিসেবে তরবারি ধারণ করতে পারাটাকে সম্মানের কাজ বলে মনে করতো। আজ যে ব্যক্তি একজন সাধারণ যোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করছে আগামীকাল সে একটি রেজিমেন্টের বা আরো বৃহত্তর ফোর্সের কমান্ড পেতে পারে। অফিসার বা কমান্ডার নিয়োগ করা হতো একটি নির্দিষ্ট যুদ্ধ বা অভিযানের জন্য। ঐ অপারেশন শেষ হলে তার নিয়োগও শেষ এবং সে সাধারণ সৈনিক হিসেবে কাজ করতে কোনো দ্বিধাবোধ করতো না। মুসলিম বাহিনী সংগঠিত করা হয়েছিল দশমিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ ১০, ১০০ ও ১০০০ যোদ্ধার একেকটি দলের জন্য একেকজন কমান্ডার নিয়োগ করা হতো। ১০০০ যোদ্ধার একটি দলকে রেজিমেন্ট বলা হতো। অবশ্য পরিস্থিতি অনুযায়ী বৃহত্তর বাহিনীর গঠনের জন্য রেজিমেন্টের সৈন্য সংখ্যার ব্যাপারে নমনীয়তা ছিল। রাসূলে আকরাম (সা) মদীনায় এই দশমিক পদ্ধতি চালু করেছিলেন।[৩১০]

পোশাকের মতো অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে কোনো সমতা বা মানদণ্ড ছিল না। একজন সৈনিক যে অস্ত্র যোগাড় করতে পারতো তাই দিয়ে সে যুদ্ধ করতো। আর এই অস্ত্র তাকে যোগাড় করতে হতো হয় কিনে নতুবা

---

৩১০. তাবারী ঃ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৮।

পরাজিত শক্রর কাছ থেকে। বর্শা, বল্লম, তরবারি, ছুরি, তীর-ধনুক ইত্যাদি সমকালে ব্যবহৃত যে কোনো একটি বা সবগুলো অস্ত্রই একজন সৈনিক ব্যবহার করতে পারতো। তারা ধাতুর তৈরি বর্ম ও শিকলের হেলমেট পরিধান করতো এবং এ সবের রং ও আকৃতি সম্পর্কে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। বস্তুত মুসলিম বাহিনীর অনেকেই ব্যবহার করতো পারসিক ও রোমানদের নিটক হতে প্রাপ্ত অস্ত্র, বর্ম ও হেলমেট। অধিকাংশ যোদ্ধা ছিল উটের আরোহী। আর যাদের ঘোড়া ছিল তাদের সমন্বয় গঠিত হতো অশ্বারোহী দল।

মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ যাত্রার বা চলাচলের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে, লাইন অব কম্যুনিকেশন বা যোগাযোগ রক্ষা করা নিয়ে এর কোনো সমস্যা ছিল না। কেননা বাহিনীর কোনো সরবরাহ লাইন বা প্রশাসনিক ঘাঁটি বা সরবরাহ কেন্দ্র কিছুই ছিল না। এদের খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় যুদ্ধ-সম্ভার সংগে থাকতো। কোনো কারণে মাংসের ঘাটতি পড়লে তারা নারী ও শিশুদের নিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে খেজুর ও পানি দিয়ে চালিয়ে দিতে পারতো। এই বাহিনী সবকিছুই বহন করতো উটের পিঠে। তাই তারা রাস্তা ছাড়াও যে কোনো রকমের ভূমির উপর দিয়ে যেদিকে খুশি চলাচল করতে পারতো, যতক্ষণ তা মানুষ ও পশুর চলার উপযোগী থাকতো। ফলে মুসলিম বাহিনীর সরবরাহ লাইনে বাধা দিয়ে তাদেরকে বিপদে ফেলার কোনো সুযোগ প্রতিপক্ষের কখনই হতো না। চলাচলের এই সুবিধার কারণেই তারা প্রতিপক্ষের তুলনায় দ্রুত গতিতে কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ ও পরিবর্তন করতে পারতো। চলাচলে গতি সৃষ্টির সুবিধাটিই তাদেরকে রোমান বাহিনীর উপরে আধিপত্য বিস্তারে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল।

সামরিক শৃংখলার দৃষ্টিকোণ থেকে এই বাহিনীর চলাচলকে আপাতত একটি যাযাবর জাতির কাফেলার যাত্রার মতো মনে হলেও নিরাপত্তার দিক থেকে তা ছিল কম বিপজ্জনক। এই মার্চের সামনে থাকতো এক রেজিমেন্টের একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন সম্মুখরক্ষী দল। তারপরে থাকতো প্রধান বাহিনী। প্রধান বাহিনীকে অনুসরণ করতো নারী, শিশু, ও মালামাল-বাহী উটের পাল। সবার পিছনে থাকতো পশ্চাৎরক্ষী দল। দীর্ঘ যাত্রা ও বিপদের আশংকা থাকলে অশ্বারোহী দলকে সম্মুখরক্ষী (Advance guard) ও পশ্চাৎরক্ষী (Rear guard) হিসেবে ব্যবহার করা হতো। যাত্রী কলামের বাহুর দিক হতে বিপদের হুমকি থাকলে অশ্বারোহী দল বাহুর দিকে বিস্তৃত হয়ে মার্চ করতো। প্রয়োজনের মুহূর্তে গোটা বাহিনী ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এমন দুর্গম অথচ নিরাপদ ভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারতো যেখানে অন্য যে কোনো বৃহৎ বাহিনীর পক্ষে যাওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। এভাবেই মুসলিম বাহিনী বুসরা অভিমুখে মার্চ করে।

মুসলিম বাহিনীর বুসরা থেকে যাত্রাপথের কোনো বর্ণনা লিপিবদ্ধ নেই। তবে এই পথ অবশ্যই মরু সাগরের উত্তর দিয়ে হতে হবে। কেননা আমর ইবনুল আস

এই বাহিনীর সংগে যোগদান করেছিলেন আজনাদাইনে। মুসলিম বাহিনী মরু সাগরের দক্ষিণ দিয়ে অগ্রসর হলে আরাবা উপত্যকায় অবস্থানকারী আমর ইবনুল আসের দলকে পথ হতেই সংগে নিতে পারতো। আরাবা উপত্যকার অবস্থান মরু সাগরের দক্ষিণে। মুসলিম বাহিনী–সম্ভবত জারাশ এবং জেরিকো ধরে অগ্রসর হয়ে জেরুযালেমকে পাশ কাটিয়ে, কেননা এই শহরটিতে ছিল শক্তিশালী রোমান বাহিনীর অবস্থান, জুদিয়া পাহাড়ী এলাকা অতিক্রম করেছিল। এই পাহাড়ী এলাকার অবস্থান ছিল জেরুযালেমের দক্ষিণে। মুসলিম বাহিনী ২৪শে জুলাই আজনাদাইনে উপস্থিত হয়। পরদিন আমর ইবনুল আস আরাবা উপত্যকা হতে অগ্রসর হয়ে আজনাদাইনে উপস্থিত হন। আজনাদাইনে সমবেত রোমান বাহিনীর পক্ষ থেকে একটি বড় ধরনের আঘাতের আশংকা নিয়ে আমর গত কয়েক সপ্তাহ ধরে খুবই অস্থিরতার মধ্যে ছিলেন। খালিদ (রা)-এর সংগে মিলিত হয়ে তাঁর আনন্দের আর সীমা ছিল না।

মুসলিম বাহিনী রোমান ক্যাম্প হতে প্রায় এক মাইল দূরে ক্যাম্প স্থাপন করে। ৩২,০০০ সৈন্যের জন্য স্থাপিত ক্যাম্পটিকে বেশ বিশাল দেখাচ্ছিল। যুদ্ধের জন্য এটাই মুসলিম বাহিনীর পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে বড় সৈন্য সমাবেশ। রোমান ক্যাম্পটি ছিল জেরুযালেম হতে বেইত জিবরীনগামী রাস্তা বরাবর দুই সারিতে স্থাপিত। এটা করা হয়েছিল যাতে স্বল্প সময়ের নোটিশে সৈনিকগণ যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়তে পারে।

মুসলিম বাহিনী আজনাদাইনে সমবেত হতে মাত্র এক সপ্তাহ সময় নিয়েছে, যার জন্য রোমান বাহিনী নিয়েছে দুই মাস। সব নিয়মিত ও সুসজ্জিত বাহিনীর মতো রোমান বাহিনীও যে কোনো চলাচলের জন্য অনেক সময় নিতো। ভাণ্ডার হতে রসদ ও অস্ত্র সম্ভার ইস্যু করা, রসদবাহী গাড়ি ও ঘোড়া সংগ্রহ করা ইত্যাদি কাজে অনেক সময়ের প্রয়োজন হতো। তদুপরি এদের রসদ ও অন্যান্য মালামাল বহনের জন্য হাজার হাজার গরু বা ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করা হতো বিধায় চলাচলের জন্য ভাল রাস্তার প্রয়োজন হতো। সবকিছু সত্ত্বেও বিগত দুই মাসে রোমানগণ হেমসের গভর্নর ওয়ার্দানের কমান্ডে সফলতার সংগে ৯০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী আজনাদাইনে সমবেত করতে সমর্থ হয়। কুবুকলার নামের একজন জেনারেল এই বাহিনীর চীফ অব স্টাফ অথবা ডেপুটি কমান্ডার-ইন-চীফ হিসেবে কাজ করে।

আজনাদাইনে সমবেত রোমান বাহিনী মুসলমানদের জন্য কোনো হুমকির কারণ ছিল না। অবশ্য তারা সামনে বুসরার দিকে অগ্রসর হলে মুসলিম বাহিনীর জন্য হুমকি সৃষ্টি হতো। সেক্ষেত্রে প্রচলিত আরবীয় যুদ্ধ কৌশল হিসেবে তারা প্রত্যাহার করে জর্দানের পূর্ব বা দক্ষিণ অংশে গিয়ে মরুভূমিকে পিছনে রেখে যুদ্ধের জন্য অবস্থান নিতে পারতো যাতে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মরুর বুকে আশ্রয় নেয়া যায়। কিন্তু মুসলিম বাহিনী সে সময় পর্যন্ত অর্থাৎ রোমানদের অগ্রযাত্রার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করে নিজেরাই স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়ে আজনাদাইনের প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়।

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, মুসলিম বাহিনী কেন মরুভূমিকে অনেক পিছনে ফেলে সিরিয়ার অভ্যন্তরে বসতি এলাকায় প্রবেশ করে সংখ্যায় তিনগুণ শক্তির সামনা-সামনি হয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তর নিহিত খালিদের স্বভাবের মধ্যে। খালিদের জন্মই হয়েছিল যেন যুদ্ধ করার জন্য এবং যুদ্ধ তাঁকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতো। ১২ শতাব্দী পরে আর একজন পৃথিবী বিখ্যাত জেনারেলকে বলতে শোনা যায়, "যুদ্ধের চেয়ে আর কিছুতেই আমি তেমন আনন্দ পাই না।" একই স্বভাব ছিল খালিদ (রা)-এরও। এক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার খালিদ (রা) না হয়ে অন্য কেউ হলে মুসলমানগণ স্বেচ্ছায় আজনাদাইন পর্যন্ত অগ্রসর হতো কিনা সন্দেহ।

সময়ের ব্যবধানে খালিদের সিদ্ধান্তই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। আজনাদাইনে রোমান বাহিনীর বিশাল সমাবেশের কথা বিবেচনা করে মুসলমানগণ তাদের দখলীকৃত স্থানে বসে থাকতে পারতো। তবে সিরিয়ার গভীরে ঢুকে অভিযান চালানোর জন্য আজনাদাইনে সমবেত রোমান বাহিনীকে ধ্বংস করার প্রয়োজন ছিল। কেননা মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্যই হেরাক্লিয়াস চতুরতার সংগে এই সমাবেশ ঘটায়।

রোমান ও মুসলমানগণ এখন আজনাদাইনে একে অপরের মুখোমুখি। আকস্মিকতাকে উপেক্ষা করার জন্য তারা পর্যাপ্ত প্রহরী মোতায়েন করে। অফিসারগণ সামনে অগ্রসর হয়ে ব্যাপক পরিদর্শন (Reconnaissance) চালাতে থাকে এবং সৈনিকগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

রোমান বাহিনীর ক্যাম্পের বিশাল আকৃতি মুসলমানদের জন্য কিছুটা মানসিক হয়রানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের সকলেই জানতো যে, রোমানদের সৈন্যসংখ্যা প্রায় ৯০,০০০। অধিকাংশ মুসলিম সৈনিক এর পূর্বে কখনও এতো বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হয়নি। শুধু খালিদের সংগী ৯,০০০ অভিজ্ঞ যোদ্ধা মানসিক দিক থেকে শক্ত থাকে। অবশ্য এরা ইরাকে বিরাট নিয়মিত বাহিনীর মুকাবিলা করলেও এতো বিশাল আকারের বাহিনীর সামনে কখনও দাঁড়ায়নি।

খালিদ (রা) ক্যাম্প ঘরে ঘুরে প্রত্যেকটি সৈনিক ও তাদের কমান্ডারের সংগে কথা বলেন, "শোন, হে মুসলিমগণ! তোমরা পূর্বে কখনও এতো বিশাল রোমান বাহিনীর মুকাবিলা করনি। মহান আল্লাহ তোমাদের হাত দিয়ে তাদেরকে পরাজিত করলে তারা আর কখনও তোমাদের সামনে দাঁড়াবে না। অতএব যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ় থাকবে এবং নিজের বিশ্বাসকে অটুট রাখবে। শত্রুকে পিঠ দেখানো হতে সাবধান থাকবে, যদি তা করো তাহলে তার পরিণতি হবে জ্বলন্ত আগুন। নিজের অবস্থানে দৃঢ় থাকবে এবং চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। আমার নির্দেশ না পেলে আক্রমণ করবে না।"[৩১১] কমান্ডারের বিশাল ব্যক্তিত্ব ও অপরিসীম আত্মবিশ্বাস মুসলিম সৈনিকদের মনোবল সৃষ্টিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

---

৩১১. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা - ৩৫।

প্রতিপক্ষের ক্যাম্পে ওয়ার্দান তার যুদ্ধ পরিষদের সভা ডেকে জেনারেলদেরকে বলেন, "ওহে রোমানগণ! সীজার তোমাদের উপর মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তোমরা এই যুদ্ধে পরাজিত হলে আরবদের বিরুদ্ধে আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না এবং তারা তোমাদের নারীদেরকে নির্যাতন করবে। অতএব যখন আক্রমণ করবে একক শক্তি হিসেবে আক্রমণ করবে এবং দৃঢ় থাকবে। যিশুর সাহায্য প্রার্থনা করো। মনে রাখবে যে, তোমরা তাদের একজনের বিরুদ্ধে তিনজন দাঁড়াবে।"[৩১২]

যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে খালিদ (রা) খুব কাছাকাছি থেকে রোমান ক্যাম্পের তথ্য লাভের জন্য একটি সাহসী স্কাউট প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। জাররার স্বেচ্ছায় আগ্রহী হলে তাকে প্রেরণ করা হয়। জাররার পূর্বের মতোই কোমরের উপর হতে কাপড় খুলে ঘোড়া নিয়ে রোমান ক্যাম্পের কেন্দ্রের নিকটবর্তী একটি ছোট পাহাড় চূড়ায় পৌঁছে যান। রোমানগণ তাকে দেখে ফেলে এবং ৩০ জন অশ্বারোহীর একটি দল প্রেরণ করে ধরে নেয়ার জন্য। তাদেরকে অগ্রসর হতে দেখে জাররার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ধীর গতিতে মুসলিম ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তারা কাছে আসলে তিনি গতি বাড়িয়ে দেন। তার উদ্দেশ্য ছিল রোমান অশ্বারোহীদেরকে তাদের ক্যাম্প হতে দূরে নিয়ে আসা যাতে আর কেউ তাদের সাহায্যে সহজে এগিয়ে আসতে না পারে। দুই বাহিনীর মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে তিনি তাকে ধাওয়াকারীদের দিকে ফিরে দাঁড়ান এবং সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যক্তিটিকে বর্শা দ্বারা আঘাত করেন। তাকে ধরাশায়ী করে তিনি ধাওয়াকারী দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তিকেও খতম করেন এবং একই গতিতে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি ঘোড়াকে এমনভাবে পরিচালনা করছিলেন যাতে একসংগে একাধিক ব্যক্তিকে মুকাবিলা করতে না হয়। কারও কারও বিরুদ্ধে তিনি তরবারিও ব্যবহার করেন। বিশ্বাস করা হয় যে, তিনি মোট ১৯ জনকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং বাকিরা দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যায়। সে রাতে রোমান ক্যাম্পের সবার মুখে মুখে এই ভয়ংকর উলংগ বীরের গল্প ঘুরে বেড়ায়।

জাররার ফিরে এলে মুসলিমগণ তাকে উল্লাসসহকারে স্বাগত জানালেও খালিদ (রা) তাকে তিরস্কার করেন। কেননা তাকে পাঠানো হয়েছিল শুধু প্রতিপক্ষের তথ্য সংগ্রহের জন্য, কিন্তু তিনি অপরিকল্পিতভাবে শত্রুর সংগে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এর প্রেক্ষিতে জাররার বলেন যে, শত্রুর সংগে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার সময় কমান্ডারের অসন্তোষের বিষয়টি তার মনে ছিল, যার জন্য তিনি বাকিদেরকে হত্যার লক্ষ্যে ধাওয়া করা থেকে বিরত থাকেন।

এই ঘটনার পর রোমান বাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার কুবুকলার একজন আরব খৃস্টানকে প্রেরণ করে মুসিলম ক্যাম্পে ঢুকে তাদের প্রকৃত সংখ্যা ও তাদের গুণগত

---

৩১২. পূর্বোক্ত।

মান সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য। আরব খৃস্টানটি মুসলিম তাঁবুতে সহজেই প্রবেশ করতে পারে, কেননা তাকে সবাই মুসলমান হিসেবে ধরে নিয়েছিল। পরদিন সে পালিয়ে ক্যাম্প ত্যাগ করে কুবুকলারকে জানায়, "রাতেরবেলা তারা সাধক ও দিনেরবেলা যোদ্ধা। তাদের শাসকের পুত্র চুরি করলেও তার হাত কর্তন করা হয় এবং সে অবৈধ যৌন অপরাধে লিপ্ত হলে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। এভাবেই তারা তাদের মধ্যে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করেছে।"

গুপ্তচরের এই মন্তব্য শুনে কুবুকলার বলে, "তুমি যা বললে তা যদি সত্য হয় তাহলে মাটির উপরে এই লোকদের মুকাবিলা করা থেকে বিরত থেকে মাটির নিচে আশ্রয় নেয়া ভাল। আমি মনে করি তাদের থেকে দূরে থাকা উচিত যাতে আমার প্রভুকে আমাকে তাদের বিরুদ্ধে বা তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করতে না হয়।"[৩১৩]

রোমান বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ ওয়ার্দান যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হলেও কুবুকলার মনোবল হারিয়ে ফেলে।

৬৩৪ খৃস্টাব্দের ৩০শে জুলাই (২৮শে জামাদি-উল-আউয়াল ১৩ হিজরী) ভোরবেলা মুসলমানগণ ফজরের নামায শেষ করার সংগে সংগেই খালিদ (রা) তার বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধের জন্য অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ দান করেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পূর্বের দিনেই জারি করা হয়েছিল। মুসলিমগণ ক্যাম্প থেকে কয়েকশ' গজ সামনে গিয়ে সমতল ভূমির উপরে অবস্থান গ্রহণ করে। খালিদ (রা) তার বাহিনীকে পশ্চিমদিকে মুখ করে দীর্ঘ পাঁচ মাইল এলাকা জুড়ে মোতায়েন করেন যাতে সংখ্যায় কয়েকগুণ বেশি প্রতিপক্ষের গোটা সম্মুখভাগকে মুকাবিলা করা যায় ও শত্রু যাতে পার্শ্বদেশ দিয়ে ঘুরে অগ্রসর হয়ে পিছন দিকে আক্রমণ করতে না পারে। তিনি মধ্যবর্তী অবস্থান ও দুইটি শক্তিশালী বাহুর বিন্যাসে গোটা বাহিনীকে মোতায়েন করেন। দুই বাহুর প্রান্তে তিনি দুইটি শক্তিশালী পার্শ্বরক্ষী দল মোতায়েন করেন যাতে রোমানগণ পার্শ্বদেশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে মুসলিমগণকে ঘেরাও করে ফেলতে না পারে।

মুসলিম বাহিনীর মধ্যবর্তী দলের কমান্ড ন্যস্ত হয় মুআয বিন জাবালের উপরে এবং ডান ও বাম বাহুর নেতৃত্ব দেয়া হয় যথাক্রমে খলীফার পুত্র আবদুর রহমান ও সায়ীদ-বিন আমীরের উপরে। আরও জানা যায় যে, বাম বাহুর প্রান্তে মোতায়েন পার্শ্বরক্ষী দলের কমান্ডার ছিলেন শুরাহবীল। তবে ডান বাহুর পার্শ্বরক্ষী দলের কমান্ডারের নাম জানা যায় না। মধ্যবর্তী অবস্থানের পিছনে খালিদ (রা) ইয়াযীদের কমান্ডে ৪০০০ যোদ্ধা মোতায়েন করেন যারা রিজার্ভ হিসেবে কাজ করবে ও মুসলিম

৩১৩. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬১০।

ক্যাম্পের নিরাপত্তা বিধান করবে, যেখানে নারী ও শিশুরা অবস্থান করছে। খালিদ (রা) স্বয়ং অবস্থান নেন মধ্যবর্তী অবস্থানের পাশেই এবং তার সংগে থাকে বেশ কিছু সংখ্যক খ্যাতিমান যোদ্ধা ও কমান্ডার, যুদ্ধের বিশেষ প্রয়োজনে যাদেরকে ব্যবহার করা হবে। এদের মধ্যে ছিলেন আমর ইবনুল আস, জাররার, রাফে এবং উমরের পুত্র আবদুল্লাহ।

মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য অবস্থান গ্রহণ করতে দেখে রোমানগণও ছুটে এসে প্রতিপক্ষের সম্মুখ সারির আধা মাইল দূরে যুদ্ধের জন্য অবস্থান গ্রহণ করে। রোমান বাহিনীও প্রতিপক্ষের মতো বিস্তৃত সম্মুখভাগ জুড়ে অবস্থান গ্রহণ করে। তবে তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে অবস্থানের গভীরতা ছিল প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেক বেশি। ওয়ার্দান ও কুবুকলার দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত অবস্থায় মধ্যখানে অবস্থান নেয়। বিশাল রোমান বাহিনীর যুদ্ধবিন্যাস ও তাদের বহন করা বিরাট আকারের ক্রশ ও ব্যানার এক ভীতিকর দৃশ্যের অবতারণা করে।

যুদ্ধের বিন্যাস শেষ হলে খালিদ (রা) ঘোড়ায় চড়ে তার বাহিনীর সমস্ত ইউনিট ঘুরে দেখেন এবং তার সৈনিকদেরকে আল্লাহর নামে যুদ্ধ করার আহ্বান জানান। তিনি প্রত্যেকটি ইউনিটে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে সংঘবদ্ধ করে একক শক্তি হিসেবে উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "তোমরা যখন তীর ছুঁড়বে, তা যেন একই সংগে মৌমাছির একটি ঝাঁকের মতো প্রতিপক্ষের উপরে গিয়ে পড়ে।" তিনি ক্যাম্পে গিয়ে নারীদের সংগেও কথা বলেন এবং তাদের প্রতি আহ্বান জানান আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে। মুসলিম নারীগণ তাদের সর্বাধিনায়ককে এই বলে আশ্বস্ত করে যে, তাদেরকে সম্মুখে গিয়ে যুদ্ধ করার সুযোগ দেয়া না হলেও অন্তত তারা আত্মরক্ষায় সক্ষম।

উভয় বাহিনীর যুদ্ধ বিন্যাস সম্পন্ন হতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লেগে যায়। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে রোমান বাহিনীর কেন্দ্র থেকে কালো হ্যাটধারী একজন বৃদ্ধ বিশপ অর্ধেক পথ এগিয়ে এসে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় আহ্বান জানান, "তোমাদের মধ্যে কে আছে যে সামনে এসে আমার সংগে কথা বলবে ?"

ইসলামে পৌরহিত্যের কোনো নিয়ম নেই। সেনাবাহিনীর কমাণ্ডারই একই সংগে তাদের ইমাম।[৩১৪] অতএব খালিদ (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে যান। বিশপ তাকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি এই বাহিনীর কমান্ডার ?" খালিদ (রা) উত্তরে বলেন, "আমি যতক্ষণ আল্লাহর আনুগত্য করবো ও রাসূলের নির্দেশিত পথে চলবো ততক্ষণ তারা আমাকে নেতা হিসেবে মানবে। আমি এই পথ থেকে বিচ্যুৎ হলে তাদের উপরে আমার কোনো কমাণ্ড থাকবে না।" বিশপ কিছুক্ষণ চিন্তা করে মন্তব্য করেন, "এই কারণেই তোমরা আমাদের উপরে বিজয় লাভ করো।" তারপর সে তার উদ্দেশ্য

---

৩১৪. যিনি নামাযে নেতৃত্ব দান করেন।

ব্যক্ত করে, "ওহে আরবগণ! তোমরা এমন এক সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছ যা কোনো রাজাও সাহস করে না। পারসিকগণ একবার আক্রমণ করে অসম্মানজনকভাবে ফিরে গেছে। অন্য যারা এসেছিল তারাও সুবিধা করতে পারেনি। তোমরা এ যাবত আমাদের উপরে কিছু বিজয় লাভ করেছ সত্য, কিন্তু তোমাদের এ বিজয় স্থায়ী নয়।"

"আমার প্রভু ওয়ার্দান তোমাদের সংগে মহানুভবতা দেখাতে চান। তোমরা এ সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে গেলে তোমাদের প্রত্যেক সৈনিককে একটি করে দিনার, জামা ও পাগড়ি দেয়া হবে। আর তোমার জন্য দেয়া হবে ১০০ দিনার, ১০০ জামা ও ১০০ পাগড়ি।"

"দেখ,আমাদের এমন এক বাহিনী আছে যার যোদ্ধার সংখ্যা অগণিত। তোমরা পূর্বে যে রোমান বাহিনীর মুকাবিলা করেছ তাদের সংগে এই বাহিনীর তুলনা হয় না। সীজার এই বাহিনীর সংগে পাঠিয়েছেন অনেক খ্যাতিমান জেনারেল ও মহান বিশপ।"[৩১৫]

উত্তরে খালিদ (রা) সচরাচরের মতো তিনটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন ইসলাম, জিযিয়া অথবা তরবারি। এর যেকোনো একটি বাস্তবায়ন ছাড়া মুসলিমগণ সিরিয়া ত্যাগ করবে না। আর দিনার ও কাপড়ের প্রতি ইংগিত করে খালিদ (রা) বলেন যে, মুসলিমগণ ওগুলো সহসাই যুদ্ধবিজয়ের মাধ্যমে লাভ করবে।

খালিদের এই জবাব নিয়ে বিশপ ফিরে যায় এবং ওয়ার্দানকে সবকিছু অবহিত করে। ওয়ার্দান খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং মুসলিম বাহিনীর উপরে একটি ধ্বংসাত্মক আঘাত হানার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

ওয়ার্দান একসারি তীরন্দাজ ও গুলতিধারী ব্যক্তিকে রোমান বাহিনী থেকে আলাদা করে সামনে এগিয়ে দেয়। তারা মুসলিম বাহিনী থেকে তীর নিক্ষেপের দূরত্বে অবস্থান নেয়। তা দেখে মুসলিম বাহিনীর মধ্যবর্তী অবস্থানের কমান্ডার মুআয তার যোদ্ধাদেরকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে চাইলে খালিদ (রা) বাধা দান করেন এই বলে, "আমার হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো এবং দুপুরের পূর্বে নয়।"[৩১৬]

মুআয (রা) অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করতে চাচ্ছিলেন কারণ রোমকগণ উন্নতমানের তীর-ধনুক ও গুলতি ছোঁড়ার বিশেষ অস্ত্রের সাহায্যে, যা মুসলমানদের ছিল না, প্রতিপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় এই পরিস্থিতির প্রতিকার হলো প্রতিপক্ষের কাছে গিয়ে তরবারি দিয়ে মুকাবিলা করা। কিন্তু খালিদ (রা) একটি সুসজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে এতো তাড়াতাড়ি একটি অপরিকল্পিত ঝুঁকি নিতে নারাজ। এভাবে দুপুরের ঘণ্টা দুয়েক পূর্বে রোমান তীরন্দাজ ও গুলতিধারীদের দ্বারা যুদ্ধের সূচনা হয়।

---

৩১৫. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা - ৩৬।

৩১৬. পূর্বোক্ত।

প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধ মুসলমানদের প্রতিকূলে যায় এবং তাদের বেশ কিছু নিহত ও অনেকেই আহত হয়। রোমানদের তীর ও গুলতির আক্রমণ প্রতিহত করার কোনো সুব্যবস্থা না থাকায় মুসলমানগণ অগ্রসর হয়ে বর্শা ও তরবারির সাহায্যে আক্রমণ করার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়ে, কিন্তু খালিদ (রা) এখনও বাধা দান করছেন। শেষ পর্যন্ত শক্তিধর জাররার খালিদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, "মহান আল্লাহ আমাদের সংগে থাকা সত্ত্বেও আমরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছি। আল্লাহর কসম, এর ফলে শত্রুরা ভাববে যে, আমরা তাদের ভয়ে ভীত। হুকুম দিন, আমরা আপনার সাথে একযোগে আক্রমণ করি।" খালিদ (রা) সিদ্ধান্ত নেন যে, মুসলিম বীরদের সংগে রোমান বীরদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হোক। এতে মুসলিম বীরগণ ভাল করতে পারবে। ফলে রোমান বাহিনীর কিছু অফিসার নিহত হলে তাদের কার্যকরিতা হ্রাস পাবে। "তুমি আক্রমণ করতে পারো[৩১৭]" খালিদ (রা) জাররারকে আক্রমণের অনুমতি প্রদান করেন এবং এতে খুশি হয়ে জাররার সংগে সংগেই স্বীয় ঘোড়াকে সামনে এগিয়ে দেন। রোমানদের তীর থেকে আত্মরক্ষার জন্য জাররার বর্ম ও হেলমেট পরিহিত অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁর হাতে ছিল জনৈক রোমানের নিকট হতে পাওয়া হাতির চামড়ার তৈরি ঢাল। দুই বাহিনীর অবস্থানের মাঝামাঝি গিয়ে জাররার থেমে যান এবং মাথা উচু করে যুদ্ধের হুংকার ছাড়েন ঃ

আমি কাপুরুষদের মৃত্যুদূত,
আমি রোমানদের ঘাতক,
আমাকে পাঠিয়েছে শাস্তিদানের জন্য
আমি জাররার বিন আযওয়ার।[৩১৮]

কয়েকজন খ্যাতিমান রোমান যোদ্ধা এই চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার জন্য এগিয়ে এলে জাররার সংগে সংগে শরীরের উপরের অংশের কাপড় খুলে ফেলেন। রোমানগণ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে যে, এই সেই উলংগ বীর। পরবর্তী কয়েক মিনিটের মধ্যেই জাররার কয়েকজন রোমানকে হত্যা করতে সক্ষম হন। এদের মধ্যে ছিল দুইজন রোমান জেনারেল, একজন আম্মানের ও অন্যজন তিবেরিয়ামের গভর্নর।

এরপর রোমান বাহিনী হতে দশজন অফিসারের একটি দল জাররারের দিকে অগ্রসর হয়ে আসে। তা দেখে খালিদ (রা)ও দশজন যোদ্ধা নিয়ে অগ্রসর হয়ে যান এবং রোমান অফিসারদেরকে হত্যা করেন। এভাবে উভয় পক্ষের আরও কিছু খ্যাতিমান যোদ্ধা অগ্রসর হয়ে আসে এবং ব্যক্তির সংগে ব্যক্তির বা দলের সংগে

---

৩১৭. পূর্বোক্ত।
৩১৮. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা - ৩৭।

দলের দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই যুদ্ধের তীব্রতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং তা প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলে। এই সময়ে রোমান তীরন্দাজ ও গুলতিধারী ব্যক্তিরা নিষ্ক্রিয় থাকে। এই পর্যায়ে যুদ্ধের গতি মুসলমানদের অনুকূলে চলে আসে এবং তারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে অধিকাংশ রোমান অফিসারকে হত্যা করতে সক্ষম হন।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ অব্যাহত থাকা অবস্থায় দুপুর গড়িয়ে গেলে খালিদ (রা) তাঁর বাহিনীকে গোটা সম্মুখ জুড়ে একযোগে আক্রমণ করার নির্দেশ দান করেন। মুসলিম বাহিনী একযোগে প্রতিপক্ষের উপর চড়াও হয়। এই পর্যায়ে শুরু হয় তরবারি ও ঢালের সাহায্যে প্রধান যুদ্ধ।

এটি ছিল একটি সম্মুখ সংঘর্ষ এবং এতে কোনো সুচিন্তিত রণকৌশল প্রয়োগ ছিল না। কোন পক্ষই প্রতিপক্ষের পার্শ্বদেশ অতিক্রম করে সৈন্য পরিচালনার চেষ্টা করেনি। উভয়পক্ষই খুব কাছাকাছি থেকে তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে তা চলে। শেষ বিকালের দিকে উভয় পক্ষই ভীষণ ক্লান্তি বোধ করে এবং একে অপরের থেকে দূরে সরে পূর্বের অবস্থানে ফিরে যায়। আজ আর করার তেমন কিছুই নেই।

রোমান পক্ষে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব নিয়ে ওয়ার্দান মর্মাহত হয়ে যায়। সেই তুলনায় প্রতিপক্ষের ক্ষতির পরিমাণ খুবই কম। সে তার যুদ্ধ পরিষদের সভা থেকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে। তার জেনারেলগণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে এবং বিভিন্নজনে বিভিন্ন পরামর্শ দিতে থাকে। একজনের পক্ষ থেকে পরামর্শ আসে যে কোনো ভাবে মুসলিম কমান্ডারকে হত্যা করতে পারলে যুদ্ধে জয় করা সহজ হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী পরদিন সকালে ওয়ার্দান স্বয়ং সামনে অগ্রসর হয়ে খালিদ (রা)-কে আহবান জানাবে সামনে এগিয়ে এসে একান্তে শান্তির লক্ষ্যে সন্ধির শর্তাবলী আলোচনার জন্য। খালিদ (রা) এগিয়ে এলে ওয়ার্দান তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যস্ত করে ফেলবে এবং এই সুযোগে পূর্ব হতে লুকিয়ে থাকা ১০ জন রোমান যোদ্ধা অগ্রসর হয়ে মুসলিম কমান্ডারকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। ওয়ার্দান ছিল একজন সাহসী যোদ্ধা। সে এই পরিকল্পনায় রাজী হয়ে যায়। দশজন যোদ্ধাকে নির্বাচন করে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দান করে রাতের মধ্যেই যথাস্থানে মোতায়েন করে রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

রোমান কমান্ডার ডেভিড নামের তার একজন সহচরকে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে মুসলিম ক্যাম্পে প্রেরণ করে। তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, সে মুসলিম ক্যাম্পে গিয়ে খালিদের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করবে এবং তাকে বলবে যে, অনেক রক্তপাত হয়েছে। আর যুদ্ধ নয় বরং শান্তির জন্য আলোচনায় বসা উচিত। অতএব খালিদ (রা) যেন আগামীদিন ভোরবেলা সামনে অগ্রসর হয়ে ওয়ার্দানের সংগে শান্তি আলোচনায় মিলিত হন। উভয় জেনারেল কোনো সহযোগী ছাড়াই আলোচনায় মিলিত হবেন।

ডেভিড এই পরিকল্পনার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে যায়। কেননা এই শান্তি প্রস্তাব হেরাক্লিয়াসের নির্দেশের পরিপন্থী। তার নির্দেশ হলো মুসলমানদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে মরুভূমির বুকে ফেরত পাঠাতে হবে। সে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে মুসলিম ক্যাম্পে যেতে অস্বীকার করে। তখন ওয়ার্দান তাকে সমস্ত পরিকল্পনাটি খুলে বলে এবং এখানেই তার বড় ভুল হয়ে যায়।

সূর্যাস্তের পূর্বেই ডেভিড মুসলিম ক্যাম্পে পৌঁছে ওয়ার্দানের শান্তি প্রস্তাব দানের জন্য খালিদ (রা)-এর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়। মুসলমানগণ তখনও যুদ্ধের অবস্থানেই ছিল। সংবাদ পেয়ে খালিদ (রা) ডেভিডের সামনে উপস্থিত হন এবং তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

খালিদের ছয় ফুট উঁচু ও কঠিন পেশীসমৃদ্ধ অসংখ্য যুদ্ধজয়ী রুক্ষ চেহারা প্রথমবার দেখে যে কেউ নিজেকে অসহায় বোধ করতে পারে। তার ধারালো চোখের কঠোর দৃষ্টি, যার মধ্যে একধরনের নিষ্ঠুরতার প্রকাশ আছে, সামনে ডেভিড নিজেকে খুবই অসহায় মনে করেন। সে মিন মিন করে বলে, "আমি যোদ্ধা হিসেবে নয় বরং একজন শান্তির দূত হিসেবে এসেছি।"

খালিদ (রা) ডেভিডের আরো কাছে গিয়ে নির্দেশের সুরে বলেন, "বলো, সত্য কথা বললে ফিরে যেতে পারবে, আর মিথ্যা বললে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

আরব খৃস্টানটি তার প্রস্তাব পেশ করে, "ওয়ার্দান এই রক্তক্ষয়ে ব্যথিত। তিনি আরও রক্তপাতের পরিবর্তে শান্তি চান। শান্তি আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর যুদ্ধ নয়। তার প্রস্তাব হলো যে, তিনি এবং আপনি আগামীকাল সকালে একান্তে শান্তির শর্তাবলী আলোচনা করবেন।

উত্তরে খালিদ (রা) বলেন, "তোমার কমান্ডারের প্রস্তাবের মধ্যে যদি কোনো প্রতারণার আশ্রয় থেকে থাকে তাহলে জেনে রাখো যে, কিভাবে প্রতারণার মূল্যোৎপাটন করতে হয় তা আমরা ভালভাবেই জানি। তার মধ্যে যদি কোনো ষড়যন্ত্র থেকে থাকে তাহলে তা তার নিজের এবং তোমাদের সকলের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করবে। আর তার প্রস্তাব যদি সত্য হয় তাহলেও জিযিয়া প্রদানের শর্ত ব্যতিরেকে কোনো শান্তি হবে না। আর তোমরা যদি ধন-সম্পদের লোভ দেখাও, তাহলে তা আমরা শীঘ্রই তোমাদের নিকট হতে ছিনিয়ে নেব।"[৩১৯]

খালিদের অনঢ় আত্মবিশ্বাস ও কঠোর ভাষা ডেভিডের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। খালিদের বক্তব্য সে ওয়ার্দানের নিকট পৌঁছে দেবে এই কথা বলে পিছনে ঘুরে স্বীয় ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। খালিদের কঠোর দৃষ্টি এখনও তার উপরে। তিনি বুঝতে পারেন যে, প্রস্তাবটির পিছনে ওয়ার্দানের কোনো মতলব আছে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর হঠাৎ ডেভিডের চেতনার উদয় হয়। খালিদ (রা) ঠিকই বলেছেন

---

৩১৯. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা - ৩৯।

যে, রোমানগণ ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিলেও যুদ্ধে পরাজয় ঠেকাতে পারবে না। সে সবকিছু স্বীকার করে সপরিবারে নিজেকে রক্ষা করতে চায়। সে ফিরে এসে পুনরায় খালিদের সামনে দাঁড়ায় এবং ষড়যন্ত্রের গোটা পরিকল্পনাটি খুলে বলে। এমনকি ১০ জন রোমান যোদ্ধা কোথায় আত্মগোপন করে থাকবে তাও বলে দেয়। খালিদ (রা) ডেভিডকে সপরিবারে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন যদি সে ওয়ার্দানের নিকট হতে ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টি গোপন রাখে। ডেভিড রাজী হয়ে ফিরে যায়।

ডেভিড ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করে খালিদের সংগে তার প্রথম কথোপকথন ও পরদিন সকালে নির্দিষ্ট স্থানে খালিদের উপস্থিত থাকার সম্মতির কথা ওয়ার্দানকে অবহিত করে। অবশ্য সে ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টি গোপন রাখে। সবকিছু শুনে ওয়ার্দান খুবই আনন্দিত বোধ করে।

খালিদ (রা)-এর নিকট বিয়য়টি খুবই রোমাঞ্চকর মনে হয়। তিনি ভেবেছিলেন একাই নির্দিষ্ট পাহাড় চূড়ায় দশজন রোমানকে হত্যা করে বীরত্বব্যঞ্জক ইতিহাস সৃষ্টি করবেন। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে আবু উবায়দার সংগে পরামর্শ করতে গেলে তিনি তাকে সংগে দশজন সাহসী যোদ্ধা নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দান করেন। খালিদ (রা) এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান এবং দশজন সাহসী যোদ্ধাকে নির্বাচিত করে জাররারকে নেতা মনোনীত করা হয়। খালিদের পরিকল্পনা অনুযায়ী জাররার ভোরবেলা নয়জন সহযোদ্ধা নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন এবং প্রতিপক্ষের দশজন যোদ্ধার আবির্ভাবমাত্রই মুসলিম বাহিনীর সম্মুখ সারি হতে দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাদেরকে হত্যা করবেন। কিন্তু জাররারের অন্তরে রোমাঞ্চকর অভিযানের আকক্ষা। তিনি খালিদ (রা)-কে অনুরোধ করেন তাদেরকে রাতের আঁধারে সেই নির্দিষ্ট পাহাড় চূড়ায় গিয়ে আত্মগোপনকারী রোমানদেরকে হত্যা করার অনুমতিদানের জন্য। জাররারের দক্ষতার উপরে খালিদের অগাধ বিশ্বাস। তাই তিনি অনুমতি প্রদান করেন। মধ্যরাতের কিছু পূর্বেই জাররার নয়জন যোদ্ধাসহ মুসলিম ক্যাম্প ত্যাগ করেন।

সূর্য উদয়ের পর পরই ওয়ার্দান রত্নখচিত বর্ম পরে এবং একটি রত্নখচিত তরবারি ঝুলিয়ে রাজকীয় ভংগিতে সামনে অগ্রসর হয়। খালিদ (রা)ও মুসলিম বাহিনীর কেন্দ্র হতে অগ্রসর হয়ে ওয়ার্দানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে দুই বাহিনী পূর্বের দিনের মতো যুদ্ধের বিন্যাসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মুসলমানদেরকে মানসিক দিক থেকে দুর্বল করার জন্য ওয়ার্দান কথোপকথন শুরু করে। সে আরবদের সম্পর্কে তার খুবই নিচু ধারণা প্রকাশ করে। আরবরা কিভাবে ক্ষুধার সংগে যুদ্ধ করে খুব দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপন করতো সে অবজ্ঞাভরে তা বর্ণনা করে। প্রতি উত্তরে খালিদের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত ধারালো ও আক্রমণাত্মক। তিনি বলেন, "ওহে কুকুর! ইসলামকে গ্রহণ অথবা জিযিয় প্রদানের এটাই তোমার

শেষ সুযোগ।"[৩২০] খালিদের কথা শেষ হতে না হতেই ওয়ার্দান তরবারি বের না করেই, স্প্রিং এর মতো লাফ দিয়ে পড়ে খালিদ (রা)-কে জড়িয়ে ধরে এবং পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট রোমান যোদ্ধা দশজনকে ডাকতে থাকে।

ওয়ার্দান দেখতে পায় ক্ষুদ্র পাহাড় চূড়াটির আড়াল হতে দশজন রোমান যোদ্ধা উঠে তার দিকে ছুটে আসতে থাকে। তা দেখে খালিদ (রা) আতংকিত হয়ে পড়েন। কেননা তিনি আশা করেছিলেন মুসলিম যোদ্ধাদেরকে। তিনি প্রমাদ গুণলেন এই ভেবে যে, তার নিরাপত্তার আর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই এবং যদি জাররার সাহায্যে এগিয়ে আসতে না পারে তাহলে এই পরিস্থিতি কিভাবে মুকাবিলা করা যাবে। যা হোক রোমান সৈনিকগণ নিকটবর্তী হলে ওয়ার্দান বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করে যে, তাদের দলনেতা সেই অর্ধ-উলংগ বীর এবং সে সহসাই এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

প্রকৃত ঘটনা হলো যে, জাররার তার নয়জন সহযোগীকে নিয়ে পূর্বের রাতে পাহাড় চূড়াটির আড়ালে লুকিয়ে থাকা রোমান সৈনিক দশজনকে হত্যা করেন এবং স্বভাবসুলভ রসিকতা বশে তাদের পোশাক নিজেরা পরিধান করেন। অবশ্য জাররার নিজে পরবর্তীতে তার নিজের যুদ্ধের পোশাকে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি তার সংগীদেরকে নিয়ে ফজরের নামায শেষে ওয়ার্দানের আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

ওয়ার্দান খালিদ (রা)-এর নিকট হতে পিছনে সরে গিয়ে অসহায়ের মতো মুসলিম যোদ্ধাদের দিকে তাকায়। ইতিমধ্যে জাররার ও তার সংগীগণ উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে দুই কমান্ডারকে ঘিরে ফেলেছেন। ফলে ওয়ার্দান খালিদ (রা)-এর নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করে, "তোমার প্রভুর নামে মিনতি করছি, প্রয়োজন হলে তুমি নিজেই আমাকে হত্যা করো, তবু ঐ শয়তানটার হাতে আমাকে ছেড়ে দিও না।"[৩২১]

জবাবে খালিদ (রা) জাররারের দিকে তাকিয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন এবং জাররারের তরবারি মুহূর্তের মধ্যেই ঝলসে উঠে ওয়ার্দানের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

খালিদ (রা) প্রতিপক্ষের উপরে চরম আঘাত হানার জন্য এভাবেই সময়কে তৈরি করে নেন যাতে সৃষ্ট পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে শত্রুর উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। যখন কোনোভাবেই পরিস্থিতিকে অনুকূলে আনা সম্ভব নয় এবং কৌশলে সৈন্য পরিচালনার সুযোগও সীমিত তখন তিনি প্রতিপক্ষের সর্বাধিনায়ক বা অন্য কোনো প্রভাবশালী কমান্ডারকে হত্যার পরপরই হতবাক ও মানসিক দিক থেকে দুর্বল শত্রুর উপরে চরম আঘাত হানেন। এ ক্ষেত্রেও খালিদ (রা) সেই কৌশল গ্রহণ করেন।

---

৩২০. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা - ৪১।
৩২১. পূর্বোক্ত।

ওয়ার্দানকে হত্যা করার পরপরই তিনি একযোগে একটি সাধারণ আক্রমণের নির্দেশ দান করেন। তার আদেশ পেয়ে মুসলিম বাহিনীর উভয় বাহু, পার্শ্বরক্ষী দল ও মধ্যবর্তী অবস্থান একযোগে রোমান বাহিনীর উপরে প্রচণ্ড আক্রমণের সূত্রপাত করে। রোমান বাহিনীর কমান্ডার এখন কুবুকলার।

দুই বাহিনী মুখোমুখি হলে আর একদফা হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। দেখতে দেখতে যুদ্ধের গতি তীব্রতর আকার ধারণ করে এবং কোনো পক্ষই যেন সহসা ছাড় দিতে প্রস্তুত নয়। খালিদ (রা) তার অফিসারদেরকে নিয়ে রোমান অবস্থানের উপরে চরম আঘাত হানেন এবং রোমান জেনারেলগণও তাদের জীবন বাজী রেখে সাম্রাজ্যের গৌরব সমুন্নত রাখার জন্য যুদ্ধ করতে থাকে। মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং রোমানগণ তা যেকোনো মূল্যে ঠেকাতে বদ্ধপরিকর। ফলে অল্পসময়ের মধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্রটি মৃতদেহের স্তূপে পরিণত হয়। নিহতের সংখ্যা বেশি হয় রোমান পক্ষেই।

যুদ্ধের চরম পর্যায়ে উভয়পক্ষই যখন শক্তি প্রয়োগের শেষ প্রান্তে উপনীত, খালিদ (রা) ইয়াযীদের নেতৃত্বে প্রস্তুত চার হাজার মজুদ যোদ্ধাকে আক্রমণে অংশগ্রহণের নির্দেশ দান করেন। মুসলিম বাহিনীতে নতুন শক্তির সংযোগের ফলে আক্রমণের যে তীব্রতা বৃদ্ধি পায় তাতে রোমানদের প্রতিরক্ষাব্যূহের কয়েকস্থানে ভাঙন ধরে যায়। এই সুযোগে মুসলিম বাহিনীর মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে একটি দল সামনে অগ্রসর হয়ে কুবুকলারকে কাপড় দিয়ে মাথা মোড়ানো অবস্থায় দেখতে পায় এবং তাকে সহজেই হত্যা করতে সক্ষম হয়। কুবুকলার যুদ্ধের বিভীষিকা সহ্য করতে না পেরে কাপড় দিয়ে মাথা মুড়িয়েছিল।[৩২২] কুবুকলারের মৃত্যুর সংগে সংগে রোমান প্রতিরক্ষা সম্পূর্ণরূপে ভেংগে পড়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে। তাদের কিছু সাজা অভিমুখে, কিছু জাফরের উদ্দেশ্যে এবং অধিকাংশ জেরুযালেমের দিকে ছুটতে থাকে। খালিদ (রা) কালবিলম্ব না করে তার অশ্বারোহী বাহিনীকে কয়েকটি রেজিমেন্টে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি রাস্তায় প্রেরণ করেন পলাতক রোমানদেরকে হত্যা করার জন্য। যুদ্ধক্ষেত্রে যে পরিমাণ রোমান সৈন্য নিহত হয় তার চেয়ে বেশি নিহত হয় এই ধাওয়াকারী অশ্বারোহী বাহিনীর হাতে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত পলাতকদেরকে পিছু ধাওয়া ও হত্যা চলতে থাকে।

আজনাদাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে রোমান বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

আজনাদাইনের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সার্বিক বিজয় অর্জিত হয়। মুসলিমগণ প্রতিপক্ষের রাজকীয় বাহিনীকে একটি সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করে এবং নৃশংসভাবে হত্যা করে। আজনাদাইনের প্রান্তরে সমবেত রোমান বাহিনীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় যদিও একটি বড় অংশ জেরুযালেমে পালিয়ে দুর্গের দেয়ালের মধ্যে আশ্রয় নিতে

৩২২. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬১০-৬১১।

সক্ষম হয়। বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের সংগে প্রথম প্রধান সংঘর্ষে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীগণ বিজয়ী হন।

এই যুদ্ধটি একটি পরিপূর্ণ যুদ্ধ ও সংঘর্ষের তীব্রতার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও কোনো পক্ষই কৌশলে সৈন্য পরিচালনার চেষ্টা করেনি। রোমানগণ তাদের বাহিনীর বিশালতা ও নিয়ন্ত্রণগত সমস্যার কারণে প্রতিপক্ষের পার্শ্বদেশ দিয়ে কৌশলে সৈন্য পরিচালনা করে তাদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করেনি। আর মুসলিম পক্ষ এই চেষ্টা করেনি তাদের সৈন্য সংখ্যার স্বল্পতার কারণে। তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র বাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে প্রতিপক্ষকে ঘেরাও করতে গেলে প্রতিরক্ষা কেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়ার ঝুঁকির কারণেই খালিদ (রা) এই পদক্ষেপ নেননি। ফলে এটি ছিল একটি সম্পূর্ণ সম্মুখ সংঘর্ষ যাতে উভয়পক্ষে ছিল বিশাল বাহিনীর সমাবেশ। মুসলিম নেতৃত্বের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত ও সাহসিকতা এবং যোদ্ধাদের দক্ষতা এই যুদ্ধে প্রতিপক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রাধান্যকে জয় করতে সক্ষম হয়। খালিদের সামনে সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি কৌশলই অবলম্বন করার মতো ছিল আর তাহলো সর্বাত্মক আক্রমণ রচনার যথার্থ সময়টি বেছে নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো। খালিদ (রা) এই কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সংগে করেছিলেন যা বর্ণনা করা হয়েছে। রোমান বাহিনী প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে পালাতে শুরু করলেও খালিদ (রা) তার চিরাচরিত কৌশলে যত দ্রুত সম্ভব পলাতক প্রতিপক্ষকে ধাওয়া করে সর্বাধিক ক্ষতি করতে সক্ষম হন।

আজনাদাইনের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের জন্য সিরিয়া বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। একটি মাত্র যুদ্ধে বিশাল সাম্রাজ্য জয় সম্পন্ন হওয়ার কথা নয়। কেননা সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের শহরগুলোতেও ছিল রাজকীয় বাহিনীর বিশাল সমাবেশ। তদুপরি রোমান সম্রাট তা আর্মেনিয়া হতে বলকান পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের প্রচুর ঐশ্বর্যের দ্বারা যে কোনো সময়ে একটি প্রতিরক্ষা বাহিনী দাঁড় করাতেও সক্ষম ছিলেন। তবে প্রথম প্রধান যুদ্ধটিতে বিজয়ের ফলে মুসলিম বাহিনী আত্মবিশ্বাস নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছিল সম্ভাব্য যুদ্ধগুলোতে বিজয়ের আশা নিয়ে।

ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে—যুদ্ধের তিনদিন পর খালিদ (রা) খলীফাকে বিস্তারিত লিখে জানান। তিনি স্বীয় পক্ষের ৪৫০ জনের জীবনের বিনিময়ে রোমানদের ৫০,০০০ সৈন্যের প্রাণহানির বর্ণনা দান করেন।[৩২৩] তিনি যুদ্ধে রোমান বাহিনীর সর্বাধিনায়কের নিহত হওয়ার খবরও প্রদান করেন। খালিদ (রা) শীঘ্রই তাঁর দামেস্ক অভিমুখে যাত্রা শুরুর কথাও খলীফাকে অবহিত করেন। মদীনায় এই বিজয় সংবাদ আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে আনন্দের সংগে গ্রহণ করা হয়। এই বিজয় সংবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও শত শত স্বেচ্ছাসেবী সিরিয়া অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসে।

---

৩২৩. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা - ৪২।

এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আবু সুফিয়ান ও তার স্ত্রী হিন্দ। এরা উভয়ে সিরিয়া গমন করে পুত্র ইয়াযীদের কোরে যোগদান করে। খালিদের পত্রের জবাবে খলীফা তাঁকে দামেস্ক অবরোধ করে বিজয় অর্জিত না হওয় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন এবং তারপর হেম্‌স ও এন্টিওক আক্রমণের নির্দেশ দান করেন। খালিদ (রা)-এর জন্য অবশ্য সিরিয়ার উত্তর সীমান্ত অতিক্রম করে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি ছিল না।

হেরাক্লিয়াস হেমসে অবস্থান কালে আজনাদাইনের প্রান্তরে রোমান বাহিনীর ধ্বংস হওয়ার খবর লাভ করেন। এই খবরটি তার উপরে আকাশ হতে বজ্রপাতের মতোই পতিত হয়। তিনি নিজেকে খুবই বিধ্বস্ত মনে করেন এবং দ্রুত এন্টিওক যাত্রা করেন। মুসলিম বাহিনী দামেস্ক অভিমুখে যাত্রা করতে পারে অনুমান করে সম্রাট জেরুযালেমে আশ্রয় গ্রহণকারী রোমান সৈনিকদেরকে (স্থানীয় দুর্গরক্ষীগণ ব্যতীত) ইয়াকুসায়[৩২৪] অগ্রসর হয়ে তাদের যাত্রা বিলম্বিত করার নির্দেশ দান করেন। (১৬ নম্বর ম্যাপ দ্রঃ) একই সংগে তিনি দামেস্কে আরও সৈন্য সমাবেশের ও অবরোধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দান করেন।

আজনাদাইনের যুদ্ধের এক সপ্তাহ পড়ে খালিদ (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন এবং দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে জেরুযালেমকে এড়িয়ে দামেস্কের দিকে অগ্রসর হন। খালিদ (রা) একটি অশ্বারোহী দলকে আবুল আওয়ারের নেতৃত্বে ফাহলে রেখে যান যাতে সেখানকার দুর্গে অবস্থিত রোমান যোদ্ধাগণ দুর্গ থেকে বের হয়ে রাজকীয় বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতে না পারে। বাহিনীর অবশিষ্ট অংশ নিয়ে অগ্রসর হয়ে খালিদ (রা) ইয়ারমুক নদীর উত্তর তীরে ইয়াকুসায় একটি রোমান বাহিনীর সম্মুখীন হন। অবশ্য আজনাদাইনের পরাজয়ের কারণে রোমানগণ মানসিক দিক থেকে এতোটা দুর্বল ছিল যে, তারা বড় ধরনের বাধা সৃষ্টিতে সক্ষম ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীকে কিছু সময় ঠেকিয়ে রাখা যাতে দামেস্কে প্রস্তুতি গ্রহণের কিছু সময় পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও ৬৩৪ খৃস্টাব্দের মধ্য-আগস্টে (মধ্য-জমাদিউল-আখির, ১৩ হিজরী) ইয়াকুসায় একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং রোমান বাহিনী আবার পরাজিত হয়।[৩২৫]

রোমানগণ দ্রুত প্রত্যাহার করে এবং খালিদ (রা) দামেস্কের দিকে যাত্রা করেন।

---

৩২৪. ওয়াকুমা নামেও পরিচিত।

৩২৫. তাবারীসহ প্রাথমিক যুগের অনেক ঐতিহাসিক এই সংঘর্ষটিকে ইয়ারমুকের যুদ্ধ বলে ভুল করেছেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধটিও সংঘটিত হয়েছিল এই এলাকায়। তারা ১৩ হিজরীকে ইয়ারমুকের যুদ্ধের বছর বলে উল্লেখ করেছেন।

দামেস্ক বিজয়

দামেস্ক পরিচিত ছিল সিরিয়ার বেহেশত হিসেবে। একটি মহানগরীর বিখ্যাত হয়ে ওঠার জন্য যা কিছু দরকার তার সবই ছিল এই শহরটিতে। সম্পদের প্রাচুর্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, উপাসনালয় এবং প্রতিরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সৈনিক সবকিছু মিলিয়ে শহরটি ছিল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। সেই সংগে ছিল এর সমৃদ্ধ ইতিহাস। প্রধান শহরটি ১১ মিটার[৩২৬] দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তবে শহরতলি এলাকার কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। দেয়ালঘেরা শহরটির দৈর্ঘ ছিল এক মাইল ও প্রস্থ আধা মাইল এবং এতে প্রবেশের ছয়টি গেট ছিল। গেটগুলোর নাম হলো ঃ পূর্ব গেট, থমাসের গেট, জাবিয়া গেট, ফারাদীসের গেট, কেইসান গেট এবং ক্ষুদ্র গেট। শহরের উত্তর দিকের দেয়াল বরাবর বারাদা নামের একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত ছিল। অবশ্য এই নদীটি তেমন কোনো সামরিক গুরুত্ব বহন করতো না।

সিরিয়া অভিযানের প্রাক্কালে দামেস্কের রোমান সর্বাধিনায়ক ছিল সম্রাট হেরাক্লিয়াসের জামাতা থমাস। সে ছিল একজন গভীর ধর্মবিশ্বাস সমৃদ্ধ ভক্ত খৃস্টান। সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহসিকতা ও দক্ষতার খ্যাতির পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকেও তার পরিচিতি ছিল ব্যাপক। তার ডেপুটি হিসেবে হারবীস নামের জনৈক জেনারেলের কথা জানা যায়।

দামেস্ক দুর্গটি রক্ষার সক্রিয় দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল আজাজীর নামের একজন জেনারেল। আজাজীর ছিল একজন খ্যাতিমান ও প্রবীণ যোদ্ধা যে গোটা জীবন অতিবাহিত করেছে পূর্বাঞ্চলে পারস্য ও তুর্কীদের সংগে অসংখ্য যুদ্ধে লিপ্ত থেকে। তার খ্যাতি ছিল একজন মহান যোদ্ধা হিসেবে এবং তার সবচেয়ে গর্বের বিষয় ছিল যে, সে কখনো কোনো দ্বৈত যুদ্ধে পরাজিত হয়নি। সিরিয়ায় দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করার ফলে সে আরবী খুব ভাল জানতো এবং চমৎকার বলতে পারতো।

আজাজীরের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ১২,০০০। কিন্তু তারা অবরোধ মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। শহরের প্রতিরক্ষা দেয়াল মজবুত থাকলেও মানুষ ও প্রাণীর খাবারের কোনো মজুদ ছিল না। এই পরিমাণ লোকের জন্য খাদ্য মজুদ গড়ে তুলতে হলে মাসাধিক কাল সময় প্রয়োজন। এজন্য অবশ্য

---

৩২৬. সে সময়ের তুলনায় বর্তমানে দামেস্ক শহরটি চার মিটার উঁচু হওয়ায় দেয়ালটির উচ্চতা এখন ৭ মিটার।

রোমানদেরকে দোষারোপ করা যায় না। কেননা ৬২৮ খৃস্টাব্দে সম্রাট হেরাক্লিয়াসের হাতে পারস্য শক্তির চূড়ান্তভাবে পরাজিত হওয়ার পর থেকে রোমানগণ কখনই ভাবতে পারেনি যে, সিরিয়ার উপরে কখনো সামরিক হুমকি আসতে পারে। আজনাদাইনের যুদ্ধে রোমান বাহিনীর পরাজয়ের পর হতেই তারা এই বিপদ অনুভব করতে থাকে।

সম্রাট হেরাক্লিয়াস এন্টিওককে তার সদর দফতরে বসে যতো দ্রুত সম্ভব দামেস্ককে অবরোধের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত করতে থাকে। আজনাদাইনের পলাতক অবশিষ্ট যোদ্ধাদেরকে মুসলিম বাহিনীকে ইয়াকুসে বাধাদানের নির্দেশ দান করে সম্রাট এন্টিওক হতে ৫,০০০ যোদ্ধা প্রেরণ করেন দামেস্ক দুর্গের শক্তি বৃদ্ধির জন্য। এই বাহিনীর কমান্ডার নিয়োগ করা হয় ক্লজ নামের একজন জেনারেলকে যে সম্রাটের নিকট প্রতিজ্ঞা করেছিল খালিদের মস্তক একটি বর্শার ডগায় উপহার দেয়ার জন্য।[৩২৭] ক্লজ এমন সময় দামেস্কে উপস্থিত হয় যখন ইয়াকুসার যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেছে। দামেস্ক দুর্গের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় এখন মোট ১৭,০০০। তবে আজাজীর ও ক্লজ ছিল একে অপরের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের অন্তরে একে অপরের জন্য কোনো প্রকার সহানুভূতিবোধ ছিল না বরং একজন সবসময় অপরজনের পতন কামনা করতো।

থমাস শহরটিকে অবরোধ মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকে। অবরোধকারীদের দ্বারা বাইরের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলেও যেন দীর্ঘসময় টিকে থাকা যায় তার জন্য আশেপাশের এলাকা হতে দ্রুত মজুদ গড়ে তোলা হয়। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও অবশ্য দীর্ঘ অবরোধ মুকাবিলা করার মতো মজুদ গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। স্কাউট পাঠিয়ে মুসলিম বাহিনীর চলাচলের খবর সংগ্রহ করা হয় এবং শহর রক্ষার উপযোগী কিছু যোদ্ধাকে রেখে বাহিনীর বৃহত্তর অংশকে নিয়ে দামেস্কের বাইরে একটি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। এই পদক্ষেপের পিছলে ধারণা ছিল মুসলিমগণকে শহরে প্রবেশের পূর্বেই যুদ্ধে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেয়া। রোমানগণ সীমাহীন উৎকণ্ঠা নিয়ে খালিদের আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকে।

খালিদ (রা) ইতিমধ্যেই কিছু সামরিক গোয়েন্দা স্টাফ তৈরী করে নিয়েছেন। আজকের দিনের সামরিক ইতিহাসে জেনারেল স্টাফদের যে ভূমিকা তার সূত্রপাত হয় খালিদের দ্বারাই। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে বিজিত আরব, ইরাক, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন এলাকা হতে একদল আগ্রহী ও বুদ্ধিমান যোদ্ধাকে বেছে নেন তাঁর স্টাফ অফিসার হিসেবে কাজ করার জন্য এবং এই অফিসারগণ মূলত গোয়েন্দা স্টাফ হিসেবে কাজ করতো।[৩২৮] তাদের কাজ ছিল বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা এবং গোয়েন্দাগিরিতে

---

৩২৭. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা - ২০।
৩২৮. ওয়াকিদী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৭

নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে মিশন দান করে প্রেরণ করা ও ফিরে এলে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং খালিদ (রা)-কে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে সবসময় অবহিত রাখা। গোয়েন্দাগিরি যুদ্ধের একটি বিশেষ দিক এবং খালিদ (রা) এই দিকটিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। তিনি যেকোনো অনুকূল পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর জন্য সদাসতর্ক ও সদা প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, "তিনি নিজেও ঘুমাতেন না ও কাউকেও ঘুমাতে দিতেন না এবং তাঁর নিকট কোনো কিছুই গোপন থাকতো না।"[৩২৯] অবশ্য এই স্টাফগণ ছিল খালিদের ব্যক্তিগত স্টাফের মতো। কেননা তিনি যেখানে যেতেন তারাও তাঁর সংগে থাকতো।

খালিদ (রা) সেনাবাহিনীর সংগঠনের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। তিনি তাঁর বাহিনী থেকে আজনাদাইনের যুদ্ধের পর যার সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৮,০০০, ৪,০০০ সৈন্যকে আলাদা করে অশ্বারোহী দল গঠন করেন। প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণ এই বাহিনীকে আখ্যায়িত করেছেন 'চলাচলের বাহিনী' হিসেবে, আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় গতিময় রক্ষীদল (Mobile Guard)। এই অশ্বারোহী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ছিল সরাসরি খালিদের হাতে যাতে তিনি যুদ্ধের প্রয়োজনে দ্রুত ব্যবহার করতে পারেন। এই গতিময় রক্ষীদলটি গঠিত হয়েছিল সর্বোত্তম যোদ্ধাদের সমন্বয়ে।

ইয়াকুসা হতে খালিদ (রা) মুসলিম বাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। সামনে থাকে ইরাক হতে আগত খালিদের কোর, তারপরে সারিবদ্ধভাবে চলতে থাকে অন্যান্য কোর এবং নারী ও শিশুরা। ইতিমধ্যে বিপজ্জনক অগ্রযাত্রায় অংশগ্রহণকারী ইরাক বিজয়ী বাহিনীর যোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যরাও মদীনা হতে সিরিয়ায় এসে তাদের সংগে যোগদান করেছে। জারিয়ার পথ ধরে তিনদিন অগ্রসর হওয়ার পর অগ্রবর্তী দলটি দামেস্ক হতে ১২ মাইল দূরে মারজ-উস-সাফারে উপনীত হয় এবং এক বিশাল রোমান বাহিনীকে পথ রোধ করে অবস্থান নিয়ে থাকতে দেখে। আজাজীর ও ক্লজের নেতৃত্বে ১২,০০০ রোমান যোদ্ধার এই বাহিনীটি পাঠিয়েছিল থমাস। থমাসের উদ্দেশ্য ছিল শহরের বাইরে যুদ্ধ করে মুসলমানদেরকে দামেস্ক হতে বিতাড়িত করা। আর তা না হলে অন্তত তাদের গতি বিলম্বিত করা যাতে দামেস্ককে অবরোধের জন্য প্রস্তুত করার আরও সময় পাওয়া যায়। মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তী দলটি রোমান অবস্থানের এক মাইল দূরে রাতের জন্য ক্যাম্প করে। অন্যান্য কোর তখনও কিছুটা দূরে ছিল।

মারজ-উস সাফার (হলুদ পশুচারণ ভূমি) কিসওয়া হতে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। কিসওয়া বর্তমানকালের দারাআগামী সড়কের উপরে দামেস্ক হতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র শহর। এই শহরটির দক্ষিণ ধার ঘেঁষে প্রবাহিত হয়েছে একটি

---

৩২৯. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬২৬।

গাছপালাসমৃদ্ধ ক্ষুদ্র ওয়াদী এবং এই ওয়াদী হতে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত মারজ-উস-সাফার। শহরটির পশ্চিম দিকে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় চূড়া অবস্থিত এবং রোমান বাহিনীর অবস্থান ছিল এই চূড়াটির সামনে ও ওয়াদীর দক্ষিণে।[৩৩০]

পরদিন অর্থাৎ ৬৩৪ খৃস্টাব্দের ১৯ শে আগস্ট (১৯ শে জমাদি-উল-আখির, ১৩ হিজরী) সকালবেলা খালিদ (রা) তাঁর কোর নিয়ে সামনে অগ্রসর হলে মুসলিম ও রোমান বাহিনী মারজ-উস-সাফার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মুসলিম বাহিনীর বৃহত্তর অংশ তখন পর্যন্ত অনেক পিছনে এবং কমপক্ষে দুই ঘণ্টার কমে তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌঁছাতে পারবে না। খালিদ (রা) তাঁর কোরকে দিয়ে যুদ্ধ অবস্থানের ভিত্তি তৈরি করেন যাতে বাকি কোরগুলো এসে সরাসরি অবস্থান নিতে পারে। রোমান বাহিনী প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিয়ে অনঢ় থাকে। মুসলিম বাহিনীর বাকি অংশ না আসা পর্যন্ত রোমানদেরকে ব্যস্ত রাখার জন্য খালিদ (রা) দ্বৈতযুদ্ধ শুরু করে দেন।

দ্বৈতযুদ্ধের এই পর্যায়টিকে বরং উভয় পক্ষের সাহসী জেনারেলদের ব্যক্তিগত যুদ্ধ কৌশল ও দক্ষতা প্রদর্শনের একটি টুর্নামেন্ট বলাই ভাল। রোমানগণও এটিকে খেলোয়াড়ী মনোভাব নিয়েই গ্রহণ করে কেননা তাদের মধ্যেও ছিল বেশ কিছু সাহসী জেনারেল। আজাজীর ও ক্লজ ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। উভয় বাহিনী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে এই মজার খেলা উপভোগ করে। এতে করে কিছু রক্তপাত হয় মাত্র।

খালিদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাররার, শুরাহবীল ও আবদুর রহমান বিন আবূ বকরসহ বেশ কয়েকজন মুসলিম বীর দণ্ডায়মান অশ্বারোহী দল থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে প্রতিপক্ষের যোদ্ধাদের প্রতি তাদের ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মারেন। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে রোমান বীরগণ সামনে অগ্রসর হয়ে আসে এবং জোড়ায় জোড়ায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই যুদ্ধে প্রতিটি রোমান বীর নিহত হয়। একেক জনকে হত্যার পর মুসলিম বীরগণ রোমান বাহিনীর সম্মুখ দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে পরবর্তী চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করেন এবং সুযোগ মতো সম্মুখ সারির দু-একজন রোমান সৈনিককে হত্যা করে নিজ বাহিনীর সংগে যোগদান করেন। পূর্বের মতোই জাররার অর্ধ-উলংগ অবস্থায় প্রতিপক্ষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অতিবাহিত হওয়ার পর খালিদ (রা) ভাবেন যে, এটাই হেভিওয়েট বাউট শুরুর উপযুক্ত সময়। তিনি মুসলিম বীরদেরকে ফিরে আসতে বলেন এবং নিজে সামনে অগ্রসর হয়ে যান। যুদ্ধ ক্ষেত্রের মাঝামাঝি অবস্থানে পৌঁছে তিনি চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করেন ঃ

'আমি ইসলামের ভক্ত
আমি পবিত্র রাসূলের সহযোগী।

---

৩৩০. শহরচূড়া ও ওয়াদিটি এখনও বর্তমান আছে এবং আশেপাশের সমতলভূমি এখনও দেখতে কিছুটা হলুদাভ।

আমি সেই মহান যোদ্ধা
খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ।[৩৩১]

খালিদ (রা) মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন বিধায় তার চ্যালেঞ্জ প্রতিপক্ষের উঁচু পর্যায়ের জেনারেল দ্বারাই মুকাবিলা করার কথা। দ্বৈতযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রোমান বীরদের পরিণতি দেখে ক্লজ ইতিমধ্যে তার মনোবল অনেকটা হারিয়ে অনাগ্রহী হলেও তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আজাজীরের উস্কানিমূলক মন্তব্যে অগত্যা সামনে অগ্রসর হয়ে যায়। খালিদের কাছাকাছি অগ্রসর হয়ে সে তার সংগে কথা বলার প্রস্তাব দান করে। কিন্তু খালিদ (রা) তার কথায় কর্ণপাত না করে বর্শা দিয়ে প্রচণ্ড এক আঘাত হানেন। ক্লজ অস্বাভাবিক ক্ষীপ্রতার সংগে এই আঘাতকে প্রতিহত করে। খালিদের দ্বিতীয় আঘাতও ক্লজ একইভাবে প্রতিহত করে।

খালিদ (রা) বর্শাটি দূরে নিক্ষেপ করে দেন। তিনি ক্লজের কাছাকাছি গিয়ে তার জামার কলার ধরে ফেলেন এবং এক ঝটকায় তাকে ঘোড়ার উপর থেকে মাটিতে ফেলে দেন। ক্লজ মাটিতে পড়ে নিথর হয়ে থাকে। খালিদের ইশারায় দুইজন মুসলিম বীর এসে তাকে বন্দী করে নিয়ে যায়।

ক্লজ বন্দী হওয়ায় রোমান সৈনিকগণ মর্মাহত হলেও আজাজীর মনে মনে খুশি হয় এবং কামনা করতে থাকে মুসলমানগণ যেন তাকে হত্যা করে। এবারে সে সামনে অগ্রসর হয়ে আসে এবং ক্লজের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য শীঘ্রই খালিদ (রা) পরাজিত করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। সে প্রথমে মুসলিম কমান্ডারের সংগে কিছু তামাশা করতে চায়। আজাজীর খালিদের নিকট হতে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আরবীতে বলে, "ওহে আরব ভ্রাতা! সামনে আসো যাতে আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারি।"

"ওহে আল্লাহর শত্রু! তুমিই আমার নিকটে আসো অথবা আমি তোমার নিকটে গিয়ে তোমার মস্তক ছিন্ন করি" খালিদ (রা) উত্তর দিলেন। আজাজীর এই উত্তর শুনে খালিদের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকায় এবং ঘোড়াকে আগে বাড়িয়ে দ্বৈতযুদ্ধের দূরত্বে দাঁড়ায়। সে স্থির কণ্ঠে বলে, "ওহে আরব ভ্রাতা! কিসের জন্য তুমি আমার সংগে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছ ? তোমার কি একটুও ভয় হয় না যে, আমি তোমাকে হত্যা করলে তোমার বাহিনী কমান্ডারবিহীন হয়ে যাবে?"

"ওহে আল্লাহর শত্রু! তুমি ইতিমধ্যে আমার কিছু সহযোদ্ধার দক্ষতা প্রত্যক্ষ করেছ। হুকুম পেলে তারা তোমার গোটা বাহিনীকে আল্লাহর রহমতে ধ্বংস করতে সক্ষম। আমার সহযোদ্ধারা আল্লাহর পথে জীবন বিসর্জন দেয়াটাকে রহমত হিসেবে বিবেচনা করে। যা হোক তোমার পরিচয় কি?"

"তুমি কি আমাকে চেন না?" আজাজীর বিস্ময় প্রকাশ করে। "আমিই সিরিয়া[র] শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। আমিই পারসিকদের ঘাতক। আমিই তুর্কীদের যম।"

"তোমার নাম কি?" খালিদ (রা) জিজ্ঞেস করেন।

---

৩৩১. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা - ৪১ ও ৪৮।

"মৃত্যুর ফেরেশতার নামে আমার পরিচিতি। আমার নাম আজরাইল।"

এই উত্তর শুনে খালিদ (রা) হেসে উঠেন। তিনি বলেন, "আমার ভয় হয় যে, যার নামে তুমি পরিচিত সে-ই তোমার প্রাণের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে--তোমাকে দোযখে প্রেরণ করার জন্য।"

আজাজীর এই মন্তব্যটিকে গুরুত্ব না দিয়ে জিজ্ঞেস করে, "বন্দী ক্লজকে কি করা হয়েছে ?"

"তাকে শিকলের সাহায্যে বন্দী করে রাখা হয়েছে।"

"তোমরা তাকে হত্যা করছ না কেন ? রোমানদের মধ্যে সে সবচেয়ে ধূর্ত।"

"তোমাদের দুজনকে একসংগে হত্যা করতে চাই, তাই ক্লজকে এখনো হত্যা করা হয়নি।"

"আমি তোমাকে ১০০০ টুকরা সোনা, ১০টি ব্রকেডের জামা ও পাঁচটি ঘোড়া দেবো, যদি ক্লজকে হত্যা করে তার মাথা আমার নিকটে হস্তান্তর করো।"

"এটাই তার মূল্য ? আর তোমাকে হত্যা না করার জন্য কি দিবে ?"

"তুমি আমার নিকট হতে কি চাও।'

"আমি চাই জিযিয়া।"

একথা শুনে আজাজীর ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে, "আমরা সম্মানিত জাতি, আর তোমাদের পতন অনিবার্য। নিজেকে রক্ষা করো, কেননা আমি এখন তোমাকে হত্যা করবো।"

আজাজীরের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই খালিদ (রা) তাকে আক্রমণ করেন। তিনি তরবারির সাহায্যে পরপর কয়েকটি আঘাত করেন। আজাজীর অত্যন্ত দক্ষতার সংগে আঘাতগুলো ঠেকিয়ে অক্ষত থাকতে সক্ষম হয়। মুসলমানগণও আজাজীরের দক্ষতায় তার প্রতি প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে। কেননা তাদের কমান্ডারের সমকক্ষ যোদ্ধা খুবই বিরল। খালিদ (রা)ও মোহাবিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে পড়েন।

তা দেখে আজাজীর মন্তব্য করে, "যিশুর নামে আমি তোমাকে যে কোনো মুহূর্তে হত্যা করতে পারি। কিন্তু আমি তোমাকে জীবিত বন্দী করতে বদ্ধপরিকর যাতে তোমাদের সিরিয়া ত্যাগের শর্তে তোমাকে মুক্তি দিতে পারি"–কমান্ডারের এই মন্তব্য শুনে রোমানগণ আনন্দে হেসে ওঠে।

রোমান জেনারেলের ঠাণ্ডা ও প্রতিপক্ষের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের ভাব খালিদ (রা)-কে ভীষণভাবে ক্ষীপ্ত করে তোলে। তিনি আজাজীরকে জীবন্ত বন্দী করে পদানত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হলে বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করেন যে, সে তার ঘোড়াকে ঘুরিয়ে চলতে শুরু করে। রোমান জেনারেল যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করছে ভেবে খালিদ (রা) তাকে ধাওয়া করেন। উভয় বাহিনীর যোদ্ধাগণ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে যে, দুই জেনারেল বাহিনীদ্বয়ের অবস্থানের মধ্যবর্তী এলাকায় দ্রুত চক্কর দিতে থাকে। কয়েকবার চক্কর দেয়ার পর খালিদ (রা) পিছনে পড়তে থাকেন এবং তাঁর ঘোড়া ধীরে ও এলো-মেলোভাবে চলতে থাকে। আজাজীরের ঘোড়াটি ছিল দ্রুতগামী ও তার মধ্যে ক্লান্তির কোনো ছাপ ছিল না।

এটা ছিল আজাজীরের একটি কৌশল। সে খালিদের ঘোড়াকে ক্লান্ত দেখে তাকে কৌশলে পিছু ধাওয়া করতে বাধ্য করে। খালিদের মনোভাব পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে কঠোরতম রূপ ধারণ করে। সর্বশেষ পরিস্থিতিটি প্রতিকূলে যাওয়ায় তিনি মনের দিক থেকে এতোটা ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠেন যে, আজাজীরের এই মন্তব্যটি তার কানে প্রবেশ করে না, ওহে আরব, মনে করো না যে আমি ভয়ে পালাচ্ছিলাম। আসলে আমি তোমাকে কৃপা দেখাচ্ছি। আমি সত্যিকার একজন ঘাতক। আমিই মৃত্যুর দূত।"

খালিদের ঘোড়াটি আর যুদ্ধের জন্য উপযোগী ছিল না। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে তরবারি হাতে আজাজীরের দিকে অগ্রসর হন। তা দেখে সে তৃপ্তিবোধ করে, যেন শিকার হাতের নাগালের মধ্যে পাওয়া গেছে। খালিদ (রা) কাছাকাছি গেলে আজাজীর তার তরবারি তুলে বাঁকা করে একটি মরণ-আঘাত হানে যাতে প্রতিপক্ষের মাথা দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়। খালিদ (রা) দ্রুত সামনে ঝুঁকে পড়েন এবং আজাজীরের তরবারি তাঁর মাথার ইঞ্চি খানেক উপর দিয়ে শাঁ করে চলে যায়। পরবর্তী মুহূর্তে তিনি তরবারি দিয়ে প্রতিপক্ষের ঘোড়ার সামনের দুই পায়ে এমন আঘাত করেন যে, পা'দুটি দেহ থেকে আলাদ হয়ে যায়। ফলে ঘোড়া ও আরোহী উভয়ে হুমড়ি খেয়ে সামনে পড়ে। আজাজীর ঘটনার আকস্মিকতায় ঘাবড়ে যায়। সে কোনো রকমে উঠে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু খালিদ (রা) চোখের পলকে তার উপরে স্প্রীং-এর মতো লাফিয়ে পড়ে জাপটে ধরে ফেলেন। তারপর তাকে দু'হাত দিয়ে শূন্যে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলেন। এরপর তিনি আজাজীরের জামার কলার ধরে টেনে তুলে ঝাঁকি দিয়ে মুসলিম বাহিনীর দিকে নিয়ে চলেন। সেখানে তাকে ক্লজের সংগে একত্রে শিকলে বেঁধে রাখা হয়।[৩৩২]

এই বিখ্যাত দ্বৈতযুদ্ধটি শেষ হতে না হতেই আবু উবায়দা (রা) ও আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর দুটি কোর খালিদের সংগে যোগদান করে। তিনি তাদেরকে দু'বাহুতে মোতায়েন করেন এবং যুদ্ধের বিন্যাস সম্পন্ন হওয়ার সংগে সংগেই একযোগে ব্যাপক আক্রমণের নির্দেশ দান করেন।

রোমানগণ ঘন্টাখানেক প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হলেও তা বেশি টিকে থাকতে পারে না। দুই জেনারেলসহ বেশ কিছু সংখ্যক অফিসার নিহত হওয়ায় তাদের মনোবল ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তদুপরি অনতিদূরে দামেস্ক নগরীর নিরাপদ দেয়াল তাদেরকে প্রত্যাহারের জন্য প্রলুব্ধ করে। তারা শৃংখলার সংগে প্রত্যাহার করে এবং নিরাপদে শহরের দেয়ালের মধ্যে প্রবেশ করে গেট বন্ধ করে দেয়। অবশ্য তাদেরকে ফেলে যেতে হয় প্রচুর মৃতদেহ।

মুসলমানগণ সমতলভূমিতে রাত্রিযাপন করে এবং পরদিন শহরের দিকে যাত্রা শুরু করে। ৬৩৪ খৃস্টাব্দের ২০শে আগস্ট (২০ শে জমাদি-উল-আখির, ১৩ হিজরী) খালিদের নির্দেশে মুসলিম বাহিনী দামেস্ক শহর অবরোধ করে।[৩৩৩]

---

৩৩২. এই দ্বৈতযুদ্ধের বর্ণনা ও কথোপকথন ওয়াকিদী থেকে নেয়া হয়েছে। পৃষ্ঠা - ১৯-২১।
৩৩৩. মারজ-উস-সাফার যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য পরিশিষ্ট 'খ' এর ১১ নম্বর নোট দ্রষ্টব্য।

খালিদ (রা) ফাহল দুর্গকে ব্যস্ত রাখার জন্য একটি অশ্বারোহী দলকে মোতায়েন করে এসেছেন যাতে ঐ দুর্গ হতে দামেস্কের সাহায্যে কোনো সৈন্য অগ্রসর হতে না পারে বা তারা মদীনা থেকে আগত দূত বা সৈন্যকে বাধা দান করতে না পারে। এখন তিনি শহর থেকে দশ মাইল[৩৩৪] দূরে বেইত লিহিয়ার নিকটে হেম্‌সগামী সড়কের উপরে আর একটি দলকে প্রেরণ করেন স্কাউট পাঠিয়ে রোমান ত্রাণ বহরের (Relief Column) উপরে নজর রাখার ও তাকে অবহিত করার জন্য। এভাবে দামেস্ককে দক্ষিণ-সিরিয়া হতে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা করে খালিদ (রা) বাকি সৈন্যের সাহায্যে শহরটি ঘিরে ফেলেন। দামেস্কে সাহায্য আসার অধিক সম্ভাবনা ছিল সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চল হতে। (১৭ নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য)

দামেস্ক শহরের সৈন্য সংখ্যা ১৫,০০০ থেকে ১৬,০০০। সেই সংগে আছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থায়ী বেসামরিক বাসিন্দা ও আশেপাশের এলাকা হতে আশ্রয়গ্রহণকারী মানুষ। দামেস্ক অপরোধে অংশগ্রহণকারী মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে কোথাও উল্লেখ নেই। তবে এই সংখ্যা পূর্ববর্তী মাসের সৈন্য সংখ্যার চেয়ে কিছু কম হওয়া স্বাভাবিক। কেননা বিগত তিনটি যুদ্ধে অর্থাৎ আজনাদাইন, ইয়াকুসা ও মারস-উস-সাফারের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মৃতের সংখ্যা হাজার খানেকে পৌঁছে গিয়েছিল এবং আরও হাজার খানেক যোদ্ধা আহত হয়ে অবরোধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকাটাই স্বাভাবিক। তদুপরি একটি অশ্বারোহী দলকে মোতায়েন রাখা হয়েছিল ফাহল দুর্গকে ব্যস্ত রাখার জন্য। সবদিক বিবেচনা করে আমার অনুমানে দামেস্ক অবরোধে অংশগ্রহণকারী মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ২০,০০০।

খালিদ (রা) ইরাক থেকে তার সংগে আগত কোরকে মোতায়েন করেন পূর্ব গেটে। এই কোরে গতিময় রক্ষীদলও (Mobile Guard) অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি এই কোরের বৃহত্তর অংশকে রাফের কমান্ডে ন্যস্ত করেন এবং নিজে গতিময় রক্ষীদল হতে ৪০০ অশ্বারোহীর একটি মজুদদল নিয়ে পূর্ব গেট হতে অল্প দূরে অবস্থান নেন। তিনি একটি আশ্রমে তাঁর সদর দপ্তর স্থাপন করেন এবং এর ফলে এই আশ্রমটির নাম হয় "দেইর খালিদ" অর্থাৎ খালিদের আশ্রম (এটা বিশ্বাস করা হয় যে, এই আশ্রমের সন্ন্যাসীরা আহত মুসলিমদের সেবা করাসহ খালিদ (রা)-কে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছিল)[৩৩৫]। বাকি প্রত্যেকটি গেটে তিনি ৪০০০ থেকে ৫০০০ সৈন্যের একেকটি দল মোতায়েন করেন যার কমান্ডারগণ ছিলেন নিম্নরূপ ঃ (১৮ নম্বর ম্যাপ দ্রঃ)

---

৩৩৪. বেইত লিহিয়ার কোনো অস্তিত্ব বর্তমান নেই এবং এর সঠিক অবস্থানও অজ্ঞাত। এটি ছিল ঘুতার একটি ছোট শহর (ইয়াকুত ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৭৮০।) সম্ভবত এটির অবস্থান ছিল ঘুতার বাহির সীমানা বরাবর। তা না হলে খালিদ (রা) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য এই এলাকাটি নির্বাচন করতেন না।

৩৩৫. এই আশ্রমটির যা দেইর-উল-আহমার নামেও পরিচিত, কোনো অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। তবে এর অবস্থানটি জানা যায়। পূর্ব গেটের সিকি মাইল দূরে পূর্ব দিকে বিস্তৃত একটি বাগান আছে; এই বাগানেই ছিল আশ্রমটির অবস্থান।

ম্যাপ ১৪ঃ দামেস্ক বিজয় – ১
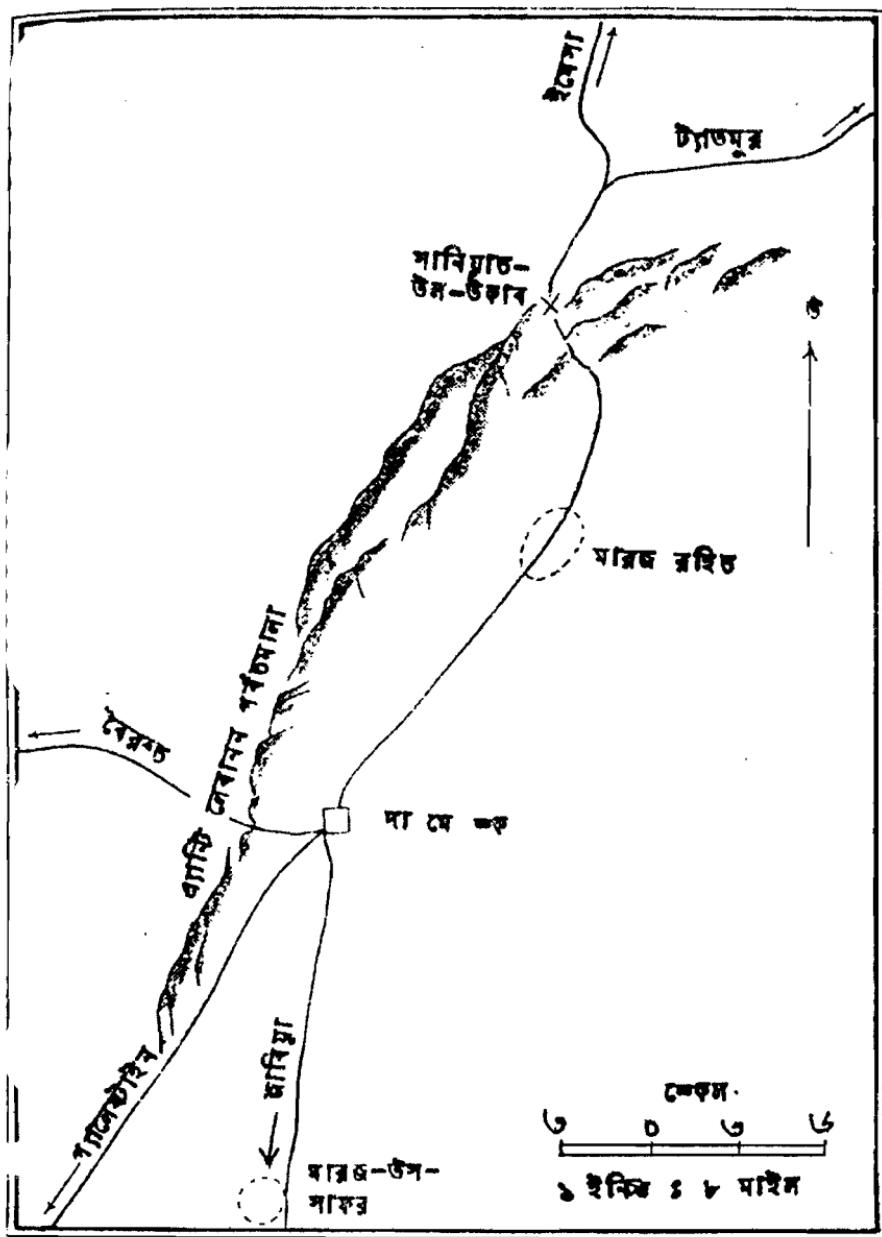
থমাস গেট ঃ শুরাহবীল
জাবিয়া গেট ঃ আবু উবায়দা
ফারাদীস গেট ঃ আমর ইবনুল আস
কেইসান গেট ও ক্ষুদ্র গেট ঃ ইয়াযীদ

কোর কমান্ডারগণকে খালিদ (রা) নিম্নরূপ নির্দেশ দান করেন ঃ

ক) দুর্গের দেয়াল থেকে তীর নিক্ষেপের দূরত্বের বাইরে ক্যাম্প স্থাপন করবে।
খ) গেটগুলোর উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।
গ) রোমান তীরন্দাজগণ যুদ্ধের জন্য বের হয়ে আসলে তাদেরকে তীরন্দাজের সাহায্যে মুকাবিলা করবে।
ঘ) রোমান বাহিনী গেটের বাইরে বের হলেই তাদেরকে আক্রমণ করে পিছু হটতে বাধ্য করবে।
ঙ) প্রয়োজন হলে বা শত্রুর চাপ অত্যধিক হলে আমার নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠাবে।

জাররারের অধীনে গতিময় রক্ষীদলের মধ্য হতে ২০০০ অশ্বারোহী ন্যস্ত করে তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয় গেটগুলোর মধ্যবর্তী এলাকায় রাতের বেলা টহল দেয়ার ও কোনো কোর রোমানদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তাদেরকে সাহায্য করার।

প্রয়োজনীয় নির্দেশদানের পর খালিদ (রা) মুসলিম কোরগুলোকে অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ দান করেন এবং অবরোধ শুরু হয়ে যায়। চারদিকে তাঁবু খাটানো হয় এবং জাররার তাঁর অশ্বারোহী দল নিয়ে টহল শুরু করেন। বাইরে থেকে যে কোনো ধরনের সরবরাহের পথ বন্ধ হয়ে যায়। সেই সংগে বন্ধ হয় দলবদ্ধভাবে পলায়নের পথও। তবে একক ব্যক্তির পক্ষে রাতের আঁধারে বেশ কয়েক জায়গা দিয়ে দেয়াল টপকিয়ে যাতায়াত করা সম্ভব ছিল এবং এভাবে থমাস বাইরের জগতের সংগে এবং এন্টিওকে হেরাক্লিয়াসের সংগে যোগাযোগ রাখতো।

অবরোধ শুরুর পরের দিন খালিদ (রা) ক্লজ ও আজাজীরকে শিকলে বন্দী অবস্থায় পূর্ব গেটের কাছে নিয়ে আসেন যাতে দুর্গের দেয়ালের উপরে দণ্ডায়মান রোমানগণ দেখতে পায়। এখানে উভয় জেনারেলকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। এরপর রোমান দুর্গবাসীদের চোখের সামনেই দুই জেনারেলের মাথা দেহ হতে ছিন্ন করা হয় এবং এদের ঘাতক জাররার বৈ আর কেউ নয়।

বড় ধরনের কোনো ঘটনা ছাড়াই তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হয়। অবশ্য রোমানদের দু'-একটি দল দু'-একবার আক্রমণ চালালেও তাতে মনের জোর তেমন একটা ছিল না। ফলে মুসলিমগণ খুব সহজেই তা প্রতিহত করে ফেলে। দিনের বেলা উভয়পক্ষই মাঝেমধ্যে বিক্ষিপ্ত তীরযুদ্ধে লিপ্ত হতো। অবশ্য এতে কোনো পক্ষেরই বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হতো না। এই অবরোধটির প্রকৃতিই ছিল করুণ পরিণতিকে বরণ করে নেয়ার। দামেস্কের অধিবাসীরা না খেয়ে মরার জন্য প্রস্তুত ছিল।

ম্যাপ ১৮ : দামেস্ক বিজয় – ২
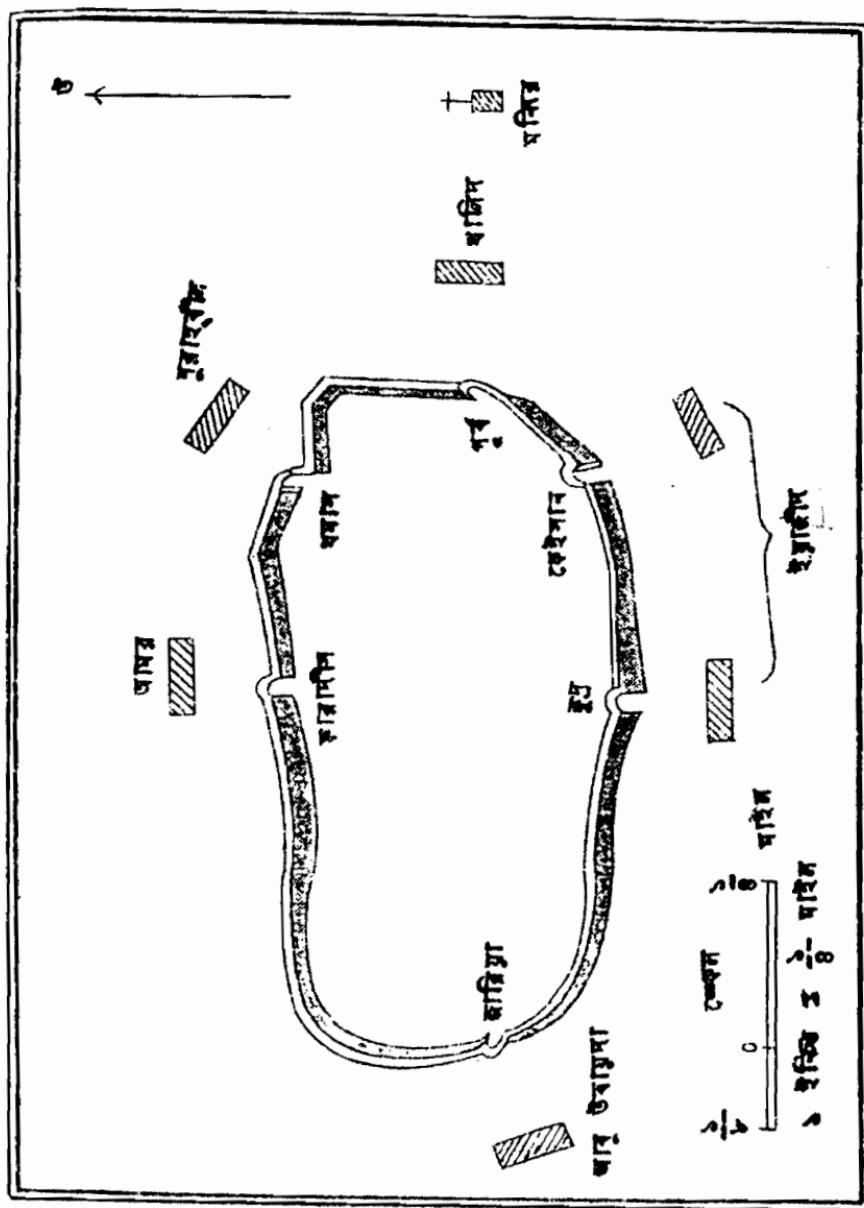
মারজ-উস-সাফারে রোমান বাহিনীর পরাজয় ও দামেস্ক নগরী অবরোধের খবর শুনেই হিরাক্লিয়াস নতুন বাহিনী গঠনের সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। রাজকীয় বাহিনীর সাম্প্রতিক পরাজয়গুলো ও মুসলিম বাহিনীর অব্যাহত অগ্রযাত্রা এবং দামেস্ক অবরোধ সম্রাটের জন্য সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি করে। দামেস্কের পতন হবে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের জন্য এমন একটি আঘাত যা থেকে উদ্ধারকল্পে গোটা সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হতে পারে। আর এরূপ একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করাও সম্রাটের জন্য হবে বিপজ্জনক। দামেস্কের পতন সৈন্য সংখ্যার স্বল্পতায় নয় বরং অপর্যাপ্ত সরবরাহের জন্যই আসন্ন হয়ে পড়েছে। শহরটি দীর্ঘ অবরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল না।

অবরোধ শুরুর দশদিনের মধ্যেই হিরাক্লিয়াস উত্তর সিরিয়া ও জাযীরার[৩৩৬] বিভিন্ন দুর্গ হতে সৈন্য সংগ্রহ করে ১২,০০০ যোদ্ধার একটি বাহিনী গঠন করে। এই বাহিনী ত্রাণ সামগ্রীর বিরাট বহর নিয়ে এন্টিওক যাত্রা করে এবং এর কমান্ডারকে নির্দেশ দান করা হয়, যে কোনো মূল্যে দামেস্কে পৌঁছে অবরুদ্ধ শহরটিকে সহায়তা করার জন্য। বাহিনীটি হেম্‌স হয়ে যাত্রা করে এবং হেম্‌স ও দামেস্কের মধ্যবর্তী এলাকায় মুসলিম স্কাউট দলের সংগে সাক্ষাৎ হয়। তারা যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি সহকারে অগ্রসর হতে থাকে।

৬৩৪ খৃস্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর (১০ই রজব, ১৩ হিজরী) তারিখে একজন অশ্বারোহী দূত এসে খালিদ (রা)-কে অবহিত করে যে, অজ্ঞাত সংখ্যক সৈন্যের এক বিরাট রোমান বাহিনী হেম্‌স হতে অগ্রসর হচ্ছে এবং দু'-একদিনের মধ্যে বেইত লিহিয়ায় বাধাদানকারী মুসলিম দলের সংগে মুকাবিলা হবে। এই সংবাদে খালিদ (রা) তেমন একটা বিস্ময় প্রকাশ করেন না, কেননা তিনি জানতেন যে, হেরাক্লিয়াস দামেস্ক শহরকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে এবং সে জন্যই তিনি প্রধান সড়কের উপরে সৈন্য ও স্কাউট মোতায়েন করেছিলেন।

তিনি দ্রুত ৫,০০০ সৈন্যের একটি অশ্বারোহী দল গঠন করেন এবং তা জাররারের কমান্ডে ন্যস্ত করেন। তিনি জাররারকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে বেইত লিহিয়ায় অবস্থিত মুসলিম সেনাদলের কমান্ড গ্রহণ করে দামেস্কের দিকে অগ্রসরমান রোমান বাহিনীর গতিরোধ করার নির্দেশ দান করেন। তিনি তাঁকে এইমর্মে সতর্ক করে দেন যে, শত্রু সংখ্যা অস্বাভাবিক বেশি হলে যুদ্ধে না জড়িয়ে তিনি যেন আরও সৈন্য চেয়ে সংবাদ প্রেরণ করেন। জাররারের জন্য অবশ্য এই সতর্ক বাণীর কোনো গুরুত্ব ছিল না, কেননা তাঁর স্বভাবে সতর্কতা নামক গুণটির বড় অভাব ছিল। রাফেকে উপ-অধিনায়ক হিসেবে নিয়ে তিনি দামেস্ক ত্যাগ করেন এবং পথ হতে মুসলিম স্কাউট

৩৩৬. জাযীরা অর্থ হচ্ছে দ্বীপ। বর্তমান কালের সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল, ইরাকের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বুঝানোর জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

দলকে সংগে নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে সানিয়াত-উল-উকারের (ঈগলের গিরিপথ) কিছু পূর্বে একটি নিচু পাহাড় চূড়ার পাশে ফাঁদ পাতেন।

পরদিন সকালে রোমান বাহিনীর আগমন দৃষ্ঠিগোচর হলে মুসলিমগণ ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে। রোমান বাহিনীর সম্মুখ অংশ মুসলমানদের কাছাকাছি চলে এলে জাররার আক্রমণের নির্দেশ দান করেন। মুসলমানগণ গোপন অবস্থান থেকে উঠে তাদের অর্ধ-উলংগ কমান্ডারের নেতৃত্বে রোমানদের উপরে চড়াও হয়। কিন্তু রোমানগণ এরূপ আকস্মিকতার জন্য প্রস্তুত ছিল বিধায় খুব দ্রুত যুদ্ধের বিন্যাসে অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে মুসলমানদের আকস্মিক আক্রমণটি একটি সম্মুখ যুদ্ধে রূপ লাভ করে। রোমানগণ ঈগলের গিরিপথের সম্মুখের উঁচু জায়গায় প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করে এবং মুসলমানরা থাকে আক্রমণকারীর ভূমিকায়। আক্রমণ করতে গিয়ে মুসলমানগণ শত্রুর সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে এবং তা কমপক্ষে দ্বিগুণ। কিন্তু জাররারের তাতে কিছু যায় আসে না। তিনি দুর্ধর্ষ গতিতে শত্রুর উপরে আঘাত হানতে হানতে প্রতিপক্ষের অনেক ভিতরে ঢুকে পড়েন এবং অল্প সময়ের মধ্যে রোমানদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে যান। তাঁর শত্রুরা তাকে পূর্বশ্রুত অর্ধ-উলংগ বীর হিসেবে শনাক্ত করে এবং তাঁকে জীবন্ত ধরে উপহার হিসেবে সম্রাটের নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়। ডান বাহুতে তীরের আঘাতে জাররার আহত হন। রোমানগণ চারদিক থেকে তাঁর দিকে এগুতে থাকলে তিনি আহত অবস্থায়ই লড়াই চালিয়ে যান। প্রতিপক্ষের আঘাতে দুর্বল হয়ে পড়লে শেষ পর্যন্ত রোমানগণ তাঁকে বন্দী করতে সক্ষম হয়।

জাররারের অভাব মুসলিম বাহিনীর উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। তবে রাফেও ছিলেন দুর্ধর্ষ জাররারের যোগ্য উত্তরসুরি। কমান্ড গ্রহণ করেই তিনি পরপর কয়েকটি আক্রমণ রচনা করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল রোমান প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে জাররারকে উদ্ধার করা। কিন্তু প্রত্যেকটি উদ্যোগ ব্যর্থ হয় এবং গোটা যুদ্ধক্ষেত্রে একটা স্থবিরতা বিরাজ করতে থাকে। রাফে উপলব্ধি করেন, রোমান প্রতিরক্ষাকে ভেঙে ফেলার ব্যাপারে তাঁর করার আর তেমন কিছুই নাই। বিকাল বেলা তিনি একজন দূত মারফত রোমানদের সংগে সংঘর্ষ, শত্রুর সংখ্যা ও জাররারের বন্দী হওয়ার সংবাদ খালিদ (রা)-কে অবহিত করেন। তিনি আরও জনান যে, জাররার হয়তো রোমানদের হাতে এখনও জীবিত আছেন।

খালিদ (রা)-এর নিকট যে সময় এই সংবাদ পৌছে তখনও সূর্য অনেক উপরে। তিনি উপলব্ধি করেন যে, বেইত লিহিয়ার মুসলমানদের চেয়ে দ্বিগুণ রোমান শক্তিকে মুকাবিলা করা রাফের পক্ষে হয়তো সম্ভব নয়। খালিদ (রা) উভয় সংকটে পড়ে যান। দামেস্কের সরবরাহ ও শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্রসরমান রোমান বাহিনীকে পরাজিত করে হেম্‌সের দিকে ঠেলে দিতে হবে এবং তা সম্ভব যদি খালিদ (রা) স্বয়ং কিছু সৈন্যসহ গিয়ে বেইত লিহিয়ার বাহিনীর কমান্ড গ্রহণ করেন। একাজ করতে না

পারলে খুব সম্ভব অগ্রসরমান রোমান দল মুসলিম বাহিনীর বাধাকে অতিক্রম করবে এবং দামেস্ক অবরোধকারী মুসলমানদের জন্য এর পরিণতি হবে অত্যন্ত মারাত্মক। এক্ষেত্রে সময়ও ছিল একটি অন্যতম সমস্যা। এই মুহূর্তে রাফের শক্তি বৃদ্ধির জন্য দুর্গ অবরোধকারী বাহিনীর এক অংশ বেইত লিহিয়ায় প্রেরণ করলে অবরুদ্ধ রোমানগণ তা দেখে ফেলবে এবং গেট খুলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবরোধকারী দলকে আক্রমণ করবে। দামেস্ক অভিমুখে আগমনকারী রোমানদেরকে বেইত লিহিয়া হতে বিতাড়িত করতে হবে আবার দুর্গে অবরুদ্ধ রোমানদের নিকট হতে রাফের শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে দামেস্ক হতে মুসলিম বাহিনীর যাত্রাকে গোপন রাখতে হবে। এই সংকটের সমাধান হিসেবে তিনি রাফের শক্তিবৃদ্ধির জন্য যাত্রা মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বিলম্বিত করার ঝুঁকি নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যাতে এই যাত্রার সংবাদ অবরুদ্ধ রোমানদের জানার সম্ভাবনা অনেক ক্ষীণ হয়ে যায়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যায়। আবু উবায়দা (রা) খালিদ (রা)-এর অনুপস্থিতিতে অবরোধ অপারেশনের কমান্ড গ্রহণ করেন। মধ্যরাতের পর মায়সারা বিন মাসরুকের নেতৃত্বে ১,০০০ যোদ্ধার একটি দল পূর্ব গেটে অবস্থান গ্রহণ করে এবং অন্যান্য গেটেও কিছুটা পুনর্বিন্যাস করা হয়। তারপর মধ্যরাতে বা তার পরের কোনো এক সময়ে খালিদ (রা) তাঁর ৪,০০০ গতিময় রক্ষীদলসহ দামেস্ক ত্যাগ করেন।

খালিদ (রা) অবশিষ্ট রাতের মধ্যেই দ্রুত অগ্রসর হয়ে ভোরের আলো ফুটে ওঠার প্রাক্কালে যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি পৌঁছে যান। রাফে (রা) এবং রোমানদের মাঝে তখনও দ্বিতীয় দিনের মতো যুদ্ধ চলছিল, কোনো পক্ষেই জয়-পরাজয়ের কোনো সম্ভাবনা ছাড়াই। মুসলমানগণ একের পর এক আক্রমণ রচনা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। অপরপক্ষে রোমানগণ ছিল পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে।

খালিদ (রা) যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন এমন সময় লক্ষ্য করেন যে, পিছন হতে একজন মুসলিম অশ্বারোহী দ্রুতবেগে তাঁকে অতিক্রম করে রোমানবাহিনীর সম্মুখে চলে যায়। খালিদ (রা) তাকে থামানোর পূর্বেই সে তাঁকে অতিক্রম করে চলে যায়। হালকা-পাতলা গড়নের এই সৈনিকটি কালো পোশাকের উপরে বুকে বর্ম এবং তরবারি ও লম্বা একটি বর্শা দ্বারা সজ্জিত। তার মাথায় ছিল একটি সবুজ পাগড়ি ও মুখ আবৃত ছিল একটি স্কার্ফ দ্বারা। স্কার্ফটি মুখোশের কাজ করায় তার চোখদুটো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। খালিদ (রা) যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে দেখেন উক্ত সৈনিকটি নিজেকে শত্রুর সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করছে যা দেখে উপস্থিত যোদ্ধাগণ তাকে ও তার ঘোড়াকে উন্মাদ ভাবতে থাকে। রাফে (রা) খালিদ (রা)-কে দেখার পূর্বে এই সৈনিককে দেখে মন্তব্য করেন, "সে খালিদের মতো ক্ষীপ্রতা নিয়ে

আক্রমণ করে, কিন্তু সে নিশ্চয় খালিদ নয়।"[৩৩৭] এর পরপরই খালিদ (রা) রাফের সংগে যোগদান করেন।

খালিদ (রা) অল্প সময়ের মধ্যে রাফের দল ও তার গতিময় রক্ষীদলকে একত্র করে একটি সমন্বিত শক্তি হিসেবে মোতায়েন করেন। ইতিমধ্যে সেই মুখোশধারী সৈনিকটি দক্ষতার সংগে ঘোড়া চালিয়ে ও বর্শার সাহায্যে প্রতিপক্ষকে আক্রমণের কলা-কৌশল দিয়ে মুসলমানদেরকে মুগ্ধ করে। সে ঘোড়া চালিয়ে রোমান অবস্থানের কাছাকাছি গিয়ে বর্শার সাহায্যে একজন শত্রু সেনাকে হত্যা করে। তারপর দ্রুত অপরপ্রান্তে গিয়ে আবার একই ভংগিতে অপর একজন শত্রুকে খতম করে এবং এভাবে চলতে থাকে। কয়েকজন রোমান এগিয়ে এসে তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে সকলেই তার বর্শার আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে যায়। এই চমকপ্রদ ঘটনায় মুগ্ধ মুসলমানগণ এখন পর্যন্ত এই সৈনিকের পোশাকে আবৃত তারুণ্যদীপ্ত চেহারা ও মুখোশের উপরে দুটি উজ্জ্বল চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। অশ্বারোহীটি রক্তাক্ত পোশাক ও বর্শা নিয়ে এমনভাবে রোমানদের উপরে একের পর এক আঘাত হেনে যাচ্ছিল যেন সে আত্মঘাতী খেলায় মেতে উঠেছে। এই যোদ্ধার আত্মত্যাগী মনোভাবের দৃষ্টান্ত রাফের যোদ্ধাদের মধ্যে নতুন সাহস ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। তারা সমস্ত ক্লান্তি ভুলে গিয়ে খালিদের নির্দেশ পাওয়ার সংগে সংগে দ্বিগুণ উদ্যমে প্রতিপক্ষের উপরে চড়াও হয়।

মুসলিম বাহিনী প্রতিপক্ষের গোটা সম্মুখ জুড়ে আক্রমণ রচনা করলে মুখোশধারী সৈনিকটিও তার ব্যক্তিগত আক্রমণ অব্যাহত রাখে। সার্বিক আক্রমণের সূত্রপাত হলে খালিদ (রা) এই যোদ্ধার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "ওহে সৈনিক! আমাকে তোমার মুখ দেখাও।" খালিদের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই যোদ্ধাটি ঘোড়া চালিয়ে শত্রুর উপরে পরবর্তী আঘাত হানার জন্য চলে যায়। কয়েকজন যোদ্ধা তার কাছাকাছি গিয়ে বলে, "হে মহান যোদ্ধা! তোমার কমান্ডার তোমাকে ডাকে অথচ তুমি তার নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। তোমার মুখ দেখাও ও নাম বলো যাতে তোমাকে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা যায়।" অশ্বারোহীটি আবার দূরে চলে যায় যেন সে তার পরিচয় ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন রাখতে চায়। সৈনিকটি শত্রুকে পুনরায় আঘাত হেনে ফিরে আসে এবং খালিদ (রা)-কে অতিক্রম করতে থাকে। এমন সময় তিনি দৃঢ়কণ্ঠে তাকে থামতে বলেন। সে তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলে খালিদ (রা) বলেন, "তোমার আত্মত্যাগের মহিমায় আমাদের অন্তর শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছে তোমার পরিচয় কি?"

---

৩৩৭. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা - ২৭।

খালিদ (রা) সৈনিকটির কণ্ঠস্বর শুনে এতটুকু বিস্মিত হন যে, তাঁর ঘোড়া থেকে পড়ে যাবার উপক্রম হয়। কেননা কণ্ঠস্বরটি ছিল একজন বালিকার, "ওহে কমান্ডার! আমি শুধু সম্ভ্রমবশত আপনার থেকে দূরে থাকতে চাই। আপনি হচ্ছেন একজন মহাবিজয়ী কমান্ডার আর আমি তাদের একজন যারা থাকে পর্দার আড়ালে। আমি এভাবেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি, কেননা আমার অন্তরে আগুন জ্বলছে।"

"কি তোমার পরিচয়।"

আমি জাররারের বোন খাওলা। আমার ভাই শত্রুর হাতে বন্দী। তাকে মুক্ত করার জন্য আমি অবশ্যই যুদ্ধ করবো।"

খালিদ (রা) বৃদ্ধ আল-আজওয়ারের কথা প্রশংসার সংগে স্মরণ করেন যিনি জাররারের মতো ছেলে ও খাওলার মতো মেয়ে জন্ম দিয়েছেন। তিনি খাওলাকে উদ্দশ্য করে বলেন, "তাহলে আসো, আমাদের সংগে মিলে শত্রুকে আক্রমণ করো।"[৩৩৮]

মুসলমানদের আঘাত তীব্র হতে তীব্রতর আকার ধারণ করলে দুপুরের দিকে রোমানগণ শৃংখলার সাথে যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রত্যাহার শুরু করে। মুসলমানগণ চাপ অব্যাহত রেখে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু জাররারকে মৃত অথবা জীবিত কোথাও দেখতে পায় না। এমন সময় সৌভাগ্যবশত কিছু স্থানীয় আরব মুসলমানদেরকে এই তথ্য প্রদান করে যে, তারা একজন অর্ধ-উলংগ বন্দীকে ঘোড়ার পিঠে বাঁধা অবস্থায় মধ্যখানে নিয়ে ১০০ জন রোমান সৈন্যকে হেমসের দিকে যেতে দেখেছে। খালিদ (রা) বুঝতে পারেন যে, রোমানগণ জাররারকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে সরিয়ে ফেলেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ রাফেকে নির্দেশ দান করেন ১০০ দ্রুতগামী অশ্বারোহীকে নিয়ে দূর দিয়ে ঘুরে রোমান বাহিনীকে অতিক্রম করে সামনে গিয়ে জাররারকে নিয়ে হেম্‌সগামী রোমান দলকে বাধাদানের জন্য। রাফে যত দ্রুত সম্ভব ১০০ অশ্বারোহীকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে যান। সংগে অবশ্যই থাকে খাওলা বিনতে আল-আজওয়ার।

রাফে (রা) অনেক দূর ঘুরে রোমান দলটিকে পাশ দিয় অতিক্রম করে সামনে গিয়ে ইমস সড়কের উপরে ফাঁদ পাতেন। রোমান দলটি উক্ত এলাকা অতিক্রম করতে থাকলে রাফে তাঁর দলসহ তাদের উপরে প্রচণ্ড আঘাত হানেন এবং অধিকাংশ রোমানকে হত্যা করে জাররারকে মুক্ত করেন। অর্ধ-উলংগ বীর ও তাঁর প্রিয় বোন একে অপরের সংগে সানন্দে মিলিত হন। রাফের নেতৃত্বে মুসলিম দলটি আবার অনেক দূর ঘুরে রোমান বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে খালিদের সংগে মিলিত হয়। জাররারকে মুক্ত করে আনার জন্য খালিদ (রা) খুবই আনন্দিত হন এবং রাফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

---

৩৩৮. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা - ২৮।

মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে রোমানগণ তাদের প্রত্যাহারের গতি বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়। ফলে মুসলমানদের আক্রমণ আরও তীব্র আকার ধারণ করে এবং রোমানদের প্রত্যাহার একসময় বিশৃংখল পলায়নের রূপ লাভ করে। তারা দ্রুতগতিতে হেম্‌সের দিকে পালাতে থাকে।

খালিদ (রা) পলাতক শত্রুকে পিছু ধাওয়া করা থেকে বিরত থাকেন। কেননা তাকে দ্রুত দামেস্কে ফিরতে হবে। দামেস্ক অবরোধকারী মুসলিম বাহিনী হতে প্রথমে রাফের নেতৃত্বে ও পরে খালিদের নেতৃত্বে মোট ৯,০০০ সৈন্য প্রত্যাহার করায় তারা এখন পূর্বের তুলনায় অনেক দুর্বল। এই সুযোগে অবরুদ্ধ রোমানগণ কোনো একটি গেট খুলে মুসলিম অবস্থানের উপরে আক্রমণ করলে অবরোধ ভেঙে যাওয়ার আশংকা প্রচুর। তাই খালিদ (রা) সাম্‌ত বিন আল-আসওয়াদের নেতৃত্বে একটি অশ্বারোহী দলকে হেম্‌সের অভিমুখে অগ্রসর হয়ে রোমানদেরকে অনুসরণ করার নির্দেশ দান করে নিজে দামেস্ক অভিমুখে যাত্রা করেন। সাম্‌ত হেম্‌সে পৌঁছে দেখেন যে, রোমানগণ সেখানে পৌঁছে দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে। হেম্‌সের স্থানীয় অধিবাসীগণ সাম্‌তের সংগে সাক্ষাত করে জানায় যে, তাদের যুদ্ধ করার কোনো অভিপ্রায় নেই বরং তারা মুসলমানদের সংগে শান্তি স্থাপনে আগ্রহী ও তাদের যে কোনো সংখ্যক যোদ্ধাকে খাওয়াতে প্রস্তুত। তাদের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনার পর সাম্‌ত দামেস্কে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইতিমধ্যে খালিদ (রা) দামেস্কে পৌঁছে মুসলিম বাহিনীর কমান্ড গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে পূর্বের বিন্যাসে মোতায়েন করেন।

দামেস্ক অভিমুখে অগ্রসরমান রোমান ত্রাণ দলটির দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির কথা দামেস্কের অধিবাসীদের মধ্যে দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। অবরুদ্ধ রোমানগণ আশা করেছিল যে, হেরাক্লিয়াস তাদেরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করবে। হেরাক্লিয়াস তার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে। কিন্তু বেইত লিহিয়ার মাঠে খালিদ (রা) সে চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। হেরাক্লিয়াস অবশ্য আরও সৈন্য বাহিনী গঠনে সক্ষম। তবে তা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ইতিমধ্যেই দুর্গের মধ্যে সরবরাহ কমতে শুরু করেছে এবং দুর্গবাসীদের সামনে এমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না যাতে তারা নতুন করে আশায় বুক বাঁধতে পারে বা মনে সাহস যোগাতে পারে।

দামেস্কবাসীদের মনে অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে। কয়েকজন একত্রিত হলেই তারা এসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করে। হেরাক্লিয়াস যদি আরও একটি বাহিনী তৈরি করে অদূর ভবিষ্যতে যার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, তারা যে সফল হবে বা পূর্ববর্তী ত্রাণদলের চেয়ে ভাল কিছু করতে পারবে তার কি নিশ্চয়তা আছে ! মুসলিম বাহিনী আজনাদাইনের যুদ্ধে ৯০,০০০ সৈন্যের রোমান বাহিনীকে যেভাবে পরাজিত করেছে তাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, দামেস্কের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রোমান

বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে পরাজয় ও বন্দী বরণকে উপেক্ষা করার কোনো উপায় নেই। এভাবে অবরুদ্ধ অবস্থায় সীমিত রসদ দিয়ে কতদিন টিকে থাকা যাবে ? তার চেয়ে মুসলমানদের সংগে শান্তি স্থাপন করে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়াটাই কি উত্তম নয় ? দুর্গবাসীদের মনোবল কমতে থাকে এবং অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে বিশেষ করে যারা রোমান নয় তাদের মধ্যে। পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে এবং অস্থিরতা অসহনীয় হয়ে ওঠে।

সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের একটি দল থমাসের সংগে সাক্ষাৎ করে তাদের উদ্বেগের কথা অবহিত করে এবং তাকে পরামর্শ দান করে খালিদের সংগে শান্তি স্থাপন করা যায় কিনা তা ভেবে দেখার জন্য। থমাস তাদেরকে এই মর্মে আশ্বাস প্রদান করে যে, শহর রক্ষার জন্য তার কাছে পর্যাপ্ত সৈন্য আছে এবং সে শীঘ্রই অবরোধ ভেংগে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করার জন্য আক্রমণ করবে। গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান করে দামেস্ক শহরকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষার জন্য স্রষ্টার সাহায্য কামনা করা হয়। থমাস একজন অত্যন্ত সাহসী যোদ্ধা। বিজয়ের সামান্য সম্ভাবনা থাকা অবস্থায় সে আত্মসমর্পণ করবে না। সে একটি প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পরদিন সকালে, ৬৩৪ খৃস্টাব্দের তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকে থমাস শহরের প্রত্যেকটি সেকটর হতে সৈন্য সংগ্রহ করে একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে এবং থমাস গেট দিয়ে অবরোধ ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নেয়। থমাস গেটের অবরোধকারী দলের নেতা ছিলেন শুরাহবীল, যার সৈন্য সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। থমাস ঘন বৃষ্টির মতো তীর ও গুলতি নিক্ষেপের মাধ্যমে অপারেশন শুরু করে। তার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদেরকে কিছুটা পিছনে হটতে বাধ্য করে গেটের বাইরে সৈন্য মোতায়েন করার মতো জায়গা সৃষ্টি করা। মুসলমানরাও একই ভাবে তীর ছুঁড়ে জবাব দান করে। তীর বিনিময় শুরু হলে প্রথম ধাক্কায় কয়েকজন মুসলমান প্রাণত্যাগ করে। যার মধ্যে ছিল আবান বিন সাঈদ বিন আল আস নামের মত একজন সদ্য বিবাহিত যুবক। তার স্ত্রী ছিল একজন অত্যন্ত সাহসী মহিলা। বৈধব্যের খবর শোনার সংগে সংগে এই মহিলা একটি তীর নিয়ে স্বামী হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে মুসলিম তীরন্দাজদের সংগে যোগদান করে। থমাস গেটের পাশে দেয়ালের উপরে একজন ধর্মযাজক হাতে একটি বৃহৎ আকৃতির ক্রুশ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল রোমান যোদ্ধাদেরকে সাহস যোগানোর জন্য। এই ধর্মযাজকটির দুর্ভাগ্য যে, সে এই প্রতিশোধ পরায়ণা মহিলার টার্গেটে পরিণত হয়। তার নিক্ষিপ্ত তীর ধর্মযাজকটির বুক ভেদ করে যায় এবং মুসলমানদের উল্লাস ও রোমানদের আতংকের মধ্যদিয়ে তার দেহটি ক্রুশসহ দেয়ালের গোড়ায় মাটিতে পড়ে যায়। যাহোক, তীর যুদ্ধের এই পর্যায়ে মুসলমানরা খুব একটা সুবিধা করতে পারে না। ফলে তারা কিছুটা পিছু হটে তীর নিক্ষেপের দূরত্বের বাইরে অবস্থান নেয়।

মুসলমানরা পিছু হটলে থমাস গেটের দরজা খুলে যায় এবং রোমান পদাতিক সৈনিকদল তীর ও গুলতি নিক্ষেপের আশ্রয়ে গেটের বাইরে এসে উভয় দিকে ছড়িয়ে পড়ে যুদ্ধের বিন্যাসে অবস্থান গ্রহণ করে। অবস্থান গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার সংগে সংগে থমাস শুরাহবীলে কোরের উপরে আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ দান করে। শুরাহবীলও গেট হতে কয়েকশ' গজ দূরে যুদ্ধের বিন্যাসে অবস্থান গ্রহণ করেন। থমাস নিজেই তরবারি হাতে এই আক্রমণের নেতৃত্ব দান করে এবং বর্ণনাকারীদের ভাষায় সে, "উটের মতো গর্জন করছিল।"[৩৩৯]

খুব শীঘ্রই দুই বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মুসলমানগণ সংখ্যায় অনেক কম হলেও অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে স্বীয় অবস্থানে অনঢ় থাকে এবং আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধির সংগে সংগে রোমানদের মৃতের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। থমাস শুরাহবীলকে মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে চিনতে পেরে তার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। শুরাহবীল থমাসকে অগ্রসর হতে দেখে একটি রক্তে ভেজা তরবারি নিয়ে তার মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। কিন্তু শুরাহবীলের নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই আবার সেই বিধবার নিক্ষিপ্ত একটি তীর থমাসের ডান চোখকে বিদ্ধ করে এবং সে মাটিতে পড়ে যায়। তার লোকেরা তাকে দ্রুতগতিতে তুলে দুর্গের ভেতরে নিয়ে যায় এবং একই সংগে রোমানগণ পিছু হটতে থাকে। এভাবে মুসলমানদের তরবারির চাপে ও দুই বাহুতে মোতায়েন তীরন্দাজদের আক্রমণে বাধ্য হয়ে রোমানগণ দুর্গে প্রত্যাহার করে। তারা বাইরে ফেলে যায় অসংখ্য মৃতদেহ, যাদের বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছে আবানের বিধবার দ্বারা।

দুর্গের ভেতরে নেয়ার পর চিকিৎসকগণ থমাসের আঘাত পরীক্ষা করে দেখে। তীরটি খুব গভীরে বিদ্ধ না হলেও, তারা দেখে যে এটা বের করে আনা সম্ভব নয়। তারা তীরের ডগাটি কেটে ফেলে। একটি চোখ হারানোর দুঃখ বা আঘাতের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে থমাস নিজেকে একজন অস্বাভাবিক সাহসী ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণ করতে চায়। তার এক চোখের বিনিময়ে সে মুসলমানদের হাজার চোখ নেয়ার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে। সে মুসলমানদেরকে শুধু পরাজিত করেই ক্ষান্ত হবে না বরং আরব পর্যন্ত ধাওয়া করে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করবে। যাতে সেখানে মানুষের পরিবর্তে বন্যপ্রাণী বসবাস করতে পারে। সে আসন্ন রাতের বেলা একটি প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ দান করে।

এদিকে শুরাহবীলের বেশ কিছু যোদ্ধা নিহত হয়েছে এবং আরও কিছু আহত হয়েছে। তিনি আশংকা করেন আর একটি প্রচণ্ড ধাক্কা আসলে রোমানগণ অবরোধ ভেঙে ফেলতে সক্ষম হবে। তিনি আরও কিছু সৈন্য চেয়ে খালিদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। কিন্তু তার নিকট দেয়ার মতো কোনো সৈন্য ছিল না। অন্যান্য গেটে

---

৩৩৯ ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা - ৪৬।

মোতায়েন কোরগুলো হতে সৈন্য প্রত্যাহার করে তাদেরকে দুর্বল করা সম্ভব নয়, কেননা থমাস পরবর্তী আক্রমণের জন্য অন্য যে কোনো গেটকে বেছে নিতে পারে বা একই সংগে একাধিক গেট দিয়ে আক্রমণ করতে পারে। তিনি শুরাহবীলকে নির্দেশ দান করেন তার সাধ্যমতো স্বীয় অবস্থানকে ধারণ করে থাকার জন্য এবং সেই সংগে আশ্বাস প্রদান করেন যে, প্রতিপক্ষের চাপ অত্যন্ত বেশি হলে জাররার তার ২,০০০ অশ্বারোহী নিয়ে তার পাশে দাঁড়াবে। এমনকি প্রয়োজন বোধে খালিদ (রা) নিজেই তাঁর মজুদ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হয়ে থমাস গেটের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিবেন। প্রতিটি ব্যক্তি নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত আর একটি আক্রমণ প্রতিহত করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে শুরাহবীল অপেক্ষা করতে থাকেন।

রাতের আক্রমণের জন্য থমাস আবার থমাস গেটকে নির্বাচন করে। কেননা সে দিনের যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত শুরাহবীলের বাহিনীর দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে চায়। তবে সে অন্যান্য গেট দিয়েও আক্রমণ করতে চায় যাতে তারা শুরাহবীলের সাহায্যে এগিয়ে আসতে না পারে। থমাস জাবিয়া গেট, ক্ষুদ্র গেট ও পূর্ব গেট দিয়ে একযোগে আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ দান করে। সে পূর্ব গেটে সবচেয়ে বেশি সৈন্য মোতায়েন করে যাতে খালিদ (রা) তার অবস্থান ছেড়ে শুরাহবীলের সাহায্যে অগ্রসর হতে না পারেন। থমাসের প্রধান লক্ষ্য শুরাহবীলের অবরোধ ভেঙে ফেলা। অবশ্য একাধিক গেটে আক্রমণ করে দুর্বলতম গেটটি চিহ্নিত করে সেটিকে যুদ্ধের প্রধান সেকটরে পরিণত করার চিন্তাও থমাসের মধ্যে কাজ করে। এতে দ্রুত সফলতা লাভের সম্ভাবনা বেশি।

থমাস তার বাহিনীকে নির্দেশ দানের সময় যতো দ্রুত সম্ভব আক্রমণ পরিচালনার উপরে গুরুত্ব আরোপ করে যাতে মুসলমানদেরকে অজ্ঞাতে ধরা যায়। তাদেরকে পলায়নের কোনো সুযোগ দেয়া হবে না। কোনো মুসলিম আত্মসমর্পণ করতে চাইলে তাকে সংগে সংগে হত্যা করা হবে শুধু খালিদ (রা) ছাড়া। খালিদকে জীবন্ত ধরতে হবে। মধ্যরাতের দুই ঘণ্টা পূর্বে চাঁদ উঠলে থমাসের নির্দেশে একটি সংকেত বাজলে সকল গেট খুলে যাবে এবং একযোগে আক্রমণ পরিচালনা করা হবে।

চাঁদের আলোয় পরিকল্পনা মোতাবেক রোমান আক্রমণের সূচনা হয়। জাবিয়া গেটে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে আবু উবায়দা (রা) স্বয়ং তরবারি হাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ তরবারি চালক। বেশ কয়েকজন রোমান তাঁর আঘাতে ধরাশায়ী হয়। রোমানগণ পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে দ্রুত দুর্গে প্রবেশ করে।

ক্ষুদ্র গেটে ইয়াযীদের নেতৃত্বে ছিল তুলনামূলকভাব অনেক কম যোদ্ধা। ফলে রোমানগণ প্রাথমিকভাবে কিছুটা সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে জাররার তার ২,০০০ যোদ্ধাসহ ইয়াযীদের আশেপাশেই ছিলেন। তিনি কালবিলম্ব না করে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে রোমানগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দুর্গে প্রত্যাবর্তন করে এবং জাররার তাদেরকে গেট পর্যন্ত ধাওয়া করেন।

পূর্ব গেটে আক্রমণের জন্য রোমান বাহিনীর একটি বৃহত্তর অংশকে নিয়োগ করা হয়েছিল। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে সেখানকার পরিস্থিতি ভয়ংকর রূপলাভ করে। যুদ্ধক্ষেত্রের শব্দ শুনে খালিদ (রা) বুঝতে পারেন যে, শত্রু অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে এবং তিনি আশংকা করেন যে, রাফে তাদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে কিনা। তিনি তাঁর ৪০০ গতিময় রক্ষী নিয়ে রাফের সাহায্যে এগিয়ে যান। যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েই তিনি সিংহনাদে হুংকার দিয়ে উঠেন, "আমি মহান যোদ্ধা, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ।" খালিদের এই হুংকার রোমান সৈনিকদের পরিচিত। খালিদ (রা) স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন দেখে তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং সহসাই পূর্বগেটের যুদ্ধ পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যায়। তারা দ্রুত প্রত্যাহার শুরু করে এবং মুসলিমগণ তাদেরকে পিছু ধাওয়া করে হত্যা করতে থাকে। তাদের অধিকাংশই দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়।

সবচেয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় থমাস গেটে। দিনের বেলায় যুদ্ধে ক্লান্ত শুরাহবীলের কোরকে রাতের এই ধকল সইতে হয়। চাঁদের আলোক মুসলমানদেরকে সহায়তা করে। তারা দেখতে পায় যে, রোমানগণ গেট খুলে যুদ্ধের বিন্যাসে অবস্থান গ্রহণ করছে। এই সময় শুরাহবীলের তীরন্দাজগণ তীর নিক্ষেপ করে শত্রুর বেশ ক্ষতি সাধন করে। তা সত্ত্বেও তারা অবস্থান গ্রহণ করে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। শুরাহবীলের কোর প্রাণপণ লড়াই করে স্বীয় অবস্থানে অনড় থাকে।

মধ্যরাতের পর সম্মুখসারিতে যুদ্ধরত থমাস শুরাহবীলকে শনাক্ত করতে পারে এবং সে তাঁর সংগে দ্বৈতযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

বেশ কিছু সময় ধরে এই দ্বৈতযুদ্ধ চলে। কিন্তু কোনো পক্ষেই জয়-পরাজয়ের লক্ষণ দেখা যায় না। শুরাহবীল সুযোগ বুঝে সমস্ত শক্তি ব্যয় করে থমাসের ঘাড়ে একটি প্রচণ্ড কোপ মারেন। কিন্তু আঘাতটি ঘাড়ের উপরের বর্মপ্লেটে লেগে তরবারিটি ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। শুরাহবীল অস্ত্রশূন্য হাতে থমাসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। সৌভাগ্যবশত মুহূর্তের মধ্যেই দু'জন মুসলিম যোদ্ধা থমাসকে আক্রমণ করে। শুরাহবীল একজন শহীদ মুসলিম সৈনিকের দেহ হতে একটি তরবারি নিয়ে থমাসের উদ্দেশে ফিরে তাকান। কিন্তু থমাসকে আর সেখানে দেখা যায় না।

রোমানগণ বুঝতে পারে যে, মুসলিমগণকে পরাজিত করে পিছু ঠেলে দেয়া সম্ভব নয়। থমাসও মনে করে যে, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে অধিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া। সে রোমান বাহিনীকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দান করে। রোমানগণ শৃংখলার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে এবং মুসলিমগণও তাদেরকে পিছু ধাওয়া করা থেকে বিরত থাকে। যদিও তীরন্দাজগণ তাদের বেশ ক্ষতি করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রেও সেই বিধবা তার তীরের যথাৰ্থ ব্যবহার করে।

এটাই ছিল থমাসের অবরোধ ভেঙে ফেলার সর্বশেষ প্রচেষ্টা। সে ইতিমধ্যে তার হাজার হাজার যোদ্ধাকে হারিয়েছে এবং দেয়ালের বাইরে বের হয়ে আর কোনো আক্রমণ পরিচালনা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার যোদ্ধারাও এব্যাপারে একমত পোষণ করে। তারা শহর রক্ষার জন্য প্রস্তুত আছে তবে দুর্গের বাইরে গিয়ে আর আক্রমণ পরিচালনা করতে প্রস্তুত নয়। থমাস তার প্রধান সহযোগী হারবীসকে আরও অধিক ক্ষমতা প্রদান করে। সে তাকে এমন কিছু কাজের ক্ষমতা প্রদান করে যেগুলো এর পূর্বে সে নিজেই করতো।

মুসলিম অবরোধ ভেঙে ফেলার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলে দামেস্ক শহরে হতাশার বাতাস দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঐতিহ্যবাহী শহরের আকাশে জমাটবদ্ধ ঘনমেঘ কেটে রূপালি আলোর বিস্তারের কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না। লোকদের মাঝে চাপা অসন্তোষ বিরাজ করতে থাকে এবং তারা এখন শান্তি চায়। তাদের এই শান্তি কামনার সংগে যোগদান করে থমাস স্বয়ং। সে তার সাধ্য মতো শক্তি পরীক্ষা করেছে, এখন শান্তিই তার একান্ত কাম্য। সে শর্তসাপেক্ষে শান্তি স্থাপনে ও আত্মসমর্পণে রাজী আছে। কিন্তু খালিদ (রা) কি শান্তি স্থাপনে আগ্রহী ? খালিদের পরিচিতি হচ্ছে একজন যুদ্ধংদেহী নেতা হিসেবে যিনি যুদ্ধকে খেলার মতো মনে করেন। তিনি দামেস্ক দুর্গের অভ্যন্তরের নাজুক পরিস্থিতির কথা অবশ্যই জানেন। ফলে তিনি চাইবেন শর্তহীন আত্মসমর্পণ যার অর্থ হচ্ছে তাঁর দয়ার উপরে সবকিছু ছেড়ে দেয়া।

ইতিমধ্যে রোমানগণ প্রত্যেকটি মুসলিম জেনারেল সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে। তারা জানে যে, আবু উবায়দা হচ্ছেন মুসলিম বাহিনীর দ্বিতীয় ব্যক্তি। শল্য চিকিৎসকের পুত্র এই লোকটি ছিলেন প্রকৃত অর্থে শান্তিপ্রিয়, ভদ্র, দয়ালু ও মহানুভব। যুদ্ধকে তিনি আনন্দ উল্লাসের বিষয় হিসেবে না ভেবে বরং পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে ভাবতেন। তাঁর সংগে শান্তি স্থাপন করলে শর্তসমূহ নিশ্চয় সহজ হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আবু উবায়দা আর্মি কমান্ডার নন। দুই বা তিন দিন এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলে। তারপর প্রেমিক জোনাহ ব্যাপারটি তার নিজের হাতে তুলে নেয়।

মারকাসের পুত্র জোনাহ একজন গ্রীক। সে এক গ্রীক মেয়েকে পাগলের মতো ভালবাসতো। আসলে মেয়েটি ছিল তার স্ত্রী। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে তাদের বিয়ে হয় কিন্তু অবরোধের কারণে বিয়ে তুলে দেয়া সম্ভব হয়নি। জোনাহ অনেকবার মেয়ের অভিভাবকদেরকে অনুরোধ করেছে তার স্ত্রীকে তার হাতে তুলে দেয়ার জন্য। কিন্তু তারা যুদ্ধের ব্যস্ততা ও অস্তিত্ব রক্ষার কথা বলে কনে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। বরং তারা ভাবে এই নাজুক পরিস্থিতিতে জোনাহ কি করে বিয়ে তুলে নেয়ার চিন্তা করে? জোনাহ অবশ্য এ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারতো না।

৬৩৪ খৃস্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর বা দু'-একদিন আগে-পরে (১৯শে রজব, ১৩ হিজরী) সন্ধ্যার অন্ধকারে জোনাহ পূর্ব গেটের পার্শ্ববর্তী দেয়াল হতে নিচে নামে এবং নিকটবর্তী মুসলিম প্রহরীর নিকট খালিদের সংগে সাক্ষাতের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। তাকে খালিদের নিকট নেয়া হলে সে তার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে এবং তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। খালিদ (রা) তাকে তার স্ত্রীকে পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবেন সে এমন গোপন তথ্য সরবরাহ করবে যার ফলে দামেস্ক জয় করা সহজ হবে। খালিদ (রা) সম্মত হয়ে যান। সে জানায় যে, নগরীর বাসিন্দাগণ আজকের রাতে একটি উৎসবের কারণে আনন্দ-উল্লাস ও নেশায় বিভোর হয়ে থাকবে। এমনকি গেটগুলোতেও থাকবে সামান্য সংখ্যক প্রহরী। খালিদ (রা) দেয়াল টপকাতে পারলে গেট খুলে শহরে প্রবেশ করতে কোনো অসুবিধা হবে না।

খালিদ (রা) মনে করেন যে, লোকটিকে বিশ্বাস করা যায়। তাকে তার বক্তব্যের ব্যাপারে আন্তরিক মনে হয়। খালিদ (রা) তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালে সে রাজী হয়ে যায়। গত কয়েক বছর ধরে সে ইসলাম সম্পর্কে অনেক ভাল কথা শুনেছে এবং মনের দিক থেকে ইসলামের প্রতি অনেকটা ঝুঁকে ছিল। জোনাহ খালিদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। খালিদ (রা) তাকে শহরে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলেন। জোনাহ তাই করে।

জোনাহ বিদায় হওয়ার সংগে সংগে খালিদ (রা) রশি সংগ্রহ ও রশির সাহায্যে মই তৈরির নির্দেশ দান করেন। হাতে সময় নেই তাই কোরগুলোর সংগে যোগাযোগ করে সমন্বিত আক্রমণ পরিচালনা সম্ভব নয়। তাই তিনি স্বীয় নেতৃত্বে পূর্ব গেটে মোতায়েন ইরাক হতে তাঁর সংগে আগত বাহিনীকে নিয়েই দুর্গ আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মধ্যরাতের দিকে চাঁদ উঠলে আক্রমণ পরিচালনা হবে।

খালিদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০০ জন নির্বাচিত যোদ্ধা প্রথমে পূর্ব গেটের পাশের দেয়ালের সবচেয়ে উঁচু অংশটিতে উঠবে। দেয়ালটি এই জায়গায় সবচেয়ে উঁচু হওয়ায় প্রহরী না থাকারই কথা। প্রথমে তিনজন উঠবে রশির সাহায্যে। তারপর তারা রশির মই শক্ত করে বাঁধবে যাতে বাকিরা তা বেয়ে উপরে উঠতে পারে। কিছু লোক দেয়ালের ওপারে নিচে নেমে প্রহরী থাকলে হত্যা করবে এবং গেট খুলে দিবে যাতে গোটা কোর ঢুকে একযোগে আক্রমণ করতে পারে।

দেয়াল বেয়ে প্রথম যে তিনজন উপরে উঠেন তারা হলেন খালিদ, কাকা এবং মাজুর বিন আদী। দেয়ালের উপরে কোনো প্রহরী ছিল না। রশির মইটি দেয়ালের সংগে বেঁধে ফেলার সংগে সংগেই বাকিরা দ্রুত উপরে উঠতে থাকে। অর্ধেক উঠলেই বাকিদের ওঠার সাহায্যের জন্য কয়েকজনকে রেখে অন্যদেরকে নিয়ে খালিদ (রা) ওপারে নিচে নেমে পড়েন। কয়েকজন রোমান যোদ্ধা এগিয়ে আসলে তাদেরকে খতম করে খালিদ (রা) গেটের দিকে ছুটে যান। সেখানে দু'জন প্রহরী ছিল। একজনকে খালিদ (রা) হত্যা করেন এবং অপরজনকে কাকা। ইতিমধ্যে শহরে

বিপদ সংকেত বেজে উঠেছে এবং রোমান দলসমূহ পূর্ব গেটের দিকে ছুটে আসতে থাকে। খালিদ (রা) বুঝতে পারেন যে, হাতে আর সময় নেই।

খালিদ (রা) ও কাকা গেটের দিকে অগ্রসর হন এবং বাকি মুসলিমগণ ছুটে আসা রোমানদেরকে বাধাদানের জন্য অবস্থান গ্রহণ করে। গেটটি তালা ও শিকলের সাহায্যে মজবুত ভাবে আটকানো ছিল। পরপর কয়েকটি আঘাতে তালা ও শিকল ভেঙে গেলে গেটটি উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং সংগে সংগে ইরাকের কোর বন্যার পানির মতো দুর্গে প্রবেশ করে। যেসব রোমান সৈন্য এগিয়ে আসে তাদের কেউ ফিরে যেতে পারে না। তাদের মৃতদেহ শহরের প্রধান রাস্তার উপরে আবর্জনার স্তূপের মতো পড়ে থাকে।

গোটা দামেস্ক শহর এখন জেগে উঠেছে। প্রত্যেকটি সৈনিক পূর্বের অনুশীলনকৃত ড্রিল অনুযায়ী তাদের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে গোটা দুর্গের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সম্পন্ন হয়। থমাসের হাতে থাকে একদল মজুদ সৈন্য। খালিদ (রা) শহরের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং তাঁকে বাধাদানকারী রোমানগণ ধরাশায়ী হতে থাকে।

সকাল আসন্ন। এমন সময় থমাস অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সংগে তার শেষ তাসটি ছুঁড়ে মারেন। সে বুঝতে পারে যে, খালিদ (রা) শহরের ভিতরে একটি ভিত্তি তৈরি করেছে এবং দুর্গটিকে পদানত করা তার জন্য সময়ের ব্যাপার মাত্র। অন্য গেটসমূহে নীরবতা দেখে সে অনুমান করে যে, অন্যান্য মুসলিম কোর কমান্ডারগণ হয়তো খালিদের এই আক্রমণ পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত নয়। তারমধ্যে একটি ক্ষীণ আশার সৃষ্টি হয় যে, অন্যান্য কোর কমান্ডার বিশেষ করে আবু উবায়দা (রা) হয়তো খালিদের সর্বশেষ সাফল্য সম্পর্কে অজ্ঞাত। সে খুব দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সে তার মজুদ দলকে সামনে প্রেরণ করে যতবেশি সময় সম্ভব খালিদের অগ্রযাত্রাকে বিলম্বিত করার লক্ষ্যে এবং একই সংগে জাবিয়া গেটে আবু উবায়দার নিকট দূত প্রেরণ করে জিযিয়া প্রদানের শর্তে শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে।

আবু উবায়দা (রা) রোমান দূতকে সম্ভ্রমের সংগে স্বাগতম জানান ও তাদের কথা শুনেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, তারা খালিদের নিকট যাওয়ার সাহস না পেয়ে তাঁর নিকটে এসেছে। দুর্গ গেট থেকে তাঁর দূরত্ব যতটুকু তাতে তিনি যুদ্ধের শব্দ শুনলেও ভাবতেন যে, হয়তো রোমানগণই আক্রমণ করেছে। তাছাড়া তিনি ভাবতেও পারেন না যে, খালিদ (রা) রশি বেয়ে উঠে দেয়াল টপকিয়ে দুর্গ আক্রমণ করবেন। শান্তি স্থাপনের মাধ্যমে রক্তপাতের অবসান ঘটিয়ে দ্রুত দামেস্ক জয় করার ব্যাপারে যে খালিদও একমত হবেন এ ব্যাপারে আবু উবায়দার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন এবং রোমানদের আত্মসমর্পণকে গ্রহণ করেন। মুসলমানগণ শান্তিপূর্ণভাবে শহরে প্রবেশ করবে ' কোনো রক্তপাত ও লুটতরাজ হবে

না, মন্দির ধ্বংস করা যাবে না ও কাউকে বন্দী করাও হবে না। দামেস্কের অধিবাসীগণ জিযিয়া প্রদান করবে। আর যারা শহর ত্যাগ করতে চায় তারা তাদের সমস্ত সম্পদ সংগে নিয়ে যেতে পারবে। এরপর রোমান দূতগণ অন্যান্য কোর কমান্ডারের নিকট গিয়ে বলে যে, মুসলিম কমান্ডারের সংগে শান্তি চুক্তি হয়েছে এবং শীঘ্রই গেটগুলো খুলে যাবে ও মুসলমানগণ বিনাবাধায় শহরে প্রবেশ করতে পারবে।

ভোর হওয়ার পরপরই আবু উবায়দা (রা) তাঁর অফিসার ও কোরসহ জাবিয়া গেট দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে দামেস্ক প্রবেশ করেন এবং শহরের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তাঁর সংগে ছিল থমাস, হারবীস, দামেস্কের কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বিশপ। আবু উবায়দা (রা) সামনে অগ্রসর হচ্ছেন শান্তির ফেরেশতার মতো আর খালিদ (রা) অগ্রসর হচ্ছেন টর্ণেডোর মতো। উভয়ে একই সময়ে দামেস্ক শহরের কেন্দ্রে মেরীর চার্চে উপস্থিত হন। খালিদ (রা) সবেমাত্র সর্বশেষ রোমান বাধাকে অতিক্রম করে এসেছেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য কোর কমান্ডারও শহরে শান্তিপূর্ণভাবে প্রবেশ করে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

আবু উবায়দা ও খালিদ (রা) একে অপরের দিকে বিস্ময়ের সংগে তাকান। আবু উবায়দা (রা) লক্ষ্য করেন যে, খালিদ (রা) ও তাঁর সংগীদের তরবারি হতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে। তিনি সহজেই অনুমান করেন যে, এমন কিছু একটা হয়েছে যা তিনি জানেন না। খালিদ (রা) লক্ষ্য করেন যে, আবু উবায়দা (রা) ও তাঁর সংগীদের তরবারি কোষবদ্ধ এবং তাদের আশেপাশে শান্তির আবহ বিরাজ করছে। তাঁর সংগীদের মধ্যে আছে দামেস্কের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বিশপগণ।

কিছুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হয়। আবু উবায়দা নীরবতা ভেঙে বলেন, "ওহে সুলাইমানের পিতা! আল্লাহ শান্তিপূর্ণভাবে এই শহরকে আমার হাতে সমর্পণ করেছেন এবং মুসলমানদেরকে আর এই শহরের জন্য অহেতুক যুদ্ধ করতে হবে না।"

কিসের শান্তি, খালিদ (রা) ফেটে পড়েন, "আমি শক্তির মাধ্যমে এই শহরকে পদানত করেছি। আমাদের তরবারি তাদের রক্তে রঞ্জিত এবং তাদের সম্পদ ও মানুষের উপরে এখন আমাদের অধিকার।"

এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুই জেনারেলের মধ্যে একটি বিরোধ আসন্ন যা ভয়ংকর রূপ নিতে পারে। খালিদ (রা) মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং তাঁর সিদ্ধান্তই সবার জন্য চূড়ান্ত হওয়ার কথা। তাঁর মতো কমান্ডারের পক্ষে অধীন কোনো অফিসারের অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করার কথা নয়। তাঁর আকাশচুম্বী ব্যক্তিত্ব ও প্রশ্নাতীত সামরিক প্রজ্ঞা তাঁকে এমন আসনে অধিষ্ঠিত করেছে যে, তাঁর সিদ্ধান্তে প্রশ্ন করার চিন্তা কেউ করতো না, বিশেষ করে এই রকম পরিস্থিতিতে যেখানে তিনি মনে করছেন যে, দামেস্ক জয় করা হয়েছে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। অপরপক্ষে আবু উবায়দা খালিদ (রা)-এর মতো সামরিক প্রতিভা ও খ্যাতির অধিকারী ছিলেন না। তবে মুসলিম হিসেবে তিনি ছিলেন প্রথম সারির একজন। তিনি ছিলেন জান্নাতের

সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন এবং জাতির বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তিনি ওহুদের যুদ্ধে রাসূলে আকরাম (সা)-এর চিবুক হতে হেলমেটের লিংক টেনে তুলতে গিয়ে সামনের মাড়ির দাঁত হারিয়ে মুসলিম সমাজে খুবই সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে সমাদৃত।

খালিদ (রা)-এর সংগে পরামর্শ না করে বা তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে রোমানদের সংগে শান্তি চুক্তি করে আবু উবায়দা (রা) হয়তো ভুল করেছিলেন। তবে তিনি এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, একজন মুসলমানের সম্পাদিত চুক্তিকে অবশ্যই সম্মান দিতে হবে এবং আর কোনো রক্তপাত করা যাবে না। তিনি খালিদের সামরিক নেতৃত্বকে সম্মান করতেন এবং এও জানতেন যে, তাঁকে কৌশলে সম্মত করাতে হবে। সিরিয়ায় আবু উবায়দাই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি মুসলিম সমাজে তাঁর মর্যাদার কারণে খালিদের যে কোনো সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করতে পারতেন। এমনকি খালিদ (রা) ও আবু উবায়দা (রা)-এর সংগে কথা বলার সময় কণ্ঠস্বরকে নীচু রাখতেন তা যে কোনো পরিস্থিতিতেই হোক। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে আশার কথা ছিল যে, এই দুই জেনারেল একে অপরকে সত্য সত্যই ভালবাসতেন। তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন গুণাবলীর জন্য যা উভয়কে খ্যাতিমান করেছে, একে অপরকে সম্মানও করতেন। আবু উবায়দা জানতেন যে, তাঁর নিকট এমন এক ক্ষমতা আছে, তা খালিদ (রা) জানেন না, যা দিয়ে তিনি সহজেই তাকে চুপ করে দিতে পারেন। কিন্তু এই ক্ষমতাটি তিনি এখনই প্রয়োগ না করে শেষ হাতিয়ার হিসেবে রাখতে চান। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে তা প্রয়োগ করবেন।

ওহে কমান্ডার, আবু উবায়দা বলেন, "জেনে রাখুন যে, আমি শান্তিপূর্ণভাবে শহরে প্রবেশ করেছি।"

খালিদ (রা)-এর চাহনিতে ক্ষোভের চিহ্ন থাকলেও তিনি নিজেকে সংযত রাখেন এবং সম্ভ্রম রক্ষা করেই বলেন, "আপনার কখনই বোধোদয় হবে না। তারা আপনার নিকট থেকে কিভাবে শান্তির নিশ্চয়তা আশা করতে পারে, যেখানে আমি শক্তি প্রয়োগ করে শহরে প্রবেশ করেছি এবং তাদের সমস্ত বাধাকে ধ্বংস করা হয়েছে।"

"আল্লাহকে ভয় করুন, ওহে কমান্ডার! আমি তাদেরকে শান্তির নিশ্চয়তা দিয়েছি এবং ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়ে গেছে।"

"আমার আদেশ ছাড়া তাদেরকে শান্তির নিশ্চয়তা দানের কোনো ক্ষমতা আপনার নেই। আমাকে আপনার কমান্ডার মনোনীত করা হয়েছে। আমি আমার তরবারি কোষবদ্ধ করবো না যতক্ষণ না রোমানদের শেষ ব্যক্তিটি নিশ্চিহ্ন হয়।"

আবু উবায়দা (রা) অনেকটা যুক্তি দেখানোর মতো বলেন, "আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে, আমি যেখানে প্রত্যেকটি লোকের জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছি আপনি তার বিরোধিতা করবেন। আমি তাদেরকে শান্তির নিশ্চয়তা দিয়েছি আল্লাহর নামে (সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য) এবং পবিত্র রাসূলের নামে (তাঁর উপরে আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)। আমার সংগী মুসলমানগণ এই চুক্তিতে সম্মত ছিলেন। সন্ধির শর্ত ভংগ করা মুসলমানের গুণাবলীর মধ্যে পড়ে না।"

দুই জেনারেলের কথোপকথন শুনতে শুনতে খালিদ (রা)-এর সংগী কিছু যোদ্ধা পাশে কিছু রোমানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। তারা তরবারি দুলাতে দুলাতে তাদেরকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হয়। এই দেখে আবু উবায়দা (রা) খালিদের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে তাদেরকে বাধা দান করেন এবং খালিদের সংগে তাঁর আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংযত হওয়ার নির্দেশ দান করেন। মুসলিম যোদ্ধাগণ এই আদেশ মেনে নেয়। শুধু আবু উবায়দার পক্ষেই এটা সম্ভব ছিল এবং খালিদ (রা)-এরও ক্রোধ হজম করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

অন্য তিনজন কোর কমান্ডার একত্রে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে খালিদ (রা)-কে অবহিত করেন। চুক্তি মোতাবেক শান্তি স্থাপিত হওয়া উচিত; কেননা সিরিয়ায় রোমানগণ যদি জানতে পারে যে, মুসলমানগণ শান্তির নিশ্চয়তা দিয়ে পরবর্তীতে লোকদেরকে হত্যা করেছে তাহলে আর কোনো শহর মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণের চিন্তা করবে না। ফলে মুসলমানদের সিরিয়া বিজয় খুবই কষ্টকর কাজ হয়ে দাঁড়াবে।

খালিদের আবেগ কখনই যুক্তিকে ছোট করে দেখতো না। তাঁর যুক্তিবোধ জেনারেলদের পরামর্শের মধ্যে সামরিক প্রজ্ঞা খুঁজে পায়। তিনি কিছু সময়ের জন্য থমাস ও হারবীস-এর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, "ঠিক আছে, আমি শান্তি চুক্তি মেনে নিলাম, তবে এই দুই অভিশপ্ত রেহাই পাবে না।"

এই দুই ব্যক্তিই আমার সংগে প্রথম শান্তি চুক্তিতে আসে, "আবু উবায়দা (রা) বলেন, আমার প্রতিশ্রুতি ভংগ করা ঠিক হবে না। আল্লাহ আপনার উপরে দয়া বর্ষণ করুন।"

খালিদ (রা) আশা ছেড়ে দেন। তিনি আবেগভরে বলেন, "আল্লাহর নামে বলছি, শুধু আপনার ওয়াদার জন্য তারা রক্ষা পেল, নতুবা আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। তাদের উভয়কে এই শহর ত্যাগ করতে দিন এবং তারা যেখানে যাবে আল্লাহর অভিশাপ তাদেরকে অনুসরণ করবে।"

থমাস ও হারবীস ভীত বিহবল অবস্থায় দুই মুসলিম জেনারেলের কথোপকথন শুনছিল এবং দোভাষী তা ভাষান্তর করে শুনাচ্ছিল। শান্তি স্থাপনে খালিদের সম্মতির কথা শুনেই তাদের চেহারার মধ্যে স্বস্তির আভা ফুটে ওঠে। তারা দোভাষী নিয়ে আবু উবায়দার সামনে উপস্থিত হয় এবং যে কোনো রাস্তা ধরে দামেস্ক ত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করে।

হ্যাঁ, তোমরা যে কোনো রাস্তা দিয়ে যেতে পারো, "আবু উবায়দা (রা) বলেন, "তবে আমরা অন্য কোনো শহর দখল করলে সেখানে যদি তোমাদেরকে পাওয়া যায় তাহলে সেখানে তোমরা এই চুক্তির আওতায় পড়বে না।"

খালিদ (রা) পিছু ধাওয়া করতে পারেন এই ভয়ে ভীত হয়ে থমাস প্রার্থনা করে, "আমাদেরকে তিনটি দিন সময় দিন। তিনদিন পরে এই চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। তারপর যদি আমাদেরকে বন্দী করেন তাহলে আমাদেরকে হত্যা বা দাসে পরিণত করতে পারবেন।"

এখানে খালিদ (রা) আবার কথা বলেন, "তোমাদেরকে তিনদিন সময় দেয়া হবে, তবে তোমরা শুধু পথের খাবার ছাড়া আর কিছু নিতে পারবে না।

আবু উবায়দা (রা) এতে আপত্তি করে বলেন, "এটাও সন্ধির শর্ত ভংগের শামিল হয়ে যায়। চুক্তি অনুযায়ী তারা তাদের সবকিছু সংগে নিতে পারবে।"

আমি তাতেও রাজী আছি, খালিদ (রা) বলেন, "তবে তারা অস্ত্র নিতে পারবে না।"

এবারে থমাস আপত্তি করে, "মুসলমানগণ ছাড়া অন্য শত্রুর হাত হতে আত্মরক্ষার জন্য কিছু অস্ত্র আমাদের নিকট থাকতে হবে। নতুবা আমরা এখানেই থাকবো, আপনারা যা খুশি করতে পারেন।" থমাস ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, মুসলমানগণ যে কোনো মূল্যেই শান্তির শর্তকে সম্মান দেখানোকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করে। সে এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চায়।

খালিদ (রা) এটুকু রাজী হন যে, প্রত্যেকটি লোক বর্শা, তরবারি অথবা তীর যে কোনো একটি অস্ত্র বহন করতে পারবে। এভাবেই সর্বশেষ সমস্যাটির সমাধান হয়।[৩৪০]

এরপরই তখন সবেমাত্র সূর্য উঠেছে, সন্ধির শর্তাবলী ঠিক করা হয় এবং খালিদ (রা) তা স্বাক্ষর করেন। শর্তগুলো নিম্নরূপ ঃ

> "মহান দয়াময় আল্লাহর নামে। এই শর্তসমূহ হচ্ছে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের পক্ষ হতে দামেস্কের লোকদের উদ্দেশ্যে। মুসলমানদের শহরে প্রবেশকালে তারা (অধিবাসীরা) নিরাপদ থাকবে। তাদের সম্পদ, মন্দির ও শহরের দেয়াল কিছুই ধ্বংস করা যাবে না। তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (তাঁর উপরে আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) ও খলীফাতুল মুসলিমীনের পক্ষ হতে। তারা যতদিন জিযিয়া প্রদান করবে ততদিন খলীফার নিকট হতে ভালকিছু আশা করতে পারে।"[৩৪১]

জনপ্রতি এক দিনার করে জিযিয়া ধার্য হয়। সেই সংগে মুসলমানদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবারও সরবরাহ করতে হবে। কি পরিমাণ খাবার সরবরাহ করা হবে তাও লিপিবদ্ধ করা হয়।

দামেস্ক বিজয় সম্পন্ন। এন্টিওককে বাদ দিলে দামেস্কই হচ্ছে সিরিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ শহর। এই শহর এখন মুসলমানদের হাতে এবং যারা এই শহর বিজয় করেছে তাদের মধ্যে একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া কাজ করছে।

---

৩৪০. খালিদ ও আবু উবায়দার মধ্যকার কথোপকথন গ্রহণ করা হয়েছে ওয়াকিদীর, পৃষ্ঠা-৫১-৫২ হতে।
৩৪১. বালাযুরী ঃ পৃষ্ঠা - ১২৮।

দামেস্ক বিজয়ের জন্য মুসলমানদের কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রতিপক্ষের তুলনায় তাদের হতাহতের সংখ্যা খুবই কম হলেও এই শহরটির জন্য তাদেরকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। তারা এক মাস ধরে বীরত্বের সংগে লড়াই করেছে এবং এই বিজয়ের জন্য প্রচুর ঘাম ও রক্ত ঝড়িয়েছে। তারা তরবারির সাহায্যেই এই শহরকে পদানত করেছে, বিশেষ করে ইরাকের বাহিনী রাতের বেলা দেয়াল টপকিয়ে শহরে প্রবেশ করে শত্রুর সর্বশেষ বাধাকেও চূর্ণ করে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই ত্যাগ ও পরিশ্রমের ফল ছিনিয়ে নিয়েছে থমাসের শেষ মুহূর্তের চাতুর্য এবং আবু উবায়দার সরল মহানুভবতা ও উদারতা। তাঁর এ কাজটি করার কথা না থাকলেও তিনি তা করেছিলেন; হাজার হলেও তিনি ছিলেন জাতির বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের একজন। তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে একটি শব্দও উচ্চারিত হয় না।

রোমান বহর শহর ত্যাগ করতে থাকলে মুসলিমগণ দলে দলে দাঁড়িয়ে তা দেখতে থাকে। এই বহরে ছিল রোমান সৈনিকগণ ও হাজার হাজার বেসামরিক ব্যক্তি, তাদের স্ত্রী ও সন্তানগণসহ। হেরাক্লিয়াসের কন্যা থমাসের স্ত্রীও স্বামীর সংগে ছিল। এই বহরে ছিল শত শত গাড়ি ও ওয়াগন ভর্তি মালামাল ও হেরাক্লিয়াসের ৩০০ বেল ব্রকেডের কাপড়। কিছু মুসলিম এই দৃশ্য ক্ষোভের সংগে অবলোকন করে আর কিছু দুঃখের সংগে। শহরটি সম্পদ শূন্য হয়ে যাচ্ছে। দামেস্ক বিজেতাদের জন্য এটা ছিল সত্যই কষ্টকর মুহূর্ত।

খালিদ (রা) তাঁর কিছু অফিসারসহ দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল যে, রোমানগণ কোনো মূল্যবান বস্তুই দামেস্কে রাখবে না। বিষয়টি তাঁকে ব্যথিত করে। মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে তিনি তরবারির সাহায্যে দামেস্ক জয় করেছেন। আর আবু উবায়দার জন্য সে বিজয়ের এই পরিণতি।

তিনি আশেপাশে দণ্ডায়মান সবার চেহারায় ক্ষোভের চিহ্ন দেখতে পান। এই সমস্ত সম্পদ বিজয়ীদের হওয়ার কথা ছিল। পথের দুপাশে দাঁড়ানো মুসলিম যোদ্ধাগণ নীরবে এই দৃশ্য দেখতে থাকে। ইচ্ছা করলে তারা যে কোনো সময় রোমান বহরের উপরে চড়াও হয়ে যা খুশি তা ছিনিয়ে নিতে পারতো। কিন্তু এই ছিল মুসলিম বাহিনীর শৃংখলাবোধ ও প্রতিপক্ষকে প্রদত্ত ওয়াদার প্রতি শ্রদ্ধা। এই শৃংখলাবোধ ও চুক্তির শর্ত রক্ষার নৈতিকবোধের কারণেই একজন সৈনিকও রোমান বহরের শহর ত্যাগে বিঘ্ন সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয় না।

খালিদ (রা) অনেক কষ্টে তাঁর ক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ রাখেন। তিনি আকাশের দিকে অস্ত্র তুলে তীব্র মনঃকষ্ট নিয়ে প্রার্থনা করেন, "হে আল্লাহ! মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এই সম্পদরাজি আমাদেরকে দান করো।"[৩৪২]

---

৩৪২. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা - ৫২।

খালিদ (রা) তাঁর পিছনে একটি মৃদু কাশির শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখেন প্রেমিক জোনাহ দাঁড়িয়ে আছে। গতরাতে খালিদের তাঁবুতে গমনকালে সে যেমন বেদনায় ভারাক্রান্ত ছিল এখনও অনুরূপ দেখাচ্ছে। দামেস্কের পতনের পর সে তার নবপরিণীতা স্ত্রীর নিকট গিয়ে তার সংগে চলে আসার আহ্বান জানায়। প্রথমে সে এই আহ্বানে সাড়া দেয়। কিন্তু জোনাহ্ মুসলমানদের সংগে যোগ দিয়েছে এই কথা শুনেই সে জোনাহের সংগে সকল প্রকার সম্পর্ক ছেদ করে দেয়। এমনকি এখন সে থমাসের বহরের সংগে দামেস্ক ত্যাগ করছে। জোনাহ্ তার প্রেমে পাগলপ্রায় অবস্থায় খালিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছে।

মুসলমানরা কি মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়ে জোনাহের হাতে তুলে দিতে পারে? না পারে না। মেয়েটিও চুক্তির আওতায় নিরাপদে দামেস্ক ত্যাগের অধিকার পেয়েছে এবং তাকে বাধা দিলে চুক্তির শর্ত ভংগ হবে।

তিনদিন পরে চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে কি সে চেষ্টা করা যাবে ? না তাতে লাভ হবে না। রোমানগণ দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে তিনদিনে এতদূর অগ্রসর হয়ে যাবে যে, মুসলমানদের পক্ষে তাদেরকে ধরা সম্ভব হবে না।

হ্যাঁ, অবশ্যই পারবে। জোনাহ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত পথের সন্ধান জানে যা ধরে দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনী অগ্রসর হলে রোমান বহরকে ধরে ফেলতে পারবে। রোমান বহর যতো দ্রুতই অগ্রসর হোক তাদেরকে প্রধান রাস্তা ধরে চলতে হবে এবং তাদের পথ সংক্ষিপ্ত করার কোনো উপায় নেই। তবে তাতেও হয়তো কোনো কাজ হবে না। কেননা হেম্‌স বালাবাক ও ত্রিপোলীর মতো রোমান দুর্গগুলো এ রকম দূরত্বে ছিল যে, বহরটি তিনদিনে সহজেই যে কোনো একটিতে পৌঁছে নিরাপদে দুর্গের দেয়ালের ভেতরে আশ্রয় নিতে পারবে।

না, রোমান বহর এই তিনটি দুর্গের কোনোটার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে না। জোনাহ জানে যে, তারা এন্টিওকের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং সেখানে পৌঁছতে তাদের বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে। জোনাহ মুসলিম বাহিনীকে সংক্ষিপ্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সে শুধুমাত্র তার নববধুকে ফিরে পেতে চায়।

খালিদের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। জোনাহর প্রস্তাবকে তৃষ্ণার্তের নিকট পানির সংবাদের সংগেই শুধু তুলনা করা যায়। খালিদ (রা) জাররার, রাফে ও আবদুর রহমান বিন আবু বকরকে নির্বাচিত করেন। তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার সংগে সংগেই তাঁরা রোমান বহরকে ধরার জন্য ধাওয়া করবেন। বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করা হয় এবং সকল প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়। চুক্তির আওতাভুক্ত তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার সংগে সংগেই দ্রুত গতিময় অশ্বারোহী বাহিনী দ্রুততম গতিতে ছুটে যাবে রোমান বহরকে ধরার জন্য। জোনাহর পরামর্শে এই বাহিনীকে স্থানীয় আরবদের পোশাকে সজ্জিত করা হয় যাতে পথে রোমান বাহিনীর কোনো ইউনিটের সাক্ষাৎ হলে তাদের বাধার সম্মুখীন হয়ে সময় নষ্ট না করতে হয়। বিশ্বাসীদের অন্তরে আশার আলো জ্বলতে শুরু করে।

চতুর্থ দিনের সূর্য উদয়ের সংগে সংগে চুক্তির আওতাভুক্ত তিন দিন শেষ হলে মুসলিম বাহিনীর অশ্বারোহী দল দ্রুতবেগে দামেশক ত্যাগ করে। এই দলের সামনে থাকেন খালিদ (রা) ও জোনাহ। আবু উবায়দা (রা) মুসলিম বাহিনীর অবশিষ্ট অংশের কমাণ্ডার হিসেবে দামেস্কে থেকে যান।

মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী যে পথ ধরে অগ্রসর হয়েছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমানগণ এন্টিওকের অল্প দূরে থাকতেই রোমান বহরটিকে ধরে ফেলে। বহরটি তখন সমুদ্রের নিকটবর্তী একটি মালভূমিতে অবস্থান করছিল। এই মালভূমির অবস্থান ছিল একটি পাহাড় সারির পাশে যা আরবদের নিকট পরিচিত ছিল আবরাশ নামে ও রোমানদের নিকট বারদা নামে।[৩৪৩] রোমান বহরটি এই মালভূমিতে পৌঁছলে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। ফলে রোমানগণ মালপত্রগুলো ফেলে রেখে খারাপ আবহাওয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য আশেপাশে আশ্রয় নেয়। রোমানগণ বিন্দুমাত্র চিন্তাও করতে পারেনি যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে বজ্রপাতের মতো একটি ঝটিকা আক্রমণ আসতে পারে। তারা রাস্তার মধ্যে এতো পরিমাণ ব্রকেডের কাপড়ের বেল ফেলে রেখেছিল যে, এই সমতল ভূমিটি পরবর্তীকালে ব্রকেডের উদ্যান হিসেবে পরিচিত হয় এবং এই সংঘর্ষও ব্রকেডের উদ্যানের যুদ্ধ নামে খ্যাত হয়।

আবহাওয়া পরিষ্কার হলে জোনাহ ও অন্যান্য স্কাউট রোমানদের অজ্ঞাতেই তাদের অবস্থান উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। তারা খালিদ (রা)-কে পর্যাপ্ত তথ্যও সরবরাহ করে যাতে তিনি আক্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। তিনি কয়েক ঘন্টার মধ্যে নির্দেশ জারি ও মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য মোতায়েন করেন। কৌশলে সৈন্য পরিচালনায় দক্ষ ও আকস্মিকতা অর্জনের প্রভু খালিদ (রা) এক্ষেত্রেও যুদ্ধের নীতিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে চরম দক্ষতার পরিচয় দান করেন।

অর্ধ-উলংগ জাররারের নেতৃত্বে একটি অশ্বারোহী দল দক্ষিণ দিকের দামেস্কগামী রাস্তার পাশ থেকে চার্জ করে অগ্রসর হলে রোমানগণ মুসলিম বাহিনীর উপস্থিতি সম্পর্কে প্রথম জানতে পারে। তারা এই ভেবে বিস্মিত হয়ে যায় যে, জাররারের দল তাদের ঘিরে ফেলেছে। তবে জাররারের সংগে একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে দেখে তারা তা টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলে আবার বিশ্রাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা যুদ্ধের জন্য দাঁড়ায় এবং সাহসিকতার সংগে মুসলিম চার্জ গ্রহণ করে।

আধা ঘন্টা পরে পূর্ব দিক হতে রাফের নেতৃত্বে ১,০০০ সৈন্যের আর একটি মুসলিম অশ্বারোহী দল আবির্ভূত হলে রোমানগণ বুঝতে পারে যে, মাত্র একটি মুসলিম রেজিমেন্টের উপস্থিতির কথা ভেবে তারা ভুল করেছে। তারা এবারে মনে

---

৩৪৩. বর্তমানের জাবল আনসারিয়াই হয়তো ছিল এই পাহাড় সারিটি। বর্তমানের এই সারিটির উত্তর প্রান্ত এন্টিওকের দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত।

করে যে, দু'টি মুসলিম রেজিমেন্ট তাদেরকে অনুসরণ করেছে। প্রথমটি আক্রমণ করেছে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আর দ্বিতীয়টি পার্শ্বদেশ থেকে প্রধান আক্রমণ রচনা করবে। রোমানগণ এটাকে বড় সমস্যা মনে করে না। তারা দু'টি মুসলিম রেজিমেন্টকেই টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলার সংকল্প গ্রহণ করে এবং সে অনুসারে সৈন্য পুনর্বিনাস করে রাফের চার্জকেও গ্রহণ করে।

আরও আধা ঘন্টা পরে উত্তর দিক অর্থাৎ এন্টিওকের দিক হতে আব্দুর রহমান বিন আবু বকরের নেতৃত্বে আর একটি মুসলিম অশ্বারোহী রেজিমেন্টের উদয় হলে রোমানগণ দারুণভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা কল্পনার অতীত বিপদে পড়েছে বলে মনে করতে থাকে, কেননা তারা এন্টিওকের সংগে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এন্টিওকের পথ উন্মুক্ত করা বা পশ্চিম দিকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া, যা এখনও উন্মুক্ত আছে তারা আর কোনো উপায় দেখতে পায় না। রোমানগণ মনোবলের দিক থেকে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লেও আবার পুনর্গঠিত হয়। মুসলমানগণ রোমানদের উপরে বর্শা ও তরবারির সাহায্যে আক্রমণ রচনা করে। রোমানগণ আপ্রাণ চেষ্টা করে তাদের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়। ভয়ংকর যুদ্ধ প্রায় একঘন্টা ধরে চলতে থাকে।

এরপর পশ্চিম দিক থেকে চার্জ করে অগ্রসর হয় চতুর্থ মুসলিম অশ্বারোহী রেজিমেন্ট। এই রেজিমেন্টের কমান্ডারের হুংকার ধ্বনি শুনেই রোমানগণ তাঁর পরিচয় জানতে পারে।

আমিই মহান যোদ্ধা
খালিদ বিন আল-ওয়ালীদ।

খালিদের নির্দেশে ব্যাপক হত্যা সংঘটিত হয়। তিনি নিজ হাতেই দ্বৈতযুদ্ধে থমাস ও হারবীসকে হত্যা করেন। যুদ্ধের এক পর্যায় তিনি সংগীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শত্রুবাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যান। আব্দুর রহমান বিন আবু বকর একটি অশ্বারোহী দল নিয়ে রোমানদের বেরিকেড ভেঙে তাকে উদ্ধার না করলে তিনি জীবন্ত ফিরে আসতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

যুদ্ধ আরও কিছু সময় চলে এবং এক সময় রোমান প্রতিরোধ ভেঙে যায়। সংখ্যার স্বল্পতার কারণে মুসলমানদের পক্ষে গোটা রোমান বাহিনীকে ঘিরে ফেলা সম্ভব ছিল না এবং সেই সংগে যুদ্ধের তীব্রতাজনিত বিশৃংখলার সুযোগে হাজার হাজার রোমান নিরাপদে পলায়ন করতে সক্ষম হয়। অবশ্য সমগ্র মালামাল এবং অসংখ্য নারী ও পুরুষ বন্দী হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয়। জোনাহ তার প্রিয়তমাকে খুঁজে পায়। সে তার দিকে অগ্রসর হলে মেয়েটি তার পোশাকের ভাঁজ হতে একটি ছুরি বের করে নিজের বুকে বসিয়ে দেয়। মেয়েটি পড়ে গেলে জোনাহ পাশে বসে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে। সে তার প্রিয়ার প্রতি, সম্ভবত সে তার জন্য নির্ধারিত ছিল না, বিশ্বস্ত থেকে অন্য কোনো মেয়ের প্রতি না তাকানোর প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে।

খালিদ (রা) জোনাহর এই দুঃসংবাদ শুনে তাকে কাছে ডেকে আনেন এবং পাশে দাঁড়ানো একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়ে তাকে গ্রহণ করার আহবান জানান। এই মেয়েটি ছিল তার প্রিয়ার চেয়ে অধিক সুন্দরী ও সুসজ্জিত। জোনাহ মেয়েটিকে দেখে কিছুক্ষণ বোবার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। সম্বিত ফিরে পেলে সে খালিদ (রা)-কে জানায় যে, এই মেয়েটি থমাসের বিধবা পত্নি ও সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কন্যা বৈ আর কেউ নয়। সে তাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। কেননা সম্রাট শীঘ্রই আর একটি বাহিনী প্রেরণ করে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা মুক্তিপণের বিনিময়ে মেয়েকে উদ্ধার করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

মুসলমানগণ মালামাল ও বন্দীদেরকে নিয়ে আনন্দচিত্তে প্রত্যাবর্তন করে। তাদের প্রত্যাবর্তনের রাস্তারও কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে এটুকু জানা যায় যে, তারা পথে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি। দামেস্ক থেকে একদিনের পথ বাকি থাকতেই তারা লক্ষ্য করে যে, এন্টিওকের দিক হতে ধুলি উড়িয়ে একটি ক্ষুদ্র অশ্বারোহী দল অগ্রসর হচ্ছে। তাদের দেখেই মনে হয় যে, তারা যুদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে না। ক্ষুদ্র দলটি কাছে পৌঁছলে একজন সম্ভ্রান্ত রোমান ঘোড়া থেকে নেমে খালিদের দিকে অগ্রসর হয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বলে- 'আমি সম্রাট হেরাক্লিয়াসের দূত।' সম্রাট আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, আমি শুনেছি আপনি কিভাবে আমার বাহিনী ধ্বংস করেছেন। আপনি আমার জামাতাকে হত্যা করেছেন এবং আমার মেয়েকে বন্দী করেছেন। আপনি যুদ্ধে জয়ী হয়ে নিরাপদে ফিরে গেছেন। আমি আপনার নিকট হতে আমার মেয়েকে চাচ্ছি। হয় তাকে মুক্তিপণের বিনিময়ে প্রদান করুন নতুবা সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ উপহার হিসেবে দিন।[৩৪৪]

খালিদ (রা) প্রতিপক্ষকে সম্মান প্রদর্শনের বেলায় ছিলেন উদার বা এটা ছিল তাঁর চরিত্রের একটি অন্যতম দিক, যেমন ছিল বীরত্ব ও মহানুভবতা। জীবনভর তিনি মহানুভবতা দেখিয়েছেন এবং এই মহানুভবতার জন্যই পরবর্তী কালে তাঁকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি এক্ষেত্রেও রোমান সম্রাটের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করেন, "তাকে উপহার হিসেবে নিয়ে যাও, কোনো মুক্তিপণ লাগবে না।" সম্রাটের দূত খালিদ (রা)-কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে সম্রাটের কন্যাকে নিয়ে যায়।

জোনাহ বিষণ্নই থেকে যায়। কোনো কিছুই তাকে উৎফুল্ল করতে পারে না। খালিদ (রা) তাকে নিজের অংশ হতে কিছু সম্পদ উপহার হিসেবে দিতে চান যা দিয়ে প্রয়োজনে সে আর একজন স্ত্রী লাভ করতে পারবে। কিন্তু জোনাহ তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সে তার প্রিয়ার প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত থাকতে চায়। সে অবশ্য তার নতুন বিশ্বাসের প্রতিও ছিল বিশ্বস্ত এবং ইসলামের পতাকাতলে দুবছর যুদ্ধ করার পর ইয়ারমুকের প্রান্তরে শাহাদৎ বরণ করে।

---

৩৪৪. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা-৫৮।

দামেস্কের মুসলমানগণ প্রচুর মালামালসহ প্রত্যাবর্তনকারী অশ্বারোহী বাহিনীকে আনন্দচিত্তে স্বাগতম জানায়। আল্লাহর তরবারি শেষ পর্যন্ত সফলকাম হয়েছেন। খালিদ (রা) দামেস্কে মোট দশদিন অনুপস্থিত ছিলেন। এই সময়টা মুসলমানদের কেটেছে খুবই উদ্বেগের মধ্য দিয়ে।

এখন তারা নিশ্চিন্ত। দামেস্কে ফিরে খালিদ (রা) পত্র লিখে খলীফা আবূ বকর (রা)-কে দামেস্ক বিজয়, রোমানদের দ্বারা আবু উবায়দার প্রতারিত হওয়ার ঘটনা, অশ্বারোহী দল নিয়ে তাঁর রোমান বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন, থমাস ও হারবীসকে হত্যা, প্রচুর পরিমাণ মালামাল ও বন্দী হস্তগত হওয়া এবং সর্বশেষ সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কন্যার মুক্তিদানের বিষয়সমূহ বিস্তারিত জানান। এই পত্রটি লেখা হয় ৬৩৪ খৃস্টাব্দের ১লা অক্টোবর (২রা শাবান, ১৩ হিজরী)।[৩৪৫]

খালিদের পত্রবাহী দূত দামেস্ক ত্যাগের কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই আবু উবায়দা (রা) খালিদ (রা)-কে পাশে ডেকে বলেন, আবূ বকর ইন্তিকাল করেছেন এবং হযরত উমর (রা) এখন খলীফা। তিনি একটি পত্র বের করেন যা নতুন খলীফা তাঁকে লিখেছেন। খালিদ (রা) দ্বিধাসহকারে পত্রটি হাতে নেন এবং খালিদ (রা) তা থেকে চোখ তুলে নেন .... এবং পাঠ করতে শুরু করেন। এই পত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইনটি ছিল,"আমি তোমাকে খালিদ বিন আল-ওয়ালীদের বাহিনীর কমান্ডার নিয়োগ করছি।"

নির্দয় আঘাত

মদীনায় মৃত্যুশয্যায় শুয়ে খলীফা আবূ বকর (রা) তাঁর শেষ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন ঃ উমর হবেন পরবর্তী খলীফা এবং বিশ্বাসীগণ তাঁর প্রতি অনুগত্য প্রকাশ করবেন।

২২শে আগস্ট, ৬৩৪ খৃস্টাব্দ (২২শে জমাদি-উল-আখির, ১৩ হিজরী) আবূ বকর (রা) ইন্তিকাল করেন এবং উমর (রা) খলীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নতুন খলীফা খালিদ (রা)-কে কমান্ড হতে বরখাস্ত করে একটি নির্দেশ জারি করেন। তিনি আবু উবায়দার নিকট লিখেন, 'মহান করুণাময় আল্লাহর নামে।

সেই আল্লাহকে স্মরণ করবে, সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও যিনি বর্তমান থাকেন এবং যিনি আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে এনেছেন।

আমি তোমাকে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করছি। তুমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করো।

ধন-সম্পদের প্রত্যাশায় মুসলমানদেরকে এমন কোনো অভিযানে প্রেরণ করবে না যাতে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন হয় এবং ভালভাবে পরিদর্শন না করে কোনো এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করবে না। বাহিনী ভালভাবে সংগঠিত না করে কোনো অভিযান পরিচালনা করবে না। এমন কোনো পদক্ষেপ নিবে না যাতে মুসলিমগণ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়।

---

৩৪৫. দামেস্ক অবরোধ ও বিজয়ের তারিখের ব্যাখ্যার জন্য পরিশিষ্ট 'খ'-এর ১২ নম্বর নোট দেখুন।

আমরা উভয়ে আল্লাহর পরীক্ষার সম্মুখীন। জাগতিক প্রলোভন থেকে দূরে থাকবে। যাতে তারা তোমাকে ধ্বংস করতে না পারে। তুমিতো দেখেছ প্রলোভন কিভাবে অনেককে ধ্বংস করেছে।[৩৪৬]

খলীফা বার্তাবাহকের হাতে পত্রটি দিয়ে এই মর্মে নির্দেশ দান করেন যে, সে যেন সিরিয়া পৌঁছে ব্যক্তিগতভাবে আবু উবায়দার নিকট তা হস্তান্তর করে।

পরদিন উমর মসজিদে নব্বীতে নামাযের জামাতে ইমামতি করেন। নামায শেষ হলে তিনি উপস্থিত মুসলমানদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। খলীফার দায়িত্ব গ্রহণের পর এটাই ছিল তাঁর জনসম্মুখে প্রথম বক্তৃতা। তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্র রাসূলের প্রতি তাঁর রহমত বর্ষণের প্রার্থনার মাধ্যমে বক্তৃতা শুরু করেন, "দেখ, আরবগণ হচ্ছে একটি উটের মতো যে তার প্রভুর নির্দেশকে অনুসরণ করে চলে। কাবার প্রভুর নামে শপথ করে বলছি, আমি তোমাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথে পরিচালিত করবো।"

বক্তৃতার বাকি অংশ খলীফা মুসলমানদের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং ইসলামের উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধ্যমতো সবকিছু করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে তিনি উপস্থিত জনতাকে অবহিত করেন যে, খালিদ (রা)-কে সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর কমান্ড হতে অপসারণ করে আবু উবায়দাকে তাঁর স্থলে সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করা হয়েছে।

এই ঘোষণায় শ্রোতাদের মধ্যে এক ধরনের নীরবতা বিরাজ করে। খালিদের ব্যাপারে উমরের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সবাই জানতেন। তবে তিনি এতো দ্রুত এমন একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তা কেউ আশা করেনি, বিশেষ করে বিগত তিন বছরে খালিদের নেতৃত্বে ইসলামের বিজয়সমূহের প্রেক্ষাপটে। উমরের ব্যক্তিত্বকে সবাই ভয় ও শ্রদ্ধা করতো এবং খুব কম লোকই তাঁর সামনে মুখ খোলার সাহস পেতো। তদুপরি খলীফা হিসেবে তিনি তাঁর পছন্দমতো যে কাউকে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করার ও যে কাউকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা রাখেন, এবং তাঁর সিদ্ধান্তকেই সকলে মেনে চলতে হবে। সবাই নীরব থাকে, তবে এই নীরবতাও এক ধরনের বক্তব্য প্রকাশ করে।

উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্য হতে জনৈক তরুণ নিজেকে সামলাতে না পেরে দু'পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে বলে, "আপনি কি এমন এক ব্যক্তিকে বরখাস্ত করেছেন আল্লাহ যার হাতে বিজয়ের তরবারি স্থাপন করে তাঁর ধর্মকে শক্তিশালী করেছেন। আল্লাহর উন্মুক্ত তরবারিকে কোষবদ্ধ করার অপরাধ হতে আল্লাহ ও মুসলমানগণ কখনও আপনাকে ক্ষমা করবে না।"

উমর (রা) এই তরুণকে চিনতেন। সে খালিদের গোত্র বনী মাখজুমের সদস্য। তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের মনোভাবও উপলব্ধি করেন এবং বুঝতে পারেন যে, তাঁর

---

৩৪৬. তাবারী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬২২।

ঘোষণায় তাদের প্রতিক্রিয়া আর যাই হোক অত্যন্ত অনুকূল নয়। তিনি এই মুহূর্তে বিষয়টি নিয়ে আর কিছু না বলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যুবকটি তার চাচাতো ভাইয়ের জন্য ক্ষুব্ধ।[৩৪৭] শুধু এই মন্তব্যটি করে মসজিদ ত্যাগ করেন।

উমর (রা) গোটাদিন ধরে খালিদের অপসারণের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন। তিনি মুসলমানদের সামনে খালিদের অপসারণের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। খালিদের মতো একজন শৌর্যমণ্ডিত কমান্ডারকে পর্যাপ্ত কারণ ছাড়া অপসারণ করা যায় না। পরদিন তিনি আবার সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমি খালিদের কামান্ডার থাকার বিরোধী নই। কিন্তু সে অপব্যয়ী এবং সে কবি ও যোদ্ধাদের পিছনে তাদের প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করেছে যা দিয়ে অনেক দরিদ্র মুসলমানকে সাহায্য করা যেতো। কারো একথা বলা উচিত না যে, আমি একজন শক্তিশালী যোদ্ধাকে অপসারণ করে একজন নম্র-স্বভাবের লোককে তার স্থলে কমান্ডার নিয়োগ করেছি, কেননা আল্লাহ তাঁর সংগে (আবু উবায়দার) আছেন এবং তাঁকে সাহায্য করবেন।[৩৪৮]

এবার আর কেউ কোনো কথা বলে না।

বার্তাবাহক খলীফার গুরুত্বপূর্ণ পত্রটি নিয়ে দামেস্কে পৌছে দেখে যে, মুসলমানগণ দুর্গ অবরোধ করে আছে। রোমান ত্রাণবহরের বিরুদ্ধে অভিযান তখনও সংঘটিত হয়নি। খলীফার বার্তাবাহক পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত ছিল। বুদ্ধিমান ব্যক্তি হিসেবে সে সহজেই বুঝতে পারে যে, বিরাজমান পরিস্থিতিতে তথ্যটি প্রকাশিত হয়ে গেলে যুদ্ধরত মুসলমানদের মধ্যে তার বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। অতএব যাদের সংগে তার দেখা হলো সে সকলকেই জানালো যে, সব খবর ভাল এবং মদীনা হতে আরও কিছু যোদ্ধা দামেস্কের পথে আছে। আবু উবায়দার তাঁবুতে পৌঁছে সে তাঁকে একা পেয়ে পত্রটি হস্তান্তর করে।

আবু উবায়দা পত্রটি পাঠ করে বিস্মিত হয়ে পড়েন। খালিদের এই পরিণতি হোক তা তিনি কখনও চাননি। তিনি জানতেন যে, মুসলিম যোদ্ধাদের নিকট খালিদ (রা) হচ্ছেন বীরত্বের প্রতীক এবং তাঁর কমান্ডই তাদেরকে যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সাহস ও শক্তি জোগাতো। মুসলিম বাহিনী এমন একটি অবরোধ অপারেশনে নিয়োজিত যার ফলাফল তাদের অনুকূলে হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। এই পরিস্থিতিতে কমান্ড পরিবর্তন হলে তার ফলাফল বিরূপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই নাজুক অবস্থায় খালিদের অপসারণের যৌক্তিকতাও যুদ্ধরত সৈনিকদের বুঝানো সম্ভব হবে না। তদুপরি খালিদের পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত এই অপারেশন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আবু উবায়দা কমান্ড

---

৩৪৭. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা-৬১।

৩৪৮. পূর্বোক্ত।

গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন না। অতএব, তিনি দামেস্ক অবরোধ সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত খলীফার মৃত্যু সংবাদ ও কমান্ড পরিবর্তন বিষয়টি গোপন রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বার্তাবাহককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন যে, সে কাউকে পত্রের বিষয় সম্পর্কে কিছু বলেনি। তিনি তাকে পত্রের বিষয় সম্পর্কে কাউকে কিছু না বলার জন্য সতর্ক করে দেন।

অবরোধের বাকি সময় মুসলিম সৈনিকগণ কমাণ্ড পরিবর্তন সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে যায়। এমনকি দামেস্ক দুর্গের পতনের দিন খালিদের সংগে কথা কাটাকাটির সময়ও আবু উবায়দা (রা) এই প্রসংগটি উত্থাপন করা থেকে বিরত থাকেন। কেননা তা করলে খালিদ (রা)-কে উপস্থিত শত্রু-মিত্র সকলের সামনে হেয় করা হতো। এমনকি দামেস্কবাসীদের সংগে সম্পাদিত সন্ধিপত্রেও আবু উবায়দা নয় বরং খালিদ (রা)ই স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষরের তিনদিন পরে রোমানদেরকে ধাওয়া করে ব্রকেডের উদ্যানের সফল রেইড পরিচালনা করে খালিদ (রা) ফিরে না আসা পর্যন্ত আবু উবায়দা (রা) অপেক্ষা করেন। ব্রকেডের উদ্যান থেকে ফিরে আসার কয়েক ঘন্টা পরে তিনি খালিদ (রা)-কে একান্তে ডেকে নিয়ে খলীফা আবূ বকরের মৃত্যু ও নতুন খলীফা নির্বাচনের সংবাদ প্রদান করে তাঁকে উমরের পত্রটি পাঠ করতে দেন।

খালিদ (রা) পত্রটি ধীরে পাঠ করেন। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে, তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং আবু উবায়দা (রা) মুসলিম বাহিনীর নতুন সর্বাধিনায়ক। উমর (রা) খলীফা হলে এরকম কিছু একটা ঘটতে পারে এ ব্যাপারে খালিদের মানসিক প্রস্তুতি থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তা ছিল না। কেননা আবূ বকরের মৃত্যু ও উমরের খলীফা হওয়ার বিষয়টি কখনও তাঁর চিন্তার মধ্যে আসেনি।

পত্রের তারিখ দেখে খালিদ (রা) বুঝতে পারেন যে, তা লেখা হয়েছে একমাস পূর্বে এবং আবু উবায়দার হস্তগত হয়েছে অন্তত তিন সপ্তাহ পূর্বে। তিনি আবু উবায়দার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন," আপনি কেন বিষয়টি এতোদিন গোপন করে রেখেছিলেন? আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।" উত্তরে আবু উবায়দা (রা) বলেন, "আপনি শত্রুর সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকা অবস্থায় আপনার কর্তৃত্বকে আমি খর্ব করতে চাইনি।"[৩৪৯]

কিছু সময়ের জন্য খালিদ (রা) মগ্নচিত্তে নিজের পরিণতির কথা ভাবেন। আরো ভাবেন তাঁর বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী আবূ বকর (রা)-এর কথা। আবু উবায়দা (রা)ও কিছুটা সহানুভূতির ও কিছুটা বিব্রত দৃষ্টি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। খালিদ (রা) মন্তব্য করেন, "আল্লাহ আবূ বকরকে ক্ষমা করুন। তিনি বেঁচে থাকলে আমাকে কমান্ড থেকে সরানো হতো না।"[৩৫০] খালিদ (রা) মাথা নিচু করে ধীর পদক্ষেপে

---

৩৪৯. বালাযুরী ঃ পৃষ্ঠা-১২২।
৩৫০. ইয়াকুবী ঃ তারীখ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪০।

গিয়ে নিজের তাঁবুতে প্রবেশ করেন। রাতে খালিদ (রা) আবূ বকরের জন্য অশ্রু বিসর্জন করেন।[৩৫১]

পরদিন অর্থাৎ ২রা অক্টোবর, ৬৩৪ খৃস্টাব্দ (৩রা শাবান, ১৩ হিজরী) সকালবেলা মুসলিম বাহিনীকে একত্র করে মদীনায় খলীফা ও সিরিয়ার কমান্ড পরিবর্তনের বিষয় দু'টি অবহিত করা হয়। একই সংগে দামেস্কের মুসলমানগণ নতুন খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

এই পরিবর্তন সম্পর্কে খালিদের মনে কোনো ক্ষোভ থাকলেও, যা থাকা খুবই স্বাভাবিক, তিনি তা আকারে-ইংগিতে প্রকাশ থেকেও বিরত থাকেন। তিনি বন্ধুদের সামনে মন্তব্য করেন,"যদি আবূ বকরের মৃত্যু হয়ে থাকে এবং উমর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন, তা হলে আমি শুনলাম এবং আনুগত্য প্রকাশ করলাম।"[৩৫২] এ ছাড়া খালিদের করার কিছুই ছিল না। উমরের বিরুদ্ধে যে কোনো প্রকারের ক্ষোভ প্রদর্শন মুসলিম বাহিনীতে সংকট সৃষ্টি করতে পারে। কোনো কারণে মুসলিম বাহিনীতে সংকট বা বিভক্তি সৃষ্টি হোক তা কোনো সত্যিকারের সৈনিক ও প্রকৃত মুসলিম কামনা করতে পারে না।

কোনো বাহিনীর সর্বাধিনায়ককে বরখাস্ত করা হলে তিনি সাধারণত পেশা ত্যাগ করেন। আর পেশায় নিয়োজিত থাকলেও ঐ বাহিনীর সংগে থাকেন না। যার কমান্ড তিনি সবেমাত্র হারিয়েছেন। তিনি অন্যত্র বদলির জন্য আবেদন জানান। অথবা তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু খালিদের জন্মই হয়েছিল হয়তো যুদ্ধ আর বিজয়ের জন্য এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ তাঁকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সামরিক গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। তাই ইতিহাস এমন একটি বিস্ময়কর ঘটনা ধারণ করে যাতে দেখা যায় যে, সে সময়ের শ্রেষ্ঠতম জেনারেল (বস্তুত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠতম জেনারেল) পদাবনতির পরেও একই বাহিনীতে এমনকি একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে পূর্বের আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকেন। এই ঘটনা থেকে সে সময়ের মুসলিম সৈনিকদের মূল প্রেরণাটা উপলব্ধি করা যায়। পক্ষকাল পরে সংঘটিত আবুল কুদ্সের ঘটনা থেকে খালিদের মানসিক অবস্থানটি সকলের নিকট পরিষ্কার হয়ে যায়।

আবু উবায়দার দায়িত্ব গ্রহণের সপ্তাহখানেক পরে একজন আরব খৃস্টান তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করে জানান যে, কয়েকদিনের মধ্যে আবুল কুদ্সে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হবে। এই মেলায় বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের এশীয় অংশ হতে অসংখ্য ব্যবসায়ী ও দর্শনার্থী অনেক মূল্যবান সম্পদ বেচা-কেনার জন্য উপস্থিত হয়।

---

৩৫১. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা-৬২।
৩৫২. পূর্বোক্ত।

মুসলমানগণ ইচ্ছা করলে মেলাটি রেইড করে এই সম্পদরাজি হস্তগত করতে পারে। (আবুল কুদ্স বর্তমানে আবলা নামে পরিচিত এবং দামেস্ক হতে ৪০মাইল দূরে বালাবাক সড়কের উপরে জাহ্লের নিকট লেবানন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত।[৩৫৩] অবশ্য খৃস্টান লোকটি এ তথ্য দিতে পারে না যে, মেলায় রোমান বাহিনীর পাহারা আছে কিনা। তবে ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী ত্রিপোলিসে একটি শক্তিশালী রোমান দুর্গ আছে।

আবু উবায়দা (রা) তাঁর চারদিকে উপবিষ্ট যোদ্ধাদের সংগে বিষয়টি নিয়ে মতবিনিময় করেন, কেউ স্বেচ্ছায় এই অভিযানে নেতৃত্ব দিতে ইচ্ছুক কিনা জানার জন্য। তিনি আশা করেছিলেন খালিদ (রা) এই দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেকে ন্যস্ত করবেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে নীরব থাকেন। তখন একজন তরুণ যার মুখে সবেমাত্র দাড়ি গজিয়েছে, অদম্য উৎসাহ নিয়ে এই দায়িত্ব গ্রহণের আগ্রহ ব্যক্ত করে। তরুণটি ছিল রাসূল (সা)-এর চাচাতো ভাই জাফরের পুত্র আবদুল্লাহ। জাফর মুতার যুদ্ধে শাহাদৎ বরণ করেছিলেন। আবদুল্লাহ সবেমাত্র মদীনা হতে এসে মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিয়েছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করার জন্য উদগ্রীব। আবু উবায়দা (রা) তার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাকে ৫০০ অশ্বারোহীর একটি দলের কমান্ডার নিয়োগ করেন।

১৪ই অক্টোবর, ৬৩৪ খৃস্টাব্দ (১৫ই শাবান, ১৩ হিজরী) অশ্বারোহী দলটি রাতের বেলা চাঁদের আলোয় যাত্রা শুরু করে। তরুণ আবদুল্লাহর সংগে ছিল আবু যার গিফারী নামের একজন দরবেশতুল্য ত্যাগী যোদ্ধা। পরদিন সকালে অদম্য উৎসাহী যুবক আবদুল্লাহ মেলা পাহারায় নিয়োজিত ৫০০০ রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁর ৫০০ অশ্বারোহীকে পরিচালনা করে। আব্দুল্লাহর কামনা ছিল বিজয় আর আবু যার গিফারীর লক্ষ্য ছিল শাহাদৎ। কাজেই তাদেরকে বিরত করার মতো আর কেউ ছিল না। ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং ফলাফল খুবই মারাত্মক আকার ধারণ করে। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর মুসলমানগণ রোমানদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে যায় এবং এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কারো পক্ষেই পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মুসলমানগণ কোণঠাসা হলে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকে। তারা ঘেরাও অবস্থায় দ্রুত একটি বহির্মুখী বৃত্তের আকার ধারণ করে এবং রোমানদের চাপ অত্যন্ত সাহসিকতার সংগে প্রতিহত করতে থাকে। রোমানগণও তাদের সাহসিকতা দেখে অত্যন্ত সতর্কতার সংগে যুদ্ধ করতে থাকে। তবে মুসলমানদের পরাজয় শুধু সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

জনৈক মুসলিম কোনোভাবে রোমানদের বৃত্ত অতিক্রম করে ঘোড়া ছুটিয়ে দামেশকে পৌঁছতে সক্ষম হয়। আবু উবায়দা (রা) সহকর্মী জেনারেলদের সংগে

---

৩৫৩. গিবন (পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২১) এই স্থানটির নাম আবিলা লিখেছেন। তাঁর সময়ে হয়তো স্থানটির নাম তাই ছিল। তবে বর্তমানে তা আবলা নামেই পরিচিত।

বসেছিলেন। এমন সময় উক্ত সৈনিক তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে আবুল কুদ্‌সের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে এবং জানায় যে, দ্রুত সাহায্য না পাঠালে একজন মুসলমানের পক্ষেও ফিরে আসা সম্ভব হবে না। আবু উবায়দা (রা) ভীতবিহ্বল হয়ে পড়েন। সংগে সংগে তাঁর স্মৃতিপটে উমরের চিঠির ভাষা ভেসে ওঠে, "ধন-সম্পদের প্রত্যাশায় মুসলমানদেরকে এমন কোনো অভিযানে প্রেরণ করবে না যাতে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়।" তদুপরি এটাই ছিল কমান্ড গ্রহণের পর তাঁর প্রথম সামরিক সিদ্ধান্ত। এই বিপদ থেকে যদি মুসলমানদেরকে রক্ষা করা না যায় তাহলে গোটা মুসলিম বাহিনীর উপরে এর প্রভাব হবে খুবই ক্ষতিকর। আল্লাহর তরবারি ব্যতীত আর কে আছে যে এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন।

আবু উবায়দা (রা) খালিদ (রা)-এর দিকে ফিরে বলেন," ওহে আবু সুলায়মান! আমি আল্লাহর নামে বলছি, আপনি গিয়ে জাফর বিন আব্দুল্লাহকে উদ্ধার করুন। একমাত্র আপনিই পারেন এই কাজটি করতে।"

"আল্লাহর হুকুম হলে আমি অবশ্যই তা করবো। আমি আপনার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিলাম"- উত্তরে খালিদ (রা) বলেন। "আপনাকে বলতে আমার দ্বিধা হচ্ছিল"- কমান্ড পরিবর্তনের ফলে যে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতি ইঙ্গিত করে আবু উবায়দা (রা) মন্তব্য করেন।

খালিদ (রা) বলেন,"আল্লাহর কসম, আপনি যদি একটি শিশুকেও আমার কমান্ডার নিয়োগ করেন, আমি তাকে মেনে চলবো। ইসলামের দৃষ্টিতে আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি সম্মানিত ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে 'জাতির নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি' বলে অভিহিত করেছেন, আমি কি আপনাকে না মেনে পারি! আমি কখনই আপনার সমান মর্যাদা লাভ করতে পারবো না। আমি এই মুহূর্তে ঘোষণা করছি যে, "আমি আমার জীবনকে মহান আল্লাহর নামে উৎসর্গ করেছি।" আবু উবায়দাও আবেগময় কণ্ঠে বলেন, "আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, ওহে আবু সুলায়মান! আপনি দ্রুত গিয়ে আপনার ভাইদেরকে উদ্ধার করুন।"[৩৫৪]

আধাঘন্টার মধ্যেই গতিময় রক্ষীদলটি (Mobile Guard) আবুল কুদ্‌সের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সামনে থাকে খালিদ (রা) ও জাররার। খালিদ (রা) মুসলমানদেরকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তবে তাদের অনেকেই রোমানদের হাতে নিহত হয়। তাছাড়াও তিনি আবুল কুদ্‌স বাজারে রেইড করে প্রচুর মালামাল হস্তগত করেন। এই সংঘর্ষে খালিদের দেহে বেশ কয়েকটি ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য আহত হওয়াটা ইদানিং খালিদের জন্য একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। ফলে এসব আঘাতকে তিনি তেমন একটা গুরুত্ব দিতেন না।

---

৩৫৪. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা-৬৬।

আবুল কুদ্‌সের ঘটনার পর হতে খালিদের বরখাস্ত হওয়ার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কারো মনে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। আবু উবায়দা (রা) উমর (রা)-কে সবকিছু অবহিত করে পত্র লিখেন এবং খালিদের প্রচুর প্রশংসা করেন।

মদীনায় খলীফার ও সিরিয়ায় সর্বাধিনায়কের পরিবর্তনের ফলে সামরিক অপারেশনের গতিধারার মধ্যেও কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হয়। পূর্ববর্তী খলীফার তুলনায় উমরের কর্মপদ্ধতি ছিল ভিন্ন। আবূ বকর (রা) তাঁর কমান্ডারকে মিশন নির্দিষ্ট করে দিয়ে অপারেশন এলাকা বলে দিতেন এবং বাকি সবকিছু তাঁর উপরে ছেড়ে দিতেন। কিন্তু উমর (রা) প্রত্যেকটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দান করতেন। পরবর্তী কালে তিনি এতো বিস্তারিত নির্দেশ দান করতেন যে, কে বামবাহু কমান্ড করবে আর কে ডান বাহু তাও বলে দিতেন। তিনি তাঁর জেনারেলদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দা ব্যবস্থা চালু করেন। প্রত্যেকটি কোর ও বাহিনীতে এই গোয়েন্দারা থাকতো এবং অফিসারগণ কি বললো বা করলো তা সংগে সংগে খলীফার নিকট চলে যেতো।[৩৫৫]

আবূ বকর (রা)-এর দেয়া বিভিন্ন কমান্ডারের নিয়োগকে উমর (রা) নিশ্চিত করেন। আমর ইবনুল আস প্যালেস্টাইনে, ইয়াযীদ দামেশকে, শুরাহবীল জর্দানে ও আবু উবায়দা হেম্‌স দখলের পর মুসলিম বাহিনী কমান্ড করলেন। এই নিয়োগ শুধু সামরিক কমান্ডের মধ্যেই সীমিত নয় বরং সংশ্লিষ্ট প্রদেশের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও এর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, শুরাহবীলের উপরে শুধু জর্দানে সামরিক অপারেশন পরিচালনার দায়িত্ব ছিল না বরং তিনি ছিলেন জর্দানের গভর্নর। অবশ্য আবু উবায়দা (রা) সার্বিকভাবে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে বহাল থাকেন। যদিও তাঁর এই কমান্ড কার্যকর হবে শুধু রোমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত মুসলিম বাহিনীর অপারেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে। খালিদের বিশেষ কোনো দায়িত্ব ছিল না। উমরের নির্দেশে তিনি আবু উবায়দার অধীনে কাজ করবেন। অবশ্য আবু উবায়দা (রা) তাঁকে ইরাক হতে আগত মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে বহাল রেখেছিলেন। গতিময় রক্ষী দলটিও এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সামরিক দিক থেকে খালিদ (রা) ছিলেন অন্যান্য কোর কমান্ডারের সমান মর্যাদার অধিকারী, কিন্তু তাঁর কোনো রাজনৈতিক দায়িত্ব ছিল না।

মুসলিম বাহিনীর সামরিক অপারেশনে মন্থরতা দেখা দেয়। আবু উবায়দা (রা) ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি এবং ভয়ভীতি শূন্য দক্ষ যোদ্ধা। পরবর্তী কয়েক বছরে খালিদের সাহচর্যের কারণে তিনিও একজন দক্ষ জেনারেলে পরিণত হন। তিনি সবসময় খালিদের পরামর্শের উপর নির্ভর করতেন এবং যতো বেশি সময় সম্ভব

---

৩৫৫. তাবারি ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৫৮।

তাঁকে পাশে রাখতেন। তবে তিনি কখনই খালিদের সামরিক কৌশলগত দূরদৃষ্টি ও যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত গভীর উপলব্ধি করায়ত্ত করতে পারেননি।

তিনি প্রত্যেকটি পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে যুদ্ধপরিষদের সভা আহবান করতেন ও খলীফার উপদেশ প্রার্থনা করতেন। অপর পক্ষে খালিদ (রা) এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর এক যুদ্ধক্ষেত্রে টর্ণেডোর মতো ছুটে বেড়াতেন এবং যুদ্ধ জয়ের লক্ষ্যে আকস্মিকতা, দুঃসাহসিকতা ও প্রচণ্ডতার মতো প্রয়োজনীয় কৌশলের ব্যাপক প্রয়োগ করতেন। অবশ্য আবু উবায়দা (রা) ধীরে হলেও দৃঢ়তার সংগে অগ্রসর হতেন এবং যুদ্ধে জয়ী হতেন।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, খালিদ (রা) ও আবু উবায়দার মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসার প্রেক্ষাপটে নতুন সর্বাধিনায়কের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর সিরিয়া অভিযান অব্যাহত থাকে।

ফাহলের যুদ্ধ

পরবর্তী একটি অধ্যায়ে সম্রাট হেরাক্লিয়াসের ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতা এবং রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণকারী মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংস করার পক্ষে তার গৃহিত কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু এটুকু বলা যায় যে, হেরাক্লিয়াস এমন একজন ব্যক্তি যিনি শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর। আবুল কুদ্সের ঘটনার পর তিনি আর একটি নতুন বাহিনী মাঠে নামানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই বাহিনীটি গঠিত হয় সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল, জাজীরা ও ইউরোপ হতে আগত বাহিনীর সমন্বয়ে। এই বাহিনীতে ব্রকেডের উদ্যান হতে পলাকত সৈনিকগণও যোগদান করে। এই নবগঠিত বাহিনীর কিছু সৈন্য সমবেত হয় এন্টিওকে এবং বাকি অংশ সমুদ্র পথে এসে অবতরণ করে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী সিরিয়া ও ফিলিস্তীন বন্দরে।

৬৩৪ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে (১৩ হিজরীর যীকাদা মাসের প্রথম দিকে) জর্দান নদীর পশ্চিমে বেইসান এলাকায় এই বাহিনীর সমাবেশ ঘটতে থাকে। পরিকল্পনা মাফিক এখান হতে রোমান বাহিনী পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে আরবের সংগে মুসলমানদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার চেষ্টা করবে। সম্রাট সম্মুখ সংঘর্ষ উপেক্ষা করে দামেশকে অবস্থিত মুসলমানদেরকে কৌশলগত দিক থেকে অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলে তাদেরকে দামেশক ত্যাগে বাধ্য করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। জর্দান নদীর পূর্বতীরের ফাহলে ইতিমধ্যেই একটি মাঝারি আকারের রোমান বাহিনী অবস্থান নিয়ে ছিল। আবুল আওয়ারের নেতৃত্বে একটি মুসলিম অশ্বারোহী দল এই রোমান বাহিনীর মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিল।

মুসলমানগণ স্থানীয় চরদের নিকট হতে রোমান বাহিনী চলাচলের খবর পেয়ে যায় এবং বেইসানে রোমান সমাবেশ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই জানতে পারে যে, নবগঠিত রোমান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা হবে ৮০,০০০ এবং তাদের কমান্ডার হলো মিখরাকের পুত্র সাকালার। এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, রোমানগণ পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে আরবের সংগে মুসলমানদের যোগাযোগ রেখা বরাবর অবস্থান নিবে। আবু উবায়দা (রা) যুদ্ধ পরিষদের সংগে পরামর্শ করেন এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, মুসলমানগণ সামনে অগ্রসর হয়ে নবগঠিত রোমান বাহিনীকে ধ্বংস করবে। অবশ্য উত্তর ও পশ্চিম দিকের সম্ভাব্য হুমকি থেকে দামেশককে রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী মুসলিম বাহিনী

মোতায়েন রাখারও সিদ্ধান্ত হয়। ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী যুদ্ধগুলোতে আহত মুসলিম যোদ্ধাগণ সেরে উঠে যুদ্ধে যোগদানের উপযোগী হয়েছে এবং আরব থেকে কিছু নতুন যোদ্ধাও যোগদান করেছে। সব মিলিয়ে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৩০,০০০-এ। এই বাহিনী বিভিন্ন আকারের পাঁচটি কোরে বিভক্ত করা হয়।

পূর্বের আয়োজন মতো ইয়াযীদ ছিলেন দামেশকের গভর্নর এবং তাঁকেই তাঁর কোরসহ দামেশক রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত রাখা হয়। বেইসান ও ফাহলে অবস্থান ছিল শুরাহবীলের কমান্ড এলাকা জর্দান জেলার মধ্যে। তাই আবু উবায়দা (রা) সবদিক বিবেচনা করে শুরাহবীলের হাতেই আসন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণকারী বাহিনীর কমান্ড ন্যস্ত করেন। ৬৩৫ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে মুসলিম বাহিনী ইয়াযীদের কোরকে পিছনে রেখে শুরাহবীলের নেতৃত্বে দামেস্ক ত্যাগ করে। খালিদের নেতৃত্বে ইরাকের কোর সম্মুখরক্ষী বাহিনীর (Advance Guard) দল হিসেবে যাত্রা করে। মধ্য জানুয়ারীতে ফাহলে পৌঁছে মুসলিম বাহিনী দেখতে পায় যে, রোমানগণ শহরটি ত্যাগ করে চলে গেছে এবং আবুল আওয়ার তা দখল করে নিয়েছেন। ফাহল এলাকাটি জর্দান নদীর উভয় তীরে বিস্তৃত এবং দেখতে অনেকটা জলাভূমির মতো।

দামেস্ক হতে মুসলিম বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার খবর শুনেই ফাহলের রোমান বাহিনী দ্রুত জর্দান নদী পার হয়ে অপর পারে বেইসানে সমবেত বাহিনীর প্রধান অংশের সংগে যোগদান করে। প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই রোমানগণ মুসলমানদের দ্বারা বেইসানে আক্রান্ত হতে চায় না। তাই তারা যতো দ্রুত সম্ভব ফাহল-বেইসান রেখার কয়েক মাইল দক্ষিণে জর্দান নদীর উপরে একটি বাঁধ নির্মাণ করে। ফলে নদীর উভয় পাশের নীচু এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। পানিতে নিমজ্জিত এলাকা দিয়ে রাস্তা থাকলেও তা শুধু রোমানদের জানা ছিল। মুসলমানগণ মরুভূমির সংগে পরিচিত, পাহাড়ী এলাকাও তাদের অপরিচিত নয়, কিন্তু এই পানি ও কর্দমাক্ত এলাকা তাদের নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে। তারা অনেকটা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তবে তারা নদী পার হওয়ার একটি উদ্যোগ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

শুরাহবীল মুসলিম বাহিনীকে ফাহলের পাদদেশের ঢালে উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ করে মোতায়েন করেন। দুই বাহুর কমান্ডে থাকেন আবু উবায়দা (রা) ও আমর ইবনুল আস (রা)। জাররারকে নিযুক্ত করা হয় মুসলিম অশ্বারোহী দলের কমান্ডার হিসেবে। আর খালিদ (রা)-কে দায়িত্ব দেয়া হয় তাঁর কোরসহ মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রার নেতৃত্ব দানের। গোটা বাহিনী একযোগে অগ্রযাত্রা শুরু করে। কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতেই অগ্রবর্তী দলটি কাদায় আটকা পড়ে এবং সেখান হতে ফিরে আসতে বেশ কষ্টের সম্মুখীন হয়। মুসলিমগণ ফাহলে প্রত্যাবর্তন করে অপেক্ষা করতে থাকে। এভাবে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়।

রোমান বাহিনীর কমান্ডার সাকালার প্রতিপক্ষের উপরে আক্রমণ রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তার প্রস্তুতি সম্পন্ন এবং সে মুসলমানদেরকে অজ্ঞাতে আক্রমণ করতে চায়। ২৩শে জানুয়ারি, ৬৩৫ খৃস্টাব্দ (২৭শে যাকাদা, ১৩ হিজরী) সূর্যাস্তের পরপরই রোমান বাহিনী নদীর পশ্চিমতীরে সমবেত হয় এবং ফাহলের দিকে যাত্রা শুরু করে। তাদের উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদেরকে রাতের আঁধারে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করা। উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের নিকট এই পথ দুর্গম মনে হলেও রোমানগণের নিকট তা ছিল পরিচিত।

মুসলমানগণ সতর্ক অবস্থায় ছিল। শুরাহবীল ছিলেন দূরদর্শী ও সতর্ক জেনারেল। তিনি মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ বিন্যাসের অবস্থানকে মনে রেখে ক্যাম্প স্থাপন করেছিলেন এবং প্রত্যেক কোরের একটি বৃহত্তর অংশকে রাতের বেলা যুদ্ধের অবস্থানে মোতায়েন রেখেছিলেন। তিনি জলাভূমিটির কিনারা বরাবরও একদল সৈন্য মোতায়েন রেখেছিলেন যাতে তারা রোমান বাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করে দ্রুত খবর দিতে পারে। ফলে রোমান বাহিনী ফাহলে পৌঁছে দেখে যে, মুসলিমগণ নিদ্রায় মগ্ন নয় বরং যুদ্ধের বিন্যাসে প্রস্তুত। যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। দুই বাহিনী রাতের বাকি অংশ ও পরের সম্পূর্ণ দিন যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। মুসলিমগণ প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে থেকে রোমানদের সব আক্রমণ প্রতিহত করে। অনুরূপ এক আক্রমণকালে সালাকার নিহত হয়। রাতের আঁধার নেমে এলে রোমানগণ প্রত্যাহার করার চিন্তা করতে থাকে। অনেক চেষ্টা করেও তারা মুসলিম অবস্থানে কোনো প্রকার ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়নি। মুসলিম বাহিনীর হাতে তারা অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আঁধারের সুযোগে তারা জলাভূমির অপর পারে বেইসানে প্রত্যাহার শুরু করে।

শুরাহবীল এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। রোমানগণ শারীরিক দিক থেকে শ্রান্ত ও মানসিক দিক থেকে দুর্বল না হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়েছেন। এখন তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে প্রত্যাহার করছে। এটাই উপযুক্ত সময় প্রতিআক্রমণ রচনার। শুরাহবীল মুসলিম বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দান করেন এবং অন্ধকারের মধ্যে মরুবাসী আরবগণ পিছন দিক হতে রোমানদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রোমান প্রত্যাহারে চরম বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের পিছু ধাওয়ায় আতংকিত হয়ে রোমানগণ সকল সমন্বয় ও সমঝোতা হারিয়ে প্রাণের ভয়ে ছুটতে থাকে। হাজার হাজার রোমান জলাভূমির মধ্যে হারিয়ে যায়। মুসলমানগণও প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার জন্য চরম আঘাত হানে। এই যুদ্ধে ১০,০০০ রোমান সৈন্য মৃত্যুবরণ করে।[৩৫৬] মুসলমানদের ইতিহাসে এই যুদ্ধটি কাদার যুদ্ধ নামেও খ্যাত।

---

৩৫৬. প্রাথমিক যুগের অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, রোমান বাহিনীর বৃহত্তর অংশ এ যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছিল। বালাযুরীর মতে, রোমান বাহিনীর নিহতের সংখ্যা ১০,০০০ (পৃষ্ঠা-১২২) এই সংখ্যাটিকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিছু রোমান নিরাপদে বেইসানে পৌঁছতে সক্ষম হলেও বাকিরা প্রাণের ভয়ে বিশৃংখলভাবে বিভিন্ন দিকে ছুটে পালায়।

রোমান বাহিনীর পরাজয়ের পর সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী আবার বিভক্ত হয়ে যায়। আবু উবায়দা (রা) খালিদ (রা)সহ ফাহলে অপেক্ষা করতে থাকেন। তাঁরা শীঘ্রই দামেস্ক ও উত্তর সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। আমর ইবনুল আস (রা)-কে সংগে নিয়ে শুরাহবীল নদী ও জলাভূমি অতিক্রম করে (এখন রাস্তার সন্ধান পাওয়া গেছে) বেইসান দুর্গ অবরোধ করেন। কয়েকদিন পর রোমানগণ অবরোধ ভেঙে ফেলার জন্য মুসলমানদেরকে আক্রমণ করে। রোমানগণ পরাজিত ও নিহত হয়। এরপর বেইসান জিযিয়া প্রদানের শর্তে আত্মসমর্পণ করে। শুরাহবীল তাবারিয়া গমন করেন এবং এই এলাকাটিও জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয় ও আত্মসমর্পণ করে। এই ঘটনাটি ঘটে ৬৩৫ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে (যিলহাজ,১৩ হিজরী) জর্দান জেলার দ্বীপ এলাকাটিতে আর কোনো বাধা অবশিষ্ট থাকে না।

চতুর্দশ হিজরীর শুরুতেই আমর ইবনুল আস (রা) ও শুরাহবীল প্যালেস্টাইনের দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এখানে আবার কমান্ডের পরিবর্তন হয়। আমর ছিলেন প্যালেস্টাইন প্রদেশের গভর্নর। তাই তিনি সম্মিলিত মুসলিম বাহিনীর কমান্ড গ্রহণ করেন এবং শুরাহবীল তাঁর অধীনে কোর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দুই কোরের সমন্বয়ে গঠিত মুসলিম বাহিনী প্যালেস্টাইনে প্রবেশের কিছু পূর্বেই এই পরিবর্তন সাধিত হয়।

জর্দানে থাকতেই আমর প্যালেস্টাইনের সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিত করে খলীফাকে পত্র লিখেন। সবচেয়ে শক্তিশালী রোমান বাহিনীর অবস্থান ছিল আজনাদাইন। উমর (রা) আমর ইবনুল আসের জন্য লক্ষ্যবস্তু নির্দিষ্ট করে দিয়ে বিস্তারিত নির্দেশ প্রেরণ করেন। তিনি ইয়াযীদকেও নির্দেশ দান করেন ভূমধ্যসাগরের উপকূল আয়ত্তে নেয়ার জন্য। খলীফার নিদের্শ পেয়ে আবু উবায়দা (রা) ও খালিদ (রা)-এর কোর ব্যতীত মুসলিম বাহিনীর বাকি অংশ প্যালেস্টাইন ও উত্তর বৈরুতের উপকূলীয় এলাকা পর্যন্ত অপারেশন পরিচালনা করে।

আমর (রা) ও শুরাহবীলের কোর আজনাদাইনের উদ্দেশে যাত্রা করে এবং আমরের কমান্ডে যুদ্ধ করে মুসলিমগণ আজনাদাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে রোমান বাহিনীকে পরাজিত করে। এরপর দুই কোর বিভক্ত হয়ে দুইদিকে যাত্রা করে। আমর (রা) নাবলুস, আসাওয়াস, গাজা ও ইয়ুবনা দখলের মধ্য দিয়ে প্যালেস্টাইন বিজয় সম্পন্ন করেন। অপরদিকে শুরাহবীল উপকূলীয় শহর আক্রা ও টায়ার আক্রমণ করেন যা শর্ত সাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করে। ইয়াযীদ তাঁর ভাই মুয়াবিয়াকে সংগে নিয়ে দামেস্ক হতে অগ্রসর হয়ে বন্দর নগরী সিডোন, আরকা, যাবেইল ও বৈরুত দখল করেন।

উমর (রা) ইয়াযীদকে ক্যাসেরিয়া দখল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইয়াযীদ ও মুয়াবিয়া দুর্গটি অবরোধ করেন। রোমানগণ সমুদ্র পথে দুর্গটিতে সৈন্য ও রসদপত্র প্রেরণ করতে সক্ষম হয়। ফলে ইয়াযীদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দুর্গটির পতন ঘটে না। ইয়ারমুকের যুদ্ধের পূর্বে সমগ্র মুসলিম বাহিনীকে একত্র করা হলে ইয়াযীদ অবরোধ প্রত্যাহার করেন এবং যুদ্ধশেষে আবার অবরোধ করেন। দীর্ঘ অবরোধের পর ৬৪০ খৃস্টাব্দে (১৯ হিজরী) দুর্গটির পতন হয়।

১৪ হিজরীর শেষ নাগাদ (৬৩৫ খৃস্টাব্দ) জেরুজালেম ও ক্যাসেরিয়া ব্যতীত প্যালেস্টাইন, জর্দান এবং সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চল মুসলমানদের আয়ত্তে চলে আসে।

হেম্‌স বিজয়

৬৩৫ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম দিকে (১৪ হিজরীর মুহাররম মাসের প্রথম দিকে) আবু উবায়দা (রা) ও খালিদ (রা) উত্তর দিকে অভিযান পরিচালনার মানসে ফাহল ত্যাগ করেন। শুরাহবীলের বেইসান ও তাবারিয়া অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্তও তাঁরা ফাহলে অপেক্ষা করেন। এই কারণে যে, যদি তাঁদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাবারিয়া বিজয় সম্পন্ন হলে জর্দানে আর বড় ধরনের যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই ভেবে তাঁরা উত্তরের দিকে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

দামেস্কের কয়েক মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি তৃণময় সমতল ভূমি আছে। মুসলিম ইতিহাসে যার নাম মারজ-উর-রোম অর্থাৎ রোমের উদ্যান। আবু উবায়দা (রা) ও খালিদ (রা) দামেস্ককে এড়িয়ে হেমসের দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এই সমতল ভূমির দিকে যাত্রা করেন। দামেশকে ইয়াযীদ শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছেন এবং উমরের নিকট হতে ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে অপারেশন পরিচালনার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সেখানে শান্তিতেই অবস্থান করার কথা। মারজ-উর-রোমে পৌঁছে আবু উবায়দা (রা) একটি মানানসই আকারের রোমান বাহিনীর সাক্ষাৎ লাভ করেন।

বেইসান ও তাবারিয়া অভিযানের কথা শুনেই হেরাক্লিয়াস অনুমান করেন যে, মুসলমানগণ তাদের পরবর্তী কৌশলগত লক্ষ্যবস্তু হিসেবে জর্দান ও প্যালেস্টাইনকে নির্বাচিত করেছে এবং তারা সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। তিনি আরও জানতে পারেন যে, মুসলিম বাহিনীর একটি দুর্বল কোর দামেস্কে মোতায়েন আছে এবং তাদের মধ্যে কোনো আক্রমণাত্মক তৎপরতা দেখা যায় না। তিনি দ্রুত অভিযান চালিয়ে দামেস্ক পুনর্দখলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে সম্রাট থিওডোরাস নামের জনৈক জেরানেলের কমান্ডে একটি রোমান বাহিনী প্রেরণ করে দ্রুত দামেস্ক আক্রমণ করেন মুসলমানদেরকে পরাজিত করার জন্য। বাহিনীটি আন্তাকিয়া হতে যাত্রা করে বৈরুত হয়ে পশ্চিম দিক থেকে দামেস্কের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। থিওডোরাসের বাহিনী যাত্রা শুরু করার পরপরই হেরাক্লিয়াস জানতে পারেন যে, আবু উবায়দা (রা) ও খালিদ (রা) ফাহল ত্যাগ করে উত্তরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। সম্রাট অনুমান করেন যে, আবু উবায়দা (রা) ও থিওডোরাস প্রায় একই সময়ে দামেস্কে উপস্থিত হবেন। ফলে রোমানদের পক্ষে আর শহরটি পুনর্দখল

করা সম্ভব হবে না। সম্রাট থিওডোরাসের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে হেম্‌সে অবস্থিত রোমান বাহিনীর একটি অংশকে দ্রুত দামেস্কের উদ্দেশে যাত্রা করার নির্দেশ দান করেন। শানের নেতৃত্বে এই রোমান দলটি হেম্‌স হতে সোজা দামেস্কের উদ্দেশে যাত্রা করে।

আবু উবায়দা (রা) ও খালিদ (রা) মারজ-উর-রোমে পৌঁছে দেখেন থিওডোরাস সেখানে অবস্থান নিয়ে আছে। একই দিনে শানও তার সংগে যোগদান করে। উভয় বাহিনী যুদ্ধের বিন্যাসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে। আবু উবায়দা (রা) দাঁড়ান শানের বাহিনীর বিপরীতে ও খালিদ (রা) থিওডোরাসের বিপরীতে। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রোমান বাহিনীর সংখ্যা সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাদের সংখ্যা দু'টি শক্তিশালী কোরের কম নয়। তা না হলে তাদের পক্ষে দু'টি মুসলিম কোরের মুকাবিলা করার কথা নয়। উভয় বাহিনী যুদ্ধের বিন্যাসে দাঁড়িয়ে গোটা দিন অতিবাহিত করে এবং তারা একে অপরের পক্ষ থেকে প্রথম আক্রমণের অপেক্ষা করতে থাকে।

রাত নামলে থিওডোরাস অত্যন্ত দক্ষতা ও কৌশলের সংগে তার বাহিনীকে পরিচালনা করে। শানকে মুসলিম বাহিনীর সামনে যুদ্ধের বিন্যাসে রেখে আঁধারের সুযোগ নিয়ে সে তার বাহিনীকে প্রত্যাহার করে এবং খালিদের অবস্থানকে পাশ দিয়ে এড়িয়ে ভোর হতে না হতেই দামেস্কে পৌঁছে যায়। তার উদ্দেশ্য ছিল শানের বাহিনী দ্বারা মুসলিম বাহিনীর প্রধান অংশকে মারজ-উর-রোমে ব্যস্ত রেখে তার কোর নিয়ে দামেস্ক আক্রমণ করে সেখানকার মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংস করা। তার এই পরিকল্পনাটি ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত এবং সে তা এতো সুসংগঠিত আকারে বাস্তবায়ন করে যে, রাতের শেষ অংশের পূর্বে মুসলিমগণ জানতেই পারেনি যে, তাদের সামনে হতে রোমান বাহিনীর অর্ধেক অংশ অন্যত্র সরে গেছে।

দামেস্কে ইয়াযীদের স্কাউটগণ ভোরবেলা রোমান বাহিনীর আগমনের খবর জানায়। এই খবর শুনেই ইয়াযীদ দ্রুত তাঁর ক্ষুদ্র কোরকে দুর্গের বাইরে নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মুখ করে অবস্থান গ্রহণ করেন। ইয়াযীদ শহরে থেকে যুদ্ধ করার চেয়ে খোলা মাঠকে বেশি গুরুত্ব দেন কেননা মুসলমানগণ দুর্গে অবরুদ্ধ থাকায় অভ্যস্ত নয়। সূর্য উদয়ের পরপরই ইয়াজীদ ও থিওডোরাসের বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং মুসলিমগণ শীঘ্রই তীব্র চাপের সম্মুখীন হয়। রোমান সৈন্যের সংখ্যা ছিল মুসলমানদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। তা সত্ত্বেও মুসলমানগণ অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে তাদের অবস্থান ধারণ করে থাকে এবং এই অবস্থা মধ্য-সকাল পর্যন্ত চলে। ইয়াযীদ জীবনের আশা বাদ দিয়ে মরিয়া হয়ে রোমান আক্রমণ প্রতিহত করছেন এমন সময় অগ্নিমূর্তি মুসলিম অশ্বারোহীদল পিছন হতে রোমান বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খালিদের নেতৃত্বে ইরাকের কোর এই আক্রমণ পরিচালনা করে এবং তাদের সামনে ছিল গতিময় রক্ষীদলটি। খালিদ (রা) অল্প সময়ের মধ্যেই রোমান বাহিনীকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেন। তিনি থিওডোরাসকে দ্বৈতযুদ্ধে হত্যা করেন। অবশ্য কিছু রোমান পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। রোমান বাহিনীর প্রচুর সম্পদ

বিশেষ করে অস্ত্রপাতি ও বর্ম মুসলমানদের হস্তগত হয়। অর্জিত সম্পদ খালিদ (রা) ও ইয়াযীদের বাহিনীর মধ্যে বণ্টন করা হয়। অবশ্য রাষ্ট্রের প্রাপ্য পাঁচ ভাগের একভাগ আলাদা করে রাখা হয়।

পূর্ববর্তী রাতের শেষ অংশে খালিদ (রা) যখন জানতে পারেন যে, রোমান বাহিনীর অর্ধেক অংশ মারজ-উর-রোম ত্যাগ করেছে তিনি তৎক্ষণাৎ অনুমান করেন যে, তারা দামেস্কে গেছে ইয়াযীদের বাহিনীকে আক্রমণ করার লক্ষ্যে। ইয়াযীদ হয়তো রোমান বাহিনীর মুকাবিলায় বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না। এই আশংকা থেকে খালিদ (রা) আবু উবায়দার নিকট প্রস্তাব করেন যে, তিনি তাঁর কোর নিয়ে ইয়াযীদের সাহায্যে দামেস্কে যেতে চান এবং আবু উবায়দা (রা) শানের মুকাবিলা করবেন। আবু উবায়দা (রা) এই প্রস্তাবে সম্মত হলে খালিদ (রা) খুব ভোরে মারজ-উর-রোম ত্যাগ করে দামেস্ক রক্ষার জন্য দ্রুত যাত্রা করেন। খালিদ (রা) দামেস্কে থিওডোরাসের কোরের মুকাবিলা করার সময়ে, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, আবু উবায়দা (রা) মারজ-উর-রোমে শানের কোরকে আক্রমণ করেন। তিনি শানকে দ্বৈতযুদ্ধে হত্যা করেন এবং রোমানদের মৃতদেহ রোমের উদ্যানে স্তূপ আকারে পড়ে থাকে। অবশ্য বেশ কিছু সংখ্যক রোমান যুদ্ধক্ষেত্র হতে দ্রুত পালিয়ে হেম্সে চলে যেতে সক্ষম হয়।

এই যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হয় ৬৩৫ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে (১৪ হিজরীর মুহাররম মাসে) এবং তা ইতিহাসে মারজ-উর-রোমের যুদ্ধ নামে খ্যাত।

মারজ-উর-রোম ও দামেস্কে অর্জিত সম্পদের বণ্টন ও আহত মুসলিমদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে কয়েকদিন অতিবাহিত হয়। সবদিক সামলিয়ে আবু উবায়দা (রা) খালিদ (রা)-কে তাঁর কোরসহ হেমসে প্রেরণ করেন এবং নিজে বালাবাকের দিকে যাত্রা করেন। খালিদ (রা) হেমসে পৌঁছে দুর্গ অবরোধ করেন। এদিকে বালাবাক আবু উবায়দার নিকট শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে।[৩৫৭] আবু উবায়দা (রা) খালিদের সংগে যোগদানের জন্য হেমসে যাত্রা করেন।

হেম্স অবরোধের কয়েকদিনের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী হেম্স মুসলমানদেরকে ১০,০০০ দিনার এবং ১০০ ব্রকেডের জামা দেবে বিনিময়ে মুসলমানগণ এক বছর হেম্সে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবে। অবশ্য নতুন কোনো রোমান বাহিনী আগমনের ফলে হেম্সের শক্তি বৃদ্ধি হলে এই চুক্তি অকার্যকর বলে বিবেচিত হবে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সংগে সংগে দুর্গের গেট খুলে যায় এবং মুসলিমগণ বাজারসহ চারদিকে নির্বিঘ্নে ঘুরাফিরা করতে থাকে। হেমসের অধিবাসীগণ বিস্ময়ভরা আনন্দের সংগে লক্ষ্য করে যে, মুসলমানগণ বাজার থেকে যা কিছু নিচ্ছে তার বিনিময় মূল্য প্রদান করছে।

---

৩৫৭. বালাবাক বিজয় সম্পর্কে ভিন্ন মতও প্রচলিত আছে। ওয়াকিদীসহ অনেকের বর্ণনা মতে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বালাবাক আবু উবায়দার নিকট আত্মসমর্পণ করে। আবার অন্য অনেক ঐতিহাসিকের মতে বালাবাক শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল। আমারও মনে হয় তাই ঘটেছিল।

কিন্নাসরীনের অধিবাসীগণ জানতে পারে কিভাবে হেমস মুসলমানদের সংগে যুদ্ধ উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। তারাও একই পদ্ধতিতে শান্তি স্থাপনে আগ্রহী। তারা চুক্তি স্বাক্ষরকে আত্মসমর্পণের তুলনায় কম অসম্মানজনক মনে করে। কিন্নাসরীনের গভর্নর আবু উবায়দার নিকট একজন দূত প্রেরণ করে এবং এক বছরের জন্য একই ধরনের শর্ত সম্বলিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। হেম্স ও কিন্নাসরীন প্রদেশের গভর্নরদ্বয় স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এই চুক্তি স্বাক্ষর করে। তাদের আশা ছিল যে, হেরাক্লিয়াস শীঘ্রই তাদের সাহায্যের জন্য রোমান বাহিনী প্রেরণ করবেন এবং সেক্ষেত্রে তারা চুক্তি অকার্যকর করে মুসলমানদের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। অবশ্য এই এলাকার সাধারণ মানুষ মুসলমানদের সৎ আচরণ ও মহানুভবতার দ্বারা চিরতরে বিজিত হয়। সিরিয়ার রোমান শাসকদের উদ্ধত ও নিষ্ঠুর আচরণে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

হেমস ও কিন্নাসরীনের সমস্যার সাময়িক সমাধান হলে আবু উবাযদা (রা) তাঁর বাহিনীর বৃহত্তর অংশকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে সিরিয়ার উত্তর অঞ্চলে রেইড পরিচালনার জন্য প্রেরণ করেন। মুসলিম দলগুলো উত্তরে আলেপ্প পর্যন্ত গমন করে। তারা কিন্নাসরীন জেলাকে বাদ দিয়ে তাদের গমন পথের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে রেইড পরিচালনা করে অসংখ্য বন্দী ও পর্যাপ্ত ধনসম্পদ নিয়ে হেম্সের নিকটবর্তী ক্যাম্পে ফিরে আসেন। জিযিয়া প্রদানে ও আনুগত্য প্রদর্শনে সম্মত হলে হাজার হাজার বন্দীকে তাদের পরিবারের সদস্য ও মালামালসহ মুক্ত করে দেয়া হয় এবং তাদেরকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও প্রদান করা হয়।

এভাবে গ্রীস্মকালের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। ইতিমধ্যে মদীনায় উমর (রা) অধৈর্য হয়ে পড়েন। প্যালেস্টাইন অভিযান সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু সিরিয়ার উত্তর অঞ্চলে অর্থাৎ আবু উবায়দার সেকটরে কেমন যেন একটা স্থবিরতা বিরাজ করছে। ৬৩৫ খৃস্টাব্দের শরতের কোনো এক সময়ে উমর (রা) আবু উবায়দার নিকট পত্র লিখেন। খলীফা তাঁর পত্রে সিরিয়া বিজয়ের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার জন্য জেনারেলের প্রতি ইংগিত প্রদান করেন। পত্র পেয়ে আবু উবায়দার যুদ্ধ পরিষদের সভা আহ্বান করেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, মুসলিম বাহিনীর উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে আরো ভূমি দখলে নেয়া উচিত। চুক্তির কারণে হেম্স ও কিন্নাসরীন আক্রমণ করা না গেলেও অন্যান্য এলাকা আক্রমণ করে দখল করা যেতে পারে।

৬৩৫ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে (১৪ হিজরীর রমযান মাসের মাঝামাঝি নাগাদ) মুসলিম বাহিনী হেম্স হতে হামার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। হামার অধিবাসীগণ শহরের বাইরে এসে মুসলমানদেরকে স্বাগতম জানায়। শহরটি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলে মুসলমানগণ সামনে অগ্রসর হতে থাকে। একের পর এক শেইজার, আফানিয়া (বর্তমানে কালাত-উল-মুজীক নামে পরিচিত) এবং মাআরা হিমস (বর্তমানে মাআরাত-উন-নোমান নামে পরিচিত) শহর মুসলমানদের হাতে

শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে ও জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয় (২৮ নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য)। কোথাও কোথাও স্থানীয় অধিবাসীগণ বাদ্যযন্ত্রের সুর মূর্ছনার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে স্বাগতম জানায়। এই সমস্ত এলাকায়, সিরিয়ায় এই প্রথম বারের মতো, স্থানীয় লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। আবু উবায়দার শান্ত ও মহানুভব ব্যক্তিত্ব স্থানীয় লোকদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মুসলমানগণ শেইজারে থাকা অবস্থায় জানতে পারে যে, হেম্‌স ও কিন্নাসরীনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য রোমান বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে। ফলে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি অকার্যকর হয়ে যায়। নতুন সৈন্য আগমনে শহর দু'টির রোমানগণের মধ্যে নতুন করে সাহসের সঞ্চার হয়। তদুপরি আসন্ন শীত মৌসুমের কথা বিবেচনা করেও তারা উল্লাস বোধ করে। মরুবাসী আরবগণ শীতের প্রকোপ সহ্য করতে অভ্যস্ত নয়। সিরিয়ার প্রচণ্ড শীতের মধ্যে তাঁবু তাদের তেমন কাজে আসবে না। অপরপক্ষে রোমানগণ থাকবে দুর্গের দেয়ালের মধ্যে নিরাপদে। হেরাক্লিয়াস হেমসে সামরিক গভর্নর হারবীসকে লিখে জানান, "এই লোকগুলোর খাদ্য হচ্ছে উটের গোশত ও পানীয় হচ্ছে দুধ। তারা ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না। প্রত্যেকটি ঠাণ্ডার দিনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যাতে বসন্তের আগমন পর্যন্ত কেউ অবশিষ্ট না থাকে।"[৩৫৮]

আবু উবায়দা (রা) প্রথমে হেমস দখল করতে চান। তা করতে পারলে সিরিয়ার উত্তর অঞ্চলে ব্যাপক অপারেশন পরিচালনাকালে পিছন দিক থেকে হুমকির আর কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। মুসলিম বাহিনী হেমসের দিকে যাত্রা করে। সামনে থাকেন খালিদ (রা) ও ইরাকের কোর। শহরে পৌঁছে খালিদ (রা) দেখতে পান যে, একটি শক্তিশালী রোমান বাহিনী তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি দ্রুত একটি প্রচণ্ড আঘাত হেনে তাদেরকে দুর্গের ভেতরে ঠেলে দেন। রোমানগণ হেরাক্লিয়াসের নির্দেশ, "প্রত্যেকটি ঠাণ্ডা দিনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো," অনুসরণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু খালিদের সংগে প্রথম দিনের সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা থেকে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, বরং শীতই তার কাজ করতে থাকুক। রোমানগণ দুর্গে প্রবেশ করে গেট বন্ধ করলে আবু উবায়দা (রা) হেম্‌সে পৌঁছে মুসলিম বাহিনীকে চারভাগে বিভক্ত করে হেম্‌সের চারটি গেটের সম্মুখে মোতায়েন করেন। হেম্‌স ছিল দুর্গ পরিবেষ্টিত গোলাকৃতির শহর যার ব্যাস ছিল এক মাইলের কম এবং শহরটি ছিল একটি প্রশস্ত পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। দুর্গের ভিতরে অবস্থিত টিলার উপরেও একটি নগরদুর্গ ছিল। শহরের বাইরে বিস্তৃত উর্বর সমতল ভূমি যা শুধু পশ্চিম দিকে অরোন্টেস (বর্তমানে আসি) নদী দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।[৩৫৯]

---

৩৫৮. তাবারী ঃ তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৬-৯৭।

৩৫৯. দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের মাসদুদ গেটটি এখনও বিদ্যমান। হেমস পরিদর্শনকারীদেরকে ট্যাডমুর (উত্তর-পূর্ব), ডুরেইব (পূর্ব) এবং হুদ (পশ্চিম) নামক অন্য তিনটি গেটের স্থান দেখানো হয়। বর্তমান অধিবাসীগণ রাস্তান নামের আরো একটি গেটের নাম শুনেছে যার অবস্থান জানা যায়

আবু উবায়দা খালিদ (রা) ও তাঁর গতিময় রক্ষীদলের সংগে নিয়ে বাস্তান গেটের অদূরে দুর্গের উত্তর দিকে অবস্থান নেন। এই অবরোধে মুসলমানদের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিল ১৫,০০০ যোদ্ধা। অপর পক্ষে দুর্গে ছিল ৮,০০০ রোমান সৈন্য। আবু উবায়দা (রা) এই অবরোধ অপারেশন পরিচালনার দায়িত্ব খালিদের উপরে ন্যস্ত করেন। এই অবরোধটি সংঘটিত হয় নভেম্বর মাসের শেষ অংশে অথবা ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে (শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি নাগাদ), এই সময় হেমসে প্রচণ্ড শীত পড়তে থাকে।

কোনো পরিবর্তনের লক্ষণ ছাড়াই দীর্ঘ দু'মাস ধরে অবরোধ চলে। প্রতিদিন কিছু তীর বিনিময় হলেও তা কোন পক্ষেই তেমন প্রভাব বিস্তার করে না। প্রচণ্ড শীতের মাঝে উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁবুতে অবস্থিত মুসলমানদের দুর্দশার কথা চিন্তা করে রোমানগণ উল্লাসে ফেটে পড়ে এই ভেবে যে, শীতের প্রচণ্ডতাই মরুচারী আরবদেরকে উচিত শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে মরুর বুকে ফিরে যেতে বাধ্য করবে। শীত মুসলমানদের জন্য কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল তবে রোমানগণ যতোটা কল্পনা করেছিল ততোটা নয়। তাদের সতর্ক অবস্থা ও মনোবলের মধ্যে কোনো দুর্বলতা ছিল না। তারা হেম্‌স দখলে ছিল বদ্ধপরিকর।

৬৩৬ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি নাগাদ (১৫ হিজরীর মুহাররম মাসের প্রথম দিকে) ইরাকের কোরকে সেখানে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ আসে। এই নির্দেশটির সংগে খালিদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ইরাকে সাদ-বিন-আবিওয়াক্কাস ও পারসিক জেনারেল রুস্তমের মধ্যে কাদিসিয়ার যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠেছিল এবং খলীফা চেয়েছিলেন ইরাকের বাহিনীকে সিরিয়া থেকে ফেরত পাঠিয়ে মুসলিম বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতে। সাদের বাহিনী ছিল রুস্তমের বাহিনীর তুলনায় কয়েক গুণ ছোট। উমর (রা) খালিদের ব্যাপারে নীরবতা পালন করেন এবং আবু উবায়দা (রা) বুঝতে পারেন যে, খলীফা (রা) চাননা খালিদ ইরাকের বাহিনীর সংগে ফেরত যাক।

বিপজ্জনক অগ্রযাত্রার মধ্য দিয়ে ইরাক হতে যে কোর সিরিয়ায় প্রবেশ করেছিল ইতিমধ্যে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সে সময় এই বাহিনীর প্রায় সব যোদ্ধাই ছিল আরবের মুহাজির, আনসার অথবা বেদুঈন। আজনাদীনের যুদ্ধের পর এই কোরের সদস্যদের দ্বারা গতিময় রক্ষীদল (Mobile Guard) গঠন করা হলে মূল কোরের ঘাটতি পূরণের জন্য ইয়েমেন ও হিজাজ থেকে যোদ্ধা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইরাকে নবদীক্ষিত মুসলমানদের মধ্য থেকে প্রধানত রাবীজা গোত্রের লোকেরাও এই

না। এটি হয়তো উত্তর দিকেই ছিল কেননা এই গেটটির মুখ ছিল রাস্তানের দিকে যা হামা সড়কের উপরে অবস্থিত। প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণ রাস্তানকে চারটি গেটের একটি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত নয় যে, উপরে উল্লেখিত চারটি গেটের কোনটি তখন ছিল না। প্রশস্ত পরিখাটির অস্তিত্ব এখনও জায়গায় জায়গায় দেখা যায়।

কোরে যোগদান করে।[৩৬০] হেম্‌স অবরোধের সময় খালিদ (রা)-এর কোরে ছিল ৪,০০০ যোদ্ধার গতিময় রক্ষীদল ও ইরাকের কোরের ৬,০০০ যোদ্ধা।

উমর (রা)-এর নির্দেশের প্রেক্ষিতে ইরাকের কোরকে দক্ষিণ-দিকে দাউমাত-উল-জান্দাল হয়ে ইরাকে প্রেরণ করা হয়। হাশিম ইবন উতবা ইবন আবীওয়াক্কাসের নেতৃত্বে কোরটি যাত্রা করে এবং কাকা বিন আমর নেতৃত্ব দেন অগ্রগামী দলের। এই কোরের বিদায়ের দৃশ্যটি ছিল খালিদের জন্য খুবই হৃদয়বিদারক এবং তিনি বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে বহু গৌরবময় বিজয়ের সাথী যোদ্ধাদেরকে বিদায় দান করেন। খালিদ (রা)-এর অধীনে আর কমান্ড করার মতো কোর থাকে না, শুধু গতিময় রক্ষী দলটি ছাড়া।[৩৬১]

রোমানগণ ইরাকের কোরের বিদায়ের দৃশ্য দেখে মনে করে যে, মুসলিমগণ শীতের প্রকোপে অতিষ্ঠ হয়ে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করছে। এতে তাদের মনের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু আরো কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন মুসলিম বাহিনীর বাকি অংশের কোনো চলাচল দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন তারা বুঝতে পারে যে, প্রতিপক্ষের অবরোধ প্রত্যাহারের কোনো পরিকল্পনা নেই। ইতিমধ্যে মার্চ মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেছে এবং শীতের প্রচণ্ডতাও কমে এসেছে। শীতের প্রকোপ মুসলমানদেরকে অবরোধ প্রত্যাহারে বাধ্য করবে বলে রোমানগণ যে আশা করেছিল তাও ব্যর্থ হয়ে যায়। তাদের রসদও কমতে থাকে। অপরপক্ষে বসন্তের আগমনের ফলে আবহাওয়ার উন্নতি হলে মুসলিম বাহিনীতে শক্তি সংযোজনের সম্ভাবনাও উপেক্ষা করা যায় না। যত দ্রুত সম্ভব কিছু একটা করা দরকার। স্থানীয় অধিবাসীগণ শান্তির পক্ষে হলেও হারবীস যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় প্রত্যাশী। সে দুর্গ হতে বের হয়ে মুসলমানদেরকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে। তার এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ অবরোধের সমাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়, যদিও তা তার প্রত্যাশা মাফিক নয়।

একদিন ভোর বেলা রাস্তান গেট খুলে গেলে হারবীস ৫,০০০ যোদ্ধা নিয়ে ঐ গেটের সম্মুখে অবস্থানকারী মুসলমানদের উপরে আকস্মিকভাবে চড়াও হয়। মুসলমানগণ এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারা দ্রুত গতিতে যুদ্ধের বিন্যাসে দাঁড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের এই দলটি অন্যান্য গেটে অবস্থান গ্রহণকারী দলগুলোর চেয়ে বড় হলেও হারবীসের আক্রমণের আকস্মিকতা ও তীব্রতার ফলে পিছু হটতে

---

৩৬০. তাবারী ঃ তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫২।

৩৬১. ইরাকের কোরের সিরিয়া ত্যাগের সময় নিয়ে মতবিরোধ আছে। এই সময়টি কাদিসিয়ার যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত এবং প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধটি সংঘটিত হওয়ার সময় হিসেবে কেউ মুহাররম, ১৪ হিজরী আবার কেউ মুহাররম ১৫ হিজরী উল্লেখ করেছেন। আমি মনে করি, মুহাররম ১৫ হিজরীতেই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল। ইরাকের কোর যুদ্ধের শেষদিনে কাদিসিয়ার প্রান্তরে উপস্থিত হয়।

বাধ্য হয়। কিছুদূর পিছু হটে মুসলমানগণ পুনরায় সংগঠিত হয়ে রোমান আক্রমণকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে কিন্তু প্রতিপক্ষের চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকলে সম্মুখ ভাগে ভাঙন আসন্ন হয়ে পড়ে।

আবু উবায়দা (রা) খালিদ (রা)-কে পরিস্থিতি মুকাবিলার দায়িত্ব প্রদান করেন। খালিদ (রা) তাঁর গতিময় রক্ষীদলসহ সামনে অগ্রসর হয়ে ভগ্নপ্রায় মুসলিম বাহিনীর কমান্ড গ্রহণ করে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য পুনর্গঠিত করেন। সকাল বেলার আকস্মিকতা ঠাণ্ডায় কাবু মুসলমানদের উপরে প্রচণ্ড বিরূপ চাপের সৃষ্টি করেছিল। খালিদ (রা)-কে কমান্ডার হিসেবে পেয়ে, কিছুটা সময় নিলেও তারা ক্রমান্বয়ে মানসিক শক্তি ফিরে পায় এবং একই গতিতে প্রতিঘাত করতে থাকে। এই অবস্থা দুপুর পর্যন্ত চলে। তারপর খালিদ (রা) প্রচণ্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে রোমানদেরকে ক্রমান্বয়ে পিছু হটতে বাধ্য করেন এবং সূর্যাস্ত নাগাদ তারা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। রোমানদের আক্রমণটি ব্যর্থ হলেও মুসলমানগণ হারবীস ও হেম্সের যোদ্ধাদের দক্ষতায় মুগ্ধ হয়।

পরদিন সকালে আবু উবায়দা (রা) যুদ্ধ পরিষদের সভা আহবান করেন। অফিসারগণের মধ্যে তিনি কিছুটা স্বাভাবিক উদ্দীপনার অভাব লক্ষ্য করেন। পূর্বের দিনের সকালের যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে পর্যাপ্ত দৃঢ়তার অভাব থাকায় তিনি তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ প্রসংগে খালিদ (রা) মন্তব্য করেন যে, তিনি পূর্বে বহুবার রোমানদের মুকাবিলা করেছেন কিন্তু হেমসের রোমানগণ সবচেয়ে সাহসী। এর প্রেক্ষিতে আবু উবায়দা (রা) জিঁজ্ঞেস করেন, "তাহলে আপনার পরামর্শ কি? ওহে সুলেইমানের পিতা ! আল্লাহ আপনার উপরে রহমত বর্ষণ করুন।"

"ওহে কমান্ডার", খালিদ উত্তর দান করুন, "আগামী কাল সকালে চলুন আমরা এই দুর্গ থেকে দূরে চলে যাই এবং .... ।"[৩৬২]

পরদিন ভোরবেলা রোমানগণ মুসলিম ক্যাম্পে বেশ তৎপরতা লক্ষ্য করে। তাঁবু গুটিয়ে উটের পিঠে বোঝাই করার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। তাদের চোখের সামনেই মুসলিম বাহিনীর প্রধান অংশ সবকিছু গুটিয়ে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে। তারা একটি ক্ষুদ্র অংশকে রেখে যায় পরিবারবর্গ, মালামাল ও পশুপালের চলাচলের তত্ত্বাবধান করার জন্য। রোমানগণ মুক্তির নিশ্বাস ফেলে। মুসলিমগণ অবরোধ প্রত্যাহার করে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেছে। শেষ পর্যন্ত শীত তাদেরকে তাড়াতে সক্ষম হলো। কিন্তু হারবীস যুদ্ধের অমীমাংসিত ফলাফলে সন্তুষ্ট থাকার মতো ব্যক্তি নয়। সে তার অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে যে, তার সামনে একটি সামরিক অভিযানের চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সে দ্রুত ৫,০০০ সৈন্য একত্র করে দুর্গ হতে বের হয়ে মুসলমানদের পিছু ধাওয়া করে। তারা দুর্গ হতে বের হয়ে প্রধান মুসলিম ক্যাম্পের

৩৬২. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা-১০৩।

দিকে অগ্রসর হলে মহিলা, মালামাল ও পশুপালের দেখাশুনায় নিয়োজিত মুষ্টিমেয় মুসলিম সবকিছু ফেলে দক্ষিণ দিকে ছুটতে থাকে।

হারবীস আপাতত ক্যাম্প আক্রমণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়, কেননা সে কাজ ফিরে এসেও করা যাবে। সে তার দ্রুতগামী অশ্বারোহীদল নিয়ে দক্ষিণদিকে প্রত্যাহারকারী মুসলমানদেরকে পিছন হতে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হয়। হেমস থেকে কয়েক মাইল দূরে মুসলমানদেরকে ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। তার সম্মুখবর্তী দল প্রতিপক্ষের উপরে আঘাত হানতে যাবে এমন সময় মুসলমানগণ আকস্মিকভাবে পিছনে ফিরে তাদের উপর এমন ক্ষীপ্রতার সংগে আক্রমণ করে যে, তারা স্বীয় অবস্থান ধরে রাখতে হিমশিম খেয়ে যায়। মুসলমানদের আক্রমণ শুরুর পরপরই খালিদ (রা) চিৎকার করে কি একটা নির্দেশ দান করেন এবং সংগে সংগে দু'টি অশ্বারোহী দল আলাদা হয়ে দু'দিকে ঘুরে রোমানদলের দু'বাহু অতিক্রম করে তাদের পিছন দিকে গিয়ে উপস্থিত হয়। পূর্বের দিনের যুদ্ধ পরিষদের সভায় খালিদের প্রস্তাবিত ও উপস্থিত সকলের অনুমোদিত পরিকল্পনা কাজ করেছে। রোমানগণ একটি শক্ত ইস্পাতের বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে। এই সংকটের মুহূর্তে হারবীসের মনে পড়ে সেই স্থানীয় ধর্মযাজকের কথা যে তাকে মুসলিমদেরকে ধাওয়া করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিল। ধর্মযাজক বলেছিল, "মসীহ্‌র নামে বলছি, এটা হচ্ছে আরবদের একটি চালাকী। আরবরা কখনও তাদের পরিবার ও উট পিছনে রেখে যায় না।"[৩৬৩] কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে।

মুসলিমগণ অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে সুসংগঠিতভাবে তরবারি ও বর্শা চালাতে চালাতে চারদিক থেকে চেপে আসতে থাকে। রক্তে ভেজা মাটির উপরে রোমানদের মৃতদেহ স্তূপের আকারে পড়তে থাকে। প্রথমদিকে রোমানগণ বন্যপ্রাণীর হিংস্রতা নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকে, কিন্তু ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণ যোদ্ধার মৃত্যুর ফলে তাদের চেহারায় হতাশা ও বিষাদ দেখা দেয়। খালিদ (রা) ডানে-বামে তরবারি চালাতে চালাতে একটি ক্ষুদ্র দলসহ রোমান বাহিনীর কেন্দ্রে চলে যান এবং দেখেন যে, হারবীস যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং সে যুদ্ধ ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। খালিদ (রা) হারবীসের দিকে অগ্রসর হলে একজন বিশাল আকৃতির রোমান জেনারেল তাকে বাধা দান করে। রোমানগণ জানে না যে, তারা মুসলমানদের হাত হতে পালাতে সক্ষম হলেও তাদের যাওয়ার কোনো জায়গা অবশিষ্ট নেই। রোমানদের বৃত্তের মধ্যে ফেলে চারদিক থেকে চাপ সৃষ্টির পাশাপাশি ৫০০ অশ্বারোহী সৈনিকের একটি দল মুয়াজ বিন জাবাল (রা)-এর নেতৃত্বে হেম্‌সে ফিরে যায় যাতে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলাতক রোমানগণ পুনরায় দুর্গে প্রবেশ করতে না পারে। অশ্বারোহী দলটি হেম্‌সের কাছাকাছি পৌঁছলে আতংকগ্রস্ত অধিবাসী ও অবশিষ্ট রোমানগণ, যারা মুসলিম

---

৩৬৩. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা-১০৪।

বাহিনীর পিছু ধাওয়া করেনি, দ্রুত দুর্গের মধ্যে প্রত্যাহার করে গেট বন্ধ করে দেয়। মুয়াজ (রা) দুর্গের গেটের সামনে তাঁর যোদ্ধাদেরকে মোতায়েন করেন। ফলে দুর্গ হতে রোমানদের বের হওয়ার বা হেমসের বাইরে থেকে এসে দুর্গে প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে যায়। মুসলিম ক্যাম্পও এখন নিরাপদ।

খালিদ (রা) ও উল্লেখিত বিশাল আকৃতির রোমান জেনারেল দ্বৈতযুদ্ধের জন্য মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুযায়ী রোমান জেনারেলটি সিংহের মতো গর্জন করতে থাকে।[৩৬৪] খালিদ (রা) সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রতিপক্ষের বর্মআবৃত মাথার উপরে তরবারি দিয়ে আঘাত করেন। তরবারিটি হেলমেট বিদ্ধ করতে সক্ষম না হয়ে ভেঙে দু'টুকরা হয়ে যায়। রোমান জেনারেল আঘাত করার পূর্বেই খালিদ (রা) কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেন। দুই বিশাল যোদ্ধা একে অপরকে নির্দয়ভাবে চেপে ধরে। এ যুদ্ধে খালিদ (রা) এমন কাজ করেন যা পূর্বে কখনও করেননি। তিনি প্রতিপক্ষের বুক এতো শক্তভাবে চেপে ধরেন যে, তার মুখ লাল হয়ে যায় এবং চাপ বৃদ্ধির সংগে সংগে তার নিশ্বাস নেয়াও বন্ধ হয়ে যায়। রোমানটি নিশ্বাস নেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চাপমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু খালিদের চাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং একসময় রোমানটির পাঁজরের হাড় ভেংগে মাংস ভেদ করে বের হয়ে যায়। প্রতিপক্ষের শরীরের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেলে খালিদ (রা) বাহুর চাপ আলগা করেন এবং একটি প্রাণহীন বিশাল দেহ মাটিতে পড়ে যায়। প্রকৃত পক্ষে খালিদ (রা) তাঁর প্রতিপক্ষকে দু'বাহুর চাপেই ধ্বংস করে ফেলেছেন।[৩৬৫] তিনি মৃত রোমান জেনারেলের তরবারিটি নিয়ে আবার যুদ্ধের হুংকার দিয়ে উঠেন।

এই সাময়িক প্রত্যাহারের পরিকল্পনাটি প্রণয়নের সময় খালিদ (রা) আবু উবায়দা (রা)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, "রোমানদেরকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা হবে," বাস্তবেও ঘটেছিল তাই। মাত্র শ'খানেক রোমান পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।[৩৬৬] অপরপক্ষে গোটা হেম্‌সের অপারেশনে মাত্র ২৩৫ জন মুসলিম নিহত হয়েছিল।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার সংগে সংগে মুসলমানগণ হেম্‌সে ফিরে দুর্গ অবরোধ করে। কিন্তু দুর্গে আশ্রয় গ্রহণকারী রোমানগণ কোনো ভাবেই যুদ্ধ করার মতো অবস্থায় ছিল না। স্থানীয় অধিবাসীগণ শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিলে আবু উবায়দা (রা) তা গ্রহণ করেন। আত্মসমর্পণের ঘটনাটি ঘটে ৬৩৬ খৃস্টাব্দের মধ্য মার্চ (১৫ হিজরীর শফর মাসের শুরুতে)। অধিবাসীগণ জনপ্রতি এক দিনার করে জিযিয়া প্রদান করলে হেম্‌সে শান্তি ফিরে আসে। মুসলিমগণ কোনো সম্পদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

---

৩৬৪. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা-১০২।
৩৬৫. পূর্বোক্ত।
৩৬৬. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা-১০৪।

হেম্‌সে আত্মসমর্পণের পর পরই মুসলমানগণ আলেপ্প ও আন্তাকিয়াসহ গোটা উত্তর সিরিয়া দখলের লক্ষ্যে যাত্রা করে। তারা হামা অতিক্রম করে শেইজারে পৌঁছে। সেখানে খালিদ (রা) রসদপত্রবাহী কিন্নাসরীন গামী একটি বহরকে আটক করেন। বন্দীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাতে মুসলিমগণ তাদের সম্মুখ যাত্রার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে।

হেরাক্লিয়াস এ যাবত মুসলমানদের বিরুদ্ধে যতোগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তার সবগুলোই ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর প্রতিটি বাহিনী, প্রতিটি ত্রাণবহর ও প্রতিটি দুর্গ, যা মুসলমানদের সম্মুখীন হয়েছে, প্রতিপক্ষের সামরিক দক্ষতার সামনে মাথা নত করেছে। শেষ চেষ্টা হিসেবে হেরাক্লিয়াস বিশাল সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে টর্ণেডোর গতিতে এমন একটি সর্বধ্বংসী আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা নিয়েছিল সময়মতো সতর্ক না হলে, যা মুসলমানদেরকে টুকরো টুকরো করে আরবের মরুভূমির বুকে ছুঁড়ে ফেলতো।

ইয়ারমুকের প্রান্তর

সিরিয়া এমন একটি রণক্ষেত্র যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষদুটোকে প্রবেশ করতে হয় দুই বিপরীত দিক থেকে। রণক্ষেত্রটির দু'দিকে বিস্তৃত দু'টি সমুদ্র। একদিকে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের পশ্চিমে বিস্তৃত ভূমধ্যসাগরের জলরাশি যা রোমান লেক নামে খ্যাত। অপরদিকে পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে বিস্তৃত নিষ্ফলা বালুর সমুদ্র মরুভূমি। রোমানগণ ভূমধ্যসাগরের বুকে নৌবহরে করে মুসলমানদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই মুক্তভাবে ঘুরাফিরা করতে সক্ষম। একইভাবে রোমান হস্তক্ষেপ ছাড়াই মুসলমানগণও মরুসমুদ্রের বুকে উটের বহরে করে চলাচল করতে সক্ষম। সমুদ্রে অভিযান চালিয়ে রোমানদের চলাচলে বাধাদানে মুসলমানরা সক্ষম ছিল না। আবার রোমানদেরও উপায় ছিল না মরুর বুকে গিয়ে মুসলিম বহরের তৎপরতায় হস্তক্ষেপ করার। রণক্ষেত্রটির অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের কারণে উভয় পক্ষ খুব স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারতো।

সিরিয়ার রণক্ষেত্রে সৈন্য মোতায়েনের বেলায় উভয় বাহিনীর জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক এলাকা ছিল আপন সমুদ্র তীর। এতে সুবিধা ছিল যে, প্রয়োজনে পিছনে বিস্তৃত নিজ সমুদ্রে নিরাপদে আশ্রয় নেয়া যেতো। আবার যুদ্ধে বিজয় লাভ করলে পলাতক শত্রুকে স্বীয় সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বেই ধাওয়া করে ধ্বংস করা যেতো। অবশ্য এক্ষেত্রে মুসলমানগণই ছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে। কেননা তারা পরাজিত হলে ধনসম্পদ বা ভূমি না হারিয়ে নিরাপদে মরুর বুকে আশ্রয় নিতে পারতো। রোমানগণের পক্ষে সহজে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার উপায় ছিল না। কেননা ক্ষেত্রটি ছিল তাদের নিজেদের সাম্রাজ্য এবং যে কোনো মূল্যে তা রক্ষা করাই তাদের দায়িত্ব। সিরিয়ার রণক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় অপারেশনটির পরিকল্পনা প্রণয়নকালে হেরাক্লিয়াসের চিন্তায় এই তথ্যটি ছিল যে, মুসলমানগণ সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে যুদ্ধ করবে।

হেরাক্লিয়াস সিংহাসনে আরোহণ করেন ৬১০ খৃস্টাব্দে। তখন পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের অবস্থা ছিল খারাপের দিকে। সাম্রাজ্যের সীমানা ছিল মাত্র কনস্টান্টিনোপলের আশেপাশের এলাকা এবং গ্রীস ও আফ্রিকার অংশ বিশেষের মধ্যে সীমিত। প্রথমে তাকে অনেক তিক্ততার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হলেও শেষ পর্যন্ত ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় এবং প্রায় দুদশকের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে সাম্রাজ্য পূর্বের

মহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হেরাক্লিয়াস উত্তরের বর্বর আক্রমণকারী, ককেশীয়, তুর্কী ও সুসভ্য পারস্য সাম্রাজ্যের রাজকীয় বাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। শুধু প্রচণ্ড যুদ্ধ নয়, এই শক্তিগুলোকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাহলো তার দক্ষ যুদ্ধকৌশল ও সৈন্যবাহিনীর মজবুত সংগঠন। হেরাক্লিয়াসের যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত ধারণা ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং তার অপরিসীম সাংগঠনিক দক্ষতার কারণেই পশ্চিম ইউরোপের ফ্রাংক থেকে শুরু করে দক্ষিণ ককেশাসের আর্মেনিয়াসহ এক ডজনেরও বেশি জাতি-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশাল সুসংগঠিত রোমান বাহিনী মাঠে নামানো সম্ভব হয়েছিল।

হেরাক্লিয়াসকে আবার সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এবারের অভিজ্ঞতার সবচেয়ে তিক্ততর দিক হলো রোমানগণ যে জাতিটিকে সবসময় অসভ্য ও পশ্চাদপদ ভেবে আসছে তাদের হাতেই বিশাল রোমান সাম্রাজ্য তছনছ হতে যাচ্ছে। তারা কখনই ভাবেনি যে, মরুচারী আরবদের পক্ষ হতে রোমান সাম্রাজ্যের উপরে কখনো কোনো প্রকার হুমকি আসতে পারে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে এযাবত গৃহীত সম্রাটের প্রত্যেকটি উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রথম রোমান উদ্যোগ ব্যর্থ হয় আজনাদাইনের প্রান্তরে। রোমানগণ পরিকল্পনা করেছিল পিছন দিক হতে আঘাত হেনে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করবে। কিন্তু খালিদের তৎপরতায় তা ব্যর্থ হয় এবং আজনাদাইনের প্রথম যুদ্ধে রোমান বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। হেরাক্লিয়াস দামেশকে একটি মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন মুসলিম অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে। দামেশকে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থাও সম্রাট করেছিলেন। কিন্তু তার কোনো প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। পরবর্তীতে মুসলমানদেরকে পিছন হতে আক্রমণের জন্য বেনইসানের সৈন্য সমাবেশও শুরাহবীলের হাতে পর্যুদস্ত হয়। দামেস্ক নগরী পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাও আবু উবায়দা (রা) ও খালিদ (রা)-এর হাতে ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয় সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এখন রীতিমতো কোণঠাসা অবস্থায়। কেননা মুসলমানগণ একের পর এক বিজয়ের মাধ্যমে প্রায় সমগ্র প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়ার সুদূর উত্তরের হেম্‌স পর্যন্ত দখল করে নিয়েছে।

হেরাক্লিয়াস বিশাল আকারের সৈন্য সমাবেশের মাধ্যমে একটি ব্যাপক প্রতিআক্রমণ রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তার রোমান বাহিনীর আকার হবে এতো বিশাল সিরিয়া পূর্বে যা কখনো প্রত্যক্ষ করেনি এবং এই বাহিনীর সাহায্যে মুসলমানদেরকে এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হবে যাতে কেউ পালিয়ে মরুর বুকে যেতে না পারে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত পরাজয়ের গ্লানিকে বিজয়ের গৌরবে পরিণত করা।

৬৩৫ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে মুসলমানদের হেম্‌স অবরোধকালে হেরাক্লিয়াস তার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেন। সাম্রাজ্যের প্রতিটি এলাকা হতে প্রত্যেকটি বাহিনীকে একত্র করা হয় এবং এতে যোগদান করে যুবরাজ ও ধর্মযাজকগণ এবং মহত ব্যক্তিবর্গ। ৬৩৬ খৃস্টাব্দের মে মাসের মধ্যে ১,৫০,০০০

সৈন্যের একটি বাহিনী সংগঠিত এবং আন্তাকিয়া ও সিরিয়ার উত্তর অঞ্চলে একত্রিত হয়। এই শক্তিশালী বাহিনীতে সমবেত হয় রুশ, স্লাভ, ফ্রাংক, রোমান, গ্রীক, জর্জীয়, আর্মেনীয় ও আরব খৃস্টানগণ।[৩৬৭] বায়যান্টাইন সম্রাজ্যে বসবাসকারী প্রত্যেকটি জাতি-গোষ্ঠী এই নতুন বাহিনীতে যোদ্ধা প্রেরণ করে খৃস্টীয় ধর্মযুদ্ধের প্রেরণা নিয়ে। এই শক্তিকে ৩০,০০০ সৈন্যের পাঁচটি বাহিনীতে বিভক্ত করা হয়। এই বাহিনীগুলোর কমান্ডারগণ হলো আর্মেনিয়ার রাজা মাহান, জনৈক রুশ যুবরাজ কানাতীর, গ্রেগরী, দীরজান ও আরব ঘাসানদের রাজা জাবালা ইবনুল আইহাম। মাহানের[৩৬৮] অধীনে ছিল শুধু আর্মেনীয় বাহিনী, জাবালা কমান্ড করে আরব খৃস্টান বাহিনী এবং রুশ ও স্লাভগণকে কমান্ড করে কানাতীর। বাকি দলগুলোর (ইউরোপীয়) কমান্ড লাভ করে গ্রেগরী ও দীরজান।[৩৬৯] রাজকীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয় মাহান।

এই সময় মুসলমানগণ বিভক্ত ছিল চারটি দলে ঃ আমর ইবনুল আস প্যালেস্টাইনে, শুরাহ্বীল জর্দানে, ইয়াযীদ ক্যাসেরীয়ায় এবং আবু উবায়দা ও খালিদ হেম্‌স ও আরো উত্তরে। এই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মুসলিম বাহিনী এমন নাজুক পরিস্থিতিতে ছিল যে, তাদের প্রত্যেকটি দলকে একের পর এক আক্রমণ করে বড় ধরনের বাধা ছাড়াই ধ্বংস করা ছিল খুবই সহজ ব্যাপার। হেরাক্লিয়াস এই পরিস্থিতিতে সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে উল্লেখিত সৈন্য সমাবেশ ঘটান।

ক্যাসেরীয়ায় ৪০,০০০ রোমান সৈন্যের সমাবেশ ঘটানো হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ইয়াযীদকে ব্যস্ত রাখা যাতে তিনি আর অন্যদের সংগে যোগদান করতে না পারেন। রাজকীয় বাহিনীর বাকি অংশ নিম্নে বর্ণিত পরিকল্পনা অনুযায়ী অপারেশনে অংশগ্রহণ করবে ঃ

ক. কানাতীর উপকূলীয় পথ ধরে বৈরুত পর্যন্ত অগ্রসর হবে। তারপর পশ্চিম দিক থেকে দামেস্কে অগ্রসর হয়ে আবু উবায়দাকে বিচ্ছিন্ন করবে।

খ. জাবালা আলেপ্প থেকে সোজা রাস্তা ধরে হামা হয়ে হেম্‌স যাত্রা করবে এবং হেম্‌স এলাকায় মুসলিম বাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে ব্যস্ত রাখবে। আরব মুসলমানদের উপরে প্রথম আঘাত হানবে আরব খৃস্টানগণ। এই প্রসংগে হেরাক্লিয়াস জাবালাকে বলেছিলেন, 'ইস্পাত দিয়েই ইস্পাত কাটতে হয়।'[৩৭০]

গ. দীরজান আলেপ্প ও উপকূলীয় এলাকার মধ্যবর্তী সড়ক দিয়ে অগ্রসর হবে এবং জাবালার সংগে সম্মুখ যুদ্ধে ব্যস্ত মুসলিম বাহিনীকে পার্শ্বদেশ দিয়ে আক্রমণ করবে।

---

৩৬৭. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা-১০০।

৩৬৮. এই রাজা বাহান নামেও পরিচিত।

৩৬৯. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা-১০৬।

৩৭০. পূর্বোক্ত।

ঘ. গ্রেগরী উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে হেম্‌স যাত্রা করবে এবং দীরজানের আক্রমণের সংগে সংগে মুসলমানদের ডান বাহুর উপরে চড়াও হবে।[৩৭১]

ঙ. মাহানের বাহিনী আরব খৃস্টানদের পিছনে যাত্রা করবে এবং মজুদ হিসেবে কাজ করবে।

এভাবে হেম্‌সে মুসলিম বাহিনীকে প্রায় দশগুণ বড় বাহিনী দ্বারা চারদিক থেকে আক্রমণ করে গিলে ফেলার পরিকল্পনা করা হয়। (১৯ নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য) খালিদ নিশ্চয় এতো বড় আঘাত প্রতিহত করার শক্তি রাখে না। অতএব হেম্‌সে মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংস করার পর রাজকীয় বাহিনী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হবে। একই সময়ে ক্যাসেরীয়া হতেও রোমান বাহিনী উপকূলীয় এলাকা ধরে সামনে অগ্রসর হবে। তারপর একের পর এক মুসলিম কোরগুলোকে বহুগুণে বেশি সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে ধ্বংস করা হবে।

রাজকীয় বাহিনীর বিজয়কে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাম্রাজ্যব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। জেনারেল ও ধর্মযাজকগণ যোদ্ধাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে বিদেশী আক্রমণের হাত হতে স্বীয় বিশ্বাস ও জন্মভূমিকে রক্ষার মরণপণ যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য। এই মহা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬৩৬ খৃস্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি নাগাদ রাজকীয় বাহিনীর অভিযান শুরু হয়।

জাবালার বাহিনীর অগ্রবর্তী দল হেম্‌সে পৌঁছে সেখানে কোনো মুসলমানকে খুঁজে পায় না। কানাতীরের বাহিনী খুব উল্লসিতচিত্তে দামেশকে ফাঁদে পড়া মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার বাসনা নিয়ে পশ্চিম দিক হতে আঘাত হানে। কিন্তু দামেশ্‌ক ও তার উত্তর অঞ্চলে একটি মুসলিম যোদ্ধাকেও দেখা যায় না। পাখি উড়ে গেছে।

শেইজারে রোমান বন্দীদের নিকট হতে মুসলমানগণ প্রথম হেরাক্লিয়াসের ব্যাপক সমর প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে পারে। মুসলিমগণ একটি চমৎকার গোয়েন্দা ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে প্রতিপক্ষের যে কোনো ধরনের চলাচল ও সমাবেশের খবর তাদের নিকট পৌঁছে যেতো। সময় অতিবাহিত হওয়ার সংগে সংগে প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদনসমূহ একত্র করে মুসলমানগণ রোমান বাহিনীর তৎপরতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেয়ে যায়। এমনকি ক্যাসেরীয়ায় রোমানদের শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা ও সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কেও তারা জানতে পারে।

বিভিন্ন দলে বিভক্ত মুসলিম বাহিনীর অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে সংকটময় হয়ে উঠতে থাকে। খালিদ (রা) তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সামরিক প্রজ্ঞা দ্বারা

---

৩৭১. ওয়াকিদী ঃ (পৃষ্ঠা-১০৭) বর্ণনা অনুযায়ী গ্রেগরী ইরাক হতে হেম্‌স যাত্রা করেছিল। এই সময়ে প্রায় গোটা পশ্চিম ইরাক ছিল মুসলমানদের হাতে। কাজেই উল্লেখিত পথটি অধিকতর সম্ভাব্য বলে মনে হয়।

হেরাক্লিয়াসের মহাপরিকল্পনা বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারেন যে, হেম্স ও শেইজারে মুসলিম বাহিনীর অবস্থা খুবই বিপজ্জনক। এই পরিস্থিতিকে মুকাবিলার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো উত্তর ও মধ্য সিরিয়া এমনকি পালেস্টাইন হতে ও সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহার করে এক জায়গায় সমবেত করা যাতে রোমান সমাবেশের বিরুদ্ধে একটি অর্থবহ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যায়। খলিদ (রা) আরো উপলব্ধি করেন যে, মুসলিম বাহিনীর এই সমাবেশ হওয়া উচিত বন্ধুপ্রতীম মরুভূমি থেকে অনতি দূরে। খালিদ (রা) এই মর্মে পরামর্শ প্রদান করলে সর্বাধিনায়ক আবু উবায়দা (রা) তা গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম বাহিনী প্রত্যাহার করে সিরিয়া, জর্দান ও প্যালেস্টাইন হতে আগত রাস্তাসমূহের মিলনকেন্দ্র জাবিয়ায় সমবেত হওয়ার নির্দেশ দান করেন। তিনি সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়কত্বের ক্ষমতা প্রয়োগ করে শুরাহবীল, ইয়াযীদ ও আমর ইবনুল আস (রা)-কে তাদের দখলীকৃত ভূমি ত্যাগ করে জাবিয়ায় একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দান করেন। ফলে রোমানগণ দামেস্কে পৌঁছার পূর্বেই আবু উবায়দা ও খালিদ (রা) এবং ইয়াযীদ তাঁর কোরসহ জাবিয়ায় পৌঁছে যান। অন্যরাও তখন জাবিয়ার পথে। তাঁরা মৃত্যুর থাবা থেকে নিজেদেরকে নিরাপদে প্রত্যাহার করতে সক্ষম হয়।

মুসলিম বাহিনী হেম্স ত্যাগের প্রাক্কালে আবু উবায়দা (রা) স্থানীয় অধিবাসীদের সংগে যে মহানুভব আচরণ প্রদর্শন করেন তা থেকেই এই মহত ও সাহসী জেনারেলের চরিত্র উপলব্ধি করা যায়। হেম্স দখলের পর নিরাপত্তার বিনিময়ে অমুসলিমদের নিকট হতে জিযিয়া কর সংগ্রহ করা হয়েছিল। এখন মুসলনামগণ শহর ত্যাগ করছে এবং আর কোনোভাবেই স্থানীয় অধিবাসীদের নিরাপত্তা বিধানে সক্ষম নয়। তাই আবু উবায়দা (রা) তাদের সভা ডেকে জিযিয়া হিসেবে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ ফেরৎ দান করেন। তিনি বলেন, "আমরা আর তোমাদের নিরাপত্তা বিধানে সক্ষম নই। এখন হতে তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের।" এর জবাবে জনগণ বলে, "আমরা যে দমন নীতি ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে বাস করি তার তুলনায় আপনাদের শাসন ও ন্যায়-নীতি আমাদের নিকট অনেক প্রিয়।"[৩৭২] হেমসের ইহুদীরা সবচেয়ে বেশি আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, শক্তিপ্রয়োগ ব্যতীত হেরাক্লিয়াসের কোনো অফিসার শহরে প্রবেশ করতে পারবে না। শুধু নিজের প্রদেশে জিযিয়া ফেরৎ দিয়ে আবু উবায়দা (রা) স্বস্তি বোধ করতে পারেন না। তিনি অন্যান্য প্রদেশের গভর্নরদেরকেও একই নির্দেশ দান করেন। প্রত্যেকটি কোর কমান্ডার জাবিয়ায় প্রত্যাহারের পূর্বে স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হতে সংগৃহীত জিযিয়া তাদের নিকট ফেরৎ দান করে।[৩৭৩] একটি বিজয়ী শক্তি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গৃহীত কর বিজিত শক্তির নিকট স্বেচ্ছায় ফেরৎ দানের ঘটনা ইতিহাসে পূর্বেও ঘটেনি এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে না।

---

৩৭২. বালাযুরী ঃ পৃষ্ঠা-১৪৩

৩৭৩. আবু ইউসুফ ঃ পৃষ্ঠা-১৩৯।

ম্যাপ ১৯ : ইয়ারমুকের যুদ্ধের পূর্বে রোমান তৎপরতা
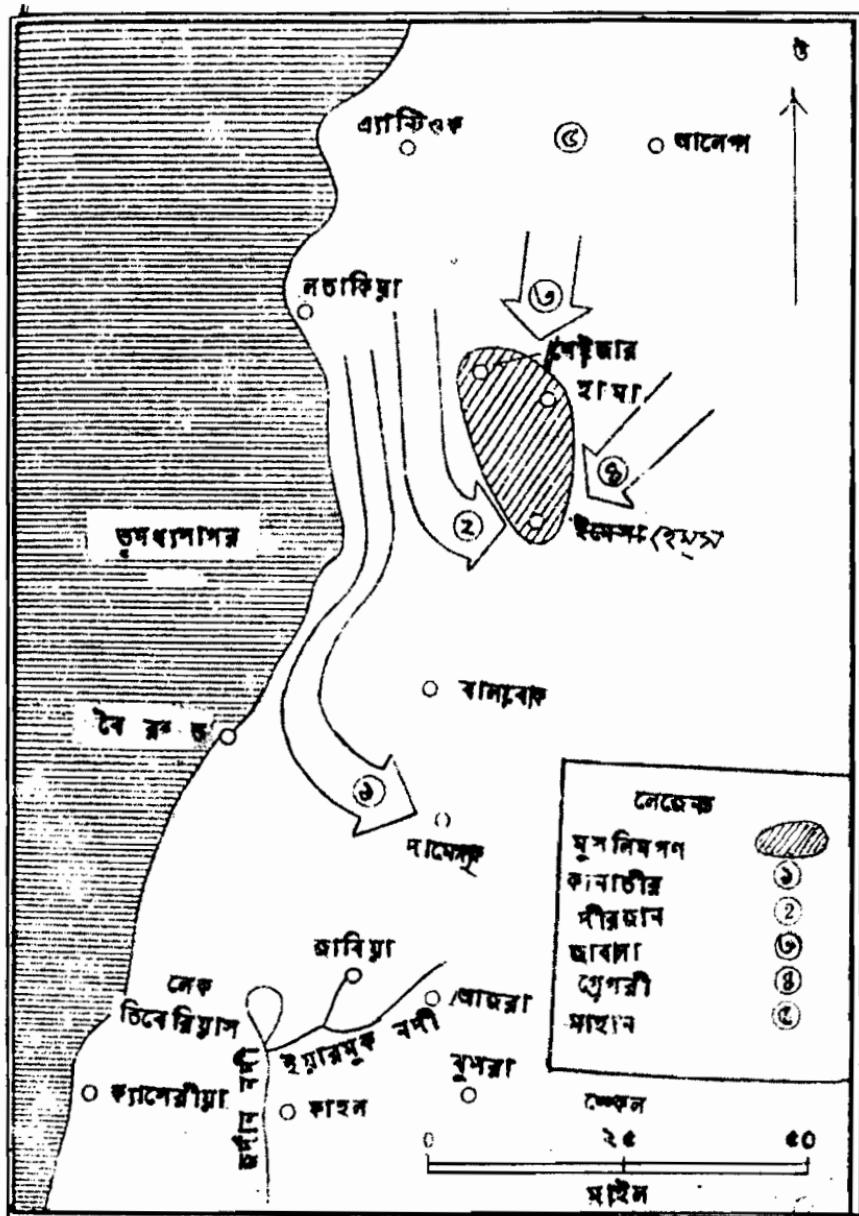
৬৩৬ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসের মাঝামাঝি নাগাদ আরব খৃস্টানদের দ্বারা গঠিত রাজকীয় বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের সংগে দামেস্ক ও জাবিয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের এক অংশের মুকাবিলা হয়। আবু উবায়দা (রা) খুবই উদ্বেগের সংগে সময় অতিবাহিত করছেন। এমন একটি যুদ্ধ আসন্ন যা সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর ভাগ্য নির্ধারণ করবে। শত্রু সৈন্যের সংখ্যা ২,০০,০০০ বলে মুসলিমগণ জানতে পারে। যা একটি ভয়ংকর স্বপ্নের মতো মনে হয়। আবু উবায়দা (রা) নিজের জন্য নয় বরং মুসলিম ও বাহিনী তথা মুসলমানদের স্বার্থের জন্য উদ্বিগ্ন। তিনি তাঁর অফিসারগণকে শত্রুর তৎপরতা ও সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাদের সম্মতি গ্রহণের জন্য একটি সভা ডাকেন।

অফিসারগণ নীরবে বসে থাকেন, যেন আসন্ন পরিস্থিতি মুকাবিলার কোনো উপায় তাঁদের হাতে নেই। একজন প্রস্তাব করে যে, আপাতত আরবে ফিরে যাওয়া হোক এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার সিরিয়ায় পুনঃপ্রবেশ করা যাবে। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়–কেননা তা সিরিয়ায় সমস্ত বিজয়কে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার শামিল হয়। অনেকে আল্লাহর উপর ভরসা করে জাবিয়ায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দান করে। উপস্থিত অধিকাংশ অফিসার এই প্রস্তাব সমর্থন করে। সভায় উপস্থিত অফিসারদের মধ্যে কোনো আনন্দময় উদ্দীপনা ছিল না বরং ছিল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্মম প্রতিজ্ঞা, প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জনের নিষ্ঠুর প্রত্যয়।

এই আলোচনা চলাকালে খালিদ (রা) নিশ্চুপ ছিলেন। আবু উবায়দা (রা) তাঁর দিকে ফিরে বলেন, "ওহে সুলাইমানের পিতা! আপনি হচ্ছেন সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষ একজন সাহসী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। আলোচ্য বিষয়ে আপনার মতামত কি?"

"তারা যা বলছে তা ভাল", খালিদ (রা) উত্তর দান করেন, "আমার ভিন্ন মত আছে তবে তা মুসলমানদের মতামতের বিরোধী নয়।"

"আপনার ভিন্ন কোনো মতামত থাকলে বলুন। আমরা তাই করার চেষ্টা করবো," আবু উবায়দা (রা) বলেন।

খালিদ (রা) তাঁর পরিকল্পনা বর্ণনা করেন, "শুনুন, হে কমান্ডার ! বর্তমান অবস্থানে থেকে যুদ্ধ করলে আপনি নিজের বিরুদ্ধে শত্রুকে সাহায্য করবেন। এইতো অনতি দূরেই, অর্থাৎ ক্যাসেরীয়ায় হেরাক্লিয়াসের পুত্র কনস্টান্টাইনের নেতৃত্বে ৪০,০০০ রোমান সৈন্য প্রস্তুত অবস্থায় আছে।[৩৭৪] আমি আপনাকে এখান থেকে প্রস্থান করে আজরাকে পিছনে ফেলে ইয়ারমুকে অবস্থান গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছি। এতে খলীফার পক্ষেও নতুন সৈন্য প্রেরণের সুবিধা হবে এবং সম্মুখে থাকবে বিশাল সমতল ভূমি যা অশ্বারোহী সৈন্য পরিচালনার জন্য খুবই উপযোগী।

৩৭৪. গিবনের মতে, (পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৩) কনস্টান্টাইন ছিল হেরাক্লিয়াসের বড় ছেলে।

খালিদ (রা) আর একটি বিষয় স্পষ্ট করে না বললেও তা তাঁর চিন্তার মধ্যে ছিল। তাহলো, জাবিয়ায় অবস্থানকালে মুসলিম বাহিনী উত্তর সিরিয়া হতে আগত রোমান বাহিনীকে মুকাবিলারত থাকা অবস্থায় কনস্টান্টাইন সহজেই তাদের পিছন দিক থেকে আক্রমণ করতে পারতো। পরিকল্পনাটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং সংগে সংগে তৎপরতা শুরু হয়। খালিদ (রা) তাঁর ৪,০০০ গতিময় রক্ষীদল নিয়ে পশ্চাৎরক্ষীদলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি জাবিয়ায় না থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে রোমান বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তিনি প্রচণ্ড আঘাত হেনে তাদের অগ্রবর্তীদলকে দামেশক ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। এতে রোমানগণ সতর্ক হয়ে যায় এবং তাঁরা আর মুসলমানদের প্রত্যাহারে বাধা দান করেনি। কয়েকদিন পর খালিদ (রা) প্রধান বাহিনীর সংগে পুনরায় যোগদান করেন।

মুসলমানগণ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কয়েক মাইল গিয়ে ইয়ারমুকের সমতল প্রান্তরের পূর্ব প্রান্তে সারিবদ্ধভাবে ক্যাম্প স্থাপন করেন। এই ক্যাম্পগুলোর সঠিক অবস্থান জানা না গেলেও তা যে বর্তমানের নাওয়া–শেখ মিসকীন রেখার দক্ষিণ বরাবর উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ করে অবস্থিত ছিল সেটা অনুমান করা যায়। কেননা এতে মুসলমানগণ উত্তরের জাবিয়ার দিক হতে ও উত্তর-পশ্চিমের কুনেত্রার দিক হতে আগত রোমান আক্রমণকে মুকাবিলার জন্য সহজে মোতায়েন হতে পারতো। এখানে আবু উবায়দার সংগে যোগদান করে শুরাহবীল, আমর ইবনুল আস ও ইয়াযীদের কোরসমূহ। মুসলমানদের অবস্থানের কিছু দূরে পূর্ব দিকে অবস্থিত লাভা পাহাড় সারি যা উত্তর থেকে আজরার পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বুসরার উত্তর ও পূর্ব দিকে বিস্তৃত জবাল-উদ-দ্রুজ পাহাড় সারি।

কয়েকদিন পরে জাবালার আরব খৃস্টানদের দ্বারা গঠিত ও হালকাভাবে সজ্জিত রোমান বাহিনীর অগ্রবর্তী দল সামনে অগ্রসর হয়ে ইয়ারমুকের সমতল ভূমিতে মুসলিম বাহিনীর পর্যবেক্ষণ ফাঁড়ির প্রহরীর সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মূল রোমান বাহিনীর আগমনের রাস্তার কোনো সঠিক উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে তা যে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে হবে তা প্রায় নিশ্চিত। কেননা তারা ক্যাম্প স্থাপন করেছিল ওয়াদী-উর-রাক্কাদের উত্তরে। খালিদের সংগে জাবিয়ার পথে সংঘর্ষের পর হয়তো তারা পথ পরিবর্তন করে ছিল। রোমান ক্যাম্পের বিস্তৃতি ছিল ১৮ মাইল। মুসলিম ক্যাম্প বিস্তৃত ছিল ইয়ারমুকের সমতল ভূমির কেন্দ্র ও কেন্দ্রের পশ্চিম এলাকা জুড়ে।[৩৭৫] রোমানদের আগমন ও ক্যাম্প স্থাপনের ফলে রোমান আক্রমণের দিক সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আবু উবায়দা (রা) ইয়ারমুক-জাবিয়া সড়ক বরাবর বিস্তৃত

---

৩৭৫. ওয়াকিদীর মতে (পৃষ্ঠা-১০৯) রোমান ক্যাম্পের অবস্থান ছিল জাউলানের নিকট (যাওয়াদি-উর-রাক্কাদ ও তিবেরিয়াস লেকের মধ্যবর্তী ও উত্তরের এলাকা নিয়ে গঠিত। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ক্যাম্পের মধ্যবর্তী দূরত্ব ছিল ১১ মাইল)

যুদ্ধের সম্মুখ রেখার সংগে সংগতি রেখে মুসলিম ক্যাম্প পুনর্বিন্যাস করেন। খালিদের পরামর্শও ছিল তাই ঃ পিছনে আজরা এবং পাশে ইয়ারমুককে রেখে অবস্থান গ্রহণ।

দুই বাহিনী তাদের ক্যাম্পে থেকে এলাকা পরিদর্শন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, নির্দেশ প্রদান, অস্ত্রশস্ত্র পরিদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। মুসলমানদের সামনে রোমান বাহিনীকে মনে হচ্ছিল পংগপালের ঝাঁকের মতো।[৩৭৬]

রোমানদের ক্যাম্প স্থাপন শেষ হতে না হতেই সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নির্দেশ নিয়ে দূত এসে সর্বাধিনায়ক মাহানকে জানায় যে, শান্তি স্থাপনের সমস্ত উদ্যোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সম্রাট যুদ্ধ শুরু করতে নিষেধ করেছেন। মুসলমানগণ আরবে ফিরে গেলে এবং আর ফিরে না আসার প্রতিশ্রুতি দিলে মাহান যেন যে কোনো সহজ শর্তে রাজী হয়। সম্রাটের এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে মাহান তার একজন বাহিনী কমান্ডার, গ্রেগরীকে মুসলমানদের সংগে শান্তি আলোচনার জন্য প্রেরণ করে। গ্রেগরী মুসলিম ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে আবু উবায়দার সংগে আলোচনা করে। রোমানদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব দেয়া হয় যে, মুসলমানগণ এ যাবত সিরিয়ায় যা কিছু অর্জন করেছে সব নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আরবে ফিরে যেতে পারবে যদি তারা আবার সিরিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে। আবু উবায়দা (রা) এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে রোমান জেনারেল শূন্যহাতে ফিরে যায়।

পরবর্তী চেষ্টা হিসেবে মাহান জাবালাকে মুসলিম ক্যাম্পে প্রেরণ করে। তার ধারণা, একজন আরব হিসেবে জাবালা হয়তো মুসলমানদের শান্তিপূর্ণভাবে সিরিয়া ত্যাগে রাজী করাতে পারবে। জাবালাও সাধ্যমতো চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

মাহান বুঝতে পারে যে, একটি যুদ্ধ আসন্ন এবং তা এড়ানোর আর কোনো উপায় নেই। সে জাবালাকে তার আরব বাহিনীর বৃহত্তর অংশ নিয়ে মুসলমানদের উপরে একটি উস্কানিমূলক আক্রমণ (Probing Attack) পরিচালনার জন্য প্রেরণ করে। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীর সম্মুখভাগের শক্তি পরীক্ষা করে দেখা। এই কাজের জন্য অন্যদের তুলনায় হালকাভাবে সজ্জিত গতিময় আরব খৃস্টান যোদ্ধারাই ছিল বেশি উপযোগী। এই ঘটনাটি ঘটে ৬৩৬ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষের দিকে (১৫ হিজরীর জুমাদি-উল-আখিরের মাঝামাঝি নাগাদ)।

জাবালা তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের বিন্যাসে দেখতে পায়। জাবালা খুব সাবধানে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। তার উদ্দেশ্য হলো যতো কাছাকাছি সম্ভব অগ্রসর হয়ে একটি সাধারণ আক্রমণের নির্দেশ দান করবে। কিন্তু সে আক্রমণের নির্দেশ দান করার পূর্বেই দেখতে পায় যে, আল্লাহর তরবারির নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম অশ্বারোহী দল দ্বারা নিজেই আক্রান্ত হয়েছে। আরব খৃস্টানগণ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে প্রত্যাহার করে নেয়। মাহান বুঝতে পারে যে, মুসলিম বাহিনীর সংগে যুদ্ধ করা খুব সহজ ব্যাপার হবে না।

---

৩৭৬. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা-১১৮।

তারপর ইয়ারমুকের সমতল প্রান্তরে কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই প্রায় একমাস অতিবাহিত হয়। এই নিষ্ক্রিয়তার কারণ জানা যায় না। তবে আমরা অনুমান করতে পারি মুসলিম বাহিনী বিশাল রোমান বাহিনীর প্রাথমিক আক্রমণের মুকাবিলা করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না এবং রোমানগণ মুসলমানদেরকে আক্রমণ করার মতো যথেষ্ট সাহসী ছিল না। এই বিরতিকালটা মুসলমানদের জন্য খুবই সহায়ক হয়। এই সময় ৬,০০০ যোদ্ধার একটি নতুন দল, যাদের অধিকাংশই ইয়েমেন থেকে আগত, তাদের সংগে যোগদান করে। এর ফলে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় রাসূলে আকরাম (সা)-এর ১০০০ সহচরসহ ৪০০০০। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহচরদের মধ্যে ১০০ জন ছিলেন ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের মহান যোদ্ধা। এই বাহিনীতে আরো ছিলেন অনেক সম্ভ্রান্ত নাগরিক যেমন, যুবায়ের (রাসূলুল্লাহর চাচাতো ভাই ও সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের একজন), আবু সুফিয়ান ও তাঁর স্ত্রী হিন্দ।

জাবালার ব্যর্থ আক্রমণের এক মাস অতিবাহিত হলে মাহান পুনরায় আক্রমণ পরিচালনার জন্য যথেষ্ট সাহস বোধ করে। তবে তার পূর্বে সে শান্তি স্থাপনের আর একটি উদ্যোগ নিতে চায়। এবারে সে নিজেই আলোচনায় বসতে আগ্রহী। সে তার ক্যাম্পে একজন মুসলিম দূত প্রেরণের অনুরোধ জানায়। আবু উবায়দা (রা) কয়েকজন সংগীসহ খালিদ (রা)-কে প্রেরণ করেন। খালিদ ও মাহান রোমান ক্যাম্পে আলোচনায় মিলিত হয় কিন্তু কোনো পক্ষই ছাড় দিতে রাজী না হলে আলোচনা ফলশূন্য ভাবে শেষ হয়। মাহান খালিদ (রা)-কে তার বাহিনীর বিশালত্বের হুমকি দেয় এবং পাশাপাশি মদীনার খলীফাসহ প্রত্যেক মুসলিম সৈনিকের জন্য মোটা অংকের অর্থ প্রদানের প্রলোভনও দেয়। তাঁর এই হুমকি ও প্রলোভন খালিদের উপরে তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করে না বরং তিনি মাহানের নিকট তিনটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন। ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া প্রদান অথবা যুদ্ধ। আর্মেনিয়ার জেনারেল শেষ প্রস্তাবটি গ্রহণ করে।

প্রতীয়মান হয় যে, এই আলোচনার ফলে দুই কমান্ডার একে অপরের ব্যক্তিত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় এবং মুসলমানগণ মাহানকে একজন ভাল মানুষ হিসেবে মনে করতে থাকে। অবশ্য আবু উবায়দার একটি মন্তব্য ছিল এর ব্যতিক্রম, "শয়তান তার লক্ষ্য অর্জনে দক্ষ হয়।"[৩৭৭]

বিদায়ের মুহূর্তে দুই নেতা বুঝতে পারে যে, আলোচনার আর কোনো সুযোগ নেই। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেখান থেকে ফিরে আসার আর কোনো পথ নেই। পরদিনই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।

দিনের বাকি অংশে জোর তৎপরতা চলে। উভয় পক্ষ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে নির্দেশ জারি করা হয়। কোর ও রেজিমেন্টসমূহকে তাদের

৩৭৭. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা ঃ ১২৮।

নিজ নিজ অবস্থানে স্থাপন করা হয় যাতে আসন্ন যুদ্ধে স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে কারও মনে কোনো সন্দেহ না থাকে। অফিসারগণ সকলের অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা করে দেখেন।

উভয় পক্ষ স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা করে সত্যের পথে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য। রোমান পক্ষে ধর্মযাজকগণ ক্রুশ উত্তোলন করে সৈন্যদেরকে যীশুর নামে প্রাণ বিসর্জনের আহবান জানায়। হাজার হাজার খৃস্টান মৃত্যুর জন্য শপথ গ্রহণ করে। তারা জীবন বিসর্জন দেবে কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবে না।

দুই বাহিনীর মধ্যে বিস্তৃত ইয়ারমুকের সমতল ভূমি যার পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ সংযুক্ত হয়েছে গভীর উপত্যকার সংগে। পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ওয়াদিউর-রাক্কাদ যা ইয়াকুসার নিকটে ইয়ারমুক নদীর সংগে সংযুক্ত হয়েছে। এই স্রোতটি একটি খাড়া পাড় সমৃদ্ধ, যদিও উপরের দিকে ততোটা খাড়া নয়, গভীর উপত্যকার মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ১১ মাইল প্রবাহিত হয়েছে। কয়েক জায়গা দিয়ে উপত্যকাটি অতিক্রম করা গেলেও বর্তমানের কাফির-উল-মা গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত অগভীর অংশটিই পারাপারের জন্য ব্যবহার করা হতো। যুদ্ধক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকে ইয়ারমুক নদীর গভীর গিরিখাতটি জালীন হতে শুরু করে ১৫ মাইল আঁকাবাঁকা হয়ে চলে উয়াদি-উর-রাক্কাদ অতিক্রম করে তিবেরীয়াস লেকের (গ্যালিলী সমুদ্র) দক্ষিণে জর্দান নদীর সংগে মিলিত হয়েছে। জালীন হতে হারীর নামের একটি শাখা বের হয়ে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে ইয়ারমুক নদী নামে পরিচিত হয়েছে। উত্তরদিকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের পরেও সমতল ভূমি বিস্তৃত, পূর্ব দিকে যাওয়াদি-উর-রাক্কাদ হতে শুরু করে ৩০ মাইল দূরবর্তী আজরা পাহাড়ের তলদেশ পর্যন্ত দীর্ঘ। ইয়ারমুক সমতল ভূমির পশ্চিম ও মধ্য অংশই যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ইয়ারমুক যুদ্ধক্ষেত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ওয়াদি-উর-রাক্কাদ ও ইয়ারমুক নদীর উপস্থিতি। এই গিরিখাত দু'টির পাড় ছিল খুবই খাড়া ও ১০০ ফুট উঁচু যা পারাপারের জন্য ছিল দুর্গম্য। এই খাড়া পাড়গুলোকে আরও দুর্গম্য করেছে স্তূপ আকারে পড়ে থাকা শিলাখণ্ড। নদীর তলদেশ, পাড়ের মাঝামাঝি ও পাড়ের উপরে স্তূপ আকারে পড়ে থাকা শিলাখণ্ডের উচ্চতা কোথাও কোথাও ১০০ হতে ২০০ ফুট। গিরিখাত দু'টির সংযোগ স্থলে পাড়গুলো আরো অধিক খাড়া ও শিলাখণ্ডের উচ্চতাও বেশি। ফলে তা দ্রুত অতিক্রম করতে গেলে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই তা করতে হবে।

কৌশলগত দিক থেকে ইয়ারমুকের সমতল প্রান্তরের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড হচ্ছে বর্তমানের নাওয়া গ্রামের ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি পাহাড়, ম্যাপে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে সামীন। নাওয়ার উত্তর-পশ্চিমেও একটি পাহাড় ছিল, যার নাম জাবিয়া। তবে ইয়ারমুকের যুদ্ধে এই পাহাড়টির কোনো ভূমিকা ছিল না। সামীন পাহাড়ের উচ্চতা ছিল ৩০০ ফুট। এই চূড়াটি থেকে ইয়ারমুকের গোটা

সমতল প্রান্তরটি পরিষ্কারভাবে দেখা যেতো। ফলে সৈন্য মোতায়েনের সময় কোনো জেনারেলের পক্ষেই এই চূড়াটিকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়, যদি তিনি উক্ত এলাকায় প্রথম সৈন্য মোতায়েন করেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধের কারণে এই পাহাড়ের নাম হয় 'জমুয়া পাহাড়' (জমুয়া অর্থ সমাবেশ), কেননা মুসলিম বাহিনীর একটি অংশ এই পাহাড়ের উপরে সমবেত হয়েছিল। এছাড়া ইয়ারমুকের সমতল প্রান্তরের যুদ্ধকে প্রভাবিত করে এমন আর কোনো ভূখণ্ড ছিল না।

ইয়ারমুকের সমতল প্রান্তরটি ছিল উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে কিছুটা ঢালু এবং কোথাও কোথাও কিছুটা উঁচু-নীচু। এ্যালান নামের একটি ক্ষুদ্র নদী প্রান্তরটির মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে ইয়ারমুক নদীর সংগে মিলিত হয়েছে। এ্যালানের শেষ পাঁচ মাইল অংশ একটি গিরিখাতে রূপান্তরিত হয়েছিল যদিও তা চলাচলের জন্য এটি বড় বাধা ছিল না। এ্যালানের দক্ষিণ অংশ বাদে যুদ্ধক্ষেত্রটি ছিল পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী চলাচলের জন্য খুবই উপযোগী।

মাহান রাজকীয় বাহিনীকে এ্যালানের সামনে নিয়ে মোতায়েন করে। সে তার চারটি নিয়মিত বাহিনীকে যুদ্ধের সম্মুখরেখা বরাবর মোতায়েন করে। সম্মুখ ভাগের বিস্তৃতি ছিল ইয়ারমুক হতে জাবিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ মাইল এলাকা জুড়ে।[৩৭৮] সে ডান বাহুতে মোতায়েন করে গ্রেগরীর বাহিনী ও বাম বাহুতে কানাতীরের বাহিনী এবং কেন্দ্রে মোতায়েন করে শীরজানের ও তার নিজের আর্মেনীয় বাহিনী। উভয় বাহিনীর কমান্ড ন্যস্ত হয় দীরজানের উপরে। রোমান নিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীকে চারটি সমান দলে বিভক্ত করে চার বাহিনী কমান্ডারের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। বাহিনী কমান্ডারগণ অশ্বারোহী দলকে পদাতিক বাহিনীর পিছনে মজুদ হিসেবে মোতায়েন করে। মাহান তার বাহিনীর গোটা সম্মুখ রেখার সামনে এক সারিতে মোতায়েন করে জাবালার আরব খৃস্টান বাহিনী। জাবালার বাহিনী ঘোড়া ও উটের পিঠে আরোহণ করে মূল বাহিনীর সামনে স্ক্রীন হিসেবে কাজ করে। তাদের দায়িত্ব ছিল শত্রুর তৎপরতা লক্ষ্য করা এবং যুদ্ধ শুরু হলে চার দলে বিভক্ত হয়ে পিছনে দণ্ডায়মান চার বাহিনীর সংগে যোগদান করে যুদ্ধে শরীক হওয়া।

ডান বাহুতে মোতায়েন গ্রেগরীর বাহিনীর ৩০,০০০ পদাতিক সৈন্য শিকলের ব্যবহার করে।[৩৭৯] একটি শিকলে ১০ জন করে যোদ্ধাকে আবদ্ধ করা হয়। শিকলের

---

৩৭৮. বর্তমানের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে রোমান বাহিনীর সম্মুখ ভাগ বিস্তৃত ছিল নাওয়া গ্রামের ২ মাইল পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম হয়ে সীলের পশ্চিম দিক দিয়ে শাম-উল-জাউলান অতিক্রম করে ইয়ারমুক নদীর তীর পর্যন্ত। এই গ্রামগুলো তখন ছিল না এবং যুদ্ধের বর্ণনায় গ্রামগুলোর কোনো উল্লেখ নেই।

৩৭৯. রোমানগণ একটি পরিখা খনন করেছিল বলেও বলা হয় এবং তারা এই পরিখাকে পিছনে ফেলে দাঁড়িয়েছিল। আমার মতে এই যুদ্ধে পরিখার তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। তবে

ব্যবহার করা হয় যোদ্ধাদের মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রতিজ্ঞার প্রতীক হিসেবে। এতে এই প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত হয় যে, তারা যে যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখানেই প্রাণ বিসর্জন দিবে তবু যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করবে না। প্রতিপক্ষের অশ্বারোহী দলের ধাক্কায় প্রতিরক্ষাব্যূহে সম্ভাব্য ভাঙনকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রেও শিকলের ব্যবহার কার্যকর ভূমিকা রাখে যা শিকলের যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ৩০,০০০ যোদ্ধার সকলেই মৃত্যুর শপথ নিয়ে যুদ্ধে শরীক হয়েছিল।

উভয় বাহিনীর সম্মুখ ভাগে যুদ্ধরেখার দৈর্ঘ সমান হলেও রোমান বাহিনী সংখ্যায় চারগুণ বড় হওয়ায় বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। মাহান সংখ্যার এই আধিক্যের সুযোগকে বিশেষভাবে কাজে লাগায়। সে একটি গোটা বাহিনীকে মূল বাহিনীর সামনে সারিবদ্ধভাবে (Screen) মোতায়েন করে এবং মূল বাহিনীতে গভীরতা সৃষ্টি করে প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেক বেশি। রোমান বাহিনীর গভীরতা ছিল ৩০ সারি

এই ভাবে বিশাল রাজকীয় বাহিনী যুদ্ধের বিন্যাসে দাঁড়িয়েছিল।

মাহানের সংগে আলোচনা শেষে ফিরে এসে খালিদ (রা) আবু উবায়দা (রা) ও অন্যান্য জেনারেলকে জানান যে, আর আলোচনার কোনো সম্ভাবনা নেই, সিদ্ধান্ত হবে তরবারির সাহায্যে এবং আগামী কালই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আবু উবায়দা (রা) এটাকে তাঁর স্বভাবসুলভ ভংগিতে আল্লাহর ইচ্ছা বলে গ্রহণ করেন। সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনি তাঁর বাহিনীকে সংগঠিত করবেন এবং তাঁর যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত জ্ঞান প্রয়োগ করে তা মোতায়েন করবেন। তিনি নিজেও জানতেন তাঁর সামরিক দক্ষতা খুব উঁচুমানের নয়। খালিদ (রা)সহ মুসলিম বাহিনীর অধিকাংশ অফিসারই তা জানতেন। আবু উবায়দা (রা) হয়তো বিবেক খাটিয়ে ও বিচক্ষণতার সংগে পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ পূর্বক দৃঢ় মনোবল নিয়ে তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। কিন্তু সংখ্যায় চারগুণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শুধু বিচক্ষণতা ও বিবেক-বুদ্ধি যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে সৃষ্টি করা এবং সৃষ্ট পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর মতো সূক্ষ্ম দূরদর্শিতা সম্পন্ন সামরিক ব্যক্তিত্ব। খালিদ (রা) তাঁর সামরিক প্রজ্ঞাকে মুসলিম বাহিনীর সেবায় ন্যস্ত করতে চান।

তিনি আবু উবায়দা (রা)-কে বলেন, "ওহে কমান্ডার! রেজিমেন্ট কমান্ডারদেরকে ডাকুন এবং তাদেরকে বলুন আমি যা বলি তা শুনতে।"[৩৮০]

আবু উবায়দা (রা) খালিদের মনোভাব বুঝতে পারেন। তিনি নিজেও এর চেয়ে ভাল কিছু আশা করতে পারেন না। তিনি সংগে সংগে একজন অফিসারকে প্রেরণ করেন সকল রেজিমেন্ট ও কোর কমান্ডারকে তাঁর সদর দপ্তরে একত্রিত হওয়ার বার্তা নিয়ে। বার্তাবাহক অফিসার কমান্ডারদের নিকট গিয়ে বলে, "আবু উবায়দা (রা)

রোমান সৈন্যদের পলায়ন রোধ করার জন্য তাদের পিছনে পরিখা খনন করার একটি যুক্তি থাকতে পারে।

৩৮০. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা-১২৯।

নির্দেশ দিয়েছেন খালিদ (রা) যা বলেন তোমরা তাই শুনবে ও অনুসরণ করবেই।"[৩৮১] কমান্ডারগণ এ বার্তার মর্ম উপলব্ধি করেন এবং খালিদের নির্দেশ গ্রহণের জন্য সদর দপ্তরে একত্রিত হন। এই কৌশলে মুসলিম বাহিনীর কমান্ড খালিদের হাতে চলে যায় এবং সকলে তা আনন্দচিত্তে গ্রহণ করে।

আবু উবায়দা (রা) আনুষ্ঠানিক কমান্ডার হিসেবে বাহিনীর প্রশাসনিক বিষয়াদি দেখাশুনা ও নামাযের ইমামতি করতে থাকেন। খালিদের যুদ্ধ পরিকল্পনার সংগে সংঘাতপূর্ণ নয় এমন কিছু আদেশ-নির্দেশও দিতে থাকেন। তবে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনী কমান্ডের দায়িত্ব খালিদের এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলবে।

খালিদ (রা) সংগে সংগে বাহিনীকে সংগঠনের কাজে লেগে যান। মুসলিম বাহিনীতে মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪০,০০০ যার মধ্যে ১০,০০০ অশ্বারোহী। খালিদ (রা) গোটা বাহিনীকে ৮০০-৯০০ সৈন্যের ৩৬টি পদাতিক ও ২০০০ যোদ্ধার ৩টি অশ্বারোহী রেজিমেন্টে বিভক্ত করেন এবং ৪০০০ অশ্বারোহী যোদ্ধার গতিময় রক্ষী দলটিকে অটুট রাখেন। অশ্বারোহী রেজিমেন্ট তিনটির দায়িত্ব ন্যস্ত হয় কায়েস বিন হুবায়রা, মায়সারাহ্ বিন মাসরুক এবং আমের বিন তোফায়েলের উপরে। চারটি কোরের প্রত্যেকটির অধীনে থাকে ৯টি করে পদাতিক রেজিমেন্ট। এই পদাতিক রেজিমেন্টগুলো গোত্রীয় ও গোষ্ঠীগত সংগঠনের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা হয় যাতে প্রত্যেকটি যোদ্ধা তার পাশের সুপরিচিত সাথীটির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে পারে।

রোমান বাহিনীর অবস্থানের সম্মুখ রেখার সংগে মোটামুটি সংগঠিত রেখে মুসলিম বাহিনীকেও দীর্ঘ ১১ মাইল জুড়ে মোতায়েন করা হয়। বাহিনীর বাম বাহুর প্রান্ত বিস্তৃত ইয়ারমুক নদী পর্যন্ত যেখান থেকে মাত্র ১ মাইল সামনেই উৎপত্তি হয়েছে গিরিখাতটির এবং ডান বাহুর বিস্তার জাবিয়া সড়ক পর্যন্ত।[৩৮২] বাম বাহুতে অবস্থান নেয় ইয়াযীদ ও ডান বাহুতে আমর ইবনুল আসের কোর এবং এই দুই বাহুর প্রত্যেক কমান্ডারের অধীনে একটি করে অশ্বারোহী বাহিনীকে ন্যস্ত করা হয়। কেন্দ্রে অবস্থান নেয় আবু উবায়দা (বামে) ও শুরাহবীলের (ডানে) কোর। আবু উবায়দা (রা)-এর রেজিমেন্ট কমান্ডারদের মধ্যে দু'জন ছিলেন ইকরামা বিন আবু জহল ও আব্দুর রহমান বিন খালিদ। কেন্দ্রে পিছনে অবস্থান নেয় গতিময় রক্ষীদল ও একটি অশ্বারোহী রেজিমেন্ট। এই দল দু'টি খালিদের কমান্ডে কেন্দ্রীয় মজুদ হিসেবে কাজ করবে। খালিদ (রা) যুদ্ধ পরিচালনা কাজে ব্যস্ত থাকলে জাররার গতিময় রক্ষীদল কমান্ড করবেন। প্রত্যেক কোর প্রতিপক্ষের তৎপরতা লক্ষ্য করার জন্য সামনে এক সারি করে স্কাউট প্রেরণ করে। (উভয় বাহিনীর যুদ্ধের বিন্যাসের জন্য ২০ নম্বর ম্যাপ দ্রঃ)।

---

৩৮১. পূর্বোক্ত।

৩৮২. বর্তমানকালের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে মুসলিম বাহিনীর সম্মুখ রেখা নাওয়ার প্রায় ১ মাইল পশ্চিমে শুরু হয়ে দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে জামুয়া পাহাড় অতিক্রম করে সীল ও আদওয়ানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তারপর শাম-উল-জাউলান ও জালীনের মধ্যবর্তী এলাকা অতিক্রম করে ইয়ারমুক নদীর কাছাকাছি গিয়ে শেষ হয়।

ম্যাপ—২০ : ইয়ারমুকের যুদ্ধে সৈন্যবিন্যাস
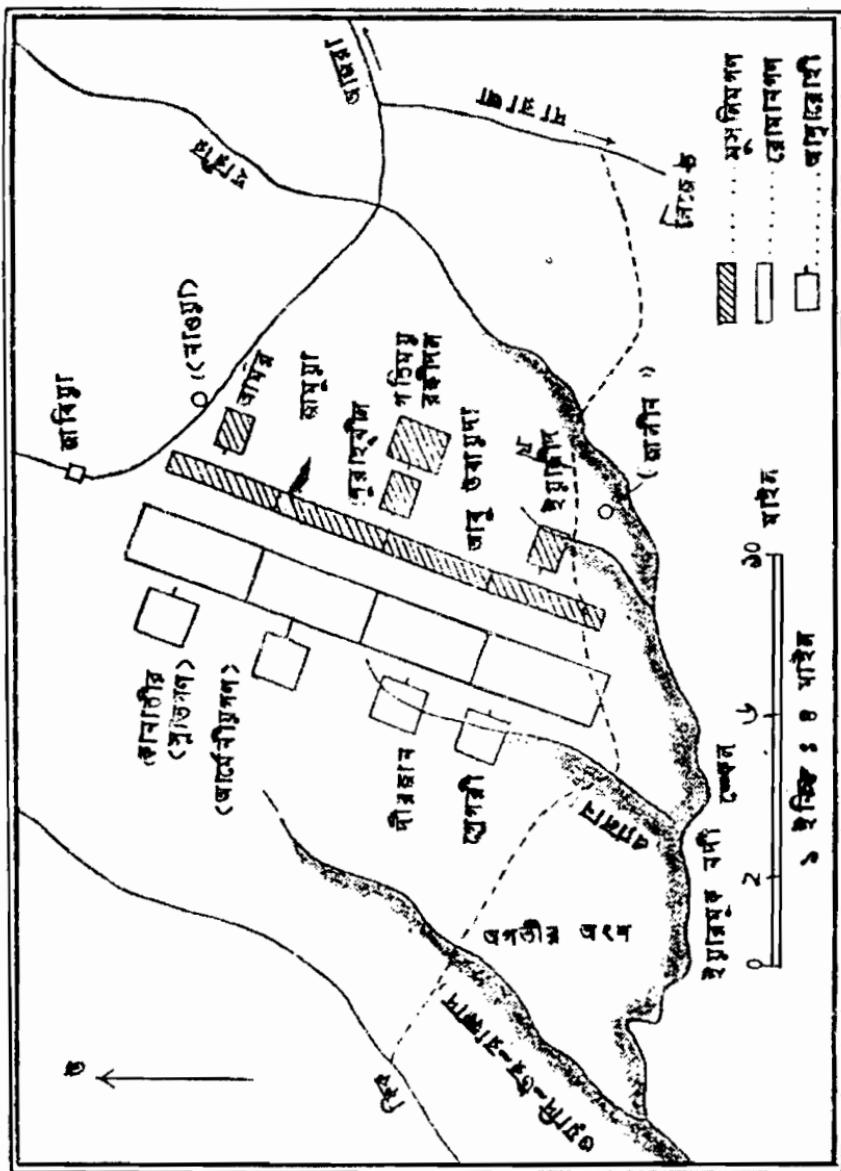
রোমান বাহিনীর তুলনায় মুসলিম বাহিনীর গভীরতা ছিল খুবই কম, মাত্র তিন সারি। কিন্তু সম্মুখের সারিতে কোনো ফাঁক ছিল না। যতো বর্শা ছিল সব সম্মুখের সারির যোদ্ধাদের হাতে দেয়া হয় এবং তাদের উপরে নির্দেশ ছিল যে, তারা লম্বা বর্শা নিয়ে এমন দৃঢ়তার সংগে দাঁড়াবে যেন বিনা আঘাতে বা জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে প্রতিপক্ষের কোনো যোদ্ধা নিকটবর্তী হতে না পারে। তীরন্দাজগণও যাদের অধিকাংশ ছিল ইয়েমেনী, সম্মুখ সারিতে ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তাদের উপরে নির্দেশ থাকে যে, শত্রুর আক্রমণের সংগে সংগে প্রথমে তীর ছুঁড়ে তারা যতোবেশি সম্ভব শত্রুকে ধরাশায়ী করবে। তরপর তারা আরো অগ্রসর হলে, তাদেরকে বর্শা দ্বারা আঘাত করা হবে এবং তারপরে উন্মুক্ত হবে তরবারি।

দু'বাহুর কোর কমান্ডারগণ তাদের অধীনের অশ্বারোহী রেজিমেন্ট দু'টিকে মজুদ হিসেবে ব্যবহার করবে এবং কোনো কারণে রোমানদের চাপে পদাতিক বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হলে অবস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য তা কাজে লাগাবে। খালিদ (রা) তাঁর গতিময় রক্ষীদল ও একটি অশ্বারোহী দল নিয়ে কেন্দ্রে মোতায়েন কোর দু'টির মজুদ শক্তি হিসেবে কাজ করবেন এবং প্রয়োজন বোধে গোটা বাহিনীর মজুদ হিসেবে দুই বাহুর কোর দু'টিকেও সহায়তা করবেন।

মুখোমুখি দণ্ডায়মান দুই বাহিনীর বাহুগুলোর অবস্থা একই। উভয় বাহিনীর দক্ষিণ বাহু ছিল ইয়ারমুক নদীর পার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই বাহু দিয়ে কোনো বাহিনীর পক্ষেই পার্শ্ব অতিক্রম সম্ভব নয়। উভয় বাহিনীর উত্তর দিকের বাহু ছিল উন্মুক্ত এবং এই বাহুতে পার্শ্ব অতিক্রম করার সুযোগ বিদ্যমান। তবে বাহিনীদ্বয়ের অবস্থানের পশ্চাৎভাগের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যে কৌশলগত কিছু পার্থক্য আছে। মুসলিম বাহিনীর পিছনে বিস্তৃত ইয়ারমুকের সমতল প্রান্তর। তারও পরে আছে আজরা ও জাবাল-উদ-দ্রুজ পাহাড়ী এলাকা। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে সহজেই এই এলাকায় প্রত্যাহার করে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ সম্ভব। রোমান অবস্থানের পিছনে বাধা হয়ে অবস্থান করছে গভীর ও দুর্গম্য ওয়াদি-উর-রাক্কাদ (গিরিখাত)। অবশ্য এই গিরিখাতটি রোমান বাহিনীর পলায়নের পথে বাধা হয়ে তাদেরকে মরিয়া হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য করতে পারে। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পিছু হটার প্রয়োজন হলে এবং সেই সংগে উত্তর দিকের পলায়নের পথ বন্ধ হলে এই গিরিখাতটি রোমানদের জন্য মৃত্যুর গহবরে পরিণত হওয়ার কথা। গিরিখাতে আটকা পড়া রোমানদের অবস্থা ফাঁদেপড়া ইঁদুরের মতো হতে পারে। তবে এই যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার কোনো ইচ্ছা রোমানদের ছিল না।

রোমান অবস্থানের পিছনের ভূমির ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে খালিদ (রা) তাঁর যুদ্ধ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। প্রথম দিকে মুসলমানগণ প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করবে এবং একের পর এক আসা রোমান আক্রমণকে

প্রতিহত করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিপক্ষ তাদের আক্রমণের তীব্রতা হারিয়ে অসংগঠিত হয়ে যায়। তারপর মুসলিম বাহিনী প্রতিআক্রমণ রচনা করে রোমানদেরকে ওয়াদি-উর-রাক্কাদের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। গিরিখাতের ফাঁদে ফেলে রোমানদের কচুকাটা করাই ছিল পরিকল্পনা। অন্তত খালিদ (রা) তাই পরিকল্পনা করেছিলেন।

মুসলিম বাহিনীর পিছনে ক্যাম্পে অবস্থান করছিল তাদের নারী ও শিশুরা। প্রত্যেক কোরের পিছন বরাবর ছিল সেই কোরের সদস্যদের স্ত্রী ও সন্তানগণ।[৩৮৩] আবু উবায়দা (রা) ক্যাম্পগুলো ঘুরে দেখেন এবং সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, "তাঁবুর খুঁটিগুলি তোমাদের হাতে নাও এবং পাথর সংগ্রহ করে স্তূপ করে রাখো। আমরা যুদ্ধে জয়ী হলে ভাল। কিন্তু তোমরা যদি দেখ যে, কোনো মুসলমান যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালানোর চেষ্টা করছে তাহলে তার মুখে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করো এবং তার প্রতি পাথর ছুঁড়ে মারো। তার সন্তানকে শূন্যে তুলে ধরে তাকে তার স্ত্রী, সন্তান ও ইসলামের জন্য যুদ্ধ করতে বলো।"[৩৮৪] নারীগণ নেতার নির্দেশ মতো প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

বাহিনী যুদ্ধের অবস্থানে দাঁড়িয়ে পড়লে আবু উবায়দা (রা), খালিদ (রা) ও অন্যান্য জেনারেল ঘোড়ায় চড়ে প্রত্যেকটি রেজিমেন্ট ঘুরে অফিসার ও সৈনিকদের সংগে কথা বলেন। খালিদ (রা) সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন, "ওহে ইসলামের সৈনিকগণ! দৃঢ়তা প্রদর্শনের সময় সমাগত। দুর্বলতা ও ভীরুতা আমাদেরকে অসম্মানের পথে ঠেলে দিবে। যে যতো বেশি দৃঢ়চিত্ত সে ততো বেশি আল্লাহর সাহায্যের উপযোগী। যে তরবারির সামনে সাহসিকতার সংগে দাঁড়াবে সে সম্মানিত হবে, আল্লাহর দরবারেও তাকে পুরস্কৃত করা হবে। আল্লাহ দৃঢ়তা পছন্দ করেন।"[৩৮৫]

খালিদ (রা) বিভিন্ন রেজিমেন্ট ঘুরে দেখছেন এমন সময় জনৈক যুবক মন্তব্য করলো, "রোমানগণ সংখ্যায় কতো বেশি আর আমরা কতো ক্ষুদ্র ।" খালিদ (রা) তার দিকে ঘুরে বলেন," রোমানগণ কতো ক্ষুদ্র আর কতো শক্তিশালী আমরা। একটি বাহিনীর শক্তি সৈন্যের সংখ্যার উপরে নির্ভর করে না। নির্ভর করে আল্লাহর সাহায্যের উপরে। আল্লাহর সাহায্য বঞ্চিত হলেই একটি বাহিনী দুর্বল হয়ে যায়।"[৩৮৬]

অন্যান্য কমান্ডার ও বয়স্ক ব্যক্তিগণ মুসলিম সৈনিকদেরকে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে কুরআনের অতি পরিচিত একটি আয়াত

---

৩৮৩. কিছু বর্ণনা মতে নারী ও শিশুদের ক্যাম্প ছিল অনেক পিছনে একটি পাহাড়ের উপরে। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে মুসলিম নারীদের ভূমিকা দেখে তা মনে হয় না।

৩৮৪. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা- ১২৯-১৩০।

৩৮৫. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা-১৩৭।

৩৮৬. তাবারী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৯৪।

পাঠ করেন, "অনেক বার দেখা গেছে একটি ক্ষুদ্র দল আল্লাহর সাহায্য নিয়ে একটি বৃহত্তর দলকে পরাজিত করেছে এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সংগে থাকেন।[৩৮৭] তাঁরা দোযখের আগুন ও বেহেশতের শান্তির কথা বলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূলে আকরাম (সা) যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা তুলে ধরেন। এছাড়াও তাঁরা যোদ্ধাদেরকে সহজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মরুভূমির ক্ষুধা ও কষ্টের জীবনের কথা এবং সিরিয়ার সমৃদ্ধ জীবনের কথা উল্লেখ করেন।

রাতটি ছিল গরম ও আবহাওয়া ছিল গুমোট। সময়টি ছিল ৬৩৬ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহ (১৫ হিজরীর রজব মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ)।[৩৮৮] মুসলমানগণ নামায পড়ে ও কুরআন তেলাওয়াত করে গোটা রাত অতিবাহিত করে এবং একে অপরকে সামনের দু'টি বিষয়ের কথা স্মরণ করাতে থাকে, বিজয় ও সুন্দর জীবন অথবা শাহাদৎ ও বেহেশত। যুদ্ধের পূর্বে সূরা আনফাল তেলাওয়াত করার ঐতিহ্য শুরু করেছিলেন রাসূলে আকরাম (সা) বদর যুদ্ধের পর। তাই মুসলমানগণ যেখানে ছিল, একাকী বা দলবদ্ধভাবে, এই সূরাটি তেলাওয়াত করে রাত পার করে দেয়।

'উভয় ক্যাম্পে সারারাত উৎসবের মতো আলো জ্বলে। দূর থেকে দেখলে মনে হতো আকাশের তারাগুলো আনন্দে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। কিন্তু আলোর সামনে যারা বসেছিল তাদের কারো অন্তরে কোনো আনন্দ ছিল না। আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাব্য বিভীষিকা তাদের সকলের অন্তর হতে আনন্দ কেড়ে নিয়েছে। আগামীকাল যুদ্ধের জন্য যারা প্রহর গুণছে–এই সব রোমান ও আরব, ইউরোপীয় ও এশীয়, খৃস্টান ও মুসলিম, সকলেই সাহসী যোদ্ধা। তাদের ছিল সিংহের মতো শক্তি, ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর নেকড়ের মতো হিংস্রতা। তবু তারা সবাই ছিল মানুষ। তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে ভাবতে থাকে, যাদের কাছ থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিদায় নেবে, হয়তো শেষ বিদায়।

এই ছিল শতাব্দীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ- ইতিহাসের ভবিষ্যত নির্ধারণী যুদ্ধগুলোর অন্যতম একটি .... এবং সম্ভবত খৃস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত সবচেয়ে ভয়ংকর যুদ্ধ- ইয়ারমুকের যুদ্ধের প্রান্তর।

---

৩৮৭. কোরআন ঃ ২ ঃ ২৪৯।

৩৮৮. প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় এই যুদ্ধের তারিখ হিসেবে শুধু ১৫ হিজরীর রজব মাসের উল্লেখ আছে। পূর্বের ঘটনাপ্রবাহের সময় হিসেব করে সপ্তাহের উল্লেখটি আমিই করেছি।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ

ভোরবেলা মুসলমানগণ তাদের কমান্ডারদের নেতৃত্বে নামাযে দাঁড়িয়ে পড়ে। নামায শেষ হওয়ার সংগে সংগেই তারা প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত স্থানে গিয়ে অবস্থান নেয়। সূর্য উঠতে না উঠতেই উভয় বাহিনী ইয়ারমুকের সমতল প্রান্তরে যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে। দু'বাহিনীর মধ্যে ব্যবধান প্রায় এক মাইলের মতো।

যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি প্রস্তুত দু'বাহিনী চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সৈনিকগণ জানতেন যে, আসন্ন যুদ্ধটি হবে চরম ধ্বংসাত্মক এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বেই একটি বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রেই চিরতরে শেষ হয়ে যাবে। মুসলিমগণ প্রতিপক্ষের বিশাল সমাবেশ ও রোমান লিজিওনগুলোর সাজসজ্জার ব্যাপক আয়োজন দেখে, তাদের মাথার উপরে ছিল অসংখ্য ব্যানার ও ক্রুশ, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। রোমানগণ অবশ্য মুসলমানদের প্রতি কিছুটা সম্ভ্রম সহকারে তাকায়। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রাধান্য দিলেও, গত দু'বছরে সিরিয়ায় মুসলমানদের সাফল্য দেখে তাদের দক্ষতার প্রতি তাদের কিছুটা শ্রদ্ধাবোধের সৃষ্টি হয়েছিল। রোমানদের দৃষ্টিতে এক ধরনের সাবধানতাও ছিল। এক ঘন্টা অতিবাহিত হলেও কোনো পক্ষে কোনো নড়াচড়া দেখা যায় না। মুখোমুখি দণ্ডায়মান যোদ্ধাগণ যুদ্ধ শুরুর প্রতীক্ষায় থাকে। বর্ণনাকারীদের মতে, "যুদ্ধটি শুরু হয়েছিল আগুনের স্ফুলিংগের মতো আর সমাপ্তি হয়েছিল বিশাল অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে" এবং "যুদ্ধটির প্রত্যেকটি দিন ছিল পূর্বের দিনের তুলনায় ভয়ংকর।"[৩৮৯]

রোমান অবস্থানের কেন্দ্র হতে জর্জ নামের একজন জেনারেল এগিয়ে আসে। মুসলিম বাহিনীর কেন্দ্রের অদূরে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে খালিদ (রা)-কে অগ্রসর হওয়ার আহবান জানায়। খালিদ (রা) দ্রুত অগ্রসর হয়ে যান এবং এই ভেবে আনন্দ বোধ করেন যে যুদ্ধটির শুরু হচ্ছে তাঁর দ্বৈতযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। তিনি যুদ্ধটির জন্য একটি ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন।

খালিদ (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে জর্জের কাছাকাছি হলেও সে তরবারি বের করার কোনো উদ্যোগ না নিয়ে প্রতিপক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকে। খালিদ (রা) আরো

---

৩৮৯. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা-১৩৩।

অগ্রসর হলে দুই ঘোড়ার ঘাড় অতিক্রম হয়ে যায় এবং জর্জ তখনও তরবারি বের করার কোনো উদ্যোগ নেয় না। সে আরবীতে জিজ্ঞেস করে," ওহে খালিদ! আমাকে সত্য কথা বলো এবং আমার নিকট হতে সত্য গোপন করো না। মহৎ ব্যক্তিগণ কখনও মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয় না। এটা কি সত্য যে, সৃষ্টিকর্তা তোমার রাসূলের নিকট একটি তরবারি পাঠিয়েছেন এবং তিনি তা তোমাকে দিয়েছেন ? .... এবং তুমি তা কখনও উন্মুক্ত করোনি অথচ তোমার শত্রুগণ তোমার সামনে দাঁড়ালেই পরাজিত হয়।"

'না' খালিদ উত্তর দেন।

"তাহলে তোমাকে আল্লাহর তরবারি বলা হয় কেন?"

রাসূল আকরাম (সা)-এর নিকট হতে কিভাবে আল্লাহর তরবারি উপাধি লাভ করেছিলেন খালিদ (রা) তা বর্ণনা করেন। জর্জ কিছুক্ষণ চিন্তা করে তারপর জিজ্ঞেস করে," বলো, আমাকে কি করতে হবে ?"

'সাক্ষ্য দান করো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল এবং তিনি আল্লাহর নিকট হতে বাণী এনেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।"

"যদি আমি তাতে সম্মত না হই ?"

"তাহলে তোমাকে জিযিয়া কর প্রদান করতে হবে এবং বিনিময়ে তোমার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে।"

"তাতেও যদি আমি সম্মত না হই ?"

"তাহলে তরবারি।"

জর্জ খালিদ (রা)-এর কথাগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে তারপর জিজ্ঞেস করে, "যে আজকে তোমাদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করে তোমাদের মাঝে তার মর্যাদা কি?"

"আমাদের বিশ্বাসে সবার মর্যাদা সমান।"

"তাহলে আমি তোমাদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করলাম।"[৩৯০]

উভয় বাহিনী বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করে যে, (কেন না তারা দুই জেনারেলের কথোপকথন সম্পর্কে কিছুই জানে না) খালিদ (রা) তার ঘোড়া ঘুরিয়ে নিচ্ছেন এবং উভয় জেনারেল ধীর পদক্ষেপে মুসলিম বাহিনীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। মুসলিম বাহিনীর কেন্দ্রীয় অবস্থানে পৌছে জর্জ খালিদ (রা)-এর সংগে সংগে উচ্চারণ করেন, "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর প্রেরিত পুরুষ"। কয়েক ঘন্টা পরে জর্জ তার নতুন বিশ্বাসের জন্য বীরত্বের সংগে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করবেন। এরকম একটি চমকপদ ঘটনার মধ্য দিয়ে ইয়ারমুকের যুদ্ধ শুরু হয়।

---

৩৯০. তাবারী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৯৫।

এরপর শুরু হয় উভয় পক্ষের খ্যাতিমান যোদ্ধাদের মধ্যে দ্বৈতযুদ্ধের পালা। এই পর্যায়টি উভয় পক্ষের যোদ্ধাদেরকে উদ্দীপ্ত করতে সহায়তা করে। মুসলিম পক্ষের কিছু অফিসার খালিদ (রা)-এর নির্দেশে এবং কিছু স্বেচ্ছায় সামনে অগ্রসর হয়ে প্রতিপক্ষের যোদ্ধাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। রোমান অফিসারগণও এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। এই পর্যায়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি রোমান অফিসার নিহত হয়। আব্দুর রহমান বিন বকর একাই একের পর এক পাঁচজন রোমান অফিসারকে হত্যা করেন এবং সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

দিনের মধ্যভাগ পর্যন্ত দ্বৈতযুদ্ধ চলে। রোমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মাহান চিন্তা করলো–এভাবে দ্বৈতযুদ্ধ চলতে থাকলে তার অফিসারদের একটি বড় অংশ নিহত হবে যা গোটা বাহিনীর উপরে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করবে। বরং এর চেয়ে সাধারণ যুদ্ধে তার বাহিনীর ভাল করার কথা। কেননা সেক্ষেত্রে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবিধাটাও কাজে লাগাতে পারবে। তবে সে এ ব্যাপারে সাবধান ছিল যে, প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তার বিরূপ প্রভাবও হবে সুদূর প্রসারী। সে প্রথমে গোটা সম্মুখ জুড়ে একটি সীমিত আক্রমণ রচনার সিদ্ধান্ত নেয়। তার উদ্দেশ্য হলো মুসলিম বাহিনীর শক্তি পরীক্ষা করা এবং সেই সংগে কোনো অংশকে দুর্বল মনে হলে সুযোগ বুঝে সেই অংশে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে প্রতিরক্ষা ব্যূহকে ভেঙে ফেলা।

দিনের মধ্য ভাগে রোমান বাহিনীর সামনের দশ সারি যোদ্ধা অর্থাৎ পদাতিক বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ যোদ্ধা আক্রমণের জন্য সামনে অগ্রসর হয়। মানব স্রোতটি ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হতে থাকে এবং তীর নিক্ষেপের দূরত্বে আসলেই মুসলিম তীরন্দাজগণ তীর ছুঁড়তে শুরু করে। এতে রোমান পক্ষের কিছু ক্ষতি হলেও তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে এবং শীঘ্রই তারা মুসলিম বাহিনীর সম্মুখ সারির উপরে চড়াও হয়। মুসলিম বাহিনীও তাদের রক্তাক্ত বর্শা ফেলে তরবারি উন্মুক্ত করে এবং উভয় বাহিনী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

রোমান আক্রমণের মধ্যে দৃঢ়তার যথেষ্ট অভাব ছিল। তাদের যোদ্ধাদের অনেকেই ছিল অনভিজ্ঞ এবং তারা আক্রমণের চাপ অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হয়। অপরপক্ষে আক্রান্ত মুসলিম অফিসারগণ ভয়ংকর তীব্রতা সহকারে আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কোনো কোনো অংশে রোমান আক্রমণের তীব্রতা থাকলেও সাধারণভাবে এই দিনের আক্রমণটি ছিল মাঝারি ধরনের তীব্রতাসম্পন্ন। রোমান বাহিনীর অবশিষ্ট যোদ্ধারা দিনের শেষ পর্যন্ত এই আক্রমণে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে এবং অপরাহ্নের দিকে উভয় বাহিনী নিজেদেরকে যুদ্ধ হতে প্রত্যাহার করে ক্যাম্পে ফিরে যায়। এই দিনের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ খুব একটা বেশি না হলেও তুলনামূলকভাবে তা রোমানপক্ষেই বেশি ছিল।

রাতটা শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়। মুসলিম নারীরা তাদের স্বামীদেরকে গর্বের সংগে অভ্যর্থনা জানায় এবং তাদের পরিধেয় দিয়ে তাদের মুখ ও অস্ত্র থেকে ঘাম ও রক্ত মুছে নেয়। স্ত্রীগণ স্বামীদেরকে বলে,"ওহে আল্লাহর বন্ধুগণ! বেহেশতের শুভসংবাদ গ্রহণ করো।"[৩৯১]

দিনের যুদ্ধের ফলাফলে মুসলমানগণ বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তারা প্রতিপক্ষের আক্রমণকে শুধু প্রতিহতই করেনি বরং তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও তুলনামূলক বেশি। তারা রাতের অধিকাংশ সময় নামায ও কুরআন তেলাওয়াতে কাটিয়ে দেয়। রাতের বেলা কিছু রোমান সৈনিক তাদের সহযোদ্ধাদের মৃতদেহ নেয়ার জন্য দু'বাহিনীর মধ্যবর্তী অবস্থানে অগ্রসর হয়ে আসলে মুসলিম প্রহরীদের সংগে সামান্য সংঘর্ষ হয়। এছাড়া রাতটি নির্বিঘ্নে কাটে।

মাহান কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়ে। পরদিনের আক্রমণ কৌশল নির্ধারণের জন্য সে যুদ্ধপরিষদের সভা ডাকে। সফলতা অর্জন করতে হলে তাকে ভিন্ন কিছু একটা করতে হবে এবং সে পরদিন সকালে মুসলমানগণকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরার লক্ষ্যে রাতের অন্ধকারে যুদ্ধের বিন্যাসে দাঁড়িয়ে ভোরের প্রথম আলোর সংগে সংগে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তদুপরি সে সর্বশক্তি নিয়োগ করে আক্রমণ করার সিদ্ধান্তও নেয়। কেন্দ্রে অবস্থিত দুই বাহিনী প্রতিপক্ষের কেন্দ্রীয় অবস্থানকে আক্রমণের মাধ্যমে ব্যস্ত রাখবে এবং একই সময় উভয় বাহুর বাহিনীদ্বয় প্রচণ্ড আক্রমণের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীর বাহুদ্বয়কে পিছু হটতে বাধ্য করবে বা কেন্দ্রের দিকে চেপে নিয়ে যাবে। যুদ্ধক্ষেত্রের সার্বিক পরিস্থিতি সরাসরি দেখার জন্য মাহান তার ডান বাহুর পিছনের একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থান গ্রহণ করে যেখান হতে ইয়ারমুকের গোটা সমতল ক্ষেত্রটি দেখা যায়। মাহানের সংগে থাকে তার পারিষদবৃন্দ ও ২,০০০ আর্মেনীয় দেহরক্ষী। রোমান বাহিনীর অবশিষ্ট যোদ্ধাগণ ভোরবেলায় আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

ভোরবেলা নামাযের অবস্থানে থেকেই মুসলমানগণ প্রতিপক্ষের ড্রামের শব্দ শুনতে পায়। রোমান আক্রমণের সংবাদ নিয়ে পর্যবেক্ষণ ফাঁড়ির প্রহরী ঘোড়া ছুটিয়ে আসে। মুসলমানগণ অবশ্যই অজ্ঞাতে ধরা পড়ে যেতো যদি খালিদ (রা) রাতের বেলা একটি শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ প্রহরীদল মোতায়েনের নির্দেশ না দিতেন। এই প্রহরীদল রোমান বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে বেশ কিছুসময় বিলম্বিত করতে সক্ষম হয়। এই সময়ের মধ্যে মুসলমানগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে নেয় এবং রোমান সৈন্যের ঢল তাদের উপরে আছড়ে পড়ার পূর্বে তারা যুদ্ধের অবস্থানে দাঁড়িয়ে পড়ে। তদুপরি মুসলমানগণ তাদের প্রতিপক্ষের কল্পনার চেয়ে দ্রুত গতিতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে সূর্য ওঠার পূর্বেই দুই বাহিনী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

৩৯১. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা-১৩৩।

কেন্দ্রীয় অবস্থানের যুদ্ধ গোটা দিনধরে চলে এবং মুসলিম বাহিনী এই আক্রমণ দৃঢ়তার সংগেই প্রতিহত করে। রোমান বাহিনীর সিদ্ধান্তই ছিল কেন্দ্রে সীমিত চাপ সৃষ্টির। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর দুই বাহুর উপরে রোমান আঘাত ছিল প্রচণ্ডতম।

মুসলিম অবস্থানের ডান বাহুতে স্লাভদের দ্বারা গঠিত কানাতীরের বাহিনী আমর ইবনুল আসের কোরের উপরে আঘাত হানে। মুসলমানগণ অত্যন্ত সাহসিকতার সংগে এই আক্রমণকে প্রতিহত করে। কানাতীর নতুন যোদ্ধা নিয়ে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করলে মুসলমানগণ তাও প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু কানাতীর তৃতীয়বারের মতো অন্য একটি নতুন রেজিমেন্টের সাহায্যে আক্রমণ করলে ক্লান্ত মুসলিম বাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যূহে কিছুটা ফাটল ধরে এবং এই কোরের অধিকাংশ যোদ্ধা ক্যাম্পের দিকে পিছু হটে এবং বাকিরা কেন্দ্রের দিকে অর্থাৎ শুরাহবীলের কোরের দিকে সরে যায়।

পদাতিক কোর পিছু হটলে আমর তাঁর অশ্বারোহী রেজিমেন্টের ২,০০০ যোদ্ধার সাহায্যে প্রতি আক্রমণ চালিয়ে রোমানদেরকে পিছু ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করেন। অশ্বারোহী রেজিমেন্টটি ক্ষীপ্রতাসহ আক্রমণে যায় এবং কিছু সময়ের জন্য রোমান অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করে, তবে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। অশ্বারোহী রেজিমেন্টটিও রোমান চাপের মুখে ক্যাম্পের দিকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিকগণ প্রায় একই সময়ে ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছে দেখে যে, নারীগণ তাঁবুর খুঁটি ও পাথর হাতে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তারা সমস্বরে চিৎকার করে উঠে, "যারা শত্রুর নিকট হতে পলায়ন করে তাদের উপরে আল্লাহর অভিশাপ নাজিল হোক" এবং তারা স্বামীদের প্রতি চিৎকার করে বলে, "তোমরা যদি আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের হাত হতে রক্ষা করতে না পারো তাহলে তোমরা আমাদের স্বামী নও।"[৩৯২]

> অন্য রমণীরা ড্রাম বাজিয়ে উপস্থিত গান শুরু করে দেয়,
> ওহে তোমরা, যারা স্বীয় রমণীকে রক্ষা করো না,
> যার গুণ ও সৌন্দর্য আছে,
> এবং তাকে ছেড়ে দাও অবিশ্বাসীর হাতে,
> ঘৃণিত ও শয়তানতুল্য অবিশ্বাসী,
> অসম্মান ও ধ্বংসকে মাথায় তুলে নাও।[৩৯৩]

পিছু হটে আসা মুসলমানগণ তাদের নারীদের নিকট হতে কঠোর তিরস্কার লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে তারা নারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারা প্রথমে পাথর নিক্ষেপ

---

৩৯২. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা-১৪০
৩৯৩. পূর্বোক্ত

করে, তারপর ছুটে গিয়ে ঘোড়া ও আরোহী উভয়কে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করে। গর্বিত সৈনিকগণ এর বেশি আর সহ্য করতে পারে না। তারা তীব্র ক্ষোভ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে যায়। আমর এই সুযোগে তাঁর অধিকাংশ যোদ্ধাকে সংগঠিত করে দ্বিতীয় দফা প্রতি আক্রমণ রচনা করেন।

মুসলিম বাহিনীর বাম বাহুর অবস্থাও ছিল প্রায় অনুরূপ। এখানেও মুসলমানগণ রোমানদের প্রথম আঘাত প্রতিহত করে কিন্তু দ্বিতীয় আঘাতে ইয়াযীদের কোরের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙে যায়। ইয়াযীদের প্রতিপক্ষ দিল শিকলে আবদ্ধ গ্রেগরীর বাহিনী। শিকলের কারণে এদের অগ্রযাত্রা ধীর গতিসম্পন্ন হলেও অবস্থান ছিল মজবুত। ইয়াযীদও অশ্বারোহী রেজিমেন্ট ব্যবহার করে প্রতিআক্রমণ করেন, কিন্তু কিছু সময়ের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তারাও পিছু হটতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রেও মুসলিম রমণীরা পাথর ও তাঁবুর খুঁটি হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছিল। এদের নেতৃত্বে ছিল হিন্দ ও খাওলা। বাম বাহু হতে পিছু হটে আসা প্রথম ব্যক্তি ছিলেন আবু সুফিয়ান এবং তিনি প্রথম যে নারীর সাক্ষাৎ লাভ করেন সেও তাঁর স্ত্রী হিন্দ ছাড়া আর কেউ নয়। হিন্দ স্বামীর ঘোড়ার মাথায় তাঁবুর খুঁটির দ্বারা আঘাত করে বলে, "কোথায় যাও ওহে হারব-এর পুত্র ? ফিরে যাও এবং যুদ্ধে তোমার সাহসিকতা প্রদর্শন করো যাতে আল্লাহর বাণীবাহকের বিরোধিতা করার পাপ হতে মুক্তি পাও।"[৩৯৪]

আবু সুফিয়ান তাঁর স্ত্রীর মেযাজের পরিচয় পূর্বেও পেয়েছেন। তিনি দ্রুত ঘোড়া ঘুরিয়ে ফেলেন। অন্য যোদ্ধাগণও রমণীদের নিকট হতে একই ধরনের আচরণ লাভ করে এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরে যায়। শীঘ্রই ইয়াযীদের কোর যুদ্ধের মাঠে পুনর্গঠিত হয়। কিছু মহিলা ঘোড়ার সংগে সংগে ছুটে যায় এবং এদের একজনের তরবারির আঘাতে জনৈক রোমান যোদ্ধা প্রাণ হারায়। ইয়াযীদের কোর গ্রেগরীর বাহিনীর উপরে প্রতিআক্রমণ করলে হিন্দ তাঁর ওহুদের প্রান্তরে গাওয়া গানটি ধরে ঃ

> আমরা রজনী কন্যা
> আমরা ক্ষতির হাত হতে রক্ষার জন্য ঘুরি
> ধীরস্থির গতিতে
> আমাদের বাহুতে বালা।
> তোমরা সামনে এগিয়ে গেলে আলিংগন
> আর পিছু হটলে পরিত্যাগ করবো,
> নির্দয় প্রত্যাখ্যান।[৩৯৫]

অনেকে প্রশ্ন করতে পারে যে, হিন্দের পক্ষে কি এরূপ একটি উদ্দীপক গান গাওয়া সম্ভব। তবে হিন্দ ভেবেছিল যে, এই গান গাওয়ার জন্য তাঁর যথেষ্ট বয়স ছিল। হাজার হলেও তাঁর বয়স তো আর পঞ্চাশের একদিনও বেশি ছিল না।

---

৩৯৪. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা- ১৪১

৩৯৫. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা-১৪০।

দিনের মধ্যভাগ। মুসলিম বাহুর কোরদ্বয় প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে আর কেন্দ্রে থেকে খালিদ (রা) পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখছেন। এ যাবত তিনি যুদ্ধরত কোরদ্বয়কে সাহায্যের জন্য কিছুই করেননি এবং বিশেষভাবে প্রয়োজন হওয়ার পূর্বে কেন্দ্রীয় মজুদকে যুদ্ধে জড়িত করতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু মুসলিম কোরদ্বয় ক্যাম্প থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যুদ্ধে ফিরে এলে খালিদ (রা) তাঁর অশ্বারোহী দলকে ব্যবহার করে মুসলিম অবস্থান পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তিনি প্রথমে ডান বাহুর দিকে ঘুরে দাঁড়ান এবং তাঁর গতিময় রক্ষীদলের একটি অশ্বারোহী রেজিমেন্ট দ্বারা কানাতীরের বাহিনীর পার্শ্বদেশে ঐ সময়ে আঘাত হানেন যখন আমর তাঁর কোরকে সংগঠিত করে কানাতীরের উপরে সামনে থেকে প্রতিআক্রমণ রচনা করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই দু'দিক থেকে আক্রান্ত রোমানগণ দ্রুত পিছু হটে পূর্বের অবস্থানে চলে যায়। আমর তাঁর হৃত ভূমি পুনরুদ্ধার করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ের জন্য নিজ কোরকে সংগঠিত করেন।

আমরের অবস্থান পুনরুদ্ধারের সংগে সংগে খালিদ (রা) বাম বাহুর দিকে ঘুরে দাঁড়ান। ইতিমধ্যে ইয়াযীদ তাঁর প্রতিপক্ষকে পিছনে ঠেলে দেওয়ার জন্য সামন থেকে প্রতিআক্রমণের সূচনা করেছেন। খালিদ (রা) জাররারের কমান্ডে একটি রেজিমেন্টকে আলাদা করে দীরজানের বাহিনীকে সামন থেকে আক্রমণ করার নির্দেশ দান করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দীরজানকে ব্যস্ত রেখে রোমান ডান বাহুর উপরে চাপ সৃষ্টি করে অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে পিছু হটতে বাধ্য করা। তিনি কেন্দ্রীয় মজুদের বাকি অংশ নিয়ে গ্রেগরীর বাম বাহুর উপরে আঘাত হানেন। (২১ নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য)। গ্রেগরীর বাহিনীও সম্মুখ পার্শ্বদেশের প্রতিআক্রমণের চাপে পিছু হটতে বাধ্য হয়, তবে শিকলের বন্ধনের কারণে অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে।

গ্রেগরীর বাহিনী পিছু হঠতে থাকলে জাররার দীরজানের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে সামনে ঢুকে কমান্ডারের মুখোমুখি হন। দীরজান তার দেহরক্ষীদল পরিবেষ্টিত অবস্থায় প্রতিরক্ষা রেখার কাছাকাছি অবস্থান করছিল। জাররার দীরজানকে হত্যা করতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর পরপরই জাররারের উপরে এতো বেশি চাপ আসে যে, তিনি পিছু হটে মুসলিম প্রতিরক্ষা রেখা বরারব অবস্থান নেন।

দিনের শেষে রোমান বাহিনীর দুবাহুকে পিছু ঠেলে দেয়া হয়। সূর্যাস্তের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় অবস্থানের বাহিনীদ্বয়ও সংঘর্ষ পরিহার করে পিছু হটে এবং উভয় বাহিনী সকাল বেলার অবস্থানে ফিরে যায়। মুসলমানগণ সংকটের মধ্য দিয়ে দিনটি অতিবাহিত করলেও দিনের শেষে তাদের অবস্থান পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। আমর ইবনুল আসের সেক্টরে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ছিল সবচেয়ে বেশি। ফলে অন্যান্য কোরের তুলনায় তাঁর কোরে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বেশি হয়। যাহোক দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধও মুসলিম বাহিনীর অনুকূলে শেষ হয়।

ম্যাপ – ২৯ : ইয়ারমুকের যুদ্ধ – ২য় দিন
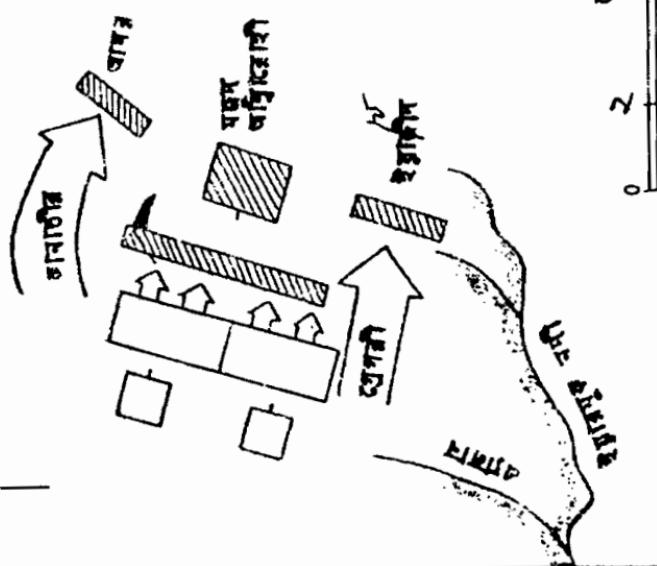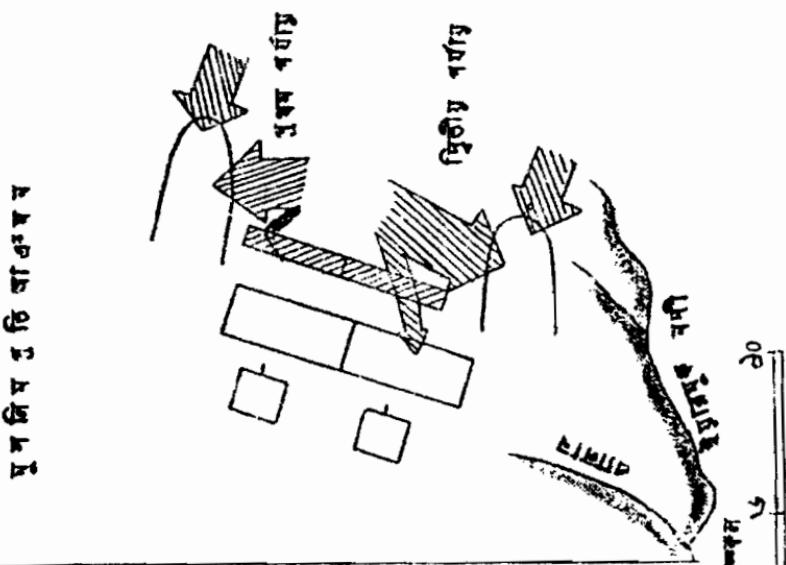
এই রাতটিও শান্তিতে অতিবাহিত হয়। মুসলিম রমণীগণ আহতদের সেবায় রাত্রি ব্যয় করে। সার্বিকভাবে মুসলমানদের মনোবল ছিল অত্যন্ত উঁচু। তারা বিশাল রোমান বাহিনীর আক্রমণের ঢেউকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে। সাধারণভাবে মুসলমানদের কৌশল ছিল প্রতিরক্ষামূলক। এমনকি তাদের প্রতিআক্রমণগুলোও ছিল প্রতিরক্ষা কৌশলের অংশ বিশেষ।

অপরপক্ষে রোমানদের মনোভাব কঠোর রূপ লাভ করে। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে হাজার হাজার রোমান নিহত হয়েছে। মুসলিম বাহিনী শুধু তাদের আক্রমণ প্রতিহতই করেনি বরং তাদের কেন্দ্রে আক্রমণ করে (জাররারের আক্রমণ) প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে বাহিনী কমান্ডারকে হত্যা করে। দীরজান ছিল একজন বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন জেনারেল এবং তার মৃত্যু ছিল রোমানদের জন্য একটি বড় ক্ষতি। মাহান দীরজানের বাহিনী কমান্ড করার জন্য কারীন নামের একজন নতুন জেনারেল নিয়োগ করে এবং আর্মেনীয় বাহিনীর কমান্ড ন্যস্ত করে বাম বাহুর কমান্ডার কানাতীরের হাতে। এই পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন ছিল এজন্য যে, তৃতীয় দিনের যুদ্ধে প্রধান আক্রমণ রচিত হবে মুসলিম বাহিনীর ডান বাহু ও কেন্দ্রীয় অবস্থানের ডান অংশের উপরে।

ইয়ারমুকের প্রান্তরে প্রথম দিনের যুদ্ধ যে অগ্নি-স্ফুলিংগের সূত্রপাত করেছিল তৃতীয় দিনে তা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের রূপলাভ না করলেও সেদিকেই অগ্রসর হতে থাকে। এই দিনটিও ছিল মুসলমানদের জন্যই।

রোমান পক্ষের শিকল পরিহিত বাহিনী এদিন তেমন একটা নড়াচড়া করে না, কেননা গতদিনে তারা কানাতীরের বাহিনীর তুলনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আবু উবায়দার কোরকে ব্যস্ত রাখার জন্য কারীনের বাহিনী সীমিত আক্রমণ পরিচালনা করে। কানাতীরের কমান্ডে আর্মেনীয় ও বাম বাহুর বাহিনীদ্বয় প্রচণ্ড তীব্রতা সহকারে মুসলিম বাহিনীর ডানবাহু ও শুরাহবীলের কোরের উপর আক্রমণ করে। শুরাহবীল ও আমর ইবনুল আসের কোরের মিলনস্থলকেই তারা তাদের আক্রমণের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেয়।

আমর ও শুরাহবীলের কোর রোমান আক্রমণের প্রথম ধাক্কাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু সংখ্যা-স্বল্পতার কারণে ক্লান্ত যোদ্ধা নিয়ে প্রতিপক্ষের নতুন নতুন সৈন্যের উপর্যুপরি আক্রমণ বেশিক্ষণ প্রতিহত করা সম্ভব হয় না। ফলে দুপুরের পূর্বেই মুসলিম প্রতিরক্ষা ব্যূহের কয়েক জায়গায় ভাঙন ধরে যায়। আমর ইবনুল আসের কোর ক্যাম্পের দিকে পিছু হটে কিন্তু বামের অংশ দৃঢ়তার সংগে স্বীয় অবস্থান ধরে রাখে। কানাতীরের বাহিনী মুসলিম প্রতিরক্ষা ব্যূহকে বেশ কয়েক জায়গায় ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয়।

মুসলিম রমণীরা আবার তাঁবুর খুঁটি, পাথর ও তীক্ষ্ণ জিহ্বা নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে এবং মুসলিম যোদ্ধাগণও আবার দ্রুত প্রত্যাবর্তন করে রোমানদের মুখোমুখি দাঁড়ায়। জনৈক মুসলিম যোদ্ধা পরে তার এক সংগীকে বলেছিল, "আমাদের নারীদের তুলনায় রোমানদের মোকাবিলা করাই সহজ।"[৩৯৬] দুই কোরের অধিকাংশ যোদ্ধা একত্রিত হয়ে দ্বিতীয় সারির প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করে এবং রোমান অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করে। এমনকি আমর তাঁর পদাতিক ও অশ্বারোহী সমন্বয়ে রোমানগণকে অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে পিছু ঠেলে দেয়ার লক্ষ্যে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন কিন্তু খুব সীমিত সফলতা অর্জন করেন।

যুদ্ধের এই পর্যায়ে একজন মুসলিম মহিলা খালিদের নিকট ছুটে আসেন। তাঁর মাথায় হঠাৎ ধারণা উদয় হয় যা তিনি তাঁকে অবহিত করা জরুরী বলে মনে করেন। "ওহে আল-ওয়ালিদের পুত্র," ভদ্রমহিলা বলেন, "আপনি আরবের মহান ব্যক্তিদের একজন। জেনে রাখুন যে, কমান্ডারগণ টিকে থাকলেই শুধু যোদ্ধাগণ টিকে থাকেন। কমান্ডারগণ দৃঢ় থাকলে যোদ্ধাগণও দৃঢ় থাকে। আর কমান্ডারগণ পরাজিত হলে যোদ্ধাগণও পরাজিত হয়।"[৩৯৭]

খালিদ (রা) তাঁকে পরামর্শের জন্য বিনয়ের সংগে ধন্যবাদ দান করেন এবং নির্ভয় দান করেন এই বলে যে, এই বাহিনীর কমান্ডারগণ পরাজিত হবে না।

খালিদ (রা) তাঁর মজুদ অশ্বারোহী রেজিমেন্টকে কানাতীরের ডান বাহুর উপরে পরিচালনা করেন। একই সংগে আমরের অশ্বারোহী রেজিমেন্ট ডান দিক দিয়ে ঘুরে কানাতীরের বাম বাহুর উপরে আঘাত হানে এবং আমর ও শুরাহবীলের পদাতিক বাহিনী সম্মুখ দিক থেকে প্রতিআক্রমণ করে (২২ নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য)। মুসলিম বাহিনীর এবারের প্রতিআক্রমণের মুখে রোমানগণ বেশ দৃঢ়তা প্রদর্শন করে এবং এই সংঘর্ষে শত শত মুসলিম প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু দিনের শেষ নাগাদ রোমান বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং পরিস্থিতি এরূপ হয় যে, উভয় বাহিনী সকাল বেলার অবস্থানে ফিরে যায়।

তৃতীয় দিনটি ছিল পূর্বের দিনের তুলনায় অনেক বেশি সংঘর্ষমুখর ও কঠিন। রোমান পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রতিপক্ষেল তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। দিনের যুদ্ধের শেষে মুসলমানদের মনোবল ছিল পূর্বের দিনের তুলনায় অনেক উঁচু। অপরপক্ষে রোমানগণ মানসিক দিক থেকে বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের সব প্রচেষ্টা একের পর এক ব্যর্থ হচ্ছে, এমনকি অনেক জীবনের বিনিময়েও। যুদ্ধের তিনদিন অতিবাহিত হলেও তাদের অবস্থান প্রথম দিনের তুলনায় মোটেও সুবিধাজনক নয়। মাহান তার জেনারেলদেরকে তিরস্কার করে এবং তারা পরবর্তী দিনের যুদ্ধে সফলতা লাভের প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে। পরের দিনের যুদ্ধটি ছিল আসলে খুবই সংকটময়।

৩৯৬. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা-১৪২।
৩৯৭. পূর্বোক্ত।

ম্যাপ – ২২ : ইয়ারমুকের যুদ্ধ – ৩য় দিন
রোমান আক্রমন
মুসলিম প্রতি আক্রমন
উ
আর্মেনীয়গণ
আমর
শুরাহ্‌বীল
আবু উবায়দা
ইয়াজীদ
ইয়ারমুক নদী
০ ২ ৬ ১০
১ ইঞ্চি : ৪ মাইল
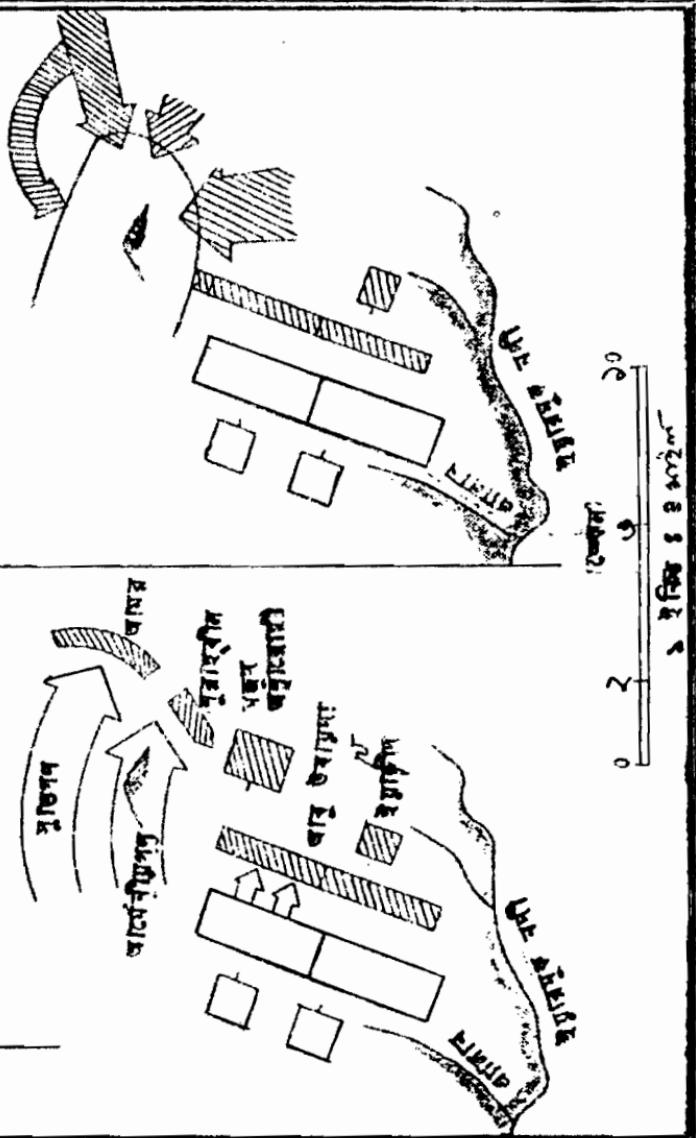
খালিদ (রা) ও আবু উবায়দা (রা) মুসলিম ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত যোদ্ধাদেরকে সাহস যুগিয়ে ও আহতদের সংগে কথা বলে রাত অতিবাহিত করেন। মুসলিম যোদ্ধাগণ আহত হলেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি পেত না। ভীষণভাবে আহত হলেই মাত্র একজন মুসলিম বিশ্রামের সুযোগ পেত। অল্প আঘাত মানে কয়েক ঘন্টার বিশ্রামের পর আবার যুদ্ধে ফিরে যাওয়া।

চতুর্থ দিনের যুদ্ধ শুরু হয় প্রচণ্ড উত্তেজনা ও বিজয়ের আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে। রোমানগণ জানতো যে, আজকের যুদ্ধই হবে চূড়ান্ত যুদ্ধ। তাই তারা আজ মুসলিম বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারা এও চিন্তা করে যে, এই আক্রমণ ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে আর কোনো উদ্যোগ গ্রহণের সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যাবে। পরিস্থিতিটি এমন যে, আজকে না হলে আর কখনও হবে না।

খালিদ (রা)ও জানতেন যে, যুদ্ধের পরিস্থিতি চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং আজকের দিনের ফলাফলের উপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যতের সফলতা অথবা ব্যর্থতা। এযাবত হাজার হাজার রোমানকে হত্যা করা হয়েছে এবং আজকেও যদি রোমানদেরকে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করে ব্যর্থ হতে হয় তাহলে তারা আর কখনও আক্রমণে উদ্যোগী হবে না। তারপর তাদের উপরই প্রতিআক্রমণ রচনার সময় আসবে। মুসলিম যোদ্ধার সংখ্যা অবশ্য পূর্বের তুলনায় অনেক কম। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তীরন্দাজগণ। তাদের মধ্যে মাত্র ২০০০ যোদ্ধা এখন শারীরিক দিক থেকে যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত। খালিদ (রা) এই ২০০০ তীরন্দাজকে চারটি কোরের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দেন। সংখ্যার স্বল্পতার কারণে প্রতিপক্ষের তুলনায় মুসলমানগল ছিল বেশি ক্লান্ত। তবে তাদের মনোবল ছিল সবসময় উঁচু।

খালিদ (রা) সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন ডান বাহুকে নিয়ে। অবশ্য একথা ভেবে তিনি আশ্বস্ত হন যে, মুসলিম বাহিনীর ডান বাহুর কমান্ডার আমর ইবনুল আস জেনারেল হিসেবে খুবই দক্ষ এবং খালিদ (রা) ছাড়া আর কারো সংগে তাঁর তুলনা চলে না। এ যাবত আমরের উপরই সবচেয়ে বেশি আঘাত এসেছে এবং আরো আসবে। যাহোক আরবদের মধ্যে সবচেয়ে চতুর ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত আমর ছিলেন যেকোনো রোমান জেনারেলের চেয়ে দক্ষ।

মুসলিম বাহিনীর ডান অংশের উপরে আক্রমণের মধ্য দিয়ে মাহান চতুর্থ দিনের যুদ্ধ শুরু করতে চায়। মুসলিম বাহিনীর এই অংশ পিছু হটতে বাধ্য হলে এবং কেন্দ্রীয় মজুদ তাদের সহায়তায় নিয়োজিত হলে সে তার বাহিনীর বাকি শক্তি নিয়োগ করে প্রতিপক্ষের বাম দিকের অংশের উপরে আঘাত হানবে। এই যুদ্ধ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কানাতীরের দু'বাহিনীকে মাঠে নামানো হয়। স্লাভ ও আর্মেনীয়গণ আমর ও শুরাহবীলের কোরের উপরে স্প্রিং-এর মতো লাফ দিয়ে পড়ে। প্রথম ধাক্কায় আমরকে পিছু হটতে হয় তবে পূর্বের দিনের মতো অতোটা পিছনে নয়।

এবারে মুসলমানগণ তাদের রমণীদের তিরস্কারের সম্মুখীন হতে রাজী নয়। মূল অবস্থানের অল্প পিছনেই তারা স্লাভদের চাপ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়। উভয় পক্ষে ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে তা মুসলিম পক্ষের তুলনায় রোমান পক্ষে অবশ্যই বেশি।

শুরাহ্‌বীলের সেক্টরে আর্মেনীয়গণ বেশ সাফল্য লাভ করে। তারা মুসলমান বাহিনীকে পিছনে ঠেলে তাদের ক্যাম্প পর্যন্ত নিয়ে যায়। রোমানদের এই সাফল্যের পিছনে জাবালার আরব খৃস্টানগণ দৃঢ় ভূমিকা পালন করে। শুরাহ্‌বীল অবশ্য রোমান অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হন, তবে তাদেরকে পিছনে ঠেলে দেয়া সম্ভব হয় না। অল্প সময়ের মধ্যে এটাও পরিষ্কার হয় যে, শুরাহ্‌বীলের কোর বেশি সময়ের জন্য রোমানদের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে পারবে না। এখন এই সেক্টরে মজুদ শক্তি নিয়ে খালিদ (রা)-এর হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

খালিদের বড় আশংকা ছিল রোমানগণ সর্বশক্তি নিয়োগ করে গোটা প্রতিরক্ষা ব্যূহের উপর আঘাত হানে কিনা। শত্রু একসংগে প্রতিরক্ষা ব্যূহের একাধিক এলাকায় ভাঙন সৃষ্টি করে সামনে অগ্রসর হলে তাকে ঠেকানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। কারণ মুসলিম বাহিনীর মজুদ শক্তি খুবই সীমিত এবং তা এক সংগে কয়েক জায়গায় নিয়োজিত করার মত নয়। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে খালিদ (রা) দু'বাহুতেই হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম এক বাহুতে পরে অন্য বাহুতে। কিন্তু রোমান বাহিনী যদি গোটা শক্তি নিয়ে কয়েক জায়গায় অগ্রসর হয় তাহলে তা সম্ভব হবে না। আমর ও শুরাহ্‌বীলের বিরুদ্ধে রোমানদের প্রাথমিক সাফল্য দেখে খালিদ (রা) আবু উবায়দা (রা) ও ইয়াযীদকে নির্দেশ দান করেন রোমানদেরকে সামনে থেকে আক্রমণ করে ব্যস্ত রাখার জন্য যাতে তাঁরা মুসলিম বাহিনীর বাম বাহুর উপর আঘাত হানতে না পারে। মধ্য-সকাল নাগাদ আবু উবায়দা (রা) ও ইয়াযীদ কারীন ও গ্রেগরীর বাহিনীদ্বয়ের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কোর দুইটি ঐ সময় রোমান বাহিনীর ডানদিকের অংশের উপরে চাপ সৃষ্টি করে যখন শুরাহ্‌বীলের অবস্থান ছিল সংকটাপন্ন।

বাম বাহুর ব্যাপারে কিছুটা নিশ্চিত হয়ে খালিদ (রা) শুরাহ্‌বীলের সহায়তার জন্য আর্মেনীয়দের উপরে আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মজুদ সৈন্যকে সমান দুই ভাবে বিভক্ত করে এক অংশের কমান্ড ন্যস্ত করেন কায়েস বিন হুবায়রার উপরে এবং বাকি অংশ রাখেন নিজের সংগে। কায়েসকে পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর অংশ নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে শুরাহ্‌বীলের কোরের পিছন দিক দিয়ে ঘুরে আর্মেনীয়দের উত্তরদিকে বাহুর উপর আঘাত হানেন। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আরব খৃস্টান ও আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে এখন তিন দিক থেকে প্রতিআক্রমণ চলে। খালিদ (রা) ডান দিক থেকে, কায়েস বাম দিক থেকে এবং শুরাহ্‌বীল সামনে থেকে। (২৩ নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য)। রোমানগণ মুসলমানদের ত্রিমুখী আক্রমণের চাপ দৃঢ়তার সংগে মুকাবিলা

করেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রের এই অংশে সংঘর্ষের তীব্রতা ভয়ংকর রূপ লাভ করে। মুসলমান ও আরব খৃস্টানদের মধ্যে কয়েকঘন্টা ধরে সমান সমান লড়াই চলতে থাকে। আর্মেনীয়গণকে অবশেষে মুসলিম পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর চাপে পিছনে হটতে হয়। তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও দাঁড়ায় প্রচুর। এই সংঘর্ষ গোটা বিকাল ধরে চলে এবং আরব খৃস্টানগণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

আর্মেনীয় বাহিনী পিছু হটার সংগে সংগে আমর ইবনলু আস স্লাভদের উপর নতুন করে আঘাত হানেন। স্লাভগণ পার্শ্ববর্তী আর্মেনীয়দের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই পিছু হটে যায়। মুসলিম বাহিনীর ডান বাহুর এই তৎপরতা সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে। ডান বাহুতে আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ চলাকালে বাম বাহুতেও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল এবং পরিস্থিতি ছিল অনুরূপ সংকটাপন্ন। বাম বাহুর পরিস্থিতি নাজুক হওয়ার কারণ খালিদ (রা)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর সমস্ত মজুদ সৈন্য ডান বাহুতে নিয়োজিত ছিল। বাম বাহুর উপরে কারীন ও গ্রেগরীর বাহিনীর আক্রমণ মুকাবিলার জন্য আবু উবায়দা ও ইয়াযীদকে নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

খালিদ (রা)-এর নির্দেশে বাম বাহুতে মোতায়েন আবু উবায়দা ও ইয়াযীদের কোর দু'টি প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে এবং একই সময়ে খালিদ (রা) গতিময় রক্ষীদল নিয়ে আর্মেনীয়দের উপরে আঘাত হানেন। প্রথমদিকে মুসলিম কোর দু'টি কিছুটা সফলতা লাভ করে এবং রোমানদেরকে পিছু ঠেলে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমানগণ প্রতিপক্ষের তীরন্দাজদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়। হাজার হাজার রোমান তীরন্দাজ এক সংগে তীর ছুঁড়তে শুরু করে। তীরের গতি ছিল অত্যন্ত তীব্র ও ঘনত্ব ছিল এতো বেশি যে, কিছু ঐতিহাসিকের বর্ণনা অনুযায়ী, "তীর শিলাঝড়ের মতো পড়তে থাকলে সূর্য আড়াল হয়ে যায়।"[৩৯৮] তীরের আঘাতে অনেক মুসলিম যোদ্ধা আহত হয় এবং এদের অনেকের আঘাত ছিল তীব্র। ৭০০ যোদ্ধা তাদের একটি করে চোখ হারায়। আবু উবায়দা (রা) ও ইয়াযীদের সেক্টর হতে বিলাপ ভেসে আসে, "আমার চোখ গেল, আমি দেখতে পাচ্ছি না।"[৩৯৯] বিশ্বাস করা হয় যে, এই সংঘর্ষে আবু সুফিয়ানও একটি চোখ হারান।[৪০০] এই দুর্যোগের কারণে চতুর্থ দিনের যুদ্ধকে চোখ হারানোর দিন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[৪০১] এই দিনটি ছিল মুসলমান যোদ্ধাদের জন্য ইয়ারমুক প্রান্তরের সবচেয়ে খারাপ দিন।

---

৩৯৮. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা- ১৪৬, ১৪৮।

৩৯৯. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা- ১৪৯।

৪০০. আবু সুফিয়ান তায়েফে একটি চোখ হারিয়েছেন বলে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে তা তায়েক নয় বরং ইয়ারমুক।

৪০১. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা- ১৪৮।

ম্যাপ – ২৩ : ইয়ারমুকের যুদ্ধ – ৪র্থ দিন
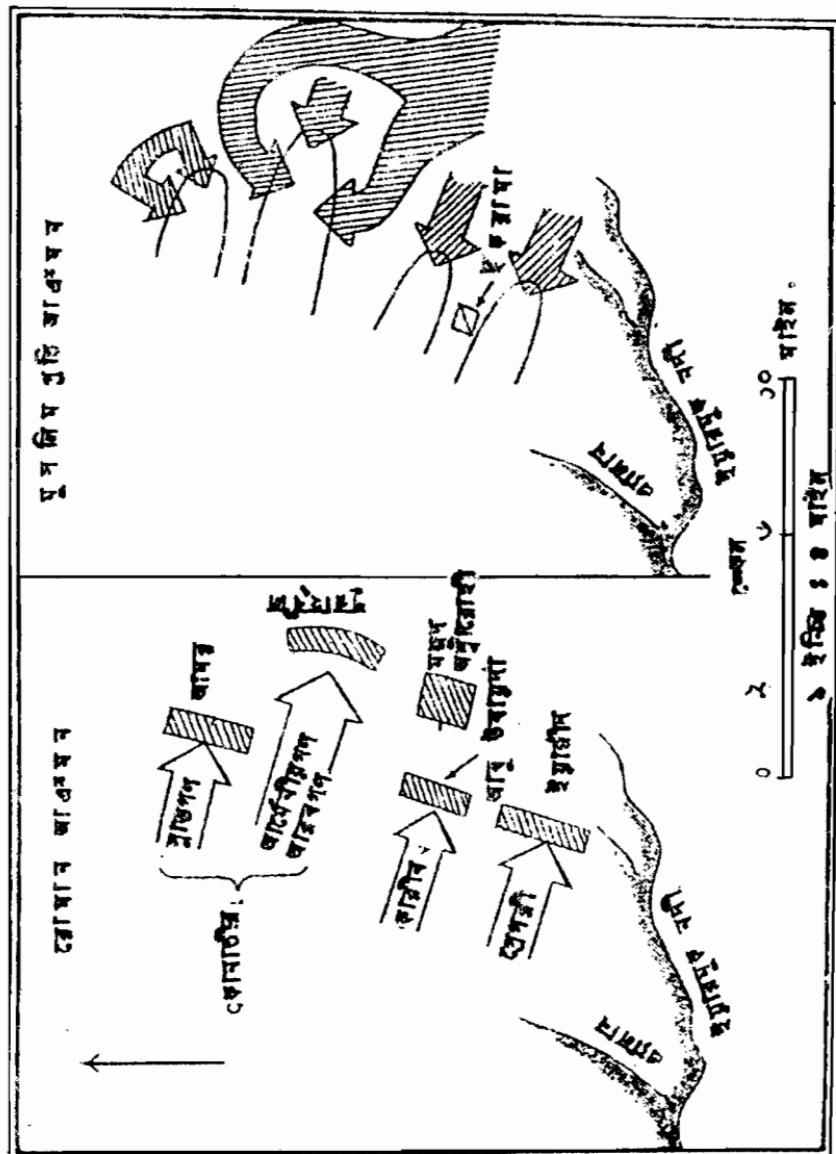
মুসলিম বামবাহু পিছনে সরে যায়। সংখ্যার স্বল্পতার কারণে তাদের নিজেদের তীর খুব একটা ভূমিকা পালন করতে পারে না। ফলে রোমান তীরের আঘাত হতে আত্মরক্ষার জন্য দ্রুত পিছু হটা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। এবং আবু উবায়দা (রা) ও ইয়াযীদ সংগে সংগে তাই করেছিলেন। উভয় পক্ষ সংঘর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং বেশ কিছু সময় স্বীয় অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। মুসলমানগণ আর সামনে অগ্রসর না হয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করে। তীরের আঘাতে চোখ হারিয়ে মুসলমানগণ কিছুটা আতংকিত ছিল।

মাহান ও তার বাহিনী কমান্ডারদ্বয় গ্রেগরী ও কাবীন লক্ষ্য করে যে, মুসলমানগণ বেশ ক্ষতির শিকার হয়েছে। তারা এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে চায়। মুসলমানগণ ধাক্কা সামলিয়ে ওঠার পূর্বেই রোমান বাহিনীদ্বয় আক্রমণের লক্ষ্যে সামনে অগ্রসর হয় এবং আবার সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রতিপক্ষের আক্রমণের চাপে মুসলমানগণ তাদের পূর্বের অবস্থানে চলে আসে। রোমানগণ জানে যে, আজকের যুদ্ধই হবে সিদ্ধান্তদানকারী যুদ্ধ। তাই তারা আরো তীব্রতা নিয়ে আক্রমণ করে। আবু উবায়দা ও ইয়াযীদের কোর আরো পিছু হটে যায় শুধু ইকরামার রেজিমেন্ট ছাড়া। ইকরামার রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল আবু উবায়দার সেক্টরের বাম অংশে।

ভয়ভীতিহীন ইকরামা স্বীয় অবস্থান থেকে পিছু হটতে অস্বীকার করে এবং তাঁর যোদ্ধাদেরকে আহবান জানায় তাঁর সংগে শপথ গ্রহণ করার অর্থাৎ তাঁরা যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিবে, তবু অবস্থান ত্যাগ করবে না। তাঁর এই আহবানে সাড়া দিয়ে ৪০০ যোদ্ধা মৃত্যুর শপথ গ্রহণ করে এবং ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো রোমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইকরামা শুধু যে তাঁর সেকটরের রোমান আক্রমণকে প্রতিহত করেন তাই নয় বরং তিনি পার্শ্ববর্তী রোমান রেজিমেন্টের উপরও আঘাত হানেন। মুসলমানগণকে এই অবস্থান কখনই হারাতে হয়নি। মৃত্যুর শপথ গ্রহণকারী ৪০০ যোদ্ধার সকলেই হয় প্রাণত্যাগ করে না হয় ভয়ংকরভাবে আহত হয়। তারা প্রতিপক্ষের বহুগুণ বেশি ক্ষতি করতে সক্ষম হয়। ইকরামা ও তার পুত্র আমর মারাত্মকভাবে আহত হন।

আবু উবায়দা (রা) ও ইয়াযীদের কোর পিছু হটলে এবারে ক্যাম্প থেকে দূরে থাকে। বরং মুসলিম রমণীরাই অগ্রসর হয়ে এসে পুরুষদের সংগে মিলিত হয় এবং তাদের অনেকের হাতেই ছিল উন্মুক্ত তরবারি। রমণীগণও বুঝতে পারে যে, এই পর্যায়ের ফলাফলের উপরই নির্ভর করে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ। তারা সামনে অগ্রসর হয় রোমানদের জন্য তরবারি ও তাঁবুর খুঁটি নিয়ে এবং আহত ও তৃষ্ণার্ত মুসলমানদের জন্য পানি নিয়ে। রমণীদের মধ্যে ছিল খাওলা, জুবায়েরের স্ত্রী ও উম্মে হাকীম, যে চিৎকার করে বলে, “খতনাবিহীনদের বাহুতে আঘাত করো।”[৪০২] রমণীগণ সামনে

---

৪০২. পূর্বোক্তঃ পৃষ্ঠা-১৪৯। বালাযুরীর মতে (পৃষ্ঠা ১৪১) এই শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিল হিন্দ।

গিয়ে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে মুসলিম কোরের মধ্য দিয়ে তাদেরকে দ্রুত অতিক্রম করে যায়। এর ফলেই এ সেক্টরের যুদ্ধের গতি ফিরে যায়।

রমণীগণকে অস্ত্র হাতে নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে দেখে এমনকি অনেকে পুরুষদের সামনে গিয়ে যুদ্ধ করতে থাকে, মুসলমানগণ ক্রোধে উন্মত্ত দানবে পরিণত হয়। অন্ধ আক্রোশে তারা রোমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই আক্রমণে না ছিল কোনো কৌশলের প্রয়োগ আর না ছিল কোনো কমান্ড। প্রত্যেক যোদ্ধাই তার জীবন বাজি রেখে মানুষের পক্ষে সম্ভব সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধ করতে থাকে। আবু উবায়দা ও ইয়াজীদের পরাক্রমশালী যোদ্ধাগণ তরবারি ও খন্‌জরের সাহায্যে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে রোমানদের উপর প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে এবং তারা হঠতে বাধ্য হয়। (২৩ নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য)।

শেষ বিকেল নাগাদ গোটা সম্মুখ জুড়ে যুদ্ধের তীব্রতা চরম আকার ধারণ করে। যুদ্ধের এই পর্যায়ে প্রতিটি মুসলিম জেনারেল তাঁদের সহযোদ্ধাদের সামনে থেকে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যান এবং তাঁরা প্রত্যেকেই সাহসী যোদ্ধাদের নেতৃত্বের যোগ্যতা প্রমাণ করেন। মুসলিম রমণীদের আঘাতে বেশ কিছু রোমান অন্ধকারে পালিয়ে যায়। খাওলা একজন রোমানের উপর চড়াও হন। কিন্তু রোমান যোদ্ধাটি একজন দক্ষ তরবারি চালক হওয়ায় খাওলার মাথায় তরবারির আঘাত হানতে সক্ষম হয়। ফলে খাওলা আহতদের গাঁদায় পড়ে যান এবং তাঁর চুল রক্তে লাল হয়ে যায়। রোমান বাহিনী পিছু হটে গেলে অন্যান্য রমণী খাওলার নিথর দেহ দেখে শোকে বিলাপ শুরু করে এবং জাররারকে খুঁজতে লেগে যায় তাঁকে তাঁর স্নেহময়ী বোনের এই দুঃসংবাদ দান করার জন্য। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত জাররারকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। পরে তিনি বোনের নিথর দেহের পাশে উপস্থিত হলে খাওলা উঠে বসেন এবং তাঁর মুখে ছিল মৃদু হাসি। তিনি অক্ষত ছিলেন।

সন্ধ্যা হলে সমস্ত তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। উভয় বাহিনী আবার তাদের মূল অবস্থানেই দাঁড়িয়ে থাকে। চতুর্থ দিনটি ছিল একটি ভয়ংকর দিন এবং ইয়ারমুকের মহান যোদ্ধারা এই দিনটির কথা কখনও ভুলবে না। রোমানগণ বিজয়ের কাছাকাছি উপনীত হয় এবং তাদের অনেক যোদ্ধা এই বিজয় অর্জনের জন্য জীবন বিসর্জন দেয় কিন্তু বিজয় তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল না। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অসহায়ের মতো জীবন দান করে গ্রেগরীর শিকলবদ্ধ বাহিনী ও আর্মেনীয় ও আরব খৃস্টানগণ। মুসলিম পক্ষেও ক্ষতির পরিমাণ ছিল পূর্বের দিনগুলোর তুলনায় অনেক বেশি এবং আহত হয়নি এমন যোদ্ধার সংখ্যাও ছিল কম। তবে তাদের মধ্যে একটি গৌরব ও তৃপ্তির ভাব ছিল যা তাদের অন্তরকে উষ্ণ রাখে। খালিদ (রা) ছিলেন সবার চেয়ে বেশি আনন্দিত। কেননা তিনি জানতেন যে, সংকট কেটে গেছে এবং যুদ্ধের গতি মোড় নিয়েছে।

চতুর্থ দিনের অর্থাৎ চোখ হারানোর দিনের যুদ্ধের বর্ণনা শেষ করার পূর্বে একটি ঘটনার উল্লেখ না করলেই নয়। শুরাহবীলের সেক্টরে যুদ্ধের বিরতির এক পর্যায়ে খালিদ

(রা)-কে খুবই উদ্বিগ্ন দেখা যায়। তা দেখে লোকজন বিস্মিত হয়ে পড়ে। কেননা তাঁকে সাধারণত উদ্বিগ্ন দেখা যায় না। তারা কারণটি জানতে পারে, যখন তিনি তাদেরকে তাঁর লাল ক্যাপটি খুঁজতে বলেন যা তিনি যুদ্ধের মাঠে ফেলেছেন। খোঁজাখুঁজির পর ক্যাপটি পাওয়া গেলে খালিদ (রা) সংশ্লিষ্ট সকলকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনেকে এই ক্যাপটি সম্পর্কে কিছুই জানতো না। তাই তারা ক্যাপটির রহস্য সম্পর্কে খালিদের নিকট জানতে চায়। খালিদ (রা) লাল ক্যাপের গল্পটি বলেন ঃ

বিদায় হজের সময় আল্লাহর রসূল (সা) তাঁর মাথার চুল ফেলে দিলে আমি কিছু চুল তুলে নেই। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ওহে খালিদ (রা) এই চুল দিয়ে তুমি কি করবে ?" আমি উত্তর দিয়েছিলাম, "হে আল্লাহর রসূল, আমি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় এর থেকে শক্তি অর্জন করবো।" তা শুনে তিনি বললেন, "যতক্ষণ এই চুল তোমার সংগে থাকবে তুমি অপরাজিত থাকবে।"

আমি সেই চুলগুলি এই ক্যাপটির মধ্যে রেখেছি। আল্লাহর রসূলের অশেষ দোয়ায় আমি এমন কোনো শত্রুর মুকাবিলা করিনি যে আমার নিকট পরাজিত হয়নি। তাঁর উপরে আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।[৪০৩]

এই ছিল খালিদের লাল ক্যাপের রহস্য যে কারণে তিনি ক্যাপটি হারাতে রাজী নন।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। আবু উবায়দার সেক্টরের বাম অংশের রক্তসিক্ত মাটির উপরে খালিদ (রা) বসে আছেন। তাঁর এক হাঁটুতে বন্ধুপ্রতিম প্রিয় ভাতিজা ইকরামার মাথা এবং অন্য হাঁটুতে আমর অর্থাৎ ইকরামার পুত্রের মাথা। পিতা ও পুত্রের দেহের খাঁচা হতে জীবন পাখি দ্রুত বিদায় নিচ্ছে। খালিদ (রা) আংগুলের ডগায় করে মৃতপ্রায় পিতা-পুত্রের মুখে ফোঁটা ফোঁটা পানি দিচ্ছেন এবং বলছেন, হানতামার পুত্র কি মনে করে যে, আমরা শহীদ হবো না ?[৪০৪] এভাবে আল্লাহর তরবারির স্নেহময় বাহুর বন্ধনে থেকে ইকরামা ও তাঁর পুত্র আমর শাহাদৎ বরণ করেন। যে লোকটি ছিলেন দীর্ঘ দিন ধরে ইসলামের চরম শত্রু আজ তিনি ইসলামের জন্যই শাহাদৎ বরণ করেন। চতুর্থ দিনের যুদ্ধে মুসলমানদের সাফল্যের সমস্ত কৃতিত্ব ইকরামা বিন আবু জহলের। মুসলমানগণ সিরিয়ায় আর কখনও এরূপ সংকটময় দিনের সম্মুখীন হবে না।

রাতটি শান্তিতে অতিবাহিত হয়। মানুষের পক্ষে যতটুকু সম্ভব তার চেয়েও বেশি শক্তি প্রয়োগ করে ক্লান্ত ও আহত যোদ্ধাগণ যুদ্ধ করেছে। তাদের বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। রাতের বেলা আবু উবায়দা (রা) সাধারণত একজন ডিউটি অফিসার মনোনীত করে দেন যিনি ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ চৌকি ও অন্যান্য এলাকার প্রহরীগণ সতর্ক আছে কিনা তা দেখেন। কিন্তু এই রাতে জেনারেলগণ এতো ক্লান্ত ছিলেন যে,

---

৪০৩. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা-১৫১।

৪০৪. তাবারী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯৭। হানতামার পুত্র ছিলেন উমর এবং আমর বলতে এখানে খালিদ বুঝিয়েছেন বনী মাখজুম গোত্রকে।

আবু উবায়দার মতো হৃদয়বান ব্যক্তি কাউকে এই কঠিন দায়িত্ব পালনের কথা বলতে পারেন না। তিনি নিজেও ছিলেন ভীষণ ক্লান্ত। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর তরবারির আঘাতেও অসংখ্য রোমানদের দেহ হতে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছে। তাঁরও বিশ্রাম প্রয়োজন ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং ডিউটি অফিসারের দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাসূল (সা)-এর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে নিয়ে তিনি বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখতে শুরু করেন। কিন্তু উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। তিনি সর্বত্র দেখতে পান জেনারেলগণ জেগে আছেন এবং ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে ঘুরে প্রহরী ও আহতদের খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং কথা বলছেন। জুবায়েরের সংগে তাঁর স্ত্রীও ঘোড়ায় চড়ে স্বামীকে কর্তব্য পালনে সহায়তা করেন।

পঞ্চম দিনের সকাল বেলা উভয় বাহিনী যুদ্ধের অবস্থানে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারা অবস্থান নেয় প্রথম দিনের যুদ্ধরেখা বরাবর। কিন্তু আজ যোদ্ধাদের দাঁড়ানোর মধ্যে কোনো তেজ নেই, দৃষ্টিতে নেই কোনো ধার। প্রত্যেকটি সুস্থ যোদ্ধার পাশে একজন করে আহত যোদ্ধা অবস্থান নেয়। অনেকের আঘাত ছিল এতো তীব্র যে তারা দাঁড়াতে পারছিল না, তবু যুদ্ধের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে। খালিদ (রা) উদ্বেগের সংগে রোমানদের দিকে তাকান–তারা আবার কোনো আক্রমণ পরিচালনা করে কিনা। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো নড়াচড়া দেখা যায় না, এমনকি দু'-এক ঘন্টার মধ্যেও নয়। এমন সময় রোমান অবস্থান থেকে একজন লোক সামনে অগ্রসর হয়ে আসে। এই লোকটি ছিল মাহানের দূত এবং সে কয়েকদিন যুদ্ধ বন্ধ রাখার সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছে যাতে স্থায়ী চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে। আবু উবায়দা (রা) প্রস্তাবটি প্রায় গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু খালিদের পরামর্শে বিরত থাকেন। খালিদের অনুপ্রেরণায় তিনি মাহানের দূতকে ফিরিয়ে দেন এবং বলেন, "আমরা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ঝামেলা শেষ করতে চাই।"[৪০৫]

খালিদ (রা)-এর অনুমান ঠিকই ছিল। রোমানগণ আর যুদ্ধ করতে আগ্রহী ছিল না। দিনের বাকি অংশটি কোনো ঘটনা ছাড়াই কেটে যায়। তবে এই সময়ে খালিদ (রা) মুসলিম বাহিনী পুনর্গঠন ও প্রতি আক্রমণের নির্দেশ দানের মধ্য দিয়ে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেন। সবকটি অশ্বারোহী দলকে একত্র করে একটি শক্তিশালী ও গতিময় অশ্বারোহী কোর সৃষ্টি করেন। খালিদের গতিময় রক্ষীদলটি এই কোরের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে কাজ করে। এই অশ্বারোহী কোরটির মোট সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৮,০০০-এ।

পরের দিন ইয়ারযুদ্ধের সমতল প্রান্তরে প্রতিশোধের তরবারি ঝলসে উঠবে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনের সকালটি ছিল পরিষ্কার ও উজ্জ্বল। সময়টি ছিল ৬৩৬ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসের চতুর্থ সপ্তাহ (১৫ হিজরীর রজব মাসের তৃতীয় সপ্তাহ)।

---

৪০৫. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা-১৫৩।

সকাল বেলার নিস্তব্ধতার মাঝে দিনের সম্ভাব্য ধ্বংসযজ্ঞের কোনো ইংগিত ছিল না। মুসলমানদেরকে পূর্বের দিনের তুলনায় আজ অনেকটা সজীব দেখাচ্ছিল এবং কামান্ডারের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনার কিছু কিছু জানতে পেরে যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আজকের বিজয়ের সম্ভাবনা তাদেরকে চোখ হারানোর দিনের স্মৃতি মুছে ফেলতে সহায়তা করে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে উদ্বিগ্ন রোমান বাহিনী বিজয়ের ব্যাপারে ততোটা আশাবাদী না হলেও তাদের মধ্যে শক্তির ঘাটতি ছিল না।

সূর্য জাবাল-উদ-দ্রুজ-এর আকাশ রেখা অতিক্রম করার পরপরই শিকলবদ্ধ রোমান বাহিনীর কমান্ডার গ্রেগরী ঘোড়ায় চড়ে সামনে অগ্রসর হয়ে আসে। অবশ্য সে বের হয় রোমান বাহিনীর কেন্দ্রীয় অবস্থান থেকে। তার উদ্দেশ্য হলো দ্বৈতযুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর কমান্ডারকে হত্যা করা। এতে মুসলমানগণ মানসিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়বে। সে মুসলিম বাহিনীর কেন্দ্রীয় অবস্থানের কাছাকাছি এসে চীৎকার করে চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করে এবং আহবান জানায়, "আরবদের কমান্ডার ছাড়া কেউ নয়।"[৪০৬]

আবু উবায়দা (রা) সংগে সংগে সামনে অগ্রসর হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। খালিদ (রা) ও অন্যান্য জেনারেল তাকে বিরত করার চেষ্টা করেন, কেননা দক্ষ যোদ্ধা হিসেবে গ্রেগরীর খুব খ্যাতি আছে এবং তাকে দেখতেও তাই মনে হয়। সকলেই মনে করে যে, খালিদ (রা) এই চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করলেই ভাল হয় কিন্তু আবু উবায়দা (রা) ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি খালিদের হাতে মুসলিম বাহিনীর পতাকা হস্তান্তর করে বলেন, "আমি ফিরে না আসলে, আপনি মুসলিম বাহিনী কমান্ড করবেন।" আবু উবায়দা (রা) গ্রেগরীর মুকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হন।[৪০৭]

দুই জেনারেল ঘোড়ার পিঠে থেকেই উন্মুক্ত তরবারি দিয়ে দ্বৈতযুদ্ধ শুরু করে। উভয়ে ছিল দক্ষ তরবারিচালক এবং তরবারির খেলা উভয় পক্ষের হাজার হাজার দর্শক মুগ্ধচিত্তে উপভোগ করে, তবে জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনায় রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে গ্রেগরীর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আবু উবায়দার নিকট হতে দূরে সরে যেতে শুরু করে। রোমান জেনারেল পরাজিত হয়েছে ভেবে মুসলিম যোদ্ধাগণ আনন্দে চিৎকার করতে থাকে, কিন্তু আবু উবায়দার মধ্যে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। গ্রেগরীর গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে তিনি ঘোড়াকে অনুসরণ করেন।

গ্রেগরী কয়েকশ কদম যেতে না যেতেই আবু উবায়দা (রা) তাঁর কাছাকাছি চলে যান। গ্রেগরী ইচ্ছাকৃতভাবে ঘোড়ার গতি নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে আবু উবায়দা (রা) তাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেন। সে হঠাৎ ঘুরেই আবু উবায়দা (রা)-কে তরবারি দিয়ে আঘাত করে। আপাত দৃষ্টিতে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগের ব্যাপারটি ছিল আবু উবায়দাকে অসতর্ক করার একটি কৌশল। কিন্তু আবু উবায়দা (রা) নতুন যোদ্ধা নন। তিনি

---

৪০৬. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা-১৫৩।
৪০৭. পূর্বোক্ত।

তরবারির খেলা ভালই জানেন এবং গ্রেগরী কোনো দিক থেকেই তার সমকক্ষ ছিল না। গ্রেগরী তরবারি উত্তোলন করে, কিন্তু সে আঘাত করার পূর্বেই আবু উবায়দার তরবারি তার ঘারের উপরে পড়ে। তার হাত থেকে তরবারি পড়ে যায় এবং সেও ঘোড়ার পিঠ হতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিথর হয়ে যায়। ঘোড়ার পিঠে বসেই আবু উবায়দা (রা) কিছুক্ষণের জন্য রোমান জেনারেলের বিশাল দেহের প্রতি তাকিয়ে থাকেন। তারপর তিনি গ্রেগরীর স্বর্ণখচিত অতি মূল্যবান পোশাক, বর্ম ও অস্ত্রপাতি উপেক্ষা করে, জাগতিক বিষয় সম্পদের প্রতি অনীহাবশতই তা তিনি করেন, এই দরবেশতুল্য সেনাপতি ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে মুসলিম বাহিনীর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

আবু উবায়দা (রা) ফিরে আসার সংগে সংগে খালিদ (রা) আর বিলম্ব না করে পতাকাটি হস্তান্তর করেই ঘোড়া ছুটিয়ে আমর ইবনুল আসের বাহিনীর পিছনে অবস্থিত অশ্বারোহী দলের সংগে যোগদানের জন্য চলে যান। নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌঁছার সংগে সংগেই তিনি সাধারণ আক্রমণ সৃষ্টির ইঙ্গিত দান করেন এবং মুসলিম বাহিনী গোটা সম্মুখ জুড়ে আক্রমণের লক্ষ্যে সামনে অগ্রসর হয়। তাদের বাম বাহু ও কেন্দ্রে মোতায়েন কোরদ্বয় সম্মুখের রোমান বাহিনীদ্বয়কে আক্রমণ করে কিন্তু খুব একটা চাপ সৃষ্টি করে না। ডানদিকের অশ্বারোহী দল পাশ দিয়ে ঘুরে রোমান বাহিনীর বাম বাহুতে চলে যায়। খালিদ (রা) সেখান থেকে অশ্বারোহী দলকে দু'ভাগে বিভক্ত করে একদলকে প্রেরণ করেন রোমান বাহিনীর বাম বাহুর অশ্বারোহী দলকে মুকাবিলার জন্য এবং বাকি দলটি নিয়ে তিনি রোমান বাহিনীর বাম বাহুর উপর (স্লাভদের উপরে) আঘাত হানেন। একই সময়ে আমর ইবনুল আসও স্লাভদের উপর সামনে থেকে প্রচণ্ড তীব্রতাসহ ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্লাভগণ ছিল শক্ত যোদ্ধা এবং কিছু সময় তারা অত্যন্ত সাহসিকতার সংগে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে, কিন্তু অশ্বারোহী দলের সমর্থন না পেয়ে এবং সম্মুখ ও পার্শ্বদেশ থেকে আক্রান্ত হয়ে তারা শেষ পর্যন্ত আশা ছেড়ে দেয়। খালিদ (রা) ও আমরের আক্রমণের চাপে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে তারা রোমান বাহিনীর কেন্দ্রের দিকে অর্থাৎ আর্মেনীয়দের অবস্থানের দিকে প্রত্যাহার করে।

রোমান বাহিনীর বাম বাহুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ায় আমর তাঁর কোরকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যান এবং বাম দিকে ঘুরে রোমান বাহিনীর বাম বাহুতে অর্থাৎ বর্তমানে আর্মেনীয়দের বাম বাহুর উপর আঘাত হানেন। পলাতক স্লাভ সৈন্যগণ বিশৃংখলভাবে আর্মেনীয়দের সংগে যোগ দেয়ায় আর্মেনীয়দের মধ্যেও কিছুটা বিশৃংখলা বিরাজ করছিল। ইতিমধ্যে খালিদ (রা) মুসলিম অশ্বারোহী দলকে রোমান বাহিনীর বাম অংশের অশ্বারোহী দলের বিরুদ্ধে, যাদেরকে তিনি অশ্বারোহীর এক অংশ দ্বারা ব্যস্ত রেখেছিলেন, পরিচালনা করেন। মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের দ্বিতীয়

পর্যায় শুরু হয় যখন একই সংগে শুরাহবীল সম্মুখে থেকে ও আমর পাশ থেকে আর্মেনীয়দেরকে আক্রমণ করেন। এই সময়ে খালিদ (রা) রোমান বাম বাহুর অশ্বারোহী দলকে পিছু হটতে বাধ্য করেন। রোমান অশ্বারোহী দলটি খালিদ (রা)-এর হাতে বড় ধরনের মার খেয়ে উত্তর দিকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে থাকে। তাদের আর যুদ্ধের দরকার নেই। (২৪ নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য)

এখানে খালিদ (রা)-এর যুদ্ধ পরিকল্পনা আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। কেননা যুদ্ধের অগ্রগতির সংগে সংগেই তা সবার সামনে ফুটে উঠবে। তবে শত্রুর অশ্বারোহী দল সম্পর্কে খালিদের পরিকল্পনাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, রোমান অশ্বারোহী দলকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে তাড়াতে হবে যাতে পদাতিক, রোমানদের অধিকাংশ সৈন্যই পদাতিক বাহিনী অশ্বারোহী বাহিনীর সমর্থন হতে বঞ্চিত হয় এবং পার্শ্বদেশ ও পিছন হতে আক্রান্ত হয়ে অসহায় বোধ করে। দ্রুত গতিসম্পন্ন যুদ্ধে অশ্বারোহী দল হচ্ছে প্রভাবশালী শক্তি এবং অশ্বারোহীর সমর্থন ব্যতিরেকে যে কোন বাহিনীকে খুবই বিপদে পড়তে হয় ও তাদের পক্ষে দ্রুত চলাচল করে আত্মরক্ষা করা বা অবস্থান পরিবর্তন করাও সম্ভব হয় না।

খালিদ (রা) যে সময় রোমান বাহিনীর বাম অংশের অশ্বারোহী দলকে তাড়িয়ে দেন, প্রায় একই সময় মাহান রোমান অশ্বারোহীর অবশিষ্ট যোদ্ধাদেরকে কেন্দ্রীয় অবস্থানের পিছনে একত্র করে একটি শক্তিশালী গতিময় দলে পুনর্গঠন করে প্রতি আক্রমণ চালিয়ে হৃত অবস্থান উদ্ধার করার লক্ষ্যে। কিন্তু বিশাল রোমান অশ্বারোহী আক্রমণ শুরু করার পূর্বেই মুসলিম অশ্বারোহী দল সম্মুখ ও পার্শ্বদেশ হতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাহানের উপস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রোমানগণ কিছু সময় বীরত্বের সংগে যুদ্ধ করে। কিন্তু এরূপ টলটলায়মান পরিস্থিতিতে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত নিয়মিত রোমান অশ্বারোহী বাহিনীর হালকা ও দ্রুত গতিসম্পন্ন মুসলিম অশ্বারোহীর সংগে সুবিধা করে উঠতে পারে না। মুসলিম অশ্বারোহী দল হালকা ও গতিময় হওয়ায় বড় সুবিধা ছিল যে, তারা খুব সহজেই আঘাত হানতে, প্রত্যাহার করতে ও কৌশলে চলাচল করে আবার আঘাত হানতে সক্ষম ছিল। আত্মরক্ষার কোন উপায় না দেখে এক সময় রোমান অশ্বারোহী দল মাহানের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তাকে সংগে নিয়েই উত্তর দিকে পালিয়ে যায়। এভাবেই রোমান অশ্বারোহী দল তাদের পদাতিক বাহিনীকে ভাগ্যের উপরে ছেড়ে দেয়। মাহানসহ ৪০,০০০ অশ্বারোহীর বিশাল বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়। এতে ছিল অর্ধেক নিয়মিত রোমান অশ্বারোহী ও অর্ধেক জাবালা আইহামের আরব খৃস্টান।

মাপ -২৪ : ইয়ারমুকের যুদ্ধ - ৬ষ্ঠ দিন - ১
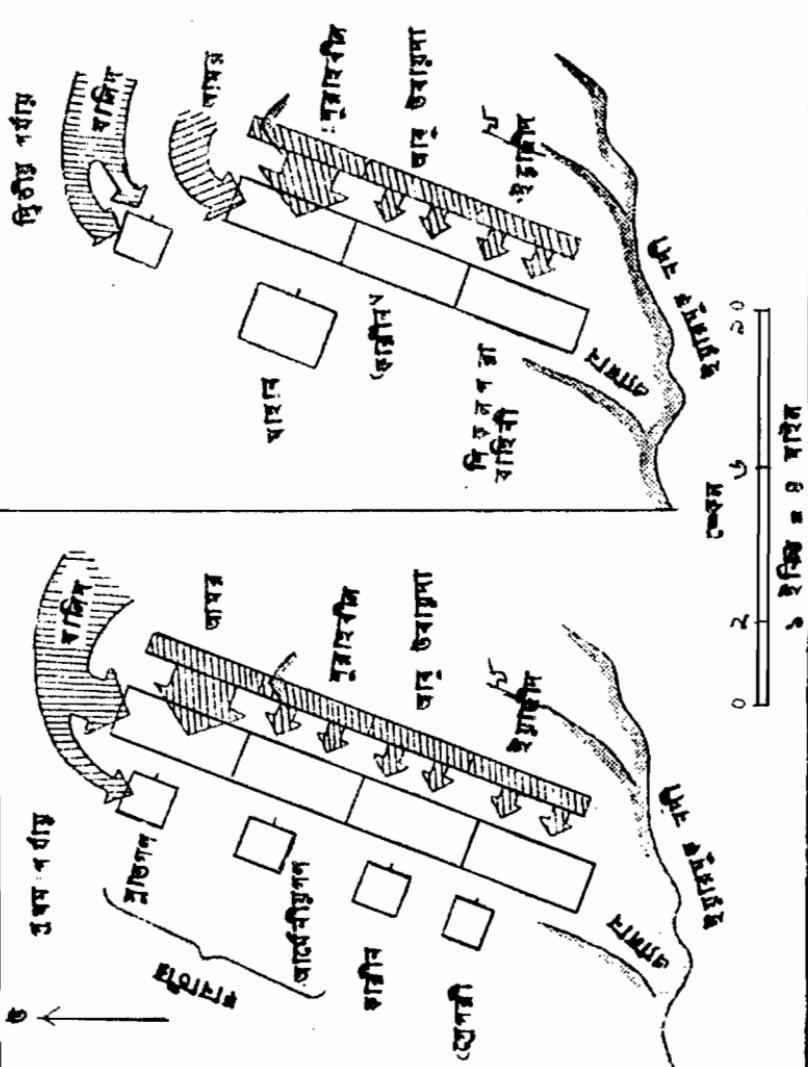
সকাল বেলার এই অশ্বারোহী অভিযানকালে জাররারকে কোথাও দেখা যায় না। মুসলমানগণ তাঁর বিশেষ যুদ্ধকৌশল দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়। তারা এও জানতো না যে, তিনি কোথায় আছেন এবং খালিদ (রা)ও কাউকে তা বলেননি।

এদিকে আর্মেনীয়গণ দৃঢ়তার সংগে আমর ও শুরাহ্বীলকে মুকাবিলা করতে থাকে। মুসলিম কোর দু'টি তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কিছুটা ভাঙন ধরাতে পারলেও তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এর থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, আর্মেনীয়গণ যোদ্ধা হিসেবে ছিল কতো সাহসী।[৪০৮] আবু উবায়দা (রা) ও ইয়াযীদও তাঁদের শাসনের কারীন ও গ্রেগরীর শিকলপরা বাহিনীকে যুদ্ধের মাধ্যমে ব্যস্ত রাখেন। তাদেরকে ব্যস্ত রাখাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। খালিদ (রা) রোমান অশ্বারোহীদলকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে আর্মেনীয়দেরকে পিছন থেকে আক্রমণ করেন। (২৫ নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য) ত্রিমুখী আক্রমণের চাপে আর্মেনীয়দের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে যায়। তারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ধাবিত হয়। একমাত্র এই দিকটিই ছিল উন্মুক্ত। যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পালাতে পেরে তারা খুবই স্বস্তিবোধ করে এই ভেবে যে, মুসলিম অশ্বারোহী দল তাদেরকে আর ধাওয়া করছে না যা তারা সহজেই করতে পারতো। তাই তারা নিরাপদ মনে করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ধাবিত হয়। খালিদ (রা)ও চেয়েছিলেন তারা ঐদিকেই ধাবিত হোক।

আর্মেনীয় প্রতিরোধ ভেঙে গেলে এবং তারা কানাতীরের স্লাভ যোদ্ধাদের অবশিষ্ট অংশসহ বিশৃংখলভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে ওয়াদি-উর-রাক্কাদের দিকে পালাতে থাকলে রোমান বাহিনীর বাকি অংশ তাদের অবস্থান সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে। তাদের পিছন এবং বাহু সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তারাও প্রত্যাহার শুরু করে এবং সংগঠিতভাবে পশ্চিমের দিকে ধাবিত হয়। এক্ষেত্রেও খালিদ (রা) তাদেরকে পিছু ধাওয়া করা থেকে বিরত থাকেন।

সূর্য তখনও মাথার উপরে যায়নি। এই সময়ের মধ্যে গোটা রোমান পদাতিক বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়ন করতে থাকে। কোনো অংশ বিশৃংখলভাবে এবং কোনো অংশ শৃংখলার সংগে। তারা ওয়াদি-উর-রাক্কাদের দিকে ধাবিত হয়। তাদের পিছনে অগ্রসর হয় পুনর্গঠিত মুসলিম বাহিনী। মুসলিম অশ্বারোহী দল রোমান বাহিনীর উত্তরে পলায়নের পথটি বন্ধ করে দেয়। যদিও এর পূর্বেই হাজার হাজার স্লাভ ও আর্মেনীয় যোদ্ধা উত্তর দিকে পালাতে সক্ষম হয়েছে। এভাবে মুসলমানগণ রোমান সম্রাটের পরাজিত বাহিনীর পলায়নের পথ বন্ধ করে তাদেরকে একটি বিশেষ দিকে ধাবিত করতে বাধ্য করে।[৪০৯]

---

৪০৮. গিবন তাঁর রোমান সাম্রাজ্যের ক্ষয় ও পতন গ্রন্থে আর্মেনীয়দের সম্পর্কে বলেছেন, "তারা ছিল রোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে দক্ষ যোদ্ধা।"

৪০৯. ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা-১৫২।

ম্যাপ – ২৫ : ইয়ারমুকের যুদ্ধ – ৬ষ্ঠ দিন–২
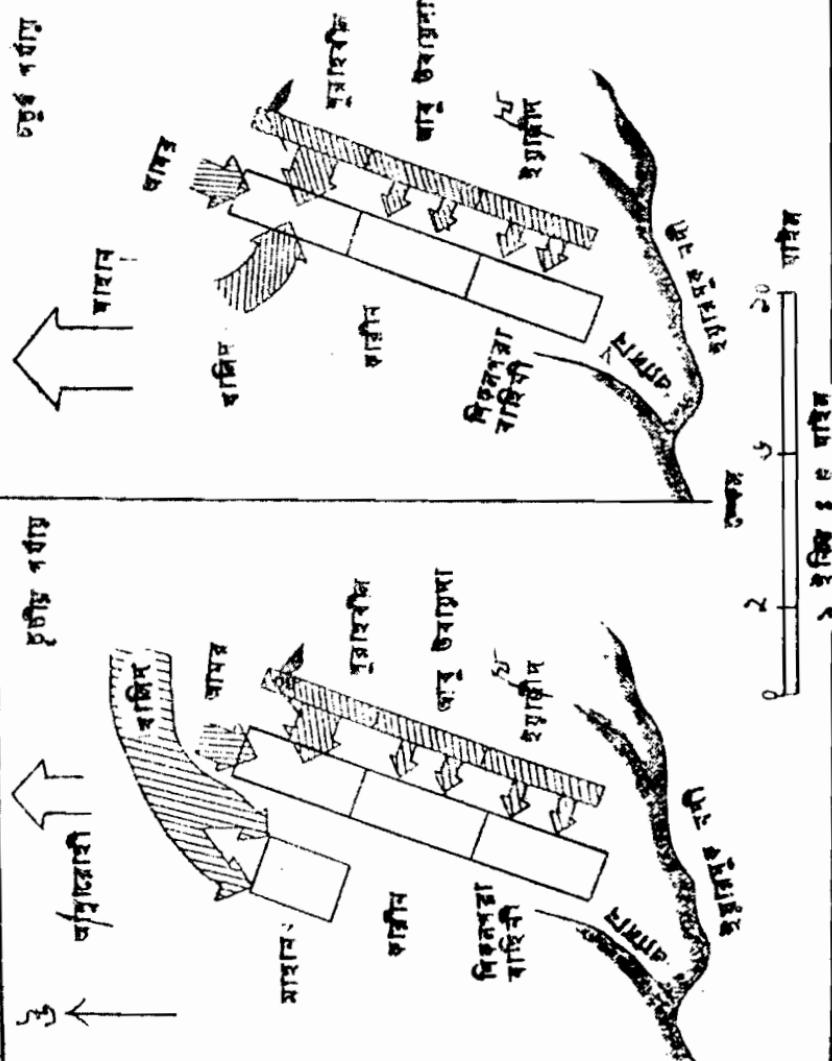
রোমানগণ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুটতে থাকে। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের নিকট হতে যতো বেশি সম্ভব দূরত্ব সৃষ্টি করা। তারা জানতো যে, উত্তরের পলায়ন পথটি মুসলিম অশ্বারোহী দল বন্ধ করে দিয়েছে। তবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গিরিখাতটির সরু অংশ দিয়ে একটি রাস্তা হয়ে গেছে সেটিকে পলায়নের পথ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অফিসারগণ তাদের যোদ্ধাদেরকে গিরিখাতের এই সরু অংশের দিকে পরিচালিত করতে থাকে। সম্মুখের রেজিমেন্টটি গিরিখাতের সরু অংশে পৌঁছেই পূর্ব পাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নেমে পানির ক্ষীণ স্রোত অতিক্রম করতে থাকে। গিরিখাতটির অন্যান্য অংশের তুলনায় এই অংশের পূর্ব পাড়টি ছিল ঢালু কিন্তু পশ্চিম পাড়টি ছিল খুব খাড়া। বিশেষ করে পশ্চিম পাড় বেয়ে ওঠা রাস্তাটির দু'ধার ছিল এতো খাড়া যে, তা যে কোনো ধরনের পারাপার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতো এবং এই খাড়া পাড়ের উপরে অবস্থান নিয়েই মাত্র কয়েকজন সাহসী যোদ্ধার পক্ষে একটি বিশাল বাহিনীকে ঠেকানো সম্ভব ছিল।

ইয়ারমুকের প্রান্তর হতে পালাতে পারার আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রথম রেজিমেন্টটি রাস্তা ধরে গিরিখাতটি অতিক্রম করে পশ্চিম পাড়ে পৌঁছে যায়। তারা খাড়া পাড়টি অতিক্রমের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে দেখতে পায় যে, একদল মুসলমান উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে পাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। আর তাদের সবার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে একজন হালকা গড়নের যুবক যার কোমরের উপর হতে উলংগ।

রাতের বেলা খালিদ (রা) গতিময় রক্ষীদলের ৫০০ অশ্বারোহী যোদ্ধাসহ জাররারকে পাঠিয়েছিলেন রোমান বাহিনীর অনেক বাম দিক দিয়ে ঘুরে ওয়াদি-উর-রাক্কাদের পিছনে গিয়ে গিরিখাতটির পশ্চিম পাড়ে অবস্থান নিয়ে থাকার জন্য। জাররার আবু জুয়েদ[৪১০] নামের জনৈক আরব খৃস্টানের সহায়তায় খুবই গোপনীয়তার সংগে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন। রোমানগণ এখানে মুসলিম যোদ্ধাদের উপস্থিতির সম্ভাবনা স্বপ্নেও চিন্তা করেনি। কেননা তারা ওয়াদি-উর-রাক্কাদের অবস্থানকে কৌশলগত বিবেচনায় অনেক দূরে মনে করেছিল। জাররার রাতের আঁধারে গিরিখাতটির পশ্চিম পাড়ে পৌঁছে তার লোকদেরকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। রোমানদেরকে খাড়া পাড়ের রাস্তা ধরে উপরে উঠতে দেখে তারা গিরিখাতের পশ্চিম পাড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং নীচে ক্লান্ত-শ্রান্ত রোমানদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে (২৬ নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য)।

---

৪১০. খালিদ (রা) একটি ধুলিঝড়ের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যা রোমানদের মুখের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, রোমানদেরকে পরাজিত করেছিলেন বলে পরবর্তীকালের কিছু পশ্চিমা ঐতিহাসিক যে কাহিনী দাঁড় করিয়েছেন তা সম্পূর্ণ অসত্য। কোনো মুসলিম ঐতিহাসিক অনুরূপ ঝড়ের কথা উল্লেখ করেননি। গিবন বলেছেন যে, (পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৭) থিওফেনস-এর মতে ধুলিঝড় ও প্রতিকূল বাতাস ছিল, কিন্তু একটি শিশুও বুঝতে পারবে যে, পূর্ব থেকে পরিকল্পনা না থাকলে হঠাৎ করে একটি ধুলিঝড়ের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর জন্য ৩০,০০০ যোদ্ধার (আরবগণ বাদে) একটি বিশাল বাহিনীকে দীর্ঘ ১১ মাইল রেখা বরাবর মোতায়েন করে স্বল্প সময়ের মধ্যে এরূপ নিখুঁত যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন তৎপরতা চালানো যায় না। তদুপরি তখনকার দিনে ঘোড়া ছাড়া যোগাযোগের আর কোনো মাধ্যম ছিল না। এই কাহিনীটি দর্পিত পশ্চিমা ঐতিহাসিকগণের রোমানদের পরাজয়ের একটি অজুহাত সৃষ্টির প্রচেষ্টা বৈ আর কিছুই নয়।

ম্যাপ - ২৬ : ইয়ারমুকের যুদ্ধ - ৬ষ্ঠ দিন - ৩
উ
জাবিয়া
রোমানদের পলায়ন
অশ্বারোহী
পদাতিক
ওয়াদি-উর-রাক্কাদ
জাররাহ
অগভীর অংশ
ইয়ারমুক নদী
স্কেল
0 2 ৬ ১০
এক ইঞ্চি = ৪ মাইল
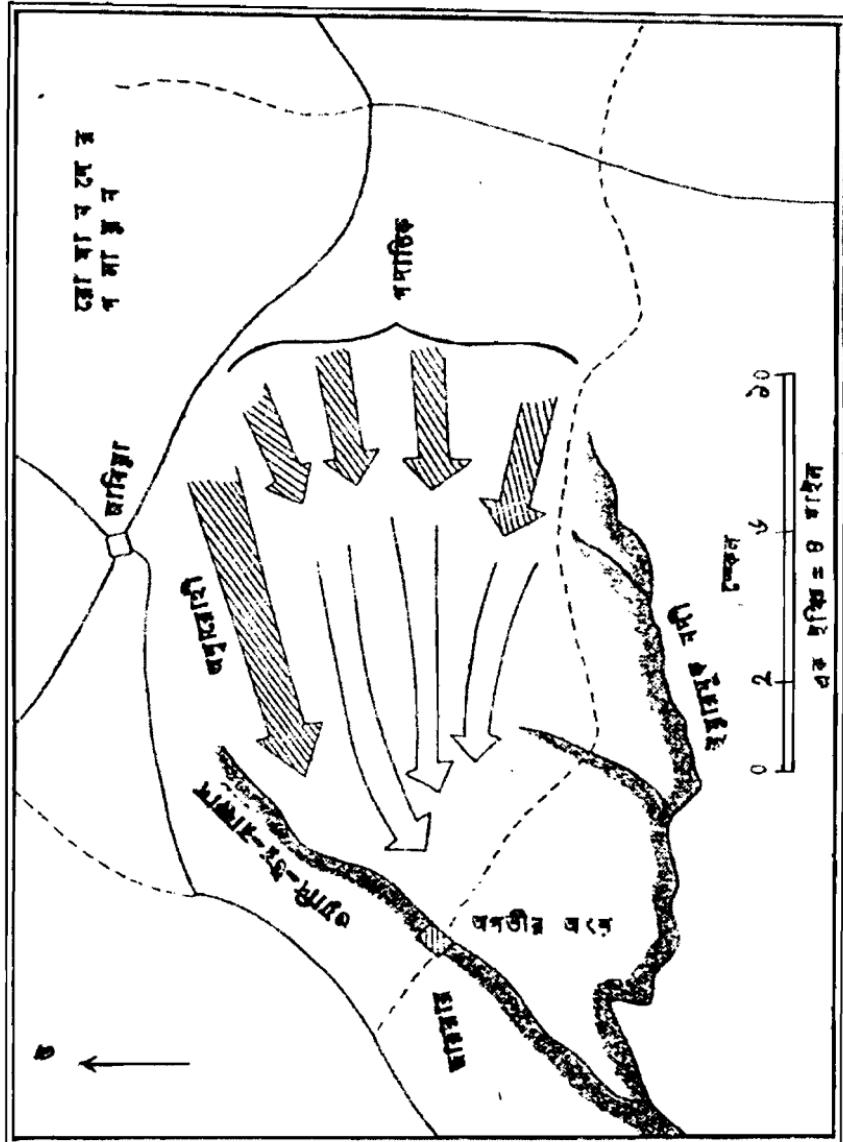
শীঘ্রই রোমানদের উপরে পাথরের ঝড় নামে। তাদের কয়েকজন পারে উঠতে সক্ষম হলেও সংগে সংগেই তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। পাথরের ঝড়ে আক্রান্ত হয়ে সামনের দল পিছনের দলের উপরে গড়িয়ে পড়ে। তারা আবার তাদের পিছনের দলের উপরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং এই ভাবে চলতে থাকে। জাররারের আঘাতে হাজার হাজার রোমান আর্তনাদে গড়াতে গড়াতে গিরিখাতের তলদেশে পৌঁছে যায়।

গিরিখাতের পূর্বতীরের রোমানগণ তাদের অগ্রবর্তী দলের দুর্দশা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারা নিশ্চিত বুঝতে পারে যে, পলায়নের এই পথটিও বন্ধ হয়ে গেছে। পারাপারের রাস্তাটির দুই পাড় খাড়া হওয়ায় কৌশলে সৈন্য চালিয়ে জাররারের মুকাবিলা করার কোনো উপায়ও নেই। তাই তারা বাধ্য হয়ে পিছনে ফিরে পূর্বদিক থেকে ধাবমান মুসলিমদের মুকাবিলা করার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে। সৈনিকদের সংগে পলায়নপর জেনারেলগণের নির্দেশে রোমানগণ দ্রুত অবস্থান নিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। তাদের পিছনে থাকে ওয়াদি-উর-রাক্কাদ এবং ডানে ইয়ারমুক নদী। তারা দুদিক থেকে বিপদের সম্মুখীন হয়। একদিকে মুসলিমগণ এবং অন্যদিকে গিরিখাত। তারা সহসা বুঝে উঠতে পারে না কোনটি তাদের জন্য বেশি বিপজ্জনক।

যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনের শেষ বিকেলের দিকে শুরু হয় মুসলিম আক্রমণের শেষ পর্যায় (২৭ নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য)। রোমান বাহিনীর মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ ইয়ারমুক সমতল ভূমির এই জনাকীর্ণ কোনায় আটকা পড়ে। মুসলিম বাহিনী তাদেরকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে ফেলে—পূর্বদিকে পদাতিক বাহিনী ও উত্তর দিকে অশ্বারোহী দল। এই পর্যায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩০,০০০-এর কম। পরিস্থিতি এমন হয়ে যায় যে, কৌশল প্রয়োগ করে সৈন পরিচালনার আর কোনো সুযোগ থাকে না। কমান্ডার তাঁর অপরিসীম দূরদর্শিতা ও দক্ষতা প্রয়োগ করে যোদ্ধাদের সামনে প্রতিপক্ষের উপর আঘাত হানার সবচেয়ে সহায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এখন যুদ্ধ করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের বিষয়টি নির্ভর করে যোদ্ধাদের দক্ষতার উপরে। মরুভূমির সিংহদল শেষ পর্যায়ের আক্রমণে অগ্রসর হলে জেনারেলগণও তরবারি হাতে সাধারণ যোদ্ধাদের স্রোতে মিশে যান।

আক্রমণকারী মুসলমানগণ তরবারি ও বর্শার সাহায্যে গাদা-গাদি অবস্থায় দণ্ডায়মান হতবুদ্ধি রোমানদের উপর আঘাত হানে। কিছু কিছু জায়গায় রোমানগণ এতো ঠাসা-ঠাসি অবস্থায় ছিল যে, অস্ত্র চালানোর জন্য হাত ঘুরানোরও কোনো সুযোগ ছিল না। তবে সম্মুখ সারির রোমানগণ খুব বীরত্বের সংগে যুদ্ধ করে অগ্রসরমান মুসলিম স্রোতকে ঠেকানোর চেষ্টা করে, যদিও তা ছিল ব্যর্থ প্রচেষ্টা। শীঘ্রই এই বাধা দূর হয় এবং মুসলমানগণ সারি সারি রোমান যোদ্ধাকে হত্যা করতে করতে অগ্রসর হতে থাকে। ধুলা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের ফলে রোমানগণ চারদিক ছুটাছুটি করে একে অপরের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়তে থাকে। শক্ত সমর্থ নয় এমন রোমান যোদ্ধাগণ নিজেদের লোকদের পায়ের নীচে চাপা পড়ে দুঃখজনক মৃত্যুর শিকার হয়।

ম্যাপ – ২৫ ঃ ইয়ারমুকের যুদ্ধ ঃ ৬ষ্ঠ দিন – ৪
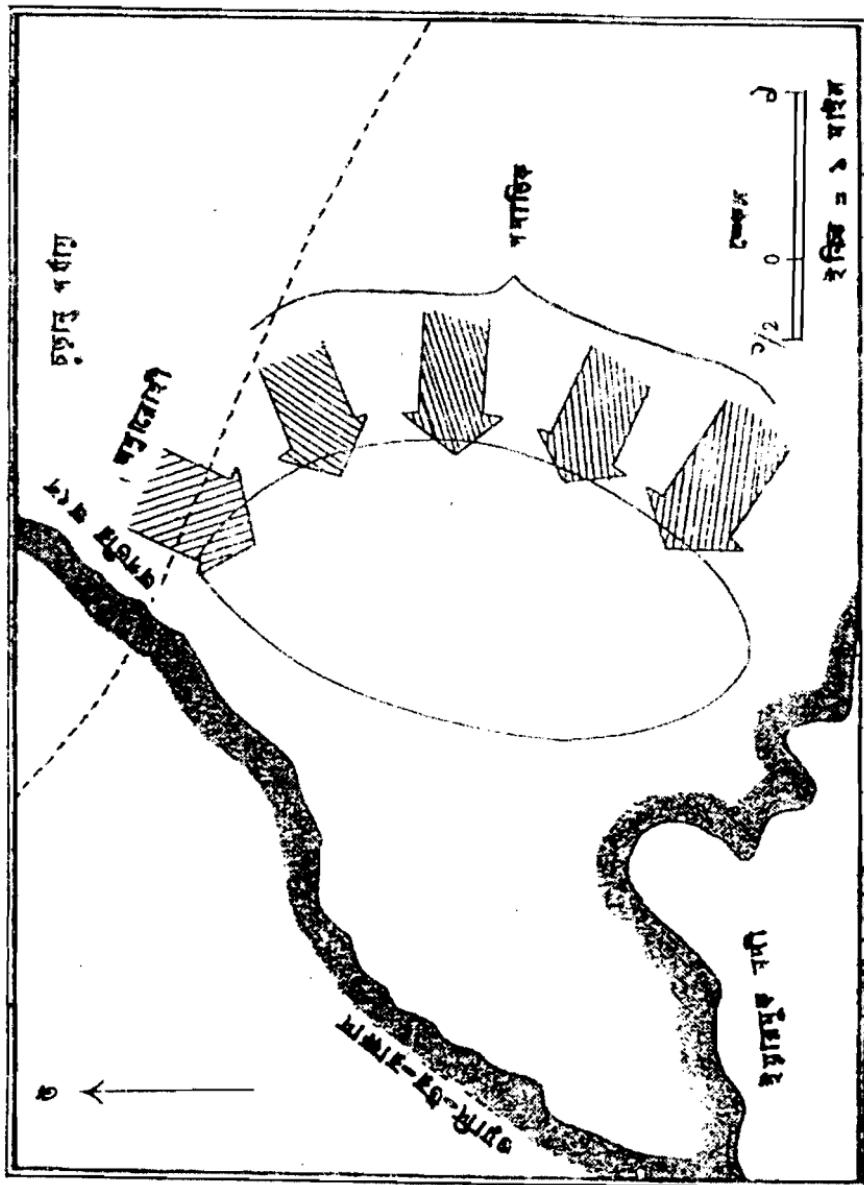
জাররার এসে মুসলিম অশ্বারোহীর সংগে যোগদান করেন এবং অশ্বারোহী দল প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে রোমানদেরকে আরও কোনার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ফলে তারা প্রতিরোধ তৎপরতার সমস্ত স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। খালিদের অশ্বারোহীগণ নিজেদের হাঁটু ও ঘোড়ার খুর ব্যবহার করে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে থাকে। রোমানদের আর্তনাদ মুসলমানদের চিৎকারের মধ্যে হারিয়ে যায়। তাদের শেষ প্রতিরোধটুকুও ভেঙে যায়। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রটি একটি কশাইখানায় পরিণত হয় এবং গোটা এলাকাটিতে দুঃস্বপ্নের বিভীষিকার সৃষ্টি হয়। রোমানদের ছুটাছুটিতে সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত হয় শিকলবদ্ধ যোদ্ধাগণ।

ছত্রভঙ্গ পশু পালের মতো তাড়িত হয়ে রোমানগণ গিরিখাতটির কিনারায় পৌঁছে যায়। গিরিখাতটির গভীরতা ছিল ভয়ংকর এবং তার চেয়েও ভয়ংকর ছিল মুসলমানদের বন্য আঘাত। অগ্রগামী মুসলিম বাহিনীর চাপে সারির পর সারি রোমান সৈন্য গিরিখাতটির মধ্যে পড়ে যেতে থাকে। পাথরের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে তারা আর্তচিৎকার করতে থাকে এবং তাদের ক্ষতবিক্ষত ও ছিন্নভিন্ন দেহ গিরিখাতের তলদেশে গিয়ে স্তূপ আকারে জমতে থাকে।

প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি সর্বশেষ রোমান সৈনিকের দেহটি গিরিখাতে গড়াতে গড়াতে নিথর হয়ে যায়। থেমে যায় ধ্বংসযজ্ঞের অগ্নিশিখার লেলিহান শিখা........। আর সেই সংগে শেষ হয় খালিদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধটিও।[৪১১]

পরদিন সকালবেলা মুসলিম বাহিনীর এক অংশ শত্রুর পরিত্যক্ত মালামাল সংগ্রহ ও শহীদদের কবরদানের কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় খালিদ (রা) অশ্বারোহী দল নিয়ে দামেস্কগামী রাস্তা ধরে অগ্রসর হন মাহানকে ধরার বাসনা নিয়ে। ভগ্নহৃদয় রোমান সর্বাধিনায়ক তার গোটা বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ব্যথা নিয়ে ধীরে-সুস্থে চলছিল। সে কখনও ভাবেনি যে, মুসলমানগণ তাকে ধাওয়া করতে পারে। বিকেলের দিকে খালিদ (রা) দামেস্কের কয়েক মাইল পূর্বে রোমানদেরকে নাগালের মধ্যে পেয়ে পশ্চাৎরক্ষী দলকে আক্রমণ করেন। মাহান সংগে সংগে পশ্চাৎরক্ষী দলের নিকট ছুটে আসে তাদের প্রতিরোধ প্রচেষ্টা তদারক করার জন্য। কিন্তু এখানেই আর্মেনিয়ার রাজা ও বিশাল রাজকীয় রোমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মাহান একজন মুসলিম অশ্বারোহী সৈনিকের হাতে নিহত হয়। তার মৃত্যুর পরপরই রোমান অশ্বারোহী কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে উত্তর ও পশ্চিম দিকে পালিয়ে খালিদের থাবা হতে আত্মরক্ষা করে।

---

৪১১. ইয়ারমুকের যুদ্ধের দুটি প্রধান বিষয় নিয়ে মতামতের ভিন্নতা দেখা যায়। প্রথমটি হলো উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যা ও দ্বিতীয়টি যুদ্ধক্ষেত্রের সঠিক অবস্থান। ব্যাখ্যার জন্য পরিশিষ্ট 'খ'-এর ১৩ ও ১৪ নম্বর নোট দেখুন।

দামেস্কের জনগণ খালিদ (রা)-কে অভিনন্দন জানাতে বের হয়ে আসে। তারা দুবছর পূর্বে দামেস্কের আত্মসমর্পণের সময়ে স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রসংগ উত্থাপন করে এবং খালিদ (রা) তাদেরকে নিরাপত্তার আশ্বাস দান করে বলেন, "তারা সেই চুক্তির আওতায় নিরাপদ।"

খালিদ (রা) পরদিন ইয়ারমুকের সমতল ভূমিতে মুসলিম বাহিনীর সংগে যোগদান করেন।

ইয়ারমুকের প্রান্তরের মতো এতো ধ্বংসাত্মক পরিণতির সম্মুখীন রোমানগণ আর কখনও হয়নি। এই পরাজয়ের ফলে সিরিয়ায় রোমান শাসনের অবসান হয়। পরবর্তী মাসেই সম্রাট হেরাক্লিয়াস এ্যান্টিওক ত্যাগ করে সড়ক পথে কনস্টান্টিনোপল গমন করেন। সম্রাট সিরিয়া ও রোমের (মুসলমানদের নিকট এলাকাটি রোম নামেই পরিচিত ছিল) সীমান্তে পৌছে পিছনে ফিরে সিরিয়া ভূমির দিকে তাকিয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিলাপ করে বলেছিলেন, "বিদায়, হে সিরিয়া! বিদায় চিরকালের জন্য। রোমানগণ আর কখনও তোমার বুকে ফিরে আসবে না। ওহ্, কি চমৎকার একটি দেশ শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি।"[৪১২]

সামরিক অপারেশনের দৃষ্টান্ত হিসেবে ইয়ারমুকের যুদ্ধে যুদ্ধবিদ্যার অনেকগুলো কৌশলের সমন্বয় হয়েছে। সম্মুখ যুদ্ধ, শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে সম্মুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ, প্রতিআক্রমণ, প্রতিরোধ, পার্শ্বদেশ থেকে আক্রমণ, পিছন থেকে আক্রমণ এবং পার্শ্বদেশ দিয়ে ঘুরে সৈন্য পরিচালনা। রোমানগণ ক্লান্ত-শ্রান্ত ও ক্ষত-বিক্ষত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরক্ষামলক কৌশল অবলম্বনের যে পরিকল্পনা খালিদ (রা) গ্রহণ করেছিলেন তা চমৎকারভাবে কাজ করেছিল। চারদিন স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক পর্যায়ে খালিদ (রা) যে সব আক্রমণাত্মক আঘাত হেনেছিলেন তার প্রত্যেকটিই ছিল একেকটি সীমিত কৌশলগত অভিযান যা পরিচালিত হয়েছিল সার্বিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে। তিনি যখন নিশ্চিত হন যে, রোমানগণ খুব খারাপ অবস্থায় উপনীত হয়েছে এবং কোনো অবস্থাতেই আর আক্রমণাত্মক অভিযান চালাতে সক্ষম নয় শুধু তখনই অর্থাৎ যুদ্ধের শেষ দিনে তিনি প্রতিআক্রমণ রচনা করেন। যুদ্ধের এই পর্যায়ে তিনি প্রথমে রোমান অশ্বারোহী বাহিনীকে পদাতিক বাহিনী হতে আলাদা করে ফেলেন এবং অশ্বারোহী বাহিনীর সমর্থনবিহীন অসহায় রোমান পদাতিক বাহিনীকে বাম বাহুর দিক থেকে শুরু করে গুটিয়ে ওয়াদি-উর-রাক্কাদ ও ইয়ারমুক নদীর মিলন স্থলের কোনায় ঠেলে নিয়ে যান। অবশ্য তার পূর্বেই তিনি জাররারকে ৫০০ অশ্বারোহীসহ গিরিখাতের পশ্চিম পাড়ে পাঠিয়ে পারাপারের পথটিও বন্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে কেউ পালিয়ে যেতে না পারে। এভাবে

---

৪১২. তাবারী ঃ তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০০, বালাযুরী ঃ পৃষ্ঠা-১৪২।

পলায়নের সম্ভাব্য পথ বন্ধ করে তিনি সর্বশেষ এবং সর্বধ্বংসী আঘাতটি হানেন। এই আঘাতে রোমান বাহিনী সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

জানা যায় যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধে ৪,০০০ মুসলিম শহীদ হয়েছিল। তবে আহত হয়নি এমন মুসলিম যোদ্ধার সংখ্যা ছিল খুবই কম। অবশ্য রোমান পক্ষের হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত আছে। ওয়াকিদীর উল্লেখিত সংখ্যা অবিশ্বাস্য রকমের অতিরঞ্জন বলে মনে হয়।[৪১৩] তাবারী এক জায়গায়[৪১৪] রোমান মৃতের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন ১,২০,০০০ কিন্তু অন্যত্র ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন ৭০,০০০।[৪১৫] বালাযুরীও রোমান পক্ষের মৃতের সংখ্যা উল্লেখ করেন ৭০,০০০।[৪১৬] এই সংখ্যাটিকে অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় যা ছিল রোমান বাহিনীর ৪৫%। এই ৭০,০০০ -এর মধ্যে অর্ধেক নিহত হয় ইয়ারমুকের সমতল প্রান্তরে এবং বাকি অর্ধেক গিরিখাতটির মধ্যে। প্রায় ৪০,০০০ রোমান যোদ্ধা পালাতে সক্ষম হয়েছিল যাদের অধিকাংশই ছিল ঘোড়া ও উটের আরোহী। মুসলমানগণ অর্ধবৃত্তের আকারে দাঁড়িয়ে পলায়নের পথ বন্ধ করার পূর্বেও কিছু রোমান পদাতিক পালাতে সক্ষম হয়। অনেকেই অনেক কষ্টে হলেও ওয়াদি-উর-রাক্কাদ অতিক্রম করেও পালাতে সক্ষম হয়েছিল।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী গৌরবময় বিজয় অর্জন করে। ইয়ারমুকের সমতল প্রান্তর ও গিরিখাতটির তলদেশে হাজার হাজার রোমান সৈনিকের মৃতদেহ স্তূপ আকারে পড়ে থাকে। ব্যাপক হত্যা সংঘটিত হয় সমতল প্রান্তরটির কোণায় যেখানে ওয়াদি-উর-রাক্কাদ ও ইয়ারমুক নদী মিলিত হয়েছে। গিরিখাতটির অবস্থাও ছিল এতো ভয়াবহ যে, মৃতদেহের স্তূপ সেখানে বাঁধের সৃষ্টি করে। সমতল প্রান্তরে পড়ে থাকা ছিন্নভিন্ন ও বিকৃত দেহগুলোর দৃষ্টিহীন উন্মিলিত নিথর চোখ মৃত্যুর চিরন্তনতাকে ঘোষণা করতে থাকে। সৈনিকদের মৃতদেহের পাশাপাশি পড়ে আছে ধর্মযাজকদের প্রাণহীন দেহ এবং তাদের নিথর মুষ্টিতে আবদ্ধ ক্রুশ। পচনশীল মানবদেহের দুর্গন্ধে ইয়ারমুকের উন্মুক্ত প্রান্তরের বাতাস ক্রমান্বয়ে দূষিত হতে থাকে।

এটি ছিল একটি বিশাল ও বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ এবং মুসলমানগণ এই যুদ্ধে একটি বিস্ময়কর ও ভয়াবহ বিজয় অর্জন করে।

---

৪১৩. লেখক সংখ্যাটি উল্লেখ করেননি–অনুবাদক।

৪১৪. তাবারী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৯৬।

৪১৫. পূর্বোক্ত ঃ তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৫।

৪১৬. বারাযুরী ঃ পৃষ্ঠা ১৪১।

চূড়ান্ত বিজয়

ইয়ারমুকের প্রান্তর হতে পলাতক রোমান সৈনিকগণ দ্রুত উত্তর সিরিয়া ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলের উত্তর অংশে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইয়ারমুকের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে আত্মরক্ষাকারী রোমান সৈনিকগণ আর কোনো ভাবেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার মতো অবস্থায় ছিল না। বিজয়ী মুসলিম যোদ্ধাদের অবস্থাও খুব একটা ভাল ছিল না। আবু উবায়দা (রা) একটি দলকে প্রেরণ করেন দামেস্ক দখলের জন্য এবং বাকিদেরকে নিয়ে তিনি জাবিয়ায় একটি গোটা মাস অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে সকলে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পায়। আহত যোদ্ধাগণও সেরে ওঠে। শত্রুর পরিত্যক্ত মালামাল সংগ্রহ করে নিয়ম অনুযায়ী বিতরণও করা হয়। বিজিত অঞ্চলের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনেক কিছুই করার ছিল। জেনারেলগণ খুব ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেন।

৬৩৬ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে (১৫ হিজরীর, শাবান মাসের শেষ নাগাদ) আবু উবায়দা (রা) ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনার জন্য যুদ্ধ পরিষদকে নিয়ে আলোচনায় বসেন। পরবর্তী লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ক্যাসেরীয়া না জেরুযালেম বেছে নেয়া হবে এ বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। আবু উবায়দা (রা) উপলব্ধি করেন যে, দুটি শহরই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর পূর্বে দুটি শহরই মুসলিম অভিযানকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিল। নিজে সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে নির্দেশের জন্য খলীফার নিকট পত্র লিখেন। উত্তরে খলীফা জেরুযালেম অধিকার করার নির্দেশ দান করেন। নির্দেশ পেয়ে আবু উবায়দা (রা) জাবিয়া হতে মুসলিম বাহিনী নিয়ে জেরুযালেমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সামনে থাকে খালিদের নেতৃত্বে গতিময় রক্ষীদল। মুসলিম বাহিনী নভেম্বরের প্রথম দিকে জেরুযালেমে পৌঁছে যায়। এই সংবাদ পেয়েই রোমানগণ সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে।

চারমাস ধরে অবরোধ চলে। তারপর সফরোনিয়াস নামের একজন পাদ্রী আত্মসমর্পণ ও জিযিয়া প্রদানের প্রস্তাব করে, তবে একটি মাত্র শর্তে। আর শর্তটি হলো যে, খলীফা উমরকে জেরুযালেমে উপস্থিত হয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে শহরের চাবি গ্রহণ করতে হবে। আবু উবায়দা (রা) খৃস্টান পাদ্রীর প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে খলীফার নিকট পত্র লিখেন এবং তাঁকে উপস্থিত হয়ে জেরুযালেমের চাবি গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। পত্র পেয়ে খলীফা কিছু সংগী নিয়ে প্রথম বারের মতো

সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি অবশ্য পরে আরও তিনবার সিরিয়া ভ্রমণ করেছিলেন।

উমর (রা) প্রথম জাবিয়া গমন করেন। সেখানে আবু উবায়দা, খালিদ ও ইয়াযীদ তাঁকে স্বাগতম জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমর ইবনুল আসকে জেরুযালেমে দুর্গে অবরোধকারী মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে রাখা হয়েছিল। খালিদ (রা) ও ইয়াযীদ সিল্ক ও ব্রকেডের জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিহিত ছিলেন এবং তাদের ঘোড়াও ছিল দামী পোশাকে আবৃত। তা দেখে উমর (রা) ক্ষীপ্ত হয়ে উঠেন। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ভূমি হতে এক মুঠো নুড়ি তুলে দুই জেনারেলের মুখে ছুঁড়ে পারেন। খলীফা চিৎকার করে বললেন, "তোমাদের উপরে অভিশাপ, তোমরা জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে সজ্জিত হয়ে আমাকে স্বাগতম জানাতে এসেছ। মাত্র দু বছরের মধ্যে তোমরা বদলে গেছ। অভিশাপ তোমাদের প্রাচুর্যকে। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, ২০০ বছরের প্রাচুর্যের পরেও যদি তোমরা এরকম আচরণ করতে তাহলে আমি তোমাদেরকে বরখাস্ত করে তোমাদের জায়গায় অন্য কাউকে নিয়োগ করতাম।"[৪১৭]

উমর (রা) ছিলেন খুবই সাদা-সিধে ও তালি দেয়া পোশাকে। রাসূল আকরাম (সা)-এর জীবদ্দশাতেও তিনি এভাবে চলাফেরা করতেন। খলীফা হওয়ার পরও জীবন যাত্রায় কোন পরিবর্তন আসেনি এবং তিনি বিলাসিতা ও জাঁকজমক পরিত্যাগ অব্যাহত রাখেন। বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠেই খালিদ (রা) ও ইয়াযীদ দ্রুত তাদের উপরের পোশাক খুলে ফেলেন এবং নিচে যে তাঁরা বর্ম পরিধান করে অস্ত্র বহন করছিলেন খলীফাকে তা দেখান। তাঁরা উভয়ে বলেন, আমীরুল মুমিনীন! এগুলো শুধুই পোশাক, আমরা এখনও অস্ত্র বহন করি।"[৪১৮] এই জবাব উমর (রা)-কে শান্ত করে। আবু উবায়দা (রা) সামনে অগ্রসর হন। আবু উবায়দাও সব সময় সাদা-সিধে জীবন যাপন করতেন। খলীফা ও মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক প্রথমে করমর্দন ও পরে একে অপরকে আলিংগন করেন।

জাবিয়া থেকে খলীফা তাঁর জেনারেলগণসহ জেরুযালেমের দিকে অগ্রসর হন। জেরুযালেমে তাঁর উপস্থিতি মুসলিম সৈনিকদের জন্য ছিল একটি বিরাট আনন্দের ব্যাপার এবং তারা খলীফাকে দেখেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

পরদিন দুপুর বেলা খলীফা তাঁর সংগীদেরকে নিয়ে বসে বিভিন্ন প্রসংগে কথাবার্তা বলছিলেন। জোহরের নামাযের সময় আসন্ন। বেলালও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বেলালের কথা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে কোরেশদের অকথ্য নির্যাতনের মুখেও নিজের বিশ্বাসে অটল

---

৪১৭. তাবারী ঃ তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৩

৪১৮. পূর্বোক্ত।

ছিলেন। দ্বিতীয় হিজরীতে আযানের নিয়ম চালু হলে রাসূল (সা) বেলাল (রা)-কে ইসলামের মুয়াজ্জিন মনোনীত করেন। তারপর হতে মুসলমানগণ প্রতিদিন পাঁচবার তাঁর উদার ও সুমধুর কণ্ঠের আযান শুনে নামাযের জন্য একত্রিত হতো। পরবর্তীকালে বেলাল (রা) একজন উচ্চ পর্যায়ের মুসলিম হিসেবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালে বেলাল (রা) নীরব হয়ে যান এবং আযান দেয়া বন্ধ করে দেন।

আলোচনায় উপস্থিত রাসূল (সা) কতিপয় সংগীর মনে একটা খেয়াল জাগলো যে, পবিত্র নগরী জেরুযালেম বিজয়ের মুহূর্তটি হয়তো বেলালের নীরবতা ভাঙার জন্য উপযুক্ত সময় হতে পারে। তাঁরা খলীফাকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন বেলাল (রা)-কে অন্তত একবার আযান দিতে বলেন। খলীফা উমর (রা) বেলালের দিকে ফিরে বললেন, "ওহে বেলাল ! আল্লাহর রসূলের সংগীগণ তোমাকে অনুরোধ করছে একবার আযান দিয়ে তাঁদেরকে রাসূল (সা)-এর সময়ের কথা মনে করিয়ে দিতে।" বেলাল (রা) কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগীগণ ও নামাযের জন্য সমবেত হাজার হাজার মুসলিম সৈনিকের ব্যাগ্র দৃষ্টির দিকে তিনি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। বেলাল (রা) আবার আযান দেবেন।

ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিনের সুমধুর কণ্ঠস্বর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কণ্ঠে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিত হওয়ার সংগে সংগেই বিশ্বাসীদের স্মৃতিপটে তাঁদের প্রিয় রাসূল (সা)-এর অসংখ্য স্মৃতি ভেসে ওঠে এবং তাদের চোখ পানিতে ভরে যায়। আর বেলালের কণ্ঠে মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল উচ্চারিত হওয়ার সংগে সংগেই সকলে ভেঙে পড়েন এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন।

পরদিন চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।[৪১৯] মুসলমানদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন খলীফা এবং সাক্ষী হিসেবে থাকেন খালিদ (রা), আমর ইবনুল আস (রা), আব্দুর রহমান ইবন আউফ ও মুআবিয়া (রা)। জেরুযালেম খলীফার নিকট আত্মসমর্পণ করলে শহরে শান্তি নেমে আসে। এই ঘটনা ঘটে ৬৩৭ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে)। জেরুযালেমে ১০ দিন অবস্থানের পর খলীফা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

খলীফার নির্দেশে ইয়াযীদ ক্যাসেরীয়া গমন করে আবার শহরটি অবরোধ করেন। আমর ও শুরাহবীল যাত্রা করেন প্যালেস্টাইন ও জর্দান পুনরায় দখল করার জন্য, যা তাঁরা বছরের শেষ নাগাদ সম্পন্ন করেন। অবশ্য ৬৪০ খৃস্টাব্দে মুয়াবিয়ার

৪১৯. কিছু বর্ণনায় দেখা যায় যে, চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল জাবিয়ায় এবং সেখানে পাদ্রীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। চুক্তি স্বাক্ষরের পর খলীফা জেরুযালেমে উপস্থিত হয়ে দুর্গের চাবি গ্রহণ করেন।

নিকট আত্মসমর্পণ করার পূর্ব পর্যন্ত ক্যাসেরীয়া দখল করা সম্ভব হয় না। আবু উবায়দা (রা) ও খালিদ (রা) ১৭,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে জেরুযালেম ত্যাগ করেন সিরিয়ার গোটা উত্তর অংশ দখল করার জন্য।

আবু উবায়দা (রা) প্রথমে দামেস্ক গমন করেন, যা পূর্ব থেকেই মুসলমানদের হাতে ছিল। তারপর তিনি হেম্‌স গেলে সেখানে তাঁর পুনর্গমনকে স্বাগতম জানানো হয়। তিনি পরবর্তী লক্ষ্যবস্তু কীন্নাসরীনের দিকে অগ্রসর হন, খালিদ (রা) তাঁর গতিময় রক্ষীদল নিয়ে সামনে থাকেন। কয়েকদিন পর অগ্রবর্তী দলটি কীন্নাসরীনের তিন মাইল পূর্বে হাজির নামক এলাকায় পৌঁছলে এক শক্তিশালী রোমান বাহিনী তাদেরকে আক্রমণ করে।[৪২০]

কীন্নাসরীনের রোমান বাহিনীর কমান্ডার ছিল মীনাস নামের একজন জেনারেল। সে খুবই খ্যাতিমান এবং তার যোদ্ধারা তাকে ভালবাসতো। মীনাস জানতো যে, সে কীন্নাসরীনে অবস্থান নিয়ে থাকলে মুসলমানগণ তাকে অবরুদ্ধ করে ফেলবে এবং এক সময় তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তাছাড়া এ মুহূর্তে সম্রাটের নিকট হতেও সাহায্য পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই সে শহর ত্যাগ করে সামনে অগ্রসর হয়ে মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তী দলকে প্রধান বাহিনী আসার পূর্বেই পরাজিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা নিয়েই মীনাস হাজিরে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে।

তার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। সে হয়তো জানতো না যে, মুসলিম অগ্রবর্তী দলে খালিদ (রা) আছেন অথবা খালিদ (রা) সম্পর্কে যা কিছু শুনেছিল তা বিশ্বাস করতো না।

খালিদের পক্ষে তাঁর অশ্বারোহী দলকে যুদ্ধের বিন্যাসে প্রস্তুত করা ছিল কয়েক মিনিটের ব্যাপার। মীনাসের বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ামাত্র তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধের প্রথম দিকে মীনাস নিহত হলে তার ভক্ত যোদ্ধাগণ তাদের প্রিয় জেনারেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য পাগলের মতো হামলা করে। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য যে, তাদের বিপরীতে ছিল সে সময়ের সর্বোত্তম যোদ্ধাদের একটি দল। তাদের প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনা ব্যর্থ হয় এবং তাদের প্রত্যেকটি যোদ্ধা নিহত হয়।[৪২১]

যুদ্ধ শেষ হওয়ামাত্র হাজিরের অধিবাসীগণ বাইরে আসে খালিদ (রা)-কে স্বাগতম জানানোর জন্য। তারা জানায় যে, তারাও আরব এবং তাদের যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা নেই। খালিদ (রা) আত্মসমর্পণকে গ্রহণ করে কীন্নাসরীনের দিকে যাত্রা করেন।

---

৪২০. হাজির একটি বড় গ্রাম হিসেবে এখনও আছে।

৪২১. তাবারী ঃ তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৮।

হাজির যুদ্ধের সংবাদ পেয়ে উমর (রা) খালিদের সামরিক প্রতিভার প্রশংসা না করে পারেন না। তিনি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলেন,"খালিদ সত্যিই একজন কমান্ডার। আল্লাহ আবূ বকরের প্রতি তাঁর রহমত বর্ষণ করুন। মানুষকে বিচারের ক্ষমতা আমার চেয়ে তাঁরই ছিল বেশি।"[৪২২] এই ছিল উমরের প্রথম স্বীকৃতি যে, তিনি হয়তো খালিদ (রা)-কে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেননি।

মুসলিম বাহিনী কীন্নাসরীনে পৌঁছার সংবাদে মীনাসের বাহিনীর অবশিষ্ট যোদ্ধাগণ, যারা তার সংগে হাজিরের যুদ্ধে অংশ নেয়নি, দুর্গে প্রবেশ করে ফটক বন্ধ করে দেয়। খালিদ (রা) তাদের নিকট বার্তা প্রেরণ করেন, "তারা যদি মেঘের কোলেও আশ্রয় নেয় তবু আল্লাহ হয় আমাদেরকে তাদের নিকটে নিয়ে যাবেন নতুবা তাদেরকে আমাদের নিকট নিয়ে আসবেন যুদ্ধের জন্য।"[৪২৩] বিলম্ব না করে কীন্নাসরীন দুর্গ আত্মসমর্পণ করে। হাজিরের যুদ্ধ ও কীন্নাসরীন দুর্গের আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটে ৬৩৭ খৃস্টাব্দের জুন মাসে (১৬ হিজরীর জমাদি-উল-আউয়াল মাসে)।[৪২৪]

আবু উবায়দা (রা) কীন্নাসরীনে খালিদের সংগে মিলিত হন এবং আলেপ্পর দিকে যাত্রা করেন। সেখানে জোয়াচিম নামের একজন জেনারেল একটি শক্তিশালী দুর্গ কমান্ড করছিল। এই জেনারেলও মীনাসের কৌশল অবলম্বন করে মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তী দলকে খোলা মাঠে মুকাবিলা করার লক্ষ্যে শহর ত্যাগ করে এবং শহরের ৬ মাইল দক্ষিণে খালিদের গতিময় রক্ষীদলকে আক্রমণ করে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে জোয়াচিম বুদ্ধিমানের কাজ করে এবং দ্রুত পিছু হটে দুর্গে আশ্রয় নেয়।

আলেপ্পো ছিল একটি বড় ও দেয়াল ঘেরা শহর । শহরের সিকি মাইলেরও কিছু বেশি দূরে একটি পাহাড়ের উপরে ছিল একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং এই দুর্গটি ছিল প্রশস্ত পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। মুসলমানগণ স্বামনে অগ্রসর হয়ে দুর্গটি অবরোধ করে। জোয়াচিম ছিল একজন সাহসী কমান্ডার এবং সে অবরোধ ভেঙে ফেলার লক্ষ্যে কয়েক দফা আক্রমণ পরিচালনা করে, কিন্তু প্রত্যেক বারই ভাল শাস্তি ভোগ করে। এর পর থেকে সে দুর্গের ভিতরে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয় এই আশায় যে, যদি হেরাক্লিয়াস কোন সাহায্য প্রেরণ করেন। শেষ পর্যন্ত কোন সাহায্য প্রেরণ করেন না। চার মাস পর ৬৩৭ খৃস্টাব্দের অক্টোবরের দিকে রোমানগণ শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গ ত্যাগ করার সুযোগ লাভ করে, কিন্তু জোয়াচিম মুসলমান হয়ে ইসলামের জন্য লড়াই

---

৪২২. তাবারী ঃ তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৮।

৪২৩. পূর্বোক্ত।

৪২৪. কীন্নাসরীনের অবস্থান আলেপ্পো থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ২০ মাইল (আকাশ পথে ১৮ মাইল)। শহরটি ছিল একটি নিচু পাহাড় চূড়ার উপরে যা বর্তমানের আলোপ্পো সারাকিব সড়কের পাশে অবস্থিত। শহরটির বৃহত্তম অংশ ছিল চূড়াটির পূর্বের অংশের দক্ষিণের ঢালে অর্থাৎ সড়কটির পূর্ব দিকে। এই চূড়াটি এখন আল-লায়ীস নামে খ্যাত এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামটিও এই নামেই পরিচিত।

করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। পরবর্তীতে সে একজন দক্ষ ও অনুগত অফিসার হিসেবে কয়েকজন মুসলিম জেনারেলের অধীনে থেকে যুদ্ধ করেছিল।

আলেপ্পো বিজয়ের পর আবু উবায়দা (রা) মালিক আশতারের নেতৃত্বে একদল যোদ্ধাকে প্রেরণ করেন রোমানগামী রাস্তার উপরে অবস্থিত আজাজ শহরটি দখলের জন্য। যে এলাকাটিকে মুসলমানগণ রোম বলত তার মধ্যে তুরাস পর্বতের পূর্ব দিকের তুরস্কের দক্ষিণ অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত ছিল। জোয়াচিমের সহায়তায় মালিক আজাজ দখল করেন এবং স্থানীয় অধিবাসিদের সংগে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে আলেপ্পোতে ফিরে যান। আজাজ দখলের উদ্দেশ্য ছিল এই মর্মে নিশ্চয়তা বিধান করা যে, আলেপ্পোর উত্তরে আর এমন কোন রোমান বাহিনীর অস্তিত্ব নেই যা মুসলিম বাহিনীর পরবর্তী অভিযানের সময় তাদেরকে পিছন বা পার্শ্বদেশ হতে আক্রমণ করতে পারে । মালিক ফিরে আসার সংগে সংগে আবু উবায়দা (রা) পশ্চিমে এ্যান্টিওকের দিকে যাত্রা করেন। (২৮ নম্বর ম্যাপ দ্রষ্টব্য)

মুসলিম বাহিনী আলেপ্পো হতে যাত্রা করে হারিম হয়ে পূর্ব দিক থেকে এ্যান্টিওকের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। শহরের ১২ মাইল দূরে মাহরুবা নামক স্থানে, যেখানে অরনটেস নদীর (বর্তমানে নহর-উল-আসি নামে পরিচিত) উপরে একটি লোহার সেতু আছে, মুসলিমগণ এ্যান্টিওকের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত একটি শক্তিশালী রোমান বাহিনীর সাক্ষাৎ লাভ করে। এখানে একটি বড় ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং আবু উবায়দা (রা) খালিদের সহায়তায় রোমান বাহিনীকে ধ্বংস করে ফেলেন। এই যুদ্ধটির কোন বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। মনে করা হয় যে, আজনাদিন ও ইয়ারমুকের যুদ্ধ ছাড়া, সিরিয়ার সংঘটিত অন্যান্য যুদ্ধে তুলনায় এই যুদ্ধে রোমান বাহিনীর অধিক সংখ্যক সৈন্য নিহত হয়। কিছু সৈন্য বিশৃংখলভাবে ছুটে গিয়ে শহরে আশ্রয় নেয়। মুসলিমগণ সামনে অগ্রসর হয়ে এ্যান্টিওক অবরোধ করে। কিছু দিন অতিবাহিত হতে না হতেই সিরিয়ার বৃহত্তম শহর এবং পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের এশিয়া অঞ্চলের রাজধানী এ্যান্টিওক মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। ৩০শে অক্টোবর ৬৩৭ খৃস্টাব্দ, (৫ই শাওয়াল, ১৬ হিজরী) আবু উবায়দা (রা) এ্যান্টিওকে প্রবেশ করেন। পরাজিত রোমান সৈনিকগণ নিরাপদে শহর ত্যাগ করার অনুমতি লাভ করে।

এ্যান্টিওকের পতনের পর মুসলিম বাহিনী ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় অঞ্চল ধরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয় এবং লতাকিয়া, জাবলা ও তারতুস দখল করে। ফলে উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকা তাঁদের দখলে চলে আসে। এর পর আবু উবায়দা (রা) আলেপ্পো ফিরে যান এবং ফেরার পথে সিরিয়ার অবশিষ্ট কিছু এলাকা পদানত করেন। খালিদ (রা) তাঁর গতিময় রক্ষীদল নিয়ে পূর্ব দিকে মুনবিজের নিকটবর্তী ইউফ্রেটিস পর্যন্ত আক্রমণ পরিচালনা করেন। পথে তিনি সামান্য বাধার সম্মুখীন হন। ৬৩৮ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে তিনি আবু উবায়দার সংগে আলেপ্পো-এ যোগদান করেন।

ম্যাপ – ২৮ ঃ উত্তর সিরিয়া
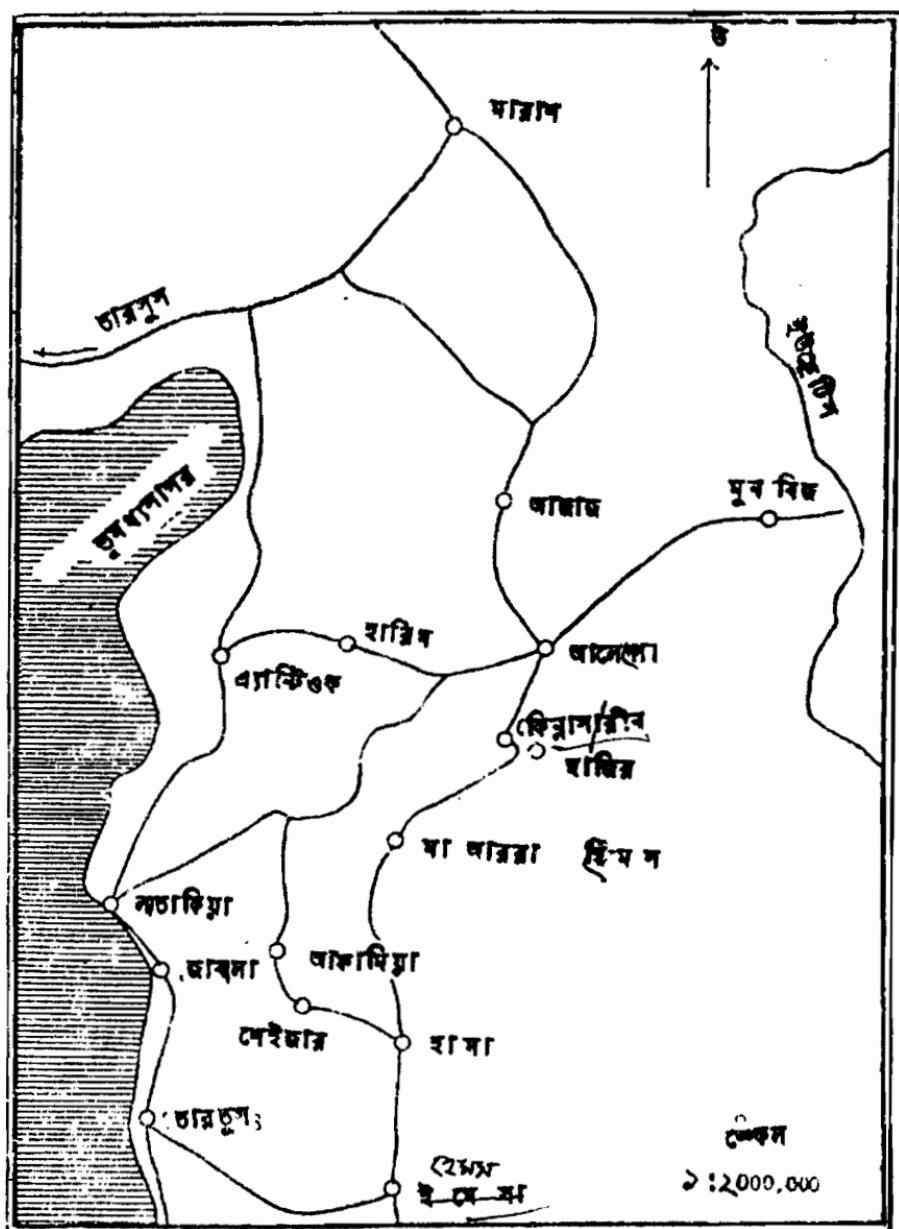
সম্পূর্ণ সিরিয়া এখন মুসলমানদের হাতে। আবু উবায়দা (রা) খালিদ (রা)-কে কীন্নাসরীনের কমান্ডার ও শাসক হিসেবে রেখে বাহিনীর বাকি অংশসহ হেম্‌সে গমন করেন। হেম্‌সে পৌঁছে তিনি প্রদেশটার গভর্ণর হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সে সময় কীন্নাসরীন ছিল হেম্‌স প্রদেশের অংশ। কীন্নাসরীন হতে খালিদ (রা) সিরিয়ার উত্তর অঞ্চলের দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

১৬ হিজরীর শেষ নাগাদ (৬৩৭ খৃস্টাব্দ) সম্পূর্ণ সিরিয়া মুসলমানদের অধিকারে আসলেও ক্যাসেরিয়া স্বীয় অবস্থানকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। আমর ইবনুল আস প্যালেস্টাইনের, শুরাহ্‌বীল জর্দানের, ইয়াযীদ দামেস্কের (বর্তমানে ক্যাসেরীয়া অবরোধে ব্যস্ত) এবং আবু উবায়দা হেম্‌স প্রদেশের প্রশাসনিক কাজে অধিক মনোযোগী হয়ে ওঠেন। খালিদ (রা) ছিলেন আবু উবায়দার অধীনে একটি অঞ্চলের প্রশাসক অর্থাৎ তাঁর নিয়োগ ছিল প্রাদেশিক গভর্ণরের তুলনায় নিম্ন পর্যায়ের। ৬৩৮ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগ পর্যন্ত কয়েক মাস শান্তি বিরাজ করে। সিরিয়ার উত্তর অঞ্চলের জাযীরার আরব খৃস্টানগণ যুদ্ধের পথ বেছে নিলে আবার শান্তি বিঘ্নিত হয়।

হেরাক্লিয়াস আর কোন অবস্থাতেই সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সিরিয়ায় প্রবেশের ক্ষমতা রাখেন না। আসলে সম্রাট এখন বেশি চিন্তিত তার সাম্রাজ্যের বাকি অংশের নিরাপত্তা নিয়ে ইয়ারমুক ও এ্যান্টিওকে রোমান বাহিনীর ধ্বংসের পর যা মুসলিম হুমকির সম্মুখীন হয়। অবশিষ্ট শক্তি দিয়েই তাকে একটির পর একটি বিজয় অর্জনকারী মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা করতে হবে। প্রস্তুতির জন্য তার কিছু সময় প্রয়োজন এবং সে জন্য মুসলমানগণকে সিরিয়ায় ব্যস্ত রাখতে হবে। এই লক্ষ্য নিয়ে সম্রাট জাযীরার আরব খৃস্টানদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য। ধর্মীয় বাঁধনের কারণেই তারা হেরাক্লিয়াসের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হাজার হাজার যোদ্ধা নিয়ে ইউফ্রেটিস অতিক্রম করে পূর্ব দিক হতে সিরিয়ার উত্তর অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনা করে।

জাযীরার আরব খৃস্টানদের যুদ্ধপ্রস্তুতির খবর আবু উবায়দা (রা) গোয়েন্দা মারফত পূর্বেই পেয়ে যান। তাদের অগ্রযাত্রা শুরু হলে আবু উবায়দা (রা) যুদ্ধ পরিষদের সভা ডাকেন পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন। খালিদ (রা) মত প্রদান করেন, শহর থেকে বের হয়ে সম্মিলিতভাবে উন্মুক্ত আকাশের নিচে আরবদের মুকাবিলা করার পক্ষে। কিন্তু অন্য সব জেনারেল হেম্‌সে একটি প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। আবু উবায়দা (রা) অধিকাংশের মতামতের সংগে একমত পোষণ করেন এবং কীন্নাসরীন হতে গতিময় রক্ষীদলসহ উত্তর সিরিয়ার অন্যান্য এলাকায় মোতায়েন দলসমূহকেও প্রত্যাহার করে নিয়ে আসেন। তিনি মুসলিম বাহিনীকে হেমসে একত্র করেন এবং একই সংগে খলীফাকেও সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিত করেন।

এ ব্যাপারে খলীফার কোন সন্দেহ ছিল না যে, আবু উবায়দা (রা) ও খালিদ (রা) আরব খৃস্টানদের হুমকি মুকাবিলায় সক্ষম। তবু তিনি তাদেরকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তা করেন অদ্ভুতভাবে। তিনি ইরাকে মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাসের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করেন জাযীরায় তিনদল মুসলিম যোদ্ধা প্রেরণের জন্য । প্রথম দল যাবে সুহাইল ইবন আদীর নেতৃত্বে রাক্কা এলাকায়, দ্বিতীয় দল আবদুল্লাহ ইবন উৎবানের নেতৃত্বে নুসেবিন এলাকায় এবং তৃতীয় দল যাবে আয়াযবিন গানামের নেতৃত্বে ও অপারেশন চালাবে প্রথম ও দ্বিতীয় দলের মধ্যবর্তী এলাকায়। (২৯ নম্বর ম্যাপ দ্র.)। একই সংগে তিনি আবু উবায়দার শক্তি বৃদ্ধির জন্য কাকা ইবন আমরের নেতৃত্বে ৪০০ যোদ্ধাকে ইউফ্রেটিসের পথ ধরে হেম্‌সে প্রেরণের নির্দেশ দান করেন।

আরব খৃস্টানগণ হেম্‌সে পৌঁছে মুসলমানদেরকে দুর্গের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় দেখে কি করবে ভেবে না পেয়ে অবরোধ করে বসে। কিন্তু আবরোধ শুরু হতে না হতেই জাযীরা হতে বার্তাবাহক ছুটে এসে জানায় যে, ইরাক হতে তিনটি মুসলিম দল জাযীরার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আরব খৃস্টানগণ পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে। তারা হেরাক্লিয়াসের প্ররোচনায় সিরিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয়েছে অথচ তাদের নিজভূমি আজ অন্য দিক থেকে আগত মুসলিম বাহিনীর হুমকির সম্মুখীন। তারা অবরোধ প্রত্যাহার করে দ্রুত জাযীরায় ফিরে যায়, এটাই ছিল তাদের জন্য একমাত্র সঠিক পদক্ষেপ। খৃস্টান আরবদের হেম্‌স ত্যাগের তিনদিন পর কাকা হেম্‌সে পৌঁছান।

আরব খৃস্টানদের জাযীরায় প্রত্যাবর্তনের খবর শুনে ইরাক হতে অগ্রসরমান মুসলিম দল তিনটি পথে থেমে যায় এবং সাদের নিকট হতে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তাদের মিশন সফল হয়েছে। সৈন্য পরিচালনার এই পরিছন্ন ও অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করে উমর (রা) একটি তীর না ছুঁড়েও জাযীরার আক্রমণকারী বাহিনীকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন।

জাযীরার আরবদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা মুসলমানদের কোন ক্ষতি করতে না পারলেও তাদের মধ্যে এই চেতনার সৃষ্টি করে যে, পার্শ্ববর্তী এলাকার শত্রুভাবাপন্ন বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী জনগোষ্ঠীকে পদানত করতে হবে। সিরিয়ার মুসলমানদের চলাচলকে নিরাপদ ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাযীরা ও তাউরাস পর্বতের পূর্ব দিকের এলাকায় বসবাসকারী আরব খৃস্টানদেরকে দমন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

খলীফা উমর (রা) প্রথমে জাযীরায় অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি সাদকে জাযীরা দখল করার নির্দেশ দান করেন এবং আয়াযবিন গানামকে এই অপারেশনের কমান্ডার নিয়োগ করেন। সাদ আয়াযকে নির্দেশ দান করেন তার বাহিনী নিয়ে জাযীরায় অভিযান পরিচালনার জন্য। এই নির্দেশ পেয়ে ইরাকের মুসলিম বাহিনী ৬৩৮ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালের শেষ নাগাদ পুনরায় অগ্রযাত্রা শুরু করে। আয়াদ কয়েক সপ্তাহ অভিযান চালিয়ে নুসেবিন ও রুহা পর্যন্ত টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী এলাকা পদানত করেন। (২৯ নম্বর ম্যাপ দ্র.)। এই অভিযান ছিল রক্তপাতহীন।

ম্যাপ – ২৯ ঃ জাযীরা

উ
মালাতিয়া
মারাশ
ইউফ্রেটিস
আমিদ
টাইগ্রিস
বিতলিস
রুহা
হাররান
রাস-উল-আইন
নুসেবীন
মুনবিজ
আলেপ্পো
রাক্কা
খাবুর
কারকীসিয়া
মসুল
তাদমুর
স্কেল
১:৪,০০০,০০০.
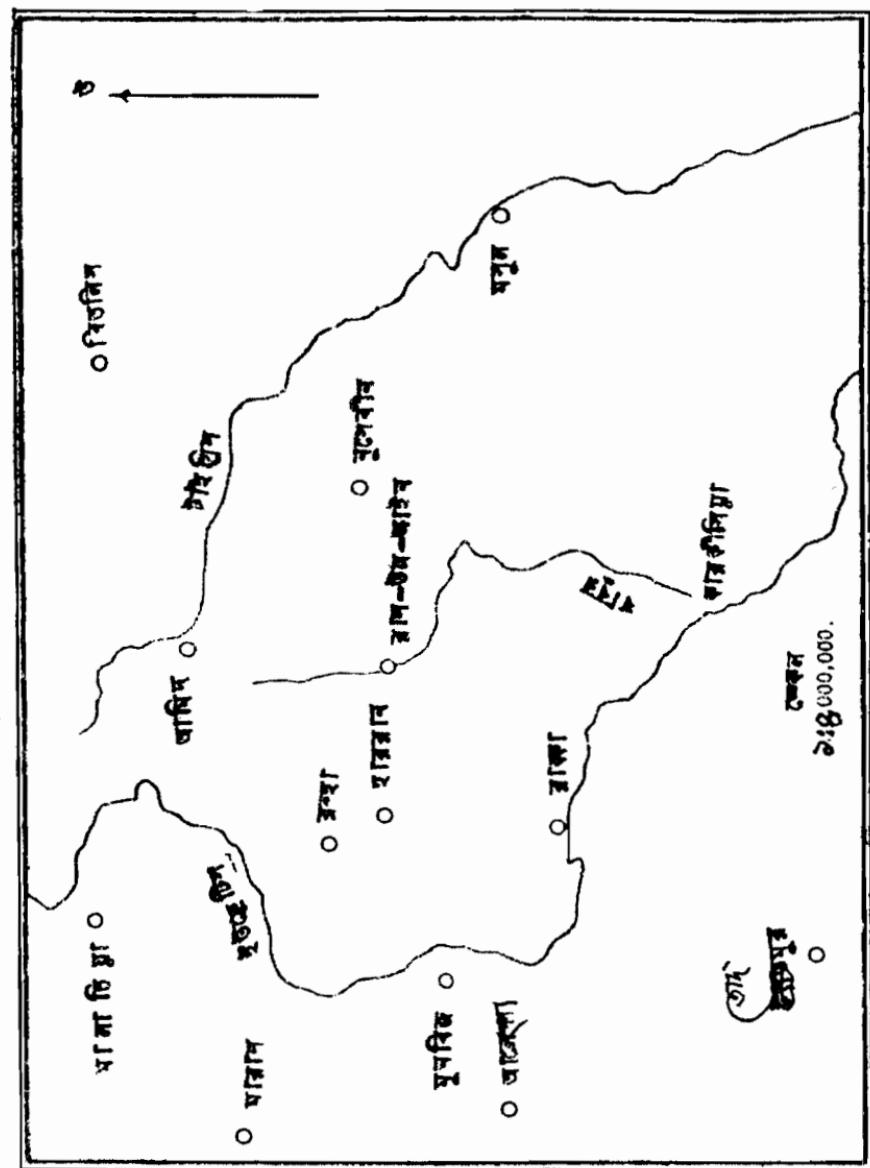
জাযীরা আয়ত্তে আসার পরপর আবু উবায়দা (রা) খলীফার নিকট পত্র লিখে আয়াযকে তাঁর কমান্ডে ন্যস্ত করার অনুরোধ করেন যাতে তাঁকে উত্তর সিমান্তের উপরে আক্রমণ পরিচালনার জন্য প্রেরণ করা যায়। খলীফা এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং আয়ায ইরাক থেকে জাযীরায় প্রেরিত মুসলিম বাহিনীর এক অংশ নিয়ে হেম্‌সের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

৬৩৮ খৃস্টাব্দের শরৎকালে আবু উবায়দা (রা) সিরিয়ার উত্তরে রোমান ভূখণ্ডে আক্রমণ পরিচালনার জন্য কয়েকটি মুসলিম দল প্রেরণ করেন। খালিদ (রা) ও আয়াযের কমান্ডেও দু'টি দল আক্রমণ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। এই দলগুলো সীমান্তের ওপারে তারতুস পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা আক্রমণ করে। খালিদের লক্ষ্যবস্তু ছিল মারআশ। মারআশ পৌছাতেই তিনি সেখানে অবস্থিত রোমান দুর্গটি অবরোধ করেন। খালিদের উপস্থিতির খবর শুনেই দুর্গবাসীগণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই দুর্গটি শর্ত সাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করে। দুর্গের অধিবাসিগণ নিরাপদে শহর ত্যাগের সুযোগ লাভ করে। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী প্রচুর ধনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়। খালিদ (রা) এতো বিপুল পরিমাণ সম্পদসহ কীন্নাসরীন প্রত্যাবর্তন করেন যা' পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। মারআশে অর্জিত সম্পদরাশি এই অভিযানের যোদ্ধাদেরকে গোটা জীবনের জন্য সম্পদশালী করে।

যুবক বয়সে খালিদের মধ্যে মিতব্যয়িতা থাকলে, তিনি সে সময়ের সব চেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করতেন। সে সময়ের প্রথা অনুযায়ী দ্বৈতযুদ্ধে পরাজিত বীরের সম্পদের অধিকারী হতো বিজয়ী বীর এবং এই সম্পদ ছিল যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের অংশের অতিরিক্ত। মুসলিম বাহিনীতে খালিদ (রা)-ই সকলের তুলনায় বেশি দ্বৈতযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং তিনি প্রত্যেকটি যুদ্ধে জয়ী হতেন। তদুপরি তার প্রতিপক্ষগণ হতেন সাধারণত জেনারেল যারা অধিক মূল্যবান বস্তুর দ্বারা সজ্জিত হয়ে যুদ্ধে অংশ নিতেন। বিশেষ করে রোমান ও পারসিক জেনারেলগণ বহু মূল্যবান রত্ন ও স্বর্ণখচিত পোশাক পরিধান করতেন। এই ভাবে খালিদ (রা) প্রচুর সম্পদ হাতে পেতেন কিন্তু সবকিছু তার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেত। তিনি কিছুটা বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন এবং উদারহস্তে সম্পদ বিতরণ করতেন। তাঁর এক যুদ্ধের অর্জিত সম্পদ বড়জোর পরবর্তী যুদ্ধ পর্যন্ত স্থায়ী হতো। তিনি একাধিক বার বিয়ে করেছিলেন এবং তার অনেক সন্তান ছিল। তাঁর সংগী-সাথীর সংখ্যাও ছিল অনেক। বিরাট পরিবারের খরচ মিটানোর জন্য তাঁকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হতো। এ ছাড়াও ছিল তাঁর পছন্দের কিছু সৈনিক। প্রত্যেক যুদ্ধের পর তিনি কিছু দক্ষ সৈনিককে বাছাই করে নিতেন এবং তাদেরকে নিজ পকেট হতে উপহার দিতেন।

খালিদের জীবন যাত্রার ধরন সম্পর্কে মিতব্যয়ী খলীফা অবহিত ছিলেন এবং তিনি এটাকে খালিদের মহানুভবতা না ভেবে অপচয় হিসেবে বিবেচনা করতেন।[৪২৫]

মারআশ ফিরেও খালিদ (রা) একই কাজ করেন। তিনি সৈনিকদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিলি করেন। ইতিমধ্যে মুসলিম বাহিনীর মধ্যেও কিছু কিছু বিবেক বর্জিত লোক তৈরি হয়েছিল যারা বিজয়ী জেনালেরদের নিকট গিয়ে তাঁদের স্তুতিমূলক গান গেয়ে উপহার আদায় করতো। এরকম একজন ছিল কিন্দা গোত্রের প্রধান আশআস বিন কায়েস যার প্রসংগ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। (সে ইয়েমেনে তার গোত্রের লোকদের স্বধর্মত্যাগের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং শেষ মুহূর্তে তার লোকদের প্রতারণা করে নিজের জীবন রক্ষা করেছিল)। আশআস ছিল একজন নাম করা কবি। সে কীন্নাসরীনে খালিদের সংগে সাক্ষাৎ করে এবং এই মহান বিজয়ী বীরের প্রশংসামূলক একটি চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করে। এতে খুশি হয়ে খালিদ (রা) তাকে ১০,০০০ দিরহাম প্রদান করেন। পক্ষ কালের মধ্যেই গোয়েন্দা সূত্র ধরে এই তথ্য খলীফার নিকট চলে যায়। খলীফা খুবই রাগান্বিত হন এবং চিন্তা করেন যে, আর সুযোগ দেওয়া যায় না।

আশআস কি জানতো যে, সে যখন কবিতা আবৃত্তি করেছিল, প্রকৃত অর্থে খালিদের সামরিক জীবনের কবর খনন করছিল।

---

৪২৫. খালিদের দৈত্বযুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ ও যুদ্ধের পর প্রাপ্ত সম্পদের অংশকে বেতনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো না। সে সময় একজন কোর কমান্ডারের বাৎসরিক বেতন ছিল ৭০০০-৯০০০ দিরহাম (আবু ইউসুফ ঃ পৃষ্ঠা-৪৬)।

বিদায় ! হে অস্ত্র বিদায় !

মারআশ অভিযানের পূর্বে খালিদ (রা) একদিন খুব যত্নসহকারে গোসল করেছিলেন। তাঁর সংগে এক ধরনের তরল পদার্থ ছিল যা প্রস্তুত করতে সুরা মিশাতে হতো। এই জিনিসটি দিয়ে শরীর ঘষলে এক ধরনের আরামদায়ক অনুভূতির সৃষ্টি হয়। খালিদ (রা) ঐ জিনিসটি দিয়ে ভাল করে শরীর ঘষে গোসল করেন এবং খুবই ঝরঝরে বোধ করেন।

কয়েক সপ্তাহ পরে খালিদ (রা) খলীফার নিকট হতে একটি পত্র লাভ করেন! 'আমি জানতে পেরেছি তুমি সুরার দ্বারা তোমার শরীর ঘষে পরিষ্কার করেছ। আল্লাহ যেভাবে পাপকে ও পাপের বস্তুকেও নিষিদ্ধ করেছেন, তেমনি সরাসরি সুরা ও সুরার সাহায্যে প্রস্তুত যে কোন বস্তুও নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি সুরা পান করার মত শরীরে প্রয়োগকেও নিষিদ্ধ করেছেন। এই অপরিচ্ছন্ন বস্তুটি যেন তোমার শরীরকে আর স্পর্শ না করে।'[৪২৬]

মুসলমানদের জন্য সুরা পান নিষিদ্ধ হওয়ার নিয়মটি নিয়ে খালিদ (রা) চিন্তা-ভাবনা করেন। রাসূল (সা)-এর অন্য সব সহচরের মতো খালিদ (রা)ও পবিত্র কুরআনের উপরে ভাল দখল রাখতেন এবং জানতেন যে, কুরআনে এ সংক্রান্ত আয়াতসমূহে নেশাগ্রস্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে মুসলমানদের জন্য সুরা পান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সুরার সাহায্যে তৈরি তেল বা মলম শরীরে প্রয়োগের ব্যাপারে কোন উল্লেখ নেই। খালিদ (রা) খলীফার নিকট পত্র লিখে যে জিনিসটি শরীরে প্রয়োগ করেছিলেন, তা কিভাবে তৈরি এবং সিদ্ধ করে সুরার প্রভাব মুক্ত করা হয় তা বর্ণনা করেন। তিনি লিখেন,"আমরা এটাকে এমন করে নেই যাতে এটা সুরার প্রভাব মুক্ত হয়ে সাধারণ গোসলের পানির মতো ব্যবহারযোগ্য হয়।"[৪২৭]

সুরা সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতের এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে খলীফার আর বলার তেমন কিছু থাকে না। তিনি শুধু একটু লিখে ক্ষান্ত হন, "আমার ভয় হয় যে মুগীরার গৃহ অন্যায় কাজে ভরে না যায়।"[৪২৮] বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যায়। খালিদ (রা) হয়তো ঐ পদার্থ দিয়ে আর কখনো গোসল করেননি। তবে এটা

---

৪২৬. তাবারী ঃ তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৬।

৪২৭. পূর্বোক্ত।

৪২৮. মুগীরা ছিলেন খালিদের পিতামহ।

পরিষ্কার যে, হাজিরের যুদ্ধের পর উমরের অন্তরে খালিদের যে মর্যাদা সৃষ্টি হয়েছিল সুরার সাহায্যে তৈরি পদার্থ শরীরে প্রয়োগ সংক্রান্ত খলীফার মতামতকে খণ্ডন করার ফলে তা হয়তো মুছে যায়।

৬৩৮ খৃস্টাব্দের শরৎকালে (১৭ হিজরী) মারআশ দখলের কিছু পরেই খলীফা জানতে পারেন যে, আশআস খালিদের প্রশংসাসূচক একটি কবিতা আবৃত্তি করে তাঁর নিকট হতে ১০,০০০ দিরহাম উপহার লাভ করেছে। খলীফা আর সুযোগ দিতে চান না। তিনি সংগে সংগে আবু উবায়দার নিকট পত্র লেখেন, "খালিদকে সবার সামনে হাজির করো, তার পাগড়ি দ্বারা হাত বেঁধে নাও এবং তার ক্যাপ খুলে ফেলো। তাকে জিজ্ঞেস করো, আশআসকে যে অর্থ উপহার দিয়েছে তা কি তার নিজের পকেট হতে না যুদ্ধে অর্জিত সম্পদ হতে ? যদি সে যুদ্ধে অর্জিত সম্পদ হতে তা দেয়ার কথা স্বীকার করে তা হলে সে সরকারী সম্পদ অপব্যবহারের দোষে দোষী। আর যদি সে দাবি করে যে, নিজের পকেট থেকে দিয়েছে তবু সে অপচয়ের জন্য দোষী। দুটির যে কোন কারণেই হোক তাকে বরখাস্ত করো এবং তার দায়িত্ব বুঝে নাও।"[৪২৯]

এটি কোন সাধারণ চিঠি ছিল না। যদিও খলীফার পত্রে বর্ণিত অভিযুক্তকে হাজির করার পদ্ধতিটি ছিল সে সময়ের আরবের খুবই প্রচলিত, কিন্তু এই অভিযুক্ত তো একজন সাধারণ ব্যক্তি নন। খলীফা এই নির্দেশটি একজন বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা প্রেরণ করতে চান এবং তিনি এই কাজের জন্য ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বেলাল (রা)-কে মনোনীত করেন। তিনি বেলালের হাতে পত্রটি হস্তান্তর করে খালিদের ব্যাপারটি নিয়ে কিভাবে অগ্রসর হতে হবে তা বুঝিয়ে দিয়ে তাঁকে যত দ্রুত সম্ভব হেম্‌স যাত্রার নির্দেশ দান করেন।

বেলাল (রা) হেম্‌স পৌঁছে পত্রটি আবু উবায়দা (রা)-এর কিট হস্তান্তর করেন। আবু উবায়দা (রা) পত্রটি পাঠ করে বিস্ময়ে বিহবল হয়ে পড়েন। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, আল্লাহ্‌র তরবারির এই পরিণতি হবে। তাঁকে খলীফার নির্দেশ পালন করতে হবে। তিনি খালিদ (রা)-কে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করতে বলেন।

আবু উবায়দার সংবাদ পেয়ে খালিদ (রা) কীন্নাসরীন ত্যাগ করেন। আসন্ন পরিণতি সম্পর্কে তিনি কিছুই ভাবতে পারেন নি, বরং তিনি ভেবেছিলেন যে, তাঁকে হয়তো যুদ্ধ পরিষদের সভায় যোগদানের জন্য ডাকা হয়েছে। হয়তো রোম বা বায়যান্টাইন স্রামাজ্যে আর একটি অভিযান অপেক্ষা করছে। তিনি আরো যুদ্ধ ও আরো বিজয়ের জন্য সামনে তাকিয়ে থাকেন। হেম্‌সে পৌঁছেই তিনি আবু উবায়দার বাসায় যান এবং সেখানেই প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারেন। সর্বাধিনায়ক তার বিরুদ্ধে আনীত খলীফার অভিযোগ ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁকে মন্তব্য করার অনুরোধ করেন। আবু উবায়দা (রা)-এর বক্তব্য শুনে খালিদ (রা) বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে

৪২৯. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা-১৬৭।

পড়েন এবং বুঝতে পারেন যে, ব্যাপারটি একটি মামুলি অভিযোগ নয়। তিনি আবু উবায়দা (রা)-কে অনুরোধ করেন তাঁর বোনের সংগে পরামর্শের জন্য কিছু সময় দিতে হবে। আবু উবায়দা (রা) সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

খালিদ (রা)-এর বোন ফাতিমা হেম্‌সে থাকতেন। তিনি তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁকে সবকিছু খুলে বলে তাঁর পরামর্শ চান। ফাতিমা খালিদ (রা)-এর সন্দেহকে যথার্থ বলে সমর্থন করেন এবং বলেন, "আল্লাহর কসম, উমর কখনই তোমার উপর খুশি হবেন না। তিনি চান যে, তুমি দোষ স্বীকার করো এবং তিনি তোমাকে বরখাস্ত করবেন।"[৪৩০]

"তুমি ঠিকই বলেছ", খালিদ (রা) মন্তব্য করেন। তিনি বোনের মাথায় চুমু খেয়ে আবু উবায়দার নিকট ফিরে গিয়ে জানান যে, তিনি কিছু স্বীকার করবেন না। তারপর উভয় জেনারেল নীরবে হেঁটে এক জায়গায় উপস্থিত হন, যেখানে বেশ কিছু মুসলিম সমবেত হয়েছিলেন। তাদের অনেকেই দৌড়ে এসে খালিদের সংগে করমর্দন করে। এক কোণায় একটা উঁচু জায়গা ছিল। আবু উবায়দা (রা) ও খালিদ (রা) সমাবেশের দিকে মুখ করে তার উপরে বসে পড়েন। আবু উবায়দার একপাশে বসেন বেলাল (রা)।

কয়েট মিনিট ধরে সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করে। মুসলমানগণ এই সমাবেশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানতো না; খালিদ (রা)ও না । তিনি খলীফার অভিযোগের সংগে এই সমাবেশের কোন সম্পর্ক থাকেতে পারে তা ভাবতেই পারেননি। কেননা তাকে প্রকাশ্য বিচারের সম্মুখীন হতে হবে তা কখনই চিন্তা করেননি। বেলাল (রা) আবু উবায়দা (রা)-এর দিকে তাকান। তাঁর চাহনিতে একটি প্রশ্ন ছিল। কিন্তু আবু উবায়দা (রা) মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি যতটুকু প্রয়োজন খলীফার নির্দেশ পালন করেছেন। খালিদের মতো জেনারেলকে, যিনি নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে বেশি সামরিক সেবা দিয়েছেন, যদি প্রকাশ্যে বিচারের সম্মুখীন হতে হয় তাহলে সে ব্যাপারে আবু উবায়দা (রা)-এর করণীয় কিছুই নাই। বেলাল (রা) যা ভাল মনে করেন তাই করতে পারেন।

বেলাল (রা) আবু উবায়দা (রা)-এর মনোভাব বুঝতে পারেন। তিনি দাঁড়িয়ে খালিদ (রা)-এর দিকে মুখ করে উপস্থিত সকলে শুনতে পারে এমনভাবে বলেন, "ওহে খালিদ ! আপনি আশআসকে ১০,০০০ দিরহাম দিয়েছিলেন নিজের পকেট হতে না যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ হতে ? "

খালিদ (রা) আহত দৃষ্টিতে নীরবে বেলাল (রা)-এর প্রতি তাকান! তিনি তাঁর কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

বেলাল (রা) তাঁর প্রশ্নটি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন। মনে হলো যেন খালিদ (রা) কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। আরো কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে কোন উত্তর না পেয়ে

---

৪৩০. পূর্বোক্ত ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬২৪। ইয়াকুবী ঃ তারীখ, পৃষ্ঠা-১৪০।

বেলাল (রা) খালিদের কাছে গিয়ে, "আমীরুল মুমিনীন এই নির্দেশ দিয়েছেন" বলতে বলতে দু'হাত দিয়ে খালিদের ক্যাপ ও পাগড়ি খুলে ফেলেন। তারপর তিনি আবার বলেন,"আপনার বক্তব্য কি ? নিজের পকেট থেকে দিয়েছেন, না যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হতে ?"

এবার খালিদ (রা) মুখ খোলেন,"না"! তিনি প্রতিবাদ করেন,"আমার পকেট হতে।"

এই বক্তব্য শুনে বেলাল (রা) খালিদের ক্যাপ ও পাগড়ি আবার নিজ হাতে পরিয়ে দেন এবং বলেন, "আমরা আমাদের খলীফার নির্দেশ মেনে চলি। আমরা তাঁদেরকে সম্মান করি!"[৪৩১] তারপর তিনি নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়েন।

কয়েক মিনিটের জন্য পিন-পতন নীরবতা বিরাজ করে। আবু উবায়দা (রা) ও বেলাল (রা) নিচের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন। খালিদ (রা) উঠে দাঁড়ান। তিনি বিব্রত ও বিহ্বল। তিনি এখন পর্যন্ত বিচারের রায় জানেন না; তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে না তিনি তাঁর কোরের কমান্ডার আছেন। তিনি আবু উবায়দা (রা)-কে প্রশ্ন করে বিব্রত করতে চাননা বলে কিছু জিজ্ঞেস না করেই ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে কীন্নাসরীনে চলে যান।[৪৩২]

বেলাল (রা) মদীনায় ফিরে খলীফা উমর (রা)-এর নিকট কার্যবিবরণী পেশ করেন। খলীফা আবু উবায়দার নিকট হতে এই মর্মে নিশ্চয়তা আশা করতে থাকেন যে, তিনি খালিদ (রা)-কে কীন্নাসরীনের কমান্ড হতে অপসারিত করেছেন। এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয় কিন্তু আবু উবায়দা (রা)-এর কোন পত্র আসে না। তখন খলীফা অনুমান করেন যে, আবু উবায়দা (রা) খালিদ (রা)-কে তার অপসারণ সম্পর্কে অবহিত করতে কিছুটা অনীহ। খলীফা নিজেই ব্যাপারটি মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং পত্র মারফত খালিদ (রা)-কে মদীনায় ডেকে পাঠান।

খলীফার পত্র পেয়েই খালিদ (রা) হেম্‌স গমন করেন এবং আবু উবায়দার নিকট স্বীয় অবস্থান সম্পর্কে জানতে চান। সর্বাধিনায়ক জানান যে, তাকে খলীফার দফতর হতে বরখাস্ত করা হয়েছে। একথা শুনে খালিদ (রা) মন্তব্য করেন, "আপনার উপরে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক ! আপনি কেন এটা করেছেন ? কেন আমার নিকট হতে এমন একটি সংবাদ গোপন করেছেন যা আমি পূর্বেই জানতে চেয়েছিলাম ? "

আবু উবায়দা (রা)-এর দৃষ্টি ছিল দুঃখভারাক্রান্ত। খালিদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ। তিনি ভগ্নকণ্ঠে বলেন, " আল্লাহর কসম, আমি জানতাম যে, এ

---

৪৩১. তাবারী ঃ তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৭

৪৩২. একটি বর্ণনা মতে দেখা যায় যে, যা সঠিক বলে মনে হয় না, উমর (রা) আবু উবায়দাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন খালিদের সম্পদের অর্ধেক বাজেয়াপ্ত করতে এবং আবু উবায়দা (রা) এই নির্দেশ এতটুকু নিখুঁতভাবে পালন করেছিলেন যে, খালিদের পায়ের দু'টি জুতার একটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। (তারারী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬২৫। ইয়াকুবী ঃ তারীখ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪০)।

সংবাদ আপনাকে ব্যথিত করবে। আমি একটি পথ খুঁজে পেলে আপনাকে কখনই এ আঘাতটি দিতাম না।"[৪৩৩]

খালিদ (রা) কীন্নাসরীন ফিরে যান এবং গতিময় রক্ষী দলটিকে একত্র করে তাদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ দান করেন। এই দলটিকে তিনি দীর্ঘ দিন কমান্ড করেছেন এবং একের পর এক যুদ্ধে বিজয় ও গৌরবের পথে পরিচালিত করেছেন। দলটিও তাঁকে অকৃত্রিম আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সংগে অনুসরণ করেছে। তিনি তাদেরকে জানান যে, তাঁকে কমান্ড থেকে অপসারণ করা হয়েছে এবং খলীফার নির্দেশে তিনি মদীনা যাত্রা করছেন। তিনি তাদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানান। খালিদ (রা)-এর অধীনে যুদ্ধ করে এই দলটি কখনও পরাজয় বরণ করেনি।

কীন্নাসরীন হতে তিনি আবার হেম্‌স গমন করেন এবং সকলের সংগে বিদায়ী সাক্ষাৎ করে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা অব্যাহত রাখেন। তার এই মদীনা যাত্রা যুদ্ধক্ষেত্র ফেরত বিজয়ী বীরের মতো সম্মানজনক নয়, বরং তিনি মদীনায় ফিরছেন একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির গ্লানি নিয়ে।

খালীদ (রা) মদীনায় পৌঁছে খলীফার আবাস গৃহের দিকে যাত্রা করেন। পথেই খলীফার সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সে সময় দু'জন মহা প্রতাপশালী ব্যক্তি, একজন শ্রেষ্ঠতম শাসক ও অন্যজন শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধা, একে অপরের নিকটবর্তী হতে থাকেন, কিন্তু কারো দৃষ্টিতে কোন প্রকার ভীতির চিহ্ন নেই। প্রথম কথা বলেন উমর (রা)। তিনি খালিদের কৃতিত্বের স্বীকৃতিবাচক একটি উপস্থিত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

তোমার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে
যা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।
কিন্তু মানুষের দ্বারা কিছুই হয় না
সবকিছু হয় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।[৪৩৪]

উত্তরে খালিদ (রা) বলেন, " আপনি যা করেছেন আমি মুসলমানদের নিকট তার প্রতিবাদ করছি। আল্লাহর কসম, ওহে উমর আপনি আমার প্রতি অবিচার করেছেন।"

"এত সম্পদ কোথা থেকে আসে" উমর (রা) প্রশ্ন করেন।

"আমি যুদ্ধে লব্ধ সম্পদের অংশ থেকে পেয়েছি। তবে ৬০,০০০ দিরহামের অতিরিক্ত যা তা আপনার।"[৪৩৫]

উমর (রা)-এর নিকট খালিদ (রা)-এর সম্পদের একটি তালিকা ছিল যার মূল্য দাড়ায় ৮০,০০০ দিরহাম । তিনি অতিরিক্ত ২০,০০০ দিরহাম বাজেয়াপ্ত করেন।

---

৪৩৩. তাবারী ঃ তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ১৬৭।
৪৩৪. পূর্বোক্ত ঃ পৃষ্ঠা - ১৬৮।
৪৩৫. তাবারী ঃ তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৭।

সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হলে উমর (রা) খালিদ (রা)-কে বলেন, " ওহে খালিদ ! আল্লাহর কসম, তুমি আমার দৃষ্টিতে খুবই সম্মানিত ব্যক্তি এবং তুমি আমার প্রিয় পাত্র। আজকের পর হতে আশা করি আমার বিরুদ্ধে তোমার আর কোন অভিযোগ থাকবে না।"[৪৩৬] এরপর এখানেই ব্যাপারটি শেষ হয়ে যায়।

কয়েক দিন পর খালিদ (রা) চিরতরের জন্য মদীনা ত্যাগ করেন। তিনি আর কখনও আরবে ফিরে আসেননি। তাঁর মদীনা ত্যাগের পরপরই রাজধানীর লোকেরা খলীফার নিকট সমবেত হয়ে আবেদন জানায় তাঁর সম্পদ ফিরে দেয়ার জন্য। এর জবাবে উমর (রা) বলেন, "আমি আল্লাহ ও মুসলমানদের সম্পদ নিয়ে ব্যবসা করি না।"[৪৩৭] তাবারীর মতে এই ঘটনার পরে খলীফার মনে খালিদ (রা) সম্পর্কে আর কোন অভিযোগ ছিল না।

অল্প সময়ের মধ্যে উমর (রা)-এর নিকট এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, খালিদের ব্যাপারে গৃহীত ব্যবস্থা মুসলমানদের মধ্যে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে। প্রকাশ্যে এরকম আলোচনা হতে থাকে যে, উমরের ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলেই খালিদের এই পরিণতি। খলীফার সিদ্ধান্তের বিরূপ সমালোচনার বিষয়টি ব্যাপক রূপ লাভ করে। ফলে উমর (রা) তাঁর কমান্ডার ও প্রশাসকদেরকে পত্র লিখে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করেন ঃ

'আমি কোন প্রকার ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা খালিদের কোন অসততার কারণে তাঁকে বরখাস্ত করিনি। মানুষ তার কৃতিত্বকে এত বড় করে দেখেছিল যে,আমার ভয় হচ্ছিল তারা আল্লাহর সাহায্যের চেয়ে তাঁর উপরেই বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। আমি তাদেরকে জানাতে চাই যে, সব কিছুই হয় আল্লহ্র পক্ষ থেকে এবং এর বিপরীত কোনো বিশ্বাস যেন কারো অন্তরে স্থান না পায়।'[৪৩৮]

খলীফার পত্রের বিষয়বস্তু এরূপ ছিল যে, খালিদের সৈনিকগণ তাকে জয়-পরাজয়ের প্রতিভূ ভাবতে শুরু করেছিল। এটা ছিল ভিন্ন অর্থে একজন জেনারেলের জন্য সর্বোচ্চ প্রশস্তি । কিন্তু খালিদ (রা) কীন্নাসরীন প্রত্যাবর্তন করেন একজন নিঃস্ব ব্যক্তি হিসেবে। স্বধর্মত্যাগের আন্দোলন নির্মূলকারী এবং ইরাক ও সিরিয়া বিজয়ী এই বীর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন একজন পদচ্যুত ও অতি সাধারণ ব্যক্তির মতো। ঘরের দরজায় স্ত্রী স্বাগতম জানালে তিনি বলেন, "উমর আমাকে পাঠিয়েছিলেন সিরিয়া বিজয়ের জন্য। বিজয় সম্পন্ন হয়েছে। এখন তিনি আমাকে বরখাস্ত করেছেন।"[৪৩৯]

---

৪৩৬. পূর্বোক্ত।
৪৩৭. তাবারী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬২৫।
৪৩৮. তাবারী ঃ তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৬৭।
৪৩৯. তাবারী ঃ তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৯।

খালিদের বিজয় অভিযানের দিন শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র তরবারি - যে তরবারিকে আল্লাহ্ পাক উন্মুক্ত করেছিলেন অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে এবং যে তরবারিকে খলীফা আবূ বকর (রা) কোষবদ্ধ করতে সবসময় অস্বীকার করেছিলেন, খলীফা উমরের দ্বারা শেষ পর্যন্ত তা কোষবদ্ধ হলো।

বরখাস্ত হওয়ার পর খালিদ (রা) মাত্র চার বছরেরও কম সময় জীবিত ছিলেন এবং এই সময়টি তাঁর ভাল কাটেনি। আর্থিক দিক থেকে সংকটের মধ্যে না থাকলেও তাঁকে খুব হিসেব করে চলতে হতো। ১৫ হিজরীতে উমর (রা) মুসলমানদের জন্য ভাতার প্রচলন করেন। ইসলামের দৃষ্টিতে মর্যাদা ও যুদ্ধে অবদানের বিষয় দুটি বিবেচনা করে এই ভাতা নির্ধারণ করা হয়। হুদায়বিয়ার চুক্তির পরে ও স্বধর্মত্যাগের আন্দোলনের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানগণের প্রত্যেকে ৩০০০ দিরহাম[৪৪০] করে ভাতা পেতেন। খালিদ (রা)ও এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে একটি পরিবার ভালভাবে চলতে পারলেও খালিদের মত বিত্তশালী পরিবারে জন্মগ্রহণকারী হাত খোলা ব্যক্তির জন্য তা ছিল অপর্যাপ্ত। তিনি হেম্‌সে একটি বাড়ি কিনে সেখানেই অবসর জীবন যাপন করেন।

সেনাবাহিনী থেকে পদচ্যুতি ছিল খালিদ (রা)-এর জন্য একটি বড় আঘাত। অবশ্য এর চেয়েও বড় আঘাত আসে তাঁর মদীনা থেকে হেম্‌সে প্রত্যাবর্তনের পর পরই। এই সময়ে প্লেগের আক্রমণে তাঁর আপন ও প্রিয়জনদের অধিকাংশই তাঁর নিকট হতে বিদায় নেয়।

প্লেগের সূত্রপাত হয় প্যালেস্টাইনের আমওয়াস এলাকায় ১৮ হিজরীর মুহাররম অথবা সফর মাসে (৬৩৯ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসে) এবং তা দ্রুত প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ায় ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে অসংখ্য খৃস্টান ও মুসলমানের জীবন হরণ করে। খলীফা সিরিয়ার মুসলমানদের নিরাপত্তার ব্যাপারে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং বিশেষভাবে আবু উবায়দা (রা)-এর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। তিনি জাতির বিশ্বস্ত ব্যক্তি আবু উবায়দা (রা)-কে মদীনায় ডেকে পাঠিয়ে দুর্যোগের কবল হতে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু আবু উবায়দা (রা) খলীফার পত্র পাঠ করে বুঝতে পারেন যে, মদীনায় গেলে মহামারী দূর না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁকে সিরিয়ায় ফিরতে দিবেন না। যিনি যুদ্ধের মাঠের চরম দুর্যোগের সময় নিজের যোদ্ধাদেরকে ত্যাগ করেননি, তিনি কিভাবে তাদেরকে প্লেগের হাতে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারেন ? তিনি মদীনায় যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং শেষ পর্যন্ত জীবন দিয়ে সহযোদ্ধাদের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেন।

আমওয়াসের প্লেগে হাজার হাজার মুসলিম প্রাণ ত্যাগ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন আবু উবায়দা, শুরাহ্‌বীল, ইয়াযীদ ও জাররারের মতো মহৎপ্রাণ ব্যক্তি ও

---

৪৪০. পূর্বোক্ত ঃ তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৯। বালাযুরী ঃ পৃষ্ঠা ৪৩৭।

খালিদ (রা)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ। তাঁর কষ্টের এখানেই শেষ নয়। প্লেগ তাঁর ৪০ জন পুত্রকেও কেড়ে নেয়। এই ভয়ংকর মহামারী খালিদের এমন সব প্রিয় ব্যক্তিকে নিয়ে যায় যারা তাঁর অবসর জীবনে কিছুটা হলেও আনন্দ ও আরামের যোগান দিতে পারতো। জানামতে খালিদ (রা)-এর মাত্র তিন পুত্র জীবিত ছিলেন– সুলাইমান, যিনি মিসর অভিযানের শেষ পর্যায়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করেন। মুহাজির, যিনি আলীর অধীনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সিফফীনের প্রান্তরে নিহত হন এবং আব্দুর রহমান অনেকদিন বেঁচে ছিলেন ও খালিদের সামরিক প্রজ্ঞার উত্তরাধিকার ছিলেন। খালিদ (রা)-এর কয়জন মেয়ে ছিল সে ব্যাপারে কিছু জানা যায় না। তবে তাঁর বংশের শেষ পুরুষ হিসেবে তাঁর পৌত্র খালিদ বিন আব্দুর রহমান বিন খালিদের নাম পাওয়া যায়।

তিনজন কোর কমান্ডারের মৃত্যুর পরে (আবু উবায়দা, শুরাহ্বীল, ও ইয়াযীদ) আমর ইবনুল আস মুসলিম বাহিনীর কমান্ড গ্রহণ করেন এবং গোটা বাহিনীকে দ্রুত সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের পাহাড়ী এলাকায় পাঠিয়ে দেন। এই করে তিনি মুসলিম বাহিনীকে মহামারীর হাত হতে দূরে নিতে সক্ষম হলেও তার পূর্বেই ২৫,০০০ প্রাণ প্লেগের উদরে চলে যায়। মহামারী দূর হওয়ার পূর্বেই খলীফা আয়ায বিন গানাম সিরিয়ার উত্তর অঞ্চলের এবং মুআবিয়াকে দামেস্ক ও জর্দানের সামরিক গভর্নর নিয়োগ করেন। আমর ইবনুল আসের হাতে থাকে প্যালেস্টাইনের কমান্ড।

স্বধর্মত্যাগ আন্দোলন বিরোধী অভিযানের বিভিন্ন জেনারেলকে কোন কমান্ডার নিয়োগের ব্যাপারে খলীফা আবূ বকর (রা) আমর ইবনুল আসের সংগে পরামর্শ করেছিলেন। খলীফা বলেছিলেন, 'ওহে আমর! বিচার-বুদ্ধির দিক থেকে আরবদের মধ্যে তুমি সবচেয়ে চতুর ব্যক্তি। খালিদের ব্যাপারে তোমার মতামত কি ? উত্তরে আমর বলেছিলেন ' তিনি যুদ্ধের প্রভু, মৃত্যুর বন্ধু। তাঁর মধ্যে আছে সিংহের ক্ষীপ্রতা ও বিড়ালের ধৈর্য।"[৪৪১]

অবশ্য খালিদের মতো একজন লোকের পক্ষে জীবনের এই পর্যায়ে বিড়ালের ধৈর্য যথেষ্ট ছিল না। বিড়াল ধৈর্য ধরে ঘাটটি মেরে থাকে একটা শিকারের সম্ভাবনাকে সামনে নিয়ে। শিকারের সম্ভাবনা না থাকলে বিড়ালের পক্ষেও ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব নয়। খালিদের সামনে ছিল না কোন সম্ভাবনা, ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করার মতো কোন কিছু। তিনি আর কোনো যুদ্ধে অংশ নিতে পারবেন না, আর কোনো শত্রুকেও হত্যা করতে পারবেন না। এই বাধ্যতামূলক বিবর্ণ অবসর জীবনের সময়গুলো তিনি নীরবে নিভৃতে প্রিয় সাথী ও পুত্রদেরকে হারানোর শোকের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন।

ইসলামের বিজয় অব্যাহত থাকে। প্লেগ বিদায় নেয়ার পর আয়ায পুনরায় ১৮ হিজরীতে জাযীরা আক্রমণ করেন এবং পরবর্তী বছরের শেষ নাগাদ তা আয়ত্তে নিয়ে

---

৪৪১. ইয়াকুবী ঃ তারীখ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ১২৯।

আসেন। তিনি উত্তরে সামসাত, আমিদ (বর্তমানে দিয়ার বকর) এবং বিতলিস পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন। এমন কি সুদূর মালাতিয়া পর্যন্ত সফলতার সংগে আক্রমণ পরিচালনা করেন। (২৯ নম্বর ম্যাপ দ্র.) পূর্ব সেকটরের খবরও ছিল খুবই আনন্দদায়ক। খালিদের বরখাস্তের সময় সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস বর্তমান ইরাকের অধিকাংশ এলাকা এবং উত্তর-পশ্চিম পারস্যের অংশ বিশেষ আহওয়ায, তুসতার ও সুস দখল করেন। এই সেকটরে মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে এবং খালিদের ইন্তিকালের পরে পারসিকদের সংগে শেষ প্রচণ্ড যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়। ৬৪০ খৃস্টাব্দে (১৯ হিজরী) ক্যাসেরীয়া শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং ২০ হিজরীতে আমর মিসরে অভিযান চালিয়ে এর পূর্বের অংশ দখল করেন।

প্রত্যেকটি বিজয়ের খবর অন্য মুসলমানদের মতো খালিদ (রা)-কেও আনন্দ দিতো। কিন্তু প্রত্যেকটি সংবাদ তাঁকে মনে করিয়ে দিতো যে, তিনি যুদ্ধে অংশ নেননি। তিনি হেম্‌সে বসে যে খবর পেতেন তা ছিল অনেকটা তেতো-মিষ্টি। তিনি এমন একজন প্রেমিক যে, একান্ত কাঙ্ক্ষিত প্রেমিকাকে দেখতে পেলেও তার দিকে আগাতে পারেন না। জীবনের শেষ কয়টি বছর খালিদ (রা) এরূপ অসহনীয় মনঃকষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন। গিবন তাঁর রোমান সাম্রাজ্যের ক্ষয় ও পতন গ্রন্থে খালিদ (রা)-কে মূল্যায়ন করেছিলেন, "………আরবদের মধ্যে সবচেয়ে ভযংকর ও সফল যোদ্ধা[৪৪২]" হিসেবে।

সৌভাগ্যক্রমে খালিদ (রা)-এর সংগে উমর (রা)-এর সম্পর্কের উন্নতি হতে থাকে । খেলাফতের কঠিন দায়িত্ব কাঁধে আসার পর হতে উমর (রা)-এর স্বভাবেও কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হয়। কঠোরতার পাশাপাশি তাঁর স্বভাবে নমনীয়তা ও ধৈর্যও দেখা যায়। তিনি কারও উপরে এমন বোঝা চাপাতেন না যা তিনি নিজে করেননি। তিনি সবলের প্রতি কঠোর, দুর্বলের প্রতি নরম এবং বিধবা ও শিশুদের প্রতি ছিলেন মহানুভব। তিনি দরিদ্র ও অসহায়দের সংগে বসে গল্প করতেন এবং মসজিদের সিঁড়িতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিতেন। রাতের বেলা তিনি চাবুক হাতে মদীনার রাস্তায় ঘুরতেন এবং তাঁর চাবুককে সকলে অন্যের তরবারির চেয়ে বেশি ভয় করতো। তিনি শুকনো রুটি, খেজুর ও জয়তুন তেল দিয়েই জীবন ধারণ করতেন এবং তাঁর পরিবারের জন্যও অতিরিক্ত কোনো ব্যয় করতেন না। তিনি অতি সাধারণ কাপড়ের তৈরি পোশাক পরিধান করতেন এবং তাঁর পোশাকে থাকতো অসংখ্য তালি। ন্যায়

---

৪৪২. কিছু কিছু ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, খালিদ (রা) জাযীরায় আয়াযের অধীনে যুদ্ধ করেছিলেন। প্রাথমিক যুগের অধিকাংশ ঐতিহাসিক বিভিন্ন সূত্র থেকে উল্লেখ করেছেন যে, আবু উবায়দার মৃত্যুর পর খালিদ (রা) আর কারো অধীনে যুদ্ধ করেননি। আমি শেষের মতটি সঠিক বলে গ্রহণ করেছি।

বিচার নিশ্চিত করতে তাঁর অনমনীয়তা ছিল অতুলনীয়। এমন কি নেশা করার অভিযোগে তিনি স্বীয় পুত্রকেও চাবুক মেরেছিলেন।

খালিদ (রা)-এর হাতে এখন প্রচুর অবসর সময়। তিনিও ধীরে ধীরে তাঁর পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীর মহান গুণাবলী উপলব্ধি করতে থাকেন। তাঁর অন্তর থেকে সমস্ত দু:খ মুছে যায় এবং তিনি উমর (রা)-এর মংগল কামনা করেন। একদিন তিনি জনৈক সাক্ষাৎকারীকে বলেছিলেন, "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আবূ বকর (রা)-কে তুলে নিয়েছেন এবং উমর (রা)-কে খেলাফত দান করেছেন। আমি এক সময় উমরকে পছন্দ করতাম না কিন্তু আজ সে আমার প্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে।"[৪৪৩] খালিদের অন্তরের পরিবর্তনটা এতো গভীর ছিল যে, মৃত্যুর সময় তিনি উমর (রা)-কেই তাঁর সম্পদের উত্তরাধিকার নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। সময়ের ব্যবধানেই এই পরিবর্তনটি সম্ভব হয়েছিল।

খালিদ (রা) তাঁর অবসর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন অতীতের যুদ্ধগুলোর স্মৃতিচারণ করে। অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। তিনি স্মৃতির পাখায় ভর করে চলে যান সেই যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে, যেখানে একের পর এক বিজয় লাভ করেছেন এবং প্রতিপক্ষের বিখ্যাত জেনারেলদের দ্বৈতযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তাদের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এই বিজয়গুলোর কথা চিন্তা করে তিনি গর্ব বোধ করতেন। তবে এ জন্য তাঁর মধ্যে কোনো অহংকারবোধ ছিল না বরং তিনি আল্লাহর রহমত ও লাল ক্যাপটিকে, যার মধ্যে সংরক্ষিত ছিল রাসূল (সা)-এর চুল, তাঁর সমস্ত বিজয়ের উৎস বলে বিশ্বাস করতেন। যুদ্ধের চিত্র স্মৃতির পর্দা থেকে সরে গেলে তিনি ভাবতেন তাঁর সহকর্মী জেনারেলদের কথা। আবু উবায়দা, শুরাহবীল, ইয়াযীদ, আমর ইবনুল-আস প্রমুখ জেনারেল ও আবদুর রহমান বিন আবূ বকর, রাফে বিন উমাইর এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী জাররার বিন আল-আজওয়ারের মত বিখ্যাত যোদ্ধাদের স্মৃতি চর্চায় তিনি বিভোর হয়ে পড়তেন। অন্যতম সহযোগী জাররারের মধ্যে তিনি নিজের দক্ষতা ও সাহসিকতার প্রতিফলন দেখতে পেতেন। তিনি মুগ্ধ হতেন এই ভেবে যে, তাঁর প্রিয় বীর জাররারের বীরত্বগাথা ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। অবশ্য ইতিহাস আজ খালিদ (রা)-কে যেভাবে মূল্যায়ন করেছে তিনি হয়তো তখন তা চিন্তা করেননি।

ইতিহাস খালিদ (রা)-এর মত কুশলী যোদ্ধা ও সামরিক প্রতিভার সাক্ষাৎ কদাচিৎ লাভ করেছে। তাঁর মধ্যে সমন্বয় হয়েছিল চেংগিস খান ও মহান ফ্রেডারিকের যুদ্ধ পরিচালনার প্রতিভা এবং পারস্য বীর রুস্তমের ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্য ও শক্তিমত্তার। ইতিহাসের পাতায় এমন আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না যার মধ্যে এরূপ বহুমুখী

---

৪৪৩. তাবারী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৯৮।

সামরিক গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ছিলেন ইতিহাসের ঐ দুজন জেনারেলের একজন যারা যুদ্ধক্ষেত্রে কখনো পরাজয় বরণ করেননি। অপরজন ছিলেন চেংগিস খান। তবে চেংগিস খান খালিদের মত চৌকশ যোদ্ধা ছিলেন না যদিও তিনি একটি বিশাল ভূখণ্ড জয় করেছিলেন। খালিদের যুদ্ধ পদ্ধতিতে কৌশলগত দূরদৃষ্টি ও সৈন্য পরিচালনার প্রতিভার সংগে সংযোগ হয়েছিল ক্ষিপ্রতার ও প্রচণ্ডতার। তাঁর দৃষ্টিতে যুদ্ধের লক্ষ্য, কৌশলে সৈন্য পরিচালনা করে বিজয় অর্জন নয় বরং প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতার সাথে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা। কৌশলে সৈন্য পরিচালনার বিষয়টি হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংসের লক্ষ্যে বাগে পাওয়ার একটি উপায় মাত্র।

খালিদ (রা)ই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি ওহুদের প্রান্তরে রাসূল আকরাম (সা)-এর উপর একটি কৌশলগত পরাজয় চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আরবের সীমানা অতিক্রম করে ভিন্নদেশ বিজয়ী প্রথম মুসলিম কমান্ডার। দুটি বিশাল সাম্রাজ্যকে পদানতকারী প্রথম মুসলিম জেনারেল। তাঁর যুদ্ধগুলো বিশ্লেষণ করলে তাঁর মধ্যে একজন যথার্থ সামরিক নেতার প্রতিকৃতি উপলব্ধি করা যায়। বিশেষ করে ওহুদ, কাজিমা, ওয়ালাজা, মুজাআ, আজনাদাইন ও ইয়ারমুকের যুদ্ধগুলো পর্যালোচনা করলে সামরিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলীর বাস্তব রূপায়ণ দেখা যায়। তাঁর যুদ্ধগুলোর মধ্যে কৌশলগত দূরদৃষ্টির প্রয়োগ ও সৈন্য পরিচালনার দক্ষতার মাপকাঠিতে ওয়ালাজা ছিল নিখুঁত, তবে ইয়ারমুখ নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ।

খালিদ (রা) ছিলেন মূলত একজন যোদ্ধা। তবে একজন উচ্চ পর্যায়ের জেনারেল হিসেবে তাঁকে বিজিত ভূখণ্ডের প্রশাসনিক বিষয়াদি পরিচালনার জন্য সামরিক গভর্নরের দায়িত্বও পালন করতে হয়েছিল। তাঁর যুদ্ধ পরিকল্পনা ও সৈন্য পরিচালনার কৌশল পর্যালোচনা করলে তাঁর মধ্যে একটি দেদীপ্যমান সামরিক প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে শিক্ষা-দীক্ষা বা সাংস্কৃতিক বিষয়াদির প্রতি তাঁর তেমন কোন ঝোঁক ছিল না। খালিদ (রা) ছিলেন একজন নির্ভেজাল ও খাঁটি সৈনিক। তাঁর নিয়তিই ছিল বিশাল বিশাল যুদ্ধে পরাক্রমশালী শত্রুদেরকে আক্রমণ করে তাদের ধ্বংস করে যুদ্ধে জয়লাভ করা। ইসলামের উত্থানের ফলে আরব ভূমিতে পবিত্র যুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। ইসলামের পতাকা তলে শামিল হওয়ার সংগে সংগে খালিদের নিয়তি তাঁকে একের পর এক যুদ্ধের পথে পরিচালিত করে। খালিদ (রা) যখনই কোনো অভিযান চালিয়েছেন শত্রু তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে, তাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত যমদূতকে প্রতিহত করতে হবে। তিনি যখনই কোনো এলাকা অতিক্রম করেছেন পিছনে রেখে গেছেন বিজয়ের পদচিহ্ন। ওহুদের যুদ্ধ হতে শুরু করে বরখাস্তের পূর্ব পর্যন্ত এই ১৫ বছর সময়ে তিনি ৪১টি যুদ্ধ (ছোট-খাটো সংঘর্ষগুলো ছাড়া) পরিচালনা করেন এবং এর মধ্যে ৩৫টিই সংঘটিত হয়েছিল শেষ ৭ বছরে। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, তিনি একটি যুদ্ধেও পরাজয় বরণ করেননি। এই ছিলেন খালিদ—অপ্রতিরোধ্য ও সর্বজয়ী জেনারেল।

এটা বড়ই কৌতূহলের বিষয় যে, খালিদ (রা) শেষ পর্যন্ত সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক থাকলে এবং তাঁকে বায়যান্টাইন সাম্রাজ্য বিজয়ের জন্য প্রেরণ করলে ইসলামের ইতিহাস কিরূপ হতো ! যেহেতু খালিদ (রা) কোনো যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতেন না, ফলে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি গোটা এশিয়া মাইনর দখল করে কৃষ্ণ সাগর ও বসফোরাস প্রণালী পর্যন্ত উপনীত হতেন। কিন্তু তা তাঁর নিয়তিতে ছিল না। ১৭ হিজরীর শেষ নাগাদ তাঁর অধ্যায়ের সমাপ্তি হয়। তারপর ইতিহাসের পাতায় ভিড় জমে অন্য নায়কদের।

৬৪১ খৃস্টাব্দে আয়ায বিন গানামের মৃত্যু হয়। একই বছরে প্রাণ ত্যাগ করেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বেলাল (রা) এবং খালিদের পরাজিত শত্রু রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি হেরাক্লিয়াস। খালিদের বিদায়ের ঘণ্টাও বাজতে থাকে।

৬৪২ খৃস্টাব্দের (২১ হিজরী) কোনো এক সময়ে ৫৮ বছর বয়সে খালিদ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুস্থতার প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তবে তা ছিল দীর্ঘস্থায়ী এবং তাঁকে খুব দুর্বল করে ফেলে। যে কোন উদ্যোগী কর্মঠ ব্যক্তি হঠাৎ করে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে সাধারণত তার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। খালিদের স্বাস্থ্যও দ্রুত ভেঙে যায়। অসুস্থতার দিনগুলো তাঁর জন্য খুব দুঃসহ হয়ে ওঠে। এই রোগশয্যা তাঁর মৃত্যুশয্যায় পরিণত হয়। তিনি বিছানায় শুয়ে আফসোস করতে থাকেন এজন্য যে, যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদতের গৌরব তার জুটলো না। বিছানায় শুয়ে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা তাঁর জন্য খুবই মানসিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শেষ নিশ্বাস ত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে জনৈক ঘনিষ্ঠ বন্ধু খালিদের সংগে সাক্ষাৎ করতে আসে। তিনি ডান পায়ের কাপড় তুলে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি আমার পায়ে এমন এক বিঘত জায়গা দেখতে পাও যেখানে তরবারি, তীর বা বর্শার আঘাত নেই ?" বন্ধু খালিদের পা পরীক্ষা করে না-সূচক উত্তর দেয়। তখন খালিদ (রা) বাম পায়ের কাপড় তুলে একই প্রশ্ন করেন এবং আবারও একই উত্তর আসে।

এরপর খালিদ (রা) প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত তুলে বন্ধুর সামনে মেলে ধরেন। বন্ধু হাত দুটি পরীক্ষা করে এবং একই অবস্থা দেখতে পায়। এবারে খালিদ (রা) তাঁর বিশাল বক্ষদেশ উন্মোচিত করেন, যার শক্তিশালী পেশীগুলো অসুস্থতার কারণে শিথিল হয়ে গেছে। বন্ধুটি খালিদের ক্ষত-বিক্ষত বক্ষদেশের অবস্থা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। একজন মানুষ বুকে এতো আঘাত পেয়েও কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে! এক্ষেত্রেও সে আঘাতহীন এক বিঘত জায়গাও খুঁজে পায় না।

এবারে খালিদ (রা) অস্থির কণ্ঠে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি বুঝতে পারো না! আমি যুদ্ধক্ষেত্রে মরতে চেয়েছিলাম। কেন তা হলো না ?" "যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার মৃত্যুর সৌভাগ্য হয়নি"- উত্তরে বন্ধুটি বলে।
"কেন হয়নি ?"

বন্ধুটি ব্যখ্যা করে বলে, "ওহে খালিদ, তোমার বোঝা উচিত যখন আল্লাহ্‌র রসূল তোমাকে 'আল্লাহ্‌র তরবারি' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, তিনি নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত না হও। একজন অবিশ্বাসীর হাতে তোমার প্রাণ যাওয়ার অর্থ দাঁড়াতো, আল্লাহ্‌র তরবারি আল্লাহ্‌র শত্রু দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। তা কখনও হতে পারে না"

খালিদ (রা) চুপ হয়ে যান এবং কিছুক্ষণ পরে বন্ধুটি চলে যায়। খালিদ (রা) বুঝতে পারে যে, বন্ধুটির কথায় যুক্তি আছে, কিন্তু তাঁর অন্তর কিছুতেই প্রশান্ত হয় না। আহা! কেন যে তিনি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদৎ বরণ করতে পারলেন না।

ইনতিকালের সময় যুদ্ধের অস্ত্র ও বর্ম ব্যতীত খালিদের আর কোনো সম্পদ ছিল না। আর ছিল একটি ঘোড়া ও বিশ্বস্ত দাস হাসাম। জীবনের শেষ দিনে তিনি বিছানায় একা শুয়ে আছেন এবং পাশে বসে আছে দুঃখভারাক্রান্ত হাসাম। চোখের সামনে হতে ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর আলো নিভে যেতে থাকলে খালিদ (রা) যন্ত্রণাক্লিষ্ট চিত্তে একটি বাক্যের মাধ্যমে তাঁর সমস্ত অনুভূতিকে প্রকাশ করেন, "আমি, এমনকি একটি উটের মতো মৃত্যু বরণ করছি, আমি বিছানার মধ্যে লজ্জাজনকভাবে প্রাণ ত্যাগ করছি। কাপুরুষের চোখও ঘুমের মধ্যে বন্ধ হয় না।"[৪৪৪]

এভাবেই আল-ওয়ালিদের পুত্র আল্লাহ্‌র তরবারির জীবনের অবসান হয় ।
আল্লাহ্ তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন। আমীন !

খালিদ (রা)-এর ইনতিকালের সংবাদ মদীনায় ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ে। মহিলারা রাস্তায় নেমে পড়ে। সামনে থাকে বনি মাখযুমের মেয়েরা। তারা বিলাপ করতে থাকে। উমর (রা)ও এই দঃখজনক সংবাদটি পেয়ে যান এবং পর পরই মহিলাদের বিলাপও শুনতে পান। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। খেলাফতের প্রথম দিনেই তিনি কারো মৃত্যুতে মহিলাদের বিলাপ নিষিদ্ধ করে নির্দেশ জারি করেছিলেন। উমরের নির্দেশের পিছনে যুক্তিও ছিল। যে ব্যক্তিটি ইনতিকালের মধ্য দিয়ে বেহেশতে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে যাচ্ছে তার জন্য কেন বিলাপ করা হবে ? আল্লাহ তো বিশ্বাসীদের জন্য পরকালে অনন্ত সুখের সুসংবাদ দান করেছেন। উমর (রা) কখনো কখনো চাবুক ব্যবহার করে হলেও তাঁর নির্দেশ বলবৎ করেছেন।[৪৪৫]

উমর (রা) মহিলাদের বিলাপের শব্দ শুনতে পেয়ে ঘরের মেঝে হতে উঠে দাঁড়ান এবং চাবুকটি সাথে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ান। কেউ তাঁর নির্দেশ অমান্য করবে তা তিনি সহ্য করবেন না। বিলাপ এখনই বন্ধ করতে হবে। তিনি দরজার কাছে গিয়ে থেমে যান। তিনি কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ান এবং চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। হাজার

---

৪৪৪. ইবনে কুতায়বা ঃ পৃষ্ঠা - ২৬৭।
৪৪৫. তাবারী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৬১৪।

হলেও এটা তো সাধারণ মৃত্যু নয়। এ হচ্ছে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের মহাপ্রয়াণ। তিনি পাশের ঘর হতে ভেসে আসা কান্নার শব্দ শুনতে পান। তাঁর নিজের মেয়ে হাবসা, রাসূল (সা)-এর বিধবা সহধর্মিণী এই মহান যোদ্ধার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছেন।[৪৪৬]

উমর (রা) ফিরে আসেন। তিনি চাবুকটি ঝুলিয়ে রেখে বসে পড়লেন। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে তিনি ব্যতিক্রমকে মেনে নিতে চান। খলীফা মন্তব্য করেন, "বনী-মাখযুমের মেয়েরা আবু সুলাইমানের সম্পর্কে যা বলতে চায় বলুক। কেননা তারা কখনো মিথ্যা বলে না। আবু সুলাইমানের শোকে যারা কাঁদতে চায় কাঁদুক।"[৪৪৭]

হেম্‌সে হামা সড়কের ডানদিকে বিস্তৃত বিশাল বাগান। বাগানটি অসংখ্য ফুলের বিছানা ও সৌন্দর্যবর্ধক গাছ দ্বারা সজ্জিত। তার মাঝ দিয়ে রয়েছে পায়ে চলার পথ। বাগানটির উত্তরে অবস্থিত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের মসজিদ। মসজিদটি খুবই জমকালো এবং এর উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমের মিনার দুটি খুবই আকর্ষণীয়। মসজিদটির ভিতরের ৫০ বর্গ গজ প্রশস্ত এলাকা কার্পেট দ্বারা আবৃত। চার কোণায় আছে চারটি সুদর্শন গম্বুজ। সবচেয়ে বড় গম্বুজটি মাঝখানে। ছাদে ঝুলন্ত বেশকিছু জমকালো ঝাড়বাতি। মসজিদটির উত্তর-পশ্চিম কোণায় অবস্থিত খালিদের কবর–আবু সুলাইমানের শেষ বিশ্রাম স্থল।

দর্শনার্থিগণ বাগানের মধ্য দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে ডানদিকেই দেখতে পাবেন খালিদের কবর। কবরটি মার্বেল পাথরের গম্বুজ বিশিষ্ট একটি কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত। গম্বুজের কারণে কবরটিকে দেখতে একটি ছোট মসজিদের মতোই মনে হয়। দর্শনার্থীরা ইচ্ছা করলেই নামায পড়ে ইসলামের এই মহান যোদ্ধার আত্মার মুক্তি কামনায় মগ্ন হতে পারেন, একমাত্র যিনি আল্লাহর তরবারি নামে আখ্যাত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। এই দর্শনার্থী যদি খালিদের সামরিক কৃতিত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হন তাহলে তার স্মৃতিপটে সহসাই অভিযান পরিচালনার একটি চিত্র ভেসে উঠতে পারে। তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাবেন এক সারি অশ্বারোহী সৈনিক একটি উঁচু ভূমির আড়াল হতে আবির্ভূত হয়ে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে রোমানদের উপর আঘাত হানছে। ছুটন্ত দলটির যোদ্ধাদের পরিধেয় বাতাসে উড়তে থাকে ও তাদের ঘোড়ার খুরের দাপটে ভূমি প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। তাদের কারও হাতে বর্শা, কারও হাতে উন্মুক্ত তরবারি, আর তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে রোমান সেনাবাহিনী। রোমানগণ জানে যে, তাদের দিকে ধাবিত হয়ে আসছে যে গতিময় রক্ষী দলটি তার গতি কেউ প্রতিহত করতে পারে না, এমন কি অভিজ্ঞতা বর্ণনার

৪৪৬. ইয়াকুবী ঃ তারীখ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা – ১৫৭।
৪৪৭. ইসফাহানী ঃ নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা –৮৯।

জন্যও কেউ রক্ষা পায় না। অশ্বারোহী দলটি ছুটে চলছে তো চলছেই। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা-কে কার আগে গিয়ে প্রতিপক্ষ অবিশ্বাসীদের উপর হামলা করবে। ফলে তাদের সম্মুখ রেখাটি কখনই সোজা নয়। কেননা তারা যেন পাগলের মত একে অপরকে অতিক্রম করতে ব্যস্ত। তবে তারা কখনই তাদের নেতাকে অতিক্রম করতে পারে না।

অগ্রসরমান মুসলিম বাহিনীর সম্মুখের যোদ্ধাটিই তাদের নেতা। বিশাল আকৃতির, প্রশস্ত কাঁধ, সুগঠিত দেহের অধিকারী এই ব্যক্তিটি একটি জমকালো আরবীয় ঘোড়ার পিঠে চড়ে এমনভাবে ছুটছেন যেন তিনি ঘোড়ারই একটি অংশ। বাতাসে তাঁর লম্বা দাড়ি উড়তে থাকে। তাঁর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে যুদ্ধ, রক্ত ও বিজয়ের সম্ভাবনায়। তাঁর আকাঙ্ক্ষা বিজয় ও শাহাদৎ। তাঁর বর্ম ও বর্শার ধারালো ডগা সূর্যের আলোয় ঝলমল করতে থাকে। তাঁর দলের ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে ভূমি কাঁপতে থাকে। আর তার পাশে দেখা যায় নিত্য সহচর একজন ক্ষীণদেহী যোদ্ধা যার কোমরের উপরিভাগ বস্ত্রহীন।

দর্শনার্থিগণ এসব কিছুই দেখেন কল্পনার চোখ দিয়ে এবং তারা অন্তর থেকে শুনতে পান গতিময় রক্ষী দলটি রোমানদের উপরে আছড়ে পড়ার পূর্বে গগণবিদারী কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ছে আল্লাহু আকবর। সে হুঙ্কার ধ্বনি ছুটে চলছে উন্মুক্ত আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। আর এই সব কিছুকে ছাপিয়ে ভেসে আসে তাদের নেতার বজ্রকণ্ঠের যুদ্ধ-ধ্বনি ঃ

আমিই মহান যোদ্ধা
আমিই আল্লাহ্‌র তরবারি
খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ।

পরিশিষ্ট ক ঃ গ্রন্থবিবরণী

১. ইবনে হিশাম ঃ সীরাত-উন-নববী, কায়রো, ১৯৫৫।

২. ওয়াকিদী ঃ মাগাযী, কায়রো, ১৯৪৮।

ফুতুহ-উশ-শাম, কায়রো, ১৯৫৪।

৩. ইবনে সাদ ঃ তাবাকাত, কায়রো, ১৯৩৯।

৪. ইবনে কুতায়বা ঃ আল-মা'আরিফ, কায়রো, ১৯৬০।

৫. ইয়াকুবী ঃ তারীখ, বৈরুত, ১৯৬০।

আল-বুলাদান, লিডেন, ১৮৯২।

৬. বালাযুরী ঃ ফুতুহ্-উল-বুলদান, কায়রো, ১৯৫৯।

৭. দীনাওয়ারী ঃ আখবার-উত-তিওয়াল, কায়রো, ১৯৬০।

৮. তাবারী ঃ তারীখ-উল-উমাম, ওয়াল-মুলুক, কায়রো, ১৯৩৯।

৯. মাসউদী ঃ মুরুজ-উয-যাহাব, কায়রো, ১৯৫৮।

আল-তানবীহ, ওয়াল-আশরাফ, কায়রো, ১৯৩৮

১০. ইবনে রুসতা ঃ আলাক-উন-নাফীসা, লিডেন, ১৮৯২।

১১. ইসফাহানী ঃ আল-আগানী, কায়রো, ১৯০৫।

১২. ইয়াকুত ঃ মুজাম-উল-বুলদান, তেহরান, ১৯৬৫।

১৩. আবু ইউসুফ ঃ কিতাব-উল-খারাজ, কায়রো, ১৯৬২।

১৪. এডওয়ার্ড গিবন ঃ ডিক্লাইন এন্ড ফল অব দ্যা রোমান এম্পায়ার, লন্ডন,১৯৫৪।

১৫. এ্যালোইস মুসিল ঃ দ্যা মিড্ল ইউফ্রেটিস, নিউইয়র্ক, ১৯২৭।

পরিশিষ্ট খ ঃ নোটসমূহ

নোট-১ঃ খালিদের বয়স

খালিদের বয়স সম্পর্কে ইতিহাসে কোন উল্লেখ নেই। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত কুস্তি প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি অনুমান করেছি যে, তিনি ছিলেন উমরের সমবয়স্ক। তাঁদের দু'জনের বয়সের মধ্যে দু'-এক বছরের ব্যবধান থাকতেও পারে। তবে এই গ্রন্থে তাঁদের বয়স একই বলে দেখানো হয়েছে।

উমর (রা)-এর বয়স সম্পর্কেও মতামতের ভিন্নতা আছে। বিভিন্ন সূত্রে মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স উল্লেখ করা হয়েছে ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৬০, ৬১, ৬৩ বছর। তাবারীর বর্ণনায় (তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৮) তাঁর বয়সের সঠিক হিসেব পাওয়া যায়। তাঁর মতে উমরের জন্ম হয়েছিল ফুজ্জার অভিযানের চার বছর পূর্বে এবং এই অভিযানটি পরিচালিত হয়েছিল হাতির বছরের ২০ বছর পরে। এভাবে হিসেব করলে দেখা যায় যে, ২৩ হিজরীর যিলকদ্ মাসে। ইন্তিকালের সময় উমর (রা)-এর বয়স ছিল ৬০ বছর।

নোট-২ঃ সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন

রাসূল (সা) তাঁর ঘনিষ্ঠ দশজন সংগীকে তাঁদের মৃত্যুর বহু পূর্বে এই শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, মৃত্যুর পর তাঁরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবেন। তাঁদেরকে বলা হতো, "আশরাত-উল-মুবাশ্বার"। এ গ্রন্থে তাঁদেরকে সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত দশজন ব্যক্তি হলেন ঃ

আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী, যুবায়ের ইবনুল আওয়াম, আব্দুর রহমান ইবন আউফ, সাদ ইবন আবীওয়াক্কাস, তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, সায়ীদ ইবন যায়েদ (রা)

নামগুলো সাজানো হয়েছে ইসলাম গ্রহণের তারিখ অনুযায়ী। আরো অনেকে আছেন যাঁরা এঁদের অনেকের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন [যেমন যায়েদ (রা) ইবন হারিসা ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী দ্বিতীয় পুরুষ] কিন্তু তাঁদের নাম এই সুসংবাদ প্রাপ্তদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

নোট-৩ ঃ খালিদ ও ইয়েমেন

প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণ কিছু কিছু এমন সূত্রের উল্লেখ করেছেন যাদের মতে খালিদ (রা)-কে ইয়েমেনে পাঠানো হয়েছিল প্রদেশটিকে ইসলামের ছায়াতলে আনার জন্য কিন্তু তিনি তাতে সফলকাম হননি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে একই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন এবং খালিদ (রা)-কে তাঁর অধীনে ন্যস্ত করেন। আলী (রা) এই দায়িত্ব পালনে সফলকাম হন। এটা সত্য যে, আলী (রা) ইয়েমেনকে ইসলামের পথে এনেছিলেন, কিন্তু এটা বিশ্বাস করা যায় না যে, খালিদ (রা)-কে আলী (রা)-এর পূর্বে ইয়েমেনে পাঠানো হয়েছিল। খালিদের মতো একজন নবদীক্ষিত মুসলমানের পক্ষে ইয়েমেনকে ইসলামের পথে আনার কাজটি ছিল একটি বড় কাজ। এর জন্য প্রয়োজন ছিল আলী (রা)-এর মতো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিখ্যাত সহচরদের কারো। তদুপরি বলা হয়েছে যে. খালিদ (রা) ইয়েমেনে সফলতা লাভ করতে পারেননি। তাই যদি হতো তাহলে খালিদের সংগে সংঘর্ষে রক্তপাত হওয়ার কথা। কিন্তু জানা মতে, ইয়েমেনে খালিদের হাতে কোনো রক্তপাত হয়নি। তাছাড়াও দেখা যায় যে, খালিদ (রা) নজরান থেকে ফিরে আসেন ৬৩২ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে (ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৯৪) এবং আলী (রা) ইয়েমেন যাত্রা করেন ৬৩১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (ইবনে সাদ ঃ ৬৮৭)। অতএব খালিদের ইয়েমেন যাত্রার বিষয়টি সত্য না হওয়ার কথা।

নজরান ও ইয়েমেনের অবস্থান ছিল কাছাকাছি। হয়তো একারণেই কিছু কিছু বর্ণনাকার খালিদের নজরান অভিযানের সূত্র ধরে ইয়েমেন গমনের কল্পনা করেছিলেন।

নোট-৪ঃ স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে অভিযানের তারিখের উল্লেখ

আবূ বকর (রা) কর্তৃক যুকীসসায় মুসলিম বাহিনীকে ১১টি কোরে সংগঠন ও তার পূর্বের প্রত্যেকটি ঘটনার মোটামুটি সঠিক তারিখ আমরা জানি। স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের পরবর্তী ঘটনাবলী উল্লেখকালে ঐতিহাসিকগণ কোনো তারিখ উল্লেখ করেননি।

আমরা জানি যে, গোটা অভিযানটি সম্পন্ন হয়েছিল ১১ হিজরী শেষ হওয়ার পূর্বেই এবং ইয়ামামার যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল শীতকালের শুরুতে ('শীত পড়তে শুরু করেছে'-তাবারী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১৮)। আমরা এই অভিযানে সংঘটিত যুদ্ধগুলো ও অন্যান্য ঘটনার ক্রমধারা সম্পর্কেও অবহিত আছি। সেই সংগে এমন কিছু ঘটনা আছে যেমন 'গ' যুদ্ধের শেষে 'ঘ' যুদ্ধের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সৈন্য প্রেরণ করা হয় ইত্যাদি, যেগুলো অভিযানটির বিভিন্ন ঘটনার ক্রমধারা ও তারিখ নির্ণয়ে সহায়তা করেছে।

উল্লিখিত তথ্যসমূহের সংগে আমার সামরিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে আমি বর্ণিত ঘটনাসমূহের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করেছি। একটি বাহিনীর 'ক' এলাকা থেকে 'খ' এলাকায় যেতে কত সময় লাগতে পারে, একটি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণে কত সময় লাগতে পারে বা একটি যুদ্ধের পর আর একটির জন্য প্রস্তুত হতে কতদিন প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে অনুমান করেছি। এই জাতীয় অনুমাণ সম্পূর্ণ সঠিক নাও হতে পারে বলে ১১টি কোর সংগঠনের পরবর্তী ঘটনাবলীর সময়কাল আমি দিনের পরিবর্তে সপ্তাহে উল্লেখ করেছি। তারপরেও যদি কোনো ভুল থাকে তবে তা এক-আধ সপ্তাহের বেশি হওয়ার কথা নয়।

নোট-৫ঃ (ইরাক অভিযানের পরিকল্পনা)

প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণ কিছু সূত্রের বরাত দিয়ে খলীফার ইরাক অভিযানের একটি ভিন্ন পরিকল্পনার বর্ণনা দিয়েছেন। এ পরিকল্পনাটি নিম্নরূপ ঃ

ক. আবূ বকর (রা) দু'জন জেনারেলকে ইরাকে প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছিলেন: খালিদ উবাল্লা হয়ে দক্ষিণ দিক থেকে এবং আয়ায বিন গানাম মুজাআ হয়ে উত্তর দিক থেকে। আয়ায সে সময় উত্তর আরবের নিব্বাজ ও হেযাজের মাঝামাঝি কোথাও ছিলেন।

খ. হীরা ছিল উভয় জেনারেলের লক্ষ্যবস্তু। যিনি আগে হীরা পৌঁছুতে সক্ষম হবেন তিনিই হবেন সর্বাধিনায়ক এবং অন্যজন তাঁর অধীনে থাকবেন।

গ. তারপর সর্বাধিনায়ক হীরার নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত সৈন্য রেখে বাকি অংশ নিয়ে পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী টেসিফোনের দিকে অগ্রসর হবেন।

আমি নিম্নে বর্ণিত কারণে উল্লেখিত পরিকল্পনাটি আবূ বকরের বলে মনে করি না ঃ

ক. আবূ বকর (রা) স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে খালিদের উপরে নির্ভরশীল ছিলেন। কাজেই তিনি এমন কোনো পরিকল্পনা নিতে পারেন না যাতে আয়ায বিন গানামের মতো একজন অপরীক্ষিত জেনারেলের অধীনে তাঁকে কাজ করতে হয়। তদুপরি আয়ায কোনো বিবেচনাতেই খালিদের সমপর্যায়ের জেনারেল ছিলেন না।

খ. স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে আবূ বকরের অভিযান পরিকল্পনা থেকে দেখা যায় যে, তিনি শক্তির সমাবেশের নীতিতে বিশ্বাস করতেন। কাজেই এটা মনে করার কোনো উপযুক্ত কারণ পাওয়া যায় না যে, তিনি এই নীতি ভংগ করে মুসলিম

শক্তিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দূরবর্তী দু'জায়গায় প্রেরণ করবেন যেখান থেকে প্রয়োজনে একে অপরকে সহায়তা করা যাবে না। কখনো কখনো পরিকল্পিতভাবেই এক শত্রুর বিরুদ্ধে দু'দিক থেকে আক্রমণ করা হয় কিন্তু এক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কেননা কয়েকগুণ শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে ভাগ করে দুর্বল করা ছিল নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। তদুপরি মুসলিম বাহিনী নিজ এলাকা থেকে অনেক দূরে গিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করেছিল। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম বাহিনীকে দ্বিখণ্ডিত করার অর্থই হচ্ছে স্বেচ্ছায় পরাজয়ের আয়োজন করা।

গ. আলোচ্য ভিন্ন পরিকল্পনাটি সঠিক হলে এবং টেসিফোন আক্রমণ করা মুসলিম বাহিনীর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলে খালিদ (রা) অবশ্যই তা করতেন। তাবারীর বর্ণনায় দেখা যায় যে, ইরাক অভিযানের শেষের দিকে খালিদ (রা) টেসিফোন আক্রমণের চিন্তা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করেননি খলীফার অনুমোদন না থাকার কারণে। খলীফা যে তাঁর পরিকল্পিত টেসিফোন অভিযান বাতিল করেছিলেন, তারও কোন উল্লেখ কোথাও নেই।

ঘ. দেখা যায় যে, আয়ায দাউমাত-উল-জান্দালের সংঘর্ষে আটকা পড়ে যান এবং খালিদ (রা) তাঁকে উদ্ধার করেন। উত্তর দিক থেকে ইরাকে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা থাকলে আয়াযের পক্ষে লক্ষ্যবস্তু থেকে অনেক দূরে শত্রুর সংগে ঘোরতর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার কথা নয় বিশেষ করে যেখানে লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছার বিকল্প রাস্তা ছিল।

আয়ায বিন গানামের অধীনে অবশ্যই একটি বাহিনী ছিল, কিন্তু সেটি খুব বড় আকারের নয়। তাঁর লক্ষ্য বস্তু হয়তো দাউমাত-উল-জান্দালই ছিল। তবে তাঁকে খালিদের সহায়তার জন্য ইরাকে প্রেরণের পরিকল্পনাও অবশ্যই খলীফার ছিল। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, তিনি দাউমাত-উল-জান্দাল অভিযানের পর ইরাকে গিয়ে খালিদের সংগে যোগদান করে তাঁর অধীনে কাজ করেন।

নোট-৬ ঃ মাকিল নদীর যুদ্ধ

তাবারীর গ্রন্থ থেকে এই যুদ্ধটির সম্পূর্ণ বর্ণনা নেওয়া হয়েছে এবং তাঁর মতে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছে মাজার এলাকায়। তিনি এই যুদ্ধটির নামকরণও করেছেন মাজার ও নদী উভয়ের নাম অনুসারেই। বালাযুরীর মতেও (পৃষ্ঠা-২৪৩) এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল মাজার এলাকায়। অপরপক্ষে ইবনে ইসহাক ও ওয়াকিদী কাযিমা, উবাল্লা ও মাজার এলাকায় সংঘটিত কোন যুদ্ধের কথাই উল্লেখ করেননি।

ইয়াকুতের মতে (চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬৮) মাজারের অবস্থান ছিল বসরা হতে ওয়াসিতগামী রাস্তার উপরে চার দিনের যাত্রাপথের দূরত্বে এবং এটি ছিল একচোখা টাইগ্রিসের পারে। মনে করা হয় যে, টাইগ্রীস নদীর ডান পারে বর্তমানের আজেইর

এলাকাতেই ছিল মাজারের অবস্থান। বসরা থেকে আজেইর-এর দূরত্ব ৮০ মাইল যা সে সময়ের বিচারে চার দিনের যাত্রাপথ। অতএব এটা নিশ্চিত যে, আজেইর এলাকাতেই ছিল মাজারের অবস্থান।

এ বিষয়টি মনে রাখা দরকার যে, মাকিল নদী হতে মাজারের দূরত্ব ছিল ৭০ মাইল এবং ইউফ্রেটিস থেকে ২৫ মাইল। ফলে নৌকার সাহায্যে নদী দু'টো অতিক্রম করা ছাড়া খালিদের পক্ষে মাজার পৌঁছা সম্ভব ছিল না। কিন্তু খালিদ (রা) যে মাজারে পৌঁছার লক্ষ্যে নৌকার সাহায্যে নদী অতিক্রম করেছিলেন এমন কোনো উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। গোটা মুসলিম বাহিনীকে নদী অতিক্রম করানোর জন্য নৌকার যে ব্যাপক আয়োজন প্রয়োজন তা অবশ্যই ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথা যেমন করেছিল উল্লিসে নদী পারাপারের বিষয়টি। ইউফ্রেটিস নদী পারাপারের মতো বিষয়টি ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়।

আমার মনে হয় খালিদ (রা) কখনই মাকিল নদী অতিক্রম করেননি । প্রকৃত পক্ষে কোন আরব কমান্ডারের পক্ষেই নদীর মতো একটি বাধা অতিক্রম করে অনেক ভিতরে যাওয়ার কথা নয়। কেননা তাতে তার মরুভূমির মাঝখানে একটি বড় বাধা বিরাজ করে এবং শক্তিশালী শত্রু কর্তৃক সহজেই পিছন হতে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে। খালিদ (রা) ও তাঁর পরবর্তী আরব কমান্ডারদের একটি প্রধান কৌশল ছিল মরুভূমির নিকটবর্তী থেকে বা মরুভূমির সংগে যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত রেখে অপারেশন পরিচালনা করা। তদপুরি যেখানে খালিদের লক্ষ্য ছিল হীরা দখল সেক্ষেত্রে মাকিল ও ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করে লক্ষ্যবস্তু হতে অনেক দূরবর্তী এলাকা মধ্য-ইরাকে অভিযান পরিচালনার ব্যাপারটি কোন বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। তাই আমার বিবেচনায় এই যুদ্ধটি ছিল মাকিল নদীর যুদ্ধ, মাজার যুদ্ধ নয়। যুদ্ধটি মাকিল নদীর তীরে সংঘটিত হয়েছে বলে আমি বর্ণনা করেছি। খালিদ (রা) ইরাকে প্রবেশের পর প্রথম এই নদীটির সম্মুখীন হন এবং এই এলাকায় আর কোন উল্লেখযোগ্য নদী পাওয়া যায় না।

নোট-৭ ঃ খানাফিস ও অন্যান্য এলাকার অবস্থান

খানাফিস, হুসেইদ, মুজাআ, সানি ও জুমেইল এলাকাগুলোর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চয়তার অভাব আছে এবং আমি এই স্থানগুলোকে যেখানে চিহ্নিত করেছি তাতেও কিছুটা ভ্রান্তি থাকাটা স্বাভাবিক।

তবে যেসব বিবেচনার ভিত্তিতে স্থানগুলো এভাবে চিহ্নিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

খানাফিস ঃ ইয়াকুতের মতে (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৭৩) খানাফিসের অবস্থান ছিল আনবারের নিকটবর্তী বারাদানের আশেপাশে। মুসিল তাঁর গ্রন্থের এক অংশে (পৃষ্ঠা-

৩০৯) স্থানটিকে চিহ্নিত করেছেন ইউফ্রেটিসের পশ্চিম তীরে, আবার অন্যত্র উল্লেখ করেছেন বাগদাদের ৫ মাইল উত্তরে বর্তমানের ফাজেমিন এলাকায়।

আমি তাবারীর বর্ণনা ও অন্যান্য ভৌগোলিক বিবেচনার প্রেক্ষিতে খানাফিসকে ইউফ্রেটিসের পশ্চিম তীরে স্থাপন করেছি ঃ

ক) তাবারীর বর্ণনায় (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৮০) দেখা যায় যে, খালিদ হীরা ত্যাগ করে খানাফিসের পথে অগ্রসর হন এবং আইন-উত-তামরে পৌঁছে কাকা ও আবু লাইলার সাক্ষাৎ লাভ করেন। খানাফিসের অবস্থান ইউফ্রেটিসের পূর্বে হলে পথে আইন-উত-তামর পড়ার কথা নয়।

খ) মুসান্না ১৩ হিজরীতে উল্লিস থেকে বাগদাদ ও খানাফিস আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। পথ প্রদর্শক তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, শহর দু'টির মধ্যে ব্যবধান কয়েকদিনের যাত্রাপথের এবং খানাফিসের অবস্থান বাগদাদের পূর্বেই। মুসান্না স্থল পথেই খানাফিস পৌঁছেছিলেন এবং তারপর আনবারের পথে যাত্রা অব্যাহত রাখেন। খানাফিসের অবস্থান কাজেমিন এলাকায় হলে তা বাগদাদ হতে কয়েক দিনের যাত্রাপথ দূরে হয় না এবং স্থল পথেও সেখানে পৌঁছা সম্ভব হয় না।

আমি বারদানকে ওয়াদী-উল খাদাফ নামে উল্লেখ করেছি যা ওয়াদী-উল-বুরদান নামেও পরিচিত এবং আইন-উত-তামরের ২৫ মাইল উত্তর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বারদান বা বুরদান স্থানটির কোন অস্তিত্ব বর্তমানে নেই, তবে ওয়াদী-উল-খাদাফের অবস্থানের ভিত্তিতে এলাকাটির ভৌগোলিক অবস্থান অনুমান করা যায়। তাবারীর বর্ণনা থেকেও এই অনুমানটির সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর বর্ণনা মতে (দ্বিতীয়, পৃষ্ঠা-৫৮১) খালিদ আইন-উত-তামর হতে মুজাআ যাবার পথে বারদান অতিক্রম করেন। আমি ওয়াদী-উল-খাদাফের সামান্য উত্তরে খানফিসকে চিহ্নিত করেছি।

হুসেইদ ঃ ইয়াকুত (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮১) এই শহরটিকে কুফা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র উপত্যকা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ফলে এ স্থানটি ইউফ্রেটিসের পশ্চিম তীরে ও খানাফিসের পূর্বে হওয়ার কথা। মাহবুজানের প্রত্যাহারের দিক বিবেচনা করেও মনে হয় খানাফিস পূর্ব দিকে হলে মাহবুজান মুজাআ এলাকায় প্রত্যাহার না করে টেসিফোনে করতেন। মুসিলও (পৃষ্ঠা-৩০৯) হুসেইদকে ইউফ্রেটিসের পশ্চিমে স্থাপন করেছেন, তবে এর সঠিক অবস্থান নিশ্চিত নয়।

মুজাআ ঃ ইয়াকুত মুজাআকে (চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৬০) ইরাকের তাগলিব বংশের রাবীআ গোত্রের আবাসভূমি দিয়ে প্রবাহিত ওয়াদী-উল-যারীবের তীরবর্তী নজদের

পাহাড়ী এলাকা বলে উল্লেখ করেছেন (এখানে নজ্‌দ বলতে বুঝানো হয়েছে উঁচু সমতল ভূমিকে, আরবের নজ্‌দকে নয়)।

তাবারী (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৮০) এর স্থানটিতে স্থাপন করেছেন হাউরান ও কালটি-এর মধ্যবর্তী এলাকায়। মুসিল (পৃষ্ঠা-৩০৩) মুজাআকে স্থাপন করেছেন হীরার ২৭০ কিলোমিটার দূরে, আনবারের ১১৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং আকলাত হাউরানের ৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আইন-উল-আরনাবে। অন্য কোনো তথ্যের অভাবে আমি এটিকে মুজাআর সঠিক অবস্থান হিসেবে ধরে নিয়েছি।

সানিওজুমেইল ঃ ইয়াকুত ও তাবারী (মুসিলও এ ব্যাপারে ইয়াকুতের মতামতকে অনুসরণ করেছেন) উভয়ে স্থান দুটিকে সম্ভাব্য অবস্থান থেকে অনেক দূরে স্থাপন করেছেন। ইয়াকুত (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৭) সানিকে রিসাফার পূর্বে এবং জুমেইলকে রিসাফা ও ইউফ্রেটিসের পূর্বে বসরার পার্শ্ববর্তী এলাকা বলে উল্লেখ করেছেন। তাবারীও (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৮২) স্থানদুটিকে রিসাফার পূর্বে বলে উল্লেখ করেছেন। রিসাফার অবস্থান হচ্ছে পালামিরার উত্তর-উত্তর-পূর্বদিকে এবং ইউফ্রেটিসের ১৫ মাইল উত্তরে সিরিয়ায়। মুসিল (পৃষ্ঠা–৩১২) এই যুদ্ধক্ষেত্র দুটিকে পালামিরার উত্তর-পূর্ব দিকে বিস্তৃত বিসরি পাহাড়ী এলাকার পাদদেশে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বসরাকে বিসরির ভিন্ন নাম বলে উল্লেখ করেছেন।

স্থান দুটির উল্লেখিত অবস্থানকে আমি কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করি। এটা চিন্তা করা যায় না যে, খালিদ (রা) আরবদের দুটি সমাবেশকে দমন করার জন্য যারা তাঁর জন্য তেমন একটা চিন্তার কারণ নয়। মুজাআ হতে ২৫০ মাইল দূরে (তার ঘাঁটি হীরা হতে ৪০০ মাইল দূরে) প্রায় ৬ সপ্তাহের যাত্রাপথ অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে যাবেন। তদুপরি বিসরি পাহাড়ী এলাকার অবস্থান হচ্ছে সিরিয়ার গভীরে এবং খালিদের পক্ষে খলীফার নির্দেশের পরিপন্থী এরূপ অভিযান পরিচালনার প্রশ্নই ওঠে না। খলীফার নির্দেশ অনুযায়ী খালিদের অপারেশন এলাকা সীমিত ছিল ইরাকের মধ্যে।

আমি জুমেইলের সন্ধান পেয়েছি। অনেক ম্যাপে এটিকে আইন-উত-তামরের ৩৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ওয়াদি জুমেইলের তীরের একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর বলে দেখানো হয়েছে। লণ্ডনের জরিপ বিভাগ হতে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত এক মিলিয়ন ম্যাপে স্থানটিকে উল্লেখ করা হয়েছে থুমেইল (Thumail) হিসেবে। আমার মতে জুমেইলের উল্লেখিত অবস্থানকেই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। সানির অবস্থান জুমেইল ও মুজাআর মধ্যবর্তী এলাকায় হওয়ার কথা এবং আমি স্থানটিকে ১৪ নং ম্যাপে জুমেইলের ২৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে দেখিয়েছি। (এতে কয়েক মাইলের ভ্রান্তি থাকতে পারে, তার বেশি নয়)।

এমন হতে পারে যে, পশ্চিম ইরাকেও রিসাফা নামের আরেকটি জায়গা আছে। সেক্ষেত্রে তাবারি ও ইয়াকুত যে রিসাফার উল্লেখ করেছেন তা ভুল নাও হতে পারে।

নোট-৮ ঃ ইরাক অভিযানের তারিখ

প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণ কিছু যুদ্ধের তারিখ উল্লেখ করেছেন এবং কিছু উল্লেখ করেননি। আমরা জানি যে, খালিদ (রা) মুহাররম মাসে ইয়ামামা ত্যাগ করেছিলেন এবং একই মাসে কাজিমার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। মাকিল নদী, ওয়ালাজা ও উল্লিসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সফর মাসে এবং হীরা বিজিত হয় রবিউল আউয়াল মাসে। আমরা খালিদের ফিরাজে উপস্থিতির আনুমানিক তারিখ ও ফিরাজ যুদ্ধের নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কেও অবগত আছি। তবে আনবার থেকে শুরু করে জুমেইল পর্যন্ত সংঘটিত যুদ্ধগুলোর তারিখ পাওয়া যায়নি। স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে ইতিহাসের আলোকে আমার সামরিক অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে এই যুদ্ধগুলোর তারিখ আমি অনুমান করেছি। আর যেহেতু এই তারিখগুলো আনুমানিক তাই এগুলোর উল্লেখ দিন-ক্ষণের পরিবর্তে সপ্তাহে করা হয়েছে।

নোট-৯ ঃ উট এবং পানি

প্রাথমিক যুগের কিছু কিছু বর্ণনায় পাওয়া যায় বিপজ্জনক যাত্রা শুরুর পূর্বে কিভাবে কিছু উটকে প্রচুর পানি পান করানো হয়েছিল তাদের পেটের ভিতরে জমা করে রাখার জন্য। পরবর্তীতে যাত্রাপথে প্রতিদিন কিছু উট জবাই করে তাদের পেটের সংরক্ষিত পানি ঘোড়াকে খাওয়ানো হতো।

এটা একটি পুরনো দিনের গল্প মাত্র এবং বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আজ পর্যন্ত এই গল্প বিশ্বাস করা হয়। প্রকৃত ঘটনা হলো, উটের শরীরে পানি সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় উটের মাংশপেশীর কোষের পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি। ফলে উট পানি ছাড়াই অনেকদিন চলতে পারে। উট পেটের মধ্যে পানি জমা করে রাখতে পারে এবং চালক প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে পারে এটি গল্প বৈ কিছু নয়।

নোট-১০ ঃ বিপজ্জনক যাত্রার পথ

আধুনিক যুগের অনেক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, খালিদ (রা) দক্ষিণ দিকের পথ ধরে অর্থাৎ দাউমাত-উল-জান্দাল হয়ে যাত্রা করেছিলেন। এই বর্ণনা মতে খালিদ (রা) হিরা থেকে দাউমাত-উল-জান্দালে গমন করেন এবং সেখান থেকে কুরাকির (দাউমাত-উল-জান্দালের ৭০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কুরাকির নামের একটি স্থান আছে)। কুরাকির থেকে তিনি মরুভূমির মধ্য দিয়ে বিপজ্জনক পথে সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

প্রাথমিক যুগের কিছু ঐতিহাসিকও দাউমাত-উল-জান্দালের কথা উল্লেখ করেছেন। বালাযুরী দাউমাত-উল-জান্দালের অবস্থান উল্লেখ করেছেন আরক ও তাদ মুরের মধ্যবর্তী এলাকায় যা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাবারী একটি উৎসের বরাত দিয়ে বলেছেন যে, খালিদ (রা) হীরা থেকে যাত্রা করে দাউমাত-উল-জান্দাল হয়ে কুরাকির পৌঁছেছিলেন। তবে তিনি এই বিপজ্জনক যাত্রার মূল বর্ণনায় দাউমাত-উল জান্দালের কোন উল্লেখ করেননি। ওয়াকিদী ও ইয়াকুবী এই প্রসংগে দাউমাত-উল-জান্দাল ও কুরাকিরের কথা আদৌ উল্লেখ করেননি।

প্রকৃত ঘটনা হলো, কিছু কিছু বর্ণনাকারী এই যাত্রার সংগে খালিদের দাউমাত-উল-জান্দাল অভিযানকে মিশিয়ে ফেলেছেন। খালিদের দাউমাত-উল-জান্দাল অভিযানের বর্ণনা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে দেওয়া হয়েছে। তাদের অনেকে এমনও বলেছেন যে, খালিদ (রা) এই যাত্রাকালেই দাউমাত-উল-জান্দাল দখল করেছিলেন। এ বর্ণনা আদৌ সত্য নয়।

খালিদ (রা) খলীফার নিকট হতে যে নির্দেশ লাভ করেছিলেন তাতে দ্রুত গতিতে যাত্রা করার জন্য বিশেষভাবে বলা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে দাউমাত-উল-জান্দাল হয়ে গেলে অনেক পথ ঘুরতে হয় যা খালীফার নির্দেশের পরিপন্থী। আর তিনি যদি দাউমাত-উল-জান্দাল যাবেনই তা হলে কাফেলার পথ ধরে অগ্রসর হয়ে বুসরা এবং জাবিয়া এলাকায় মোতায়েন মুসলিম বাহিনীর সংগে মিলিত হলেন না কেন? এ পথেও তো শত্রুর মুকাবিলার কোন ভয় ছিল না। তা না করে তিনি কেন মাত্র ২০ বা ৩০ মাইল দূরে পরিচিত পথ রেখে পানিশূন্য মরুভূমির মধ্য দিয়ে এমন একটি যাত্রার ঝুঁকি নিবেন যাতে গোটা বাহিনীর ধ্বংস হওয়ার আশংকা ছিল। আর তিনি কেনই বা মুসলিম বাহিনী এড়িয়ে, যাদেরকে সাহায্যের জন্য তিনি অগ্রসর হচ্ছেন, সিরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আবার শত্রুর মুকাবিলা করে তাদের সংগে মিলিত হবেন। এ ধরনের বর্ণনার কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

তদুপরি তাবারি (দ্বিতীয় খণ্ড , পৃষ্ঠা-৬০১) ও বালাযুরী (পৃষ্ঠা–১১৮) উভয়ের মতে খালিদ (রা) হীরা থেকে সান্দাউদা ও মুজাআ হয়ে কুরাকির যাত্রা করেছিলেন। এই স্থান দুটি হীরার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এবং মুজাআর দূরত্ব প্রায় ২০০ মাইল। খালিদ (রা) যদি দাউমাত-উল-জান্দাল হয়েই যাত্রা করেন তাহলে কেন উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করে সান্দাউদা ও মুজাআ যাবেন এবং তারপর আবার দক্ষিণ দিকে উল্টো যাত্রা করে দাউতাম-উল-জান্দালে যাবেন। এই বর্ণনাটির আদৌ কোনো বাস্তবতা নেই।

এই যাত্রা পথটির সঠিক উল্লেখ পাওয়া যায় ওয়াকিদী ও ইয়াকুবীর বর্ণনায়। অবশ্য তাবারীর বর্ণনাতেও এই পথটির সঠিক উল্লেখ আছে শুধু একটি উৎসের বরাতে উল্লেখিত দাউমাত-উল-জান্দালের প্রসংগটি বাদ দিলে। ইরাক হতে বরাবর

সিরিয়া যাত্রার যে পথটির বর্ণনা আমি দিয়েছি, সেটিই হচ্ছে সংক্ষিপ্ততম পথ। খালিদ (রা) সিরিয়ায় প্রবেশের পর পূর্বাঞ্চলে যে অপারেশনগুলো পরিচালনা করেছিলেন সেগুলো বিশ্লেষণ করলেও আমার বর্ণিত পথটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করলেও এই পথটি অনুসরণের পরিষ্কার ইংগিত পাওয়া যায় ঃ

ক. রোমান বাহিনীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সময়ের অপচয়ের ব্যাপারে খালিদের ভীতি (তাবারী দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০৩)।

খ. ওয়াকিদীর বর্ণনামতে খালিদ (রা) সামওয়াকে এড়িয়ে যাত্রা করেছিলেন। সামওয়ার অবস্থান হলো ইরাকের পশ্চিম ও সিরিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত সিরিয়ার মরুভূমিতে। (ওয়াকিদী, পৃষ্ঠা-১৪)।

গ. তাবারী উল্লেখ করেছেন যে, এই যাত্রা সম্পন্ন করার ফলে খালিদ (রা) রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা ও ইরাকের দিকে তাক করে থাকা রোমান বাহিনীকে পিছনে ফেলে এসেছেন।

ঘ. মুসান্না খালিদের সংগে কুরাকির পর্যন্ত যাত্রা করেছিলেন। কুরাকিরের অবস্থান উত্তর-পশ্চিম আরবের দূরবর্তী সীমান্ত এলাকায় হলে তা তিনি অবশ্যই করতেন না।

প্রাপ্ত তথ্য ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে খালিদের যাত্রাপথের একটি সাধারণ দিক নির্ধারণ করা গেলেও কারো পক্ষেই সঠিক পথের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। আমি যে পথের উল্লেখ করেছি তা কয়েক মাইল এদিক-সেদিক হতে পারে। যে সব বিবেচনায় এ পথটিকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় তা নিম্নে ব্যখ্যা করা হলো ঃ

সিরিয়ার ভূখণ্ডে পালমিরা হতে ২০ মাইল পূর্ব-উত্তর-পূর্ব দিকে এখনও আরাক বিদ্যমান। আরাক থেকে সুআ ছিল একদিনের যাত্রাপথের দূরত্বে এবং সুআ থেকে ঝরনাটি ছিল আরও একদিনের যাত্রাপথের দূরত্বে। অনুমান করা যায় যে, আরাক হতে ঝরনাটির দূরত্ব ছিল প্রায় ৫০ মাইল, যা বর্তমানকালের বিরওয়ারিদের আশেপাশে হওয়ার কথা। ঝরনা থেকে কুরাকিরের দূরত্ব ছিল পাঁচদিনের যাত্রাপথের এবং মাইল হিসেবে যা দাঁড়ায় ১০০ থেকে ১৫০। এ হিসেব থেকে কুরাকিরের অবস্থানের একটি ধারণা পাওয়া যায়। অবশ্য কুরাকিরের কোনো অস্তিত্ব বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না এবং কেউ বলতে পারে না কোথায় ছিল এর সঠিক অবস্থান। তবে ইয়াকুতের বর্ণনা অনুযায়ী (চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯) কুরাকির ছিল একটি উপত্যকা এবং সামাওয়ার বনী কাব গোত্র এখান হতে পানি সংগ্রহ করতো। সামাওয়া হচ্ছে সিরিয়ার মরু অঞ্চলের একটি অংশ যা উপরেও উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে

নিশ্চিত হওয়া যায় যে, কুরাকিরের অবস্থান ছিল ইরাকের পশ্চিম অঞ্চলে, আরবের উত্তর-পশ্চিম অংশে নয়।

ইরাক সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক মুদ্রিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক ম্যাপে ইরাকের পশ্চিমাঞ্চলে কিছু প্রাচীন শহর ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখানো হয়েছে। এই ম্যাপে মুজাআর পশ্চিমে দেখানো হয়েছে কসর-উল-খুব্বাজ, কসর আমিজ ও কসর মুহেবির। কসর মুহেবিরের অবস্থান মুজাআ হতে ১২০ মাইল দূরে। ধ্বংসাবশেষগুলোকে প্রাচীন আমলের নিদর্শন হিসেবে দেখানো হলেও বিশ্বাস করা হয় যে, মুসলিম শাসনকাল পর্যন্ত এগুলো পানির উৎস হিসেবে বিদ্যমান ছিল। বিপজ্জনক যাত্রা শুরুর পূর্বে খালিদ (রা) এই পথ অনুসরণ করেই কুরাকির পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। আমি কুরাকিরকে ওয়াদী হাউরোনের তীরে কসর মুহেবিরের নিকটে স্থাপন করেছি। এই এলাকাটির দূরত্ব উল্লেখিত ঝরনা হতে ১২০ মাইল যা সে সময়ের পাঁচদিনের যাত্রা পথের সমান।

নোট-১১ ঃ মারজ-উস-সফরের যুদ্ধ

ওয়াকিদীর বর্ণনায় মারজ-উস-সফরের যুদ্ধ সম্পর্কে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইয়াকুবি (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৯) ও বালাযুরী (পৃষ্ঠা–১২৫) উল্লেখ করেছেন যে, এই যুদ্ধটি দামেস্ক বিজয়ের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলেও দেখা যায় যে, ওয়াকিদী দুবার দামেস্ক অবরোধের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং পরেরটি সফল হয়েছিল। অন্যান্য ঐতিহাসিক অবশ্য সফল অবরোধটির কথাই উল্লেখ করেছেন। ওয়াকিদীর মতে (পৃষ্ঠা-১৮) খালিদ (রা) বুসরার যুদ্ধের পর উত্তর-পূর্ব দিক হতে দামেস্কের দিকে অগ্রসর হন। আজাজীর ও কুল্লুস দামেস্ক দুর্গ হতে বের হয়ে খোলা মাঠে খালিদের মোকাবিলা করলে তিনি তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করে দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু পরপরই তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করে ওয়ের্দানকে মুকাবিলার জন্য আজনাদাইন অভিমুখে যাত্রা করেন।

গিবন ওয়াকিদীর এই বর্ণনা গ্রহণ করলেও প্রকৃত পক্ষে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। খালিদের প্রতি খলীফার নির্দেশ ছিল তিনি যেন দ্রুত সিরিয়া পৌঁছে মুসলিম বাহিনীর কমাণ্ড গ্রহণ করে রোমানদের মুকাবিলা করেন। সে সময়ে রোমানদের প্রধান সমাবেশ ছিল আজনাদাইন এলাকায়। ফলে এটা চিন্তা করা যায় না যে, খালিদ (রা) সিরিয়ায় প্রবেশ করে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে অগ্রসর হয়ে মারজ রহিতে আক্রমণ করে দামেস্ককে উপেক্ষা করে বুসরা পৌঁছে তা দখল করে তারপর উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দামেস্ক যাত্রা করে আজাজীর ও কুল্লুসকে মুকাবিলা করে দামেস্ক দুর্গ অবরোধ করবেন এবং পরপরই সে অবরোধ তুলে আজনাদাইন যাত্রা করবেন। তবে ওয়াকিদী

আজাজীর ও কুন্নুসের সংগে খালিদের যুদ্ধের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সঠিক। তাই আমি মনে করি যে, এই সংঘর্ষটি সংঘটিত হয়েছিল দামেস্ক অবরোধের (দামেস্ক একবারই অবরোধ করা হয়েছিল) পূর্বে এবং এই যুদ্ধটিই মারজ-উস-সুফরের যুদ্ধ।

নোট-১২ ঃ দামেস্ক বিজয়ের তারিখ

প্রাথমিক যুগের প্রায় সব ঐতিহাসিক এবং আধুনিক যুগের সকলেই বর্ণনা করেছেন যে, দামেস্ক বিজয় সংঘটিত হয়েছিল ১০ হিজরীর রজব মাসে (সেপ্টেম্বর,৬৩৫)। ওয়াকিদীই একমাত্র ঐতিহাসিক যিনি দামেস্ক বিজয়ের বিষয়টি এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৩ হিজরীর রজব মাসে সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। আমি মনে করি ওয়াকিদীর বর্ণনাই সঠিক। সমকালের ইতিহাসের অনেক ঘটনা আছে যার আলোকে যুদ্ধটি ১৩ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল বলেই মনে হয়। এই ঘটনাগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে খলীফা আবূ বকরের মৃত্যু এবং উমর (রা) কর্তৃক খালিদ (রা)-কে মুসলিম বাহিনীর কমাণ্ড হতে অপসারণ। খলীফা আবূ বকরের মৃত্যু হয়েছিল ১৩ হিজরীর জমাদি-উল-আখির মাসে অর্থাৎ যে মাসে দামেস্ক যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার আগের মাসে। খলীফা উমর (রা) আবু উবায়দা (রা)-কে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করে তাঁর নিকট যে পত্র লিখেছিলেন তা তাঁর হাতে যখন পৌঁছে তখন একটি যুদ্ধ চলছিল। আবু উবায়দা (রা) যুদ্ধে বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত খালিদের নিকট হতে এই তথ্যটি গোপন রাখেন। এই যুদ্ধটি আজনাদাইনের যুদ্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা সব ঐতিহসিকের মতেই তা সংঘটিত হয়েছিল ১৩ হিজরীর জমাদি-উল-আউয়াল মাসে। অনেক লেখকের মতে ঐ যুদ্ধটি ছিল ইয়াকুসার যুদ্ধ। এটিও সঠিক নয় এজন্য যে, ইয়াকুসার যুদ্ধের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র একদিন। যাঁরা মনে করেন যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৩ হিজরীতে তাদের মতে এই পত্রটি আবু উবায়দার নিকট পৌঁছেছিল ইয়ারমুকের যুদ্ধ চলাকালে। এই বর্ণনাটিও সঠিক নয়, কেননা ইয়ারমুকের যুদ্ধটি হয়েছিল ১৫ হিজরীতে।

প্রাথমিক যুগের সব ঐতিহাসিক বিভিন্ন সূত্রের উল্লেখ করে বলেছেন যে, দামেস্ক অবরোধ চলাকালেই আবু উবায়দা (রা) খলীফার পত্রটি পান কিন্তু শহরটি আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তিনি পত্রের বিষয়বস্তু গোপন রাখেন। আমার মতে এই বর্ণনা সঠিক এবং তাই যদি হয় তাহলে দামেস্কের পতন ১৪ হিজরীর রজব মাসে হওয়া সম্ভব নয়। কেননা মুসলিম বাহিনীর কমান্ড পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যটি এক বছর গোপন রাখা সম্ভব নয়। তা বড় জোর কয়েক সপ্তাহ বা এক মাস গোপন রাখা যেতে পারে।

দামেস্ক দুর্গের আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্রে মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে স্বাক্ষর করেন খালিদ (রা) এবং আবু উবায়দা (রা) সাক্ষী হিসেবে থাকেন।

ওয়াকিদীর মতে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল পরবর্তী বছর কমান্ড থেকে অপসারিত হওয়ার এক বছর পরে সর্বাধিনায়কের উপস্থিতি সত্ত্বেও খালিদের পক্ষে মুসলিম বাহিনীর কমাণ্ডার হিসেবে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার প্রশ্নই ওঠে না।

ওয়াকিদীর মতে দামেস্কের মুসলমানগণ খলীফা উমরের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন ৩রা শাবান, ১৩ হিজরীতে,শহরটির আত্মসমর্পণের পর। এই ঘটনাটি ঘটেছিল খালিদ (রা) মারাজ-উদ-দাবাজে রেইড করে ফিরে আসার পর।

*অন্য একটি বিবেচ্য বিষয় হলো যে, সব ঐতিহাসিকের মতে ফাহলের যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ১৩ হিজরীর যুকাদ মাসে এবং এই যুদ্ধটি হয়েছিল দামেস্ক বিজয়ের পর।

দামেস্ক অবরোধের স্থায়িত্ব নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। বিভিন্ন বর্ণনায় এই স্থায়িত্বের কালকে এক বছর, ছয়মাস, চার মাস ও ৭০ দিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমার মতে অবরোধটি প্রায় একমাস স্থায়ী হয়েছিল। এই অবরোধটি অনেক দীর্ঘ হলে হেরাক্লিয়াস অবশ্যই অবরুদ্ধ দুর্গটি উদ্ধারের চেষ্টা করতেন। হেরাক্লিয়াস ১৩ হিজরীর যুকাদ মাসে সংঘটিত ফাহলের যুদ্ধের জন্য একটি বিশাল বাহিনী সংগঠিত করেছিল। ঐ সময়ে দামেস্ক অবরুদ্ধ থাকলে সে অবশ্যই শহরটিকে উদ্ধারের জন্য রোমান বাহিনী সংগঠিত করতো। তদুপরি দামেস্কের মতো একটি দুর্গ ও শহরের বিশাল জনসমষ্টির জন্য দীর্ঘ মেয়াদী অবরোধের প্রস্তুতি হিসেবে যে পরিমাণ মজুদ গড়ে তোলা প্রয়োজন তার জন্য পর্যাপ্ত সময় রোমান বাহিনী পায়নি। আজনাদাইনের যুদ্ধের পর প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তারা মাত্র তিন সপ্তাহ সময় পেয়েছিল। দামেস্ক পূর্ব থেকে অবরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল না এবং মাত্র তিন সপ্তাহের প্রস্তুতি দিয়ে বিশাল জনসমষ্টি সমৃদ্ধ একটি দুর্গের পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী অবরোধ মুকাবিলা করাও সম্ভব নয়। এক্ষেত্রেও ওয়াকিদীর বর্ণনাকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

সবকিছু বিবেচনা করে পরিশেষে বলা যায় যে, দামেস্কের পতন হয়েছিল ১৩ হিজরীর রজব মাসের ২০ তারিখে বা কিছু আগে-পরে এবং অবরোধটির স্থায়িত্ব ছিল একমাস।

নোট-১৩ ঃ ইয়ারমুকের যুদ্ধে বাহিনীদ্বয়ের সৈন্য সংখ্যা

ইয়ারমুকের যুদ্ধে উভয় বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে । সাধারণত দেখা যায় যে, বর্ণনাকারীদের মধ্যে স্বীয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যা কম ও প্রতিপক্ষের বেশি করে দেখানোর একটি প্রবণতা বিরাজমান।

প্রথমে রোমান পক্ষের সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে একটি ধারণা নেয়া যেতে পারে। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে তা নিম্নরূপ ঃ

ক. তাবারী এক জায়গায় (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৯৮ যেখানে তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন) উল্লেখ করেছেন ২০০,০০০। আবার অন্যত্র (তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৪) ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ১২০০০ আর্মেনীয় ও ১২০০০ আরব খৃস্টানসহ মোট ১০০,০০০।

খ. বালাযুরীর মতে (পৃষ্ঠা-১৪০) রোমান সৈন্য সংখ্যা ছিল ২০০,০০০।

গ. ওয়াকিদী (পৃষ্ঠা-১০৭) রোমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে বাড়িয়ে বললেও শিকল ব্যবহারকারী সৈন্যের যে সংখ্যা (৩০,০০০, পৃষ্ঠা-১৩৯) উল্লেখ করেছেন তা যুক্তিযুক্ত। পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের মধ্যে গিবন (পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৫) এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন প্রাথমিক যুগের বায়যানটাইন উৎসগুলো থেকে। তাঁর মতে, রোমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ১২০,০০০ এবং এর মধ্যে ৬০,০০০ ছিল আরব খৃস্টান।

এই সংখ্যা উল্লেখের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেই অতিরঞ্জন আছে। তবে পশ্চিমা পক্ষে কম বলে মনে হয়, কেননা স্বীয় শক্তি সম্পর্কে প্রতিপক্ষের তুলনায় তাদের নিজেদেরই ভাল জানার কথা। রোমান পক্ষে ২,০০,০০০ সৈন্য সমাবেশের বিষয়টি আমরা বাতিল করতে পারি। কেননা তৎকালীন সময়ের অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সৈন্যদের চলাচল, রসদ সরবরাহ ইত্যাদি প্রশাসনিক বিষয়াদির কথা বিবেচনা করলে একটি যুদ্ধের জন্য এতো বিশাল একটি বাহিনীর সমাবেশ ঘটানো বাস্তবসম্মত মনে হয় না।

পশ্চিমা ঐতিহাসিকগণও রোমান সৈন্যসংখ্যা কম করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে রোমান বাহিনীর ইউরোপীয় অংশের সৈন্যসংখ্যা তারা কম দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাঁরা আরব খৃস্টানদের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন ৬০,০০০ যা আদৌ বাস্তবসম্মত নয়। দেখা যায় যে, আরব, ইয়েমেন, ইরাক ও উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত তৎকালীন গোটা মুসলিম রাষ্ট্রে সংগ্রহ করতে পেরেছিল মাত্র ৪০,০০০ সৈন্য, সেখানে আরবের শুধু সিরিয়ার অংশ কিভাবে ৬০,০০০ সৈন্য সমাবেশ করতে পারে? পশ্চিমা ঐতিহাসিকগণ হয়তো পরাজয়ের দায়-দায়িত্ব আরবদের উপরে চাপানোর জন্যই একাজটি করেছেন।

উভয় পক্ষের অতিকথন বাদ দিলে আমার বিবেচনায় রোমান বাহিনীর সংখ্যা ছিল ১,৫০,০০০। রোমান পক্ষের গোটা শক্তিকে সংগঠিত করা হয়েছিল পাঁচটি বাহিনীতে। প্রতিটি বাহিনীতে কতজন করে সৈন্য ছিল তাও সঠিকভাবে জানা যায় না। আমার ধারণা, বাহিনীগুলো মোটামুটি সমান শক্তিশালী ছিল এবং তাহলে তাদের

সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৩০,০০০ করে। আরব খৃস্টানদের সংখ্যাও ছিল অনুরূপ। অবশ্য এই অনুমানের মধ্যে কিছুটা ভ্রান্তি থাকতে পারে।

মুসলিম পক্ষের শক্তির উল্লেখ করতে গিয়ে, তাবারী এক জায়গায় (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা -৫৯২) উল্লেখ করেছেন ৪০,০০০ এবং মজুদ ৬,০০০। তবে অন্যত্র তিনি (তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৪) ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে এই সংখ্যা ১০,০০,০০ রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে ২৪,০০০ বলে উল্লেখ করেছেন। বালাযুরী (পৃষ্ঠা-১৪) ইবনে ইসহাকের সংগে একমত পোষণ করেন। তবে ওয়াকিদীর মতে, (পৃষ্ঠা-১৪৪) মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪১,০০০।

সবদিক বিবেচনা করে আমি মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ৪০,০০০ ধরে নিয়েছি। এতে একজন মুসলিম যোদ্ধার বিপরীতে রোমান সৈন্যের অনুপাত দাঁড়ায় চারজন।

নোট-১৪ ঃ ইয়ারমুকের যুদ্ধক্ষেত্র

ইয়ারমুকের যুদ্ধটি ঠিক কোথায় সংঘটিত হয়েছিল প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণ নির্দিষ্ট করে তা বলেননি। ফলে পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে মতামতের ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। কিছু ঐতিহাসিকের মতে ইয়ারমুক নদীটিই ছিল যুদ্ধের সম্মুখ রেখা, অন্য অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রটিকে স্থাপন করেছেন ইয়ারমুক প্রান্তরের কিছু দক্ষিণে। আবার কিছু লেখকের মতে, যুদ্ধক্ষেত্রটি ছিল ইয়ারমুকের পূর্ব দিকে। বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে।

নদীকে মাঝখানে রেখে কোনো যুদ্ধ সম্ভব নয়। আমি গিরিখাতটির যে বর্ণনা দিয়েছি তার দিকে একবার তাকালেই এর সত্যতা পাওয়া যাবে। অশ্বারোহী দলের পক্ষে বর্ণিত গিরিখাতটির খাড়া পাড় অতিক্রম করা সম্ভব নয়। পদাতিক বাহিনীর পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব হলেও, তা করতে হবে এক সারিতে এবং খুব সাবধানে। কাজেই ইয়ারমুক নদীকে সামনে রেখে যুদ্ধ হয়েছিল বলে যে মতামত আছে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইয়ারমুক নদীর দক্ষিণে একটি বিশাল আকারের যুদ্ধ কোনোভাবেই সম্ভব নয়। খাড়া পাহাড় চূড়া ও দুবাহুর মতো প্রবাহিত গিরিখাতের কারণে এ এলাকায় ছোটখাটো সংঘর্ষ হতে পারে অন্য কিছু নয়। খালিদ (রা) ইয়ারমুকের প্রান্তরের বর্ণনা দিয়েছিলেন, "অশ্বারোহী আক্রমণের জন্য উপযোগী সমতল প্রান্তর" বলে। তদুপরি যুদ্ধটি ইয়ারমুকের দক্ষিণে সংঘটিত হলে রোমান বাহিনীকে ওয়াদি-উর-রাক্কাদের দিকে ঠেলে না দিয়ে বরং ইয়ারমুক নদীতেই নেয়া হতো।

ইয়ারমুকের পূর্বে দারা নামক স্থানের উত্তরে যে সমতল ভূমি আছে, সেখানে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে। তবে প্রাথমিক যুগের বর্ণনায় এমন কোনো ইংগিত পাওয়া যায় না যে, যুদ্ধটি এখানে সংঘটিত হয়েছিল। বরং প্রাপ্ত তথ্যাদি এর

বিপক্ষেই কথা বলে। তদুপরি ওয়াদি-উর-রাক্কাদ হতে পূর্বের সমতল প্রান্তরটির দূরত্ব হবে ২০ মাইল (পূর্ব প্রান্তে রোমান বাহিনীর সম্ভাব্য বাম বাহু হতে)। যুদ্ধের বর্ণনা অনুযায়ী খালিদের পক্ষেও রোমান বাহিনীর বামবাহু অতিক্রম করে তাদেরকে ঠেলে ২০ মাইল দূরত্ব রাক্কাদে নেয়া একদিনের প্রতিআক্রমণে সম্ভব নয়।

আমি নিম্নের তথ্যাবলীর ভিত্তিতে ইয়ারমুকের রণক্ষেত্রটি বর্ণনা করেছি ঃ

ক. খালিদ (রা) আবু উবায়দা (রা)-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন আজরাকে পিছনে ফেলে সৈন্য মোতায়েন করতে। তার অর্থ দাঁড়ায় যে, মুসলিম বাহিনীকে মোটামুটি পশ্চিম মুখ করে দাঁড়াতে হয়েছিল।

খ. সৈন্য মোতায়েন শেষে আবু উবায়দা (রা) খলীফাকে লিখে জানিয়েছিলেন যে, মুসলিম বাহিনীকে "জাউলানের নিকটবর্তী ইয়ারমুকে মোতায়েন করা হয়েছে।" (ওয়াকিদী ঃ পৃষ্ঠা-১১৮)

গ. রোমান ক্যাম্পের অবস্থান ছিল জাউলানের নিকটবর্তী রাক্কাদে, লেক তিবেরিয়াস ও তার উত্তরের এলাকায়। এই অবস্থান ছিল মুসলিম ক্যাম্প হতে ১১ মাইল দূরে। আমার বর্ণিত যুদ্ধরেখার সামান্য পূর্ব দিকে।

ঘ. বর্তমানের নাওয়ার ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত সানেইন পাহাড়টি এখন জামুয়া (সমাবেশ) পাহাড় নামে পরিচিত। কারণ স্থানীয় লোকদের বর্ণনা ও বিশ্বাস মতে খালিদের বাহিনীর একটি অংশ এখানে সমবেত হয়েছিল। এই বিশ্বাসটি প্রত্যেকটি আরব দেশে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে এবং এর সাহায্যে ইয়ারমুকের যুদ্ধের সম্মুখ রেখা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

ঙ. খালিদ (রা) একদিনের মধ্যে রোমান বাম বাহু দিয়ে সৈন্য পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিআক্রমণ রচনা করে যে ভাবে প্রতিপক্ষকে ওয়াদি-উর-রাক্কাদে নিয়ে ধ্বংস করেছিলেন তা সম্ভব হতে পারে শুধুমাত্র ইয়ারমুকের সমতল প্রান্তরের মধ্যভাগ বা পশ্চিম মধ্যভাগ হতে।

চ. যুদ্ধের সম্মুখ রেখাটি আরো পূর্ব দিকে হলে মুসলিম বাহিনী ইয়ারমুকের প্রান্তরে দাঁড়াতে পারে না। মুসলিম বাহিনীর বামবাহু ছিল জালীনে। তদুপরি মুসলিম বাহিনী ইয়ারমুকের প্রান্তরে না দাঁড়ালে শেষ দিনের যুদ্ধের পূর্বের রাতে জাররারের পক্ষেও প্রতিপক্ষের বাহু অতিক্রম করে গিরিখাতটির অপর পাড়ে অবস্থান নেয়া সম্ভব হতো না।

তাই এটা নিশ্চিত হয়েই বলা যায় যে, এই গ্রন্থে ইয়ারমুকের যুদ্ধক্ষেত্রের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা কম-বেশি সঠিক। এ অবস্থান বড় জোর মাইল খানেক এদিক-সেদিক হতে পারে। তবে জাবুয়া পাহাড়ের অবস্থান নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং পাহাড়টি ছিল মুসলমানদের হাতে।

ইকাবা (উন্নয়ন)/২০০৩-২০০৪/অঃসঃ/৪৪৬১-৩২৫০

আল্লাহ্‌র তলোয়ার

[দি সোর্ড অব আল্লাহ]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ